বঙ্গদর্শন

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শন
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সম্পাদিত
THE NATIONAL LITERATURE CO.
CALCUTTA

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও ফাইন আর্ট প্রেস, ৭০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পঞ্চম হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সংখ্যার পুরোভাগে তাঁহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

মাসিক পত্র ও সমালোচন

৫ম খণ্ড বৈশাখ ১২৮৪ ১ম সংখ্যা
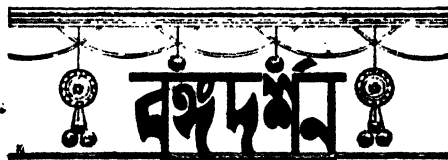
যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি-লাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন বা না করুন দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে সুশিক্ষিত

মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্র রূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক—ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হইল না। যতদিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্দ্ধা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীনবাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জীবন কালে আমি নবীনবাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও, গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবন জন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন ?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন ?" বলিতে হইবে না, যে এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলাম, তাও কি তোমার সইল না ?

বালিকা বলিল, "সবে কেন ? এখনই আবার খাই খাই ? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন।"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম ?

"কেন এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ।"

"জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালির ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠি বদ্‌হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটী অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।"

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গ-

মুঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাঁহার পিতা মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা।" সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কিছু কাল।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর, কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া, তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল, হাসি চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে, আর প্রভাতের বাতাসে মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপূর্ব্বে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্, ছপ্ ছপ্, ঝন্ ঝন্, খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল—অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা কি হবে!" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পর্দ্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিটকারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না—তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ—তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন—তাঁহার শাশুড়ী ননদ ছিল—তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১—আর শুনেছ বৌঠাকরুন?

নং ২—এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখন শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস! মাগিকে ঝাঁটাপেটা করে আসবো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌঠাকরুন বল—আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন করে জানবো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল, "আগে বল্‌না কি হয়েছে—তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১—বলিল—শোননি পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২—বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নং ৩—মাগির ঝাঁটা দিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বলবো বৌঠাকরুন বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫—ভিজে বেরালকে চিন্‌তে জোগায় না।—গলায় দড়ি!—গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করিলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এয়েছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই একজন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। একজনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন—কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি, এইজন্য যে এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে কথাটা কি। কি হয়েছে।"

তখন আবার চারিদিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহুকষ্টে, ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতা পরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্ত্তামহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল চুরি নহে ডাকাতি, কেহ বলিল সিঁদ, কেহ বলিল, না কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, "তার পর? কোন্ মাগির নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুনের আর কার?

নং ২—সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এয়েছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে!

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি?"

"কেন সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

তোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব!

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস ভ্রমর ইহার নির্দ্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই তিনি কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব কেন তুমি রোহিণীর দিকে?"

ভ্র। কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভোমরা কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও!"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাহার বসন ধরিল—"কোথা যাও?"

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এবার বলিব।

গো। বল দেখি।

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখ-চুম্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখ-চুম্বন করিলেন।*

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্‌নদ করিয়া বসিয়া, সোনার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমা ওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর একপাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহুরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে, অধোবদনা, অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জেঠা মহাশয়?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি? শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজ ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা। কেন না ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ—তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠ তাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জেঠা মহাশয়?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কানে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জেঠা মহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগির চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গতরাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি।

বোধ হইতেছে, এ মাগি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ। ও আর বলিবে কি? বলে তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণি!"

রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি।"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্‌জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি। আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল রোহিণি?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি।"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে?"

কৃষ্ণকান্ত। কি?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখ্‌ছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে? কেন ছাড়িব?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে, আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠির মুণ্ডু কর্‌বে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নন্দীকে বলিলেন, "ওরে! একে সঙ্গে করিয়া একজন চাকরাণী দিয়া মেজ বৌ-মার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্ যেন পলায় না।"

নন্দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া, ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোম্‌রা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি, রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে, একটি রূপকথা বল না।"

এদিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশ্বাস করিয়া বলিবে কি?"

বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীবন্তে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্যা। বলিল, "কর্ত্তার

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি?

রো। বলিয়া কি হইবে?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখন কখন বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "বুঝি বিধাতা তোমাকে এত গুণেই গুণবান্ করিয়াছেন। নহিলে আমি তোমার জন্য মরিতে বসিব কেন? যাই হৌক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার জোড়া নাই। যাই হউক এ কাতরা—ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা উচিত নহে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি পারি কর্ত্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন?

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—এই বলিয়া, রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গরুদ্ধ কৃষ্ণ তড়াগ-

আনিতে বলুন, আমি বৌঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকল গুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণি। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এইবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শতসহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যেদিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া আসল উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রুকুটী করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী বলিল, "তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে একহাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন আমি আনিয়া দেখাইতেছি।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?"

রো। আসল উইল রাখিয়া জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। আমি ত তোমায় কোন টাকা দিই নাই—তবে কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে?

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহুকষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "না—টাকা দেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখন পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখন পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোহিণি?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি, রোহিণি?

রো। কি? ইহজন্মে, আমি বলিতে পারিব না—কি। মেজবাবু—আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়িতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন—আমায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন। তারপর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না। তাঁহার হৃদয় সমুদ্র—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, "রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন? আমার কথা শুন—আগে বড় বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও—সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিব। তারপর—"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না?"

গো। তারপর, তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করাইতে পারিবে না?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করাইবে কে? তিনি আমাকে সহজে ছাড়িবেন কেন?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য। তোমার জন্য, কর্ত্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজল নয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে, কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

রাজা অথবা রাজস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলের দ্বারা উত্তেজিত কি উৎপাতিত হইয়া প্রকৃতিবর্গ বিদ্রোহ উপস্থিত করে, ও তদ্দ্বারা সকল প্রণালী পরবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনাকে রাষ্ট্রবিপ্লব কহে।

পৃথিবী মধ্যে আসিয়াখণ্ডের প্রজাগণ অনেকাংশে নিরীহ ও উৎসাহহীন। তথাচ এখানেও মধ্যে মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আধুনিক ইউরোপ মহাখণ্ডের অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে ও উত্তর আমেরিকায় যে একবার ঐ সংক্রান্ত তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহাই ইতিহাসের ষবিশে আলোচ্য।

লোকে কথায় বলে রাজার পাপে রাজ্যনাশ। কি পাপে রাজার রাজ্যনাশ হয় তাহা রাজা প্রজা, উভয়েরই সর্ব্বথা বিচার্য্য। ফলতঃ যখন প্রকৃতিমণ্ডলী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একবার উত্থিত হয়, তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। উচ্চ পদবীর লোকেরা প্রকৃতি সাধারণের বিদ্রোহ-স্রোতে ভাসিয়া যান। সে বেগ সম্বরণ করা কাহার সাধ্য? ঐরাবতও ভাগীরথীর ভীষণ বেগে গা ঢালিয়া দিয়া থাকে। তরঙ্গাঘাতে উভয় কূল কম্পিত হইতে থাকে। উচ্চ নীচ ও নীচ উচ্চ হয়। কোথাও নূতন দ্বীপ সৃষ্টি, কোথাও পুরাতন উত্তুঙ্গ গিরিরাজি বিদারিত ও খণ্ডীকৃত হইতে থাকে। ফলতঃ সুষুপ্ত প্রকৃতি অতি কোমল ও সহিষ্ণু, কিন্তু একবার উত্ত্যক্ত ও জাগ্রত হইলে আর নিস্তার নাই। শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন, সামাজিক রীতি নীতির বিপর্য্যয় ও লোকের অবস্থাগত অনেক তারতম্য ঘটিয়া উঠে। কি পাপে এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইতিহাস সমালোচন দ্বারা তাহা জানা যায়।

ইংরেজ নৃপতি দ্বিতীয় চার্লস্ ইতিহাসকে মিথ্যাবাদী বলিতেন। কিন্তু সত্যের আশ্রয় ব্যতীত মিথ্যা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। ইতিহাস স্থায়ী ও লোকসমাজে আদৃত; সুতরাং ঐতিহাসিক মিথ্যা কথা যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ম্মিত, তাহাতে সংশয় নাই। ইতিহাসে প্রকৃতি ও পার্থিব উভয়েরই চরিত্র ও

কার্য্যগত অনেক সত্য কথা জানিতে পারা যায়। ইতিহাসে পূর্ব্বাপর দেখিলেই কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত তাহা প্রতীয়মান হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস্ ও স্পেন রাজ্যে, যে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে ক্রমান্বয়ে তাহা আলোচিত হইতেছে। উল্লিখিত দেশসমূহের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রথমে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল, অতএব তাহার বিষয় প্রথমেই বিবৃত হইতেছে।

কখন কখন কোন দেশে বিদ্যার চর্চ্চার দ্বারা অথবা নূতন ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে স্বাধীন-চিন্তার উদয় হয়। ঐ চিন্তা দ্বারা ক্রমশঃ প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইয়া আচার ব্যবহার সংস্করণকার্য্যে নীত হয়। এইরূপে দেশে সমাজ-বিপ্লব ঘটে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজকীয় দোষের আলোচন ও সংশোধনের চেষ্টা হইতে থাকে। সকল লোকের একাগ্রতা জন্মে। রাজা প্রতিবাদী হইলে পদচ্যুত হন, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অপদস্থ অথবা তাড়িত হন। সুতরাং রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া যায়। কখনও বা সমাজবিপ্লব পরে ঘটে। কেবল রাজ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন। কোন কোন স্থলে প্রজারা ধনাঢ্যদিগের সহায়তায় কি বিনাসাহায্যে বিপ্লব উপস্থিত করে। ক্রমে নূতন পদ্ধতিতে সমাজ সংস্থাপিত হইতে থাকে।

প্রথমে ইংলণ্ডের নর্ম্মান্ বংশীয় রাজারা উচ্চ ও ধনাঢ্যদিগের সহায়তায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীরা রাজবলকে সঙ্কোচিত রাখিয়াছিল। তাহাদিগের অমতে রাজা কিছুই করিতে পারিতেন না। রাজা জন, তাহাদের প্রভাবে প্রজাদিগের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলতঃ রাজা উভয়ে ভূম্যধিকারীদিগের সহায়সাপেক্ষ ছিলেন। যেদিকে তাহারা থাকিত সেই দিকেই জয়। কালক্রমে ভূম্যধিকারীরা রাজাকে বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ভূম্যধিকারীতে ভূম্যধিকারীতে ঈর্ষ্যা ও বিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল; "গোলাপের যুদ্ধ" নামক বিবাদে নর্ম্মান বংশীয়গণ দুই দলে বিভক্ত হইল। ঐ বিবাদের অবসান হইতে হইতে ভূম্যধিকারীরা প্রায় উন্মূলিত ও ধরাশায়ী হইলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা নিস্তেজ ও ধনহীন হইলেন। রাজার একাধিপত্য হইল। টুডর বংশীয় রাজারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজারা সহ্য করিল। তৎপরে ষ্টুয়ার্ট বংশ। তাঁহারা আরও অত্যাচারী। ইতিমধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা জ্ঞানোন্নতি হইতে লাগিল। নূতন ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা প্রজারা ঐকমত্য লাভ করিল—অধ্যবসায় বৃদ্ধি হইল। প্রজার চক্ষু ফুটিল। তখন রাজা প্রথম চার্লস্। পদে পদে প্রজারা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডের গৃহে গৃহে অনল জ্বলিল। রাজা মিথ্যাবাদী, রাজা ধনলোভী, রাজা স্বয়ং বিধিবিহীন, স্বেচ্ছাচারী, তথাচ রাজা সাক্ষাৎ দেবতা। বড়লোকেরা

রাজার দোষ দেখিতে পাইলেন না। আর পাইবেনই বা কেন? রাষ্ট্রবিপ্লব হইলে সমাজবিপ্লব হইবে; তাঁহাদিগের ধন, মান, কুল সকলই যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। রাজদণ্ড লৌহের হইলেও রাজদণ্ড, তাহার আঘাত সহনীয়। মূর্খ ইতর লোকের আঘাত কি সহ্য হয়? ওপক্ষে প্রজাসাধারণ-ক্লেশের সীমান্ত লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধে জয় হয় ভাল, না হয় অধিক ক্লেশের সম্ভাবনা কি? অতএব রাজায় প্রজায় যুদ্ধ হইতে হইতে প্রজায় প্রজায় মর্ম্মান্তিক হইল। বহুদিন ব্যাপিয়া নররক্তে দেশ প্লাবিত হইল। ক্রমে রাজার প্রাণদণ্ড হইল। তখনও অনল নিবিল না। সৈনিকেরা প্রজা-প্রতিনিধিদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিল। অবশেষে সেনাপতি ক্রমওএল একাধিপত্য লাভ করিলেন।

উদ্বেলিত সাগর কৃত্রিম বাঁধে আবদ্ধ থাকেনা। পুনর্ব্বার রাজতনয় ইংলণ্ডে আহূত হইলেন। কিন্তু তিনিও "বাপ কি বেটা।" প্রজারা প্রথমে সহ্য করিল বটে, কিন্তু একবার চক্ষু ফুটিলে মুদিত হওয়া ভার। দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেম্‌স্ রাজা হইলেন। তিনিও অত্যাচারী। বলদ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিলেন। প্রজারা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় উইলিয়ম প্রজা দ্বারা আহূত হইয়া সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। ক্রমে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর সোপান গঠিত হইতে লাগিল। এক্ষণে প্রজাপ্রতিনিধিগণ রাজকার্য্যের প্রধান অবলম্বন হইয়াছেন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহাই কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিয়া, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে নবীন ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং বইন নদীর তীরে দ্বিতীয় জেম্‌সের পরাজয় দ্বারা সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালীর প্রকৃষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। ইংরাজেরা সাধারণতঃ প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষপাতী। এই জন্যই কেবল অদ্যাপি বিপ্লবের ঐ পর রাজপদের লোপ হয় নাই। তথাচ দ্বিতীয় জেম্‌সের বংশ আর ইংলণ্ডে আসিতে পান নাই। প্রজাদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। রাজার ধনতৃষ্ণা হ্রাস হইল। আজ এক কথা কাল অন্য, আর হইল না। করগ্রহণ, আয়ব্যায়, প্রজার মতসাপেক্ষ হইল। অতএব মন্দ রাজাকর্ত্তৃক পরিণামে ইংরেজদিগের উপকার দর্শিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লব তাহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইয়াছে। এমন ফল আর কুত্রাপি ফলে নাই। ফলতঃ যে দেশের লোক প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ, সে দেশে বিপ্লব দ্বারা অনিষ্ট অল্প হয়; কারণ অনেক বিবেচনার পর নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়।

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী এলিজেবেথের পূর্ব্বেই সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইতেছিল; বিপ্লব দ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে শাসনপ্রণালীতে দুইটী দল লক্ষিত হইল। প্রাচীন ও নব্য অথবা আদি ও

উন্নতিশীল। একদল চলিত প্রণালীর পোষক, একদল নূতন প্রবর্ত্তক। এই দুই দল অদ্যাপি "কমন্‌স" অর্থাৎ প্রজা প্রতিনিধিদিগের মধ্যে লক্ষিত হইতেছে এবং ইহাদিগের অন্যতর ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

প্রকৃতিবৃন্দ উন্নতমনা ও স্বাধীনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক এই অবধি আপনাদের স্বত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। উচ্চ ও ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকেরা ও রাজারা তাহাদের সহায়তা আকাঙ্ক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব পাইল। এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজারা প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলেন। এমন কি ক্রমে ক্রমে সেই ভাব বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে কোন ধর্ম্মই রাজরক্ষিত হইবে না এইরূপ কল্পনা হইতেছে। বস্তুতঃ তদানীন্তন প্রজারা আপনাদের ধর্ম্মপ্রণালীর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজরক্ষিত প্রণালীর বিপক্ষ। এই দলের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের বংশধরেরা খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতালাভ ও মানরক্ষার্থ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা "ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স" অর্থাৎ "মিলিত রাজ্য" স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার লোকেরা দুইবার ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। অতএব যে বিষবৃক্ষের বীজ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজারা প্রজাপীড়ন দ্বারা রোপিত করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে প্রথম জলসিক্ত ও পালিত করিয়াছিলেন তাহার ফল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে হানোবর বংশীয় তৃতীয় জর্জ্জ ভোগ করিলেন।

খৃঃ ১৬৪২ হইতে ১৬৬০ পর্য্যন্ত ও পুনরায় ১৬৮৮ হইতে ১৬৯০ পর্য্যন্ত রাজ-পীড়নে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তাহাতে প্রজাপক্ষও কথঞ্চিৎ পাপী ছিল। কেন না তাহারা উত্তেজিত হইয়া রাজার প্রকৃত স্বত্বেরও হন্তা হইয়াছিল। রাজাও মরিলেন প্রজারাও মরিল। ইংলণ্ডের অনেক পরিবার একেবারে কালগ্রাসে পতিত হইল। অনেক পরিবার নিঃস্ব হইল। কেহ কেহ দেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর আমেরিকার ভীষণ অরণ্যে হিংস্র জন্তু ও বন্যজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে রাজার রাজ্য-নাশ, প্রজার বনবাস হইল। রাজবংশ তাড়িত, প্রজার কেহ কেহ পলায়িত। রাষ্ট্রবিপ্লবের এই ফল ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল। ইহাতেও অনিষ্টের ভাগ অল্প। অন্যদেশে এতদপেক্ষাও গুরুতর।

কথিত সময়ে সমাজ দুই দলে বিভক্ত হইল। এক দল বেশবিন্যাস করিতে, দীর্ঘ চাঁচর রাখিতে, গন্ধাদি সেবনে, নৃত্য, গীত বাদ্য করিতে সর্ব্বদা তৎপর। সুরাপান ও পরদার বহুল পরিমাণে ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্, ফরাশী সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইয়ের আশ্রিত হইয়া তৎসভাস্থ অসৎ লোকের সংসর্গে এই সকল দুর্ম্মতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গও তদনুরূপ

হইলেন। যখন ১৬৬০ খৃঃ অব্দে রাজা ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন হইতে দেশের ধনাঢ্য ও ভূম্যধিকারীরা ঐরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইলেন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, সত্যবাক্য তাঁহাদিগের নিকট কবিকল্পনাসম্ভূত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ দাতা, উদারস্বভাব, বিদ্যোৎসাহী, সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তাৎকালিক ইংরেজি কাব্য নাটকাদি তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এদিকে অন্যদল বেশভূষায় প্রতি বিরক্ত, ধর্ম্মানুরক্ত, ধর্ম্মকথানুরক্ত ও আড়ম্বর-ত্যাগী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মের ভাণ করিতেন মাত্র, গোপণস্বভাব ও ক্রূর ও দ্বেষী ছিলেন। নাটকের চিত্রকার্য্যের ও ভাস্কর্য্যের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তবে মিল্টন ও বনিয়ান এই দলের লোক হইয়াও উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বটে। ফলতঃ এই রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরেজি সাহিত্যসংসারেও বিপ্লব ঘটিয়াছিল। প্রথমদলস্থ কবিরা ফরাসীদিগের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আদিরসের ঘটা আরম্ভ হইল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় যে অসাধারণ মানব-চরিত্রজ্ঞ সেক্ষপিয়র প্রভৃতি কবিকুলচূড়ামণিরা ইংরেজি সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তৎপরিবর্ত্তে আদিরসঘটিত গল্পের ঘটা কখন বা শব্দের ছটা ও ছন্দোলালিত্যের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। ইঁহাদিগের মধ্যে ড্রাইডেন ও অটওএ উৎকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই অবধি কাব্যের সারভাগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কবিরা ক্রমে ক্রমে ছন্দের উৎকর্ষের প্রতি যত্ন করিতে লাগিলেন। শব্দমাধুরিতে এই দলপ্রসূত ইংরেজ কবি পোপ কিছুদিন পরে সাধারণ নিকৃষ্ট কাব্যকারের আদর্শ হইয়াছিলেন। পোপ ইংরেজি ভারত। পোপের অনুকরণে ইংরেজি সাহিত্য কিছু কালের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। অতএব ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রবিপ্লব ইংরেজি সাহিত্যের অঙ্গে চিরকালের জন্য কলঙ্কচিহ্ন স্থাপন করিয়াছে, কিছুতেই তাহা মুছিবে না। পোপের অন্যান্য গুণে তিনি আদরণীয় থাকিবেন, কিন্তু দোষগুলি কাহারও ভুলিবার নহে।

সাহিত্য জাতিচরিত্রের আদর্শ। যে জাতিমধ্যে যেরূপ সাহিত্যের আদর সে জাতির চরিত্র তদনুরূপ। যেখানে আদি ও হাস্যরস আদরের সামগ্রী, সেখানকার লোক কি চরিত্রের, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইংরেজচরিত্রে এককালীন যে কলঙ্করেখা পড়িয়াছিল ইংরেজি সাহিত্যে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারে ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল ইংরেজ সমাজে, শাসনপ্রণালীতে, আচার ব্যবহারে ও সাহিত্যে সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে।

যখন প্রাচীন পদ্ধতিপ্রিয় ইংরেজদিগের মধ্যেও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল সমাজের অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে তখন উদ্ধতপ্রকৃতি জাতিগণের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজে যে একপ্রকার প্রলয় উপস্থিত করে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে

রাষ্ট্রবিপ্লব সর্ব্বথা অবিধেয় এরূপ বিবেচনা করা অনুচিত। যেমন জড়প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশীভূত, সেইরূপ মনুষ্যদিগের মনও নিয়মের অধীন এবং সমাজ ও রাজ্যপ্রণালী মনের অধীন; অতএব যে যে কারণ দ্বারা সমাজের মানসিক পরিবর্ত্তন হয় তদ্দ্বারা বিপ্লব ঘটে। ফলতঃ সর্ব্বত্র নিত্যই সমাজমধ্যে বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। অতএব বিপ্লব অনিবার্য্য। কোন না কোন সময়ে সকল দেশেই বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। বিপ্লব ত্রিধা। ধার্ম্ম্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। কেবল দেখা উচিত যে ইহার মধ্যে কোনটাই ভয়ানক না হয়। বিপ্লব যেখানে কোমল-মূর্ত্তি ধারণ করে সেখানেও যে সহজ তাহা নহে। রাজার কর্ত্তব্য যাহাতে প্রজাদিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি উত্তেজিত না হয় তাহারই চেষ্টা পান। প্রজার কর্ত্তব্য রাজার শাসনেচ্ছা অপ্রকৃত বলধারণ না করে। উভয়ের সামঞ্জস্য যতদিন থাকে ততদিন বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে না। রাজার বিবেচনা করা উচিত যে আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখায় বসিয়া আছেন, কোন্ দিন অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহার নিশ্চয় নাই। প্রজা দেখিবেন যে যেমন স্নিগ্ধচ্ছায়াদায়িনী মেঘমালা আরোহণে বজ্রপাণি বাসব বিরাজ করেন, রাজগণও তদ্রূপ; প্রজাগণ, রাজমহিমার শীতলচ্ছায়ায় থাকিয়া বজ্র দেখিতে পায়না। কিন্তু মন্দ্রধ্বনিতে কম্পিত করেন মাত্র, মনে করিলে তাড়িতাঘাতে মস্তক চূর্ণ করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে বিশ্ববিধাতার প্রত্যক্ষ উপদেশ অবহেলন করিয়া নিত্য নিত্যই আমরা বিপদে পড়িতেছি। ইতিহাসের সৃষ্টি পর্য্যন্ত এখনও রাজা বা প্রজা কেহই শিখিল না। অথবা এই কৌশলে তাঁহার কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে। মনুষ্যবুদ্ধি ততদূর দৃষ্টিসম্পন্ন নহে। মেকিয়াবেলির দুশ্চেষ্টা, বিস্মার্কের কৌশল, পিটের দূরদৃষ্টি ও মেজারিণের মন্ত্রণা অপরিহার্য্য প্রকৃতিনিয়মের নিকট হেঁটমুণ্ড হইয়া থাকে। একজন বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞের কৌশল সমাজকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না। উভয়ের মিল নহিলে যত চেষ্টাবৃদ্ধি হয় তত ফল অল্প হয়। সুচতুর রাজা এইটী বিবেচনা করিয়া চলিলেই ভাল।

জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই। বিদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের কেহই আদর করেন নাই, এবং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়দ্দিবসের জন্য উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সারহীন ও নিস্তেজ, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ইহা বৈদেশিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ্‌ সিয়াঙ্‌ শ্বেতাম্বর জৈন ও ভিক্ষুমণ্ডলীর বিবরণ তাঁহার সিংহপুরভ্রমণবৃত্তান্তমধ্যে লিখিয়াছেন, এবং অপর একস্থলে তিনি ভারতবর্ষের "চিং লিয়াঙপু" বা সম্মিত্য সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়কে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা জৈনমতের অপর নাম সম্মিতি, সুতরাং তাঁহার মতে 'সম্মিত্য" সম্প্রদায় জৈনভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নহে। এই চীনদেশীয় পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীয় প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিনশত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধেরা বারানসী হইতে কাঞ্চীতে অবস্থিতি করিয়া সুগতের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তথায় শ্রবণ বেলিগোলা হইতে অকলঙ্ক নামক একজন জৈনধর্ম্মে সুপণ্ডিত যতি আগমন করত তথাকার বৌদ্ধ-ভিক্ষুকগণকে বৌদ্ধনৃপ হিমশীতলের সম্মুখে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নৃপতির সাহায্যে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই নবধর্ম্মের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমাচার্য্য এইরূপে কুমারপালকেও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গুজরাটে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। মহীশূরের হম্চা নামক গ্রামের জৈন নৃপতির তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন ৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বের কোন প্রামাণিক জৈন শাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেলাল রাজগণ ও

বিজয়নগরের নৃপতির রাজ্যশাসনকালে ১৬০০ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম উক্ত রাজ্য সমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগণ্ড ও বেলাপোলমের বৌদ্ধমন্দির সমূহ ১১০০ খৃষ্টাব্দে জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন নৃপতি বিজ্জলকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। আমরা ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের জৈনধর্ম্মের সমুন্নতির প্রামাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক উইলসন ও কর্ণেল মেকেঞ্জি ইহার পূর্ব্বের জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্কলন করিতে পারেন নাই ; ভদ্ভিন্ন জৈন মাহাত্ম্য সমূহ জৈনধর্ম্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, তাহা হইতে অণুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুধর্ম্ম জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। জম্বুস্বামী তাঁহার শিষ্য এবং শেষ কাবলি। তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্র সূরি, যশোভদ্র সূরি, সম্ভূতিবিজয় সূরি, ভদ্র বহুসূরি, স্থূলভদ্র সূরি এই ষড়শ্রুত কাবলি ও আর্য্য মহাগিরি, সুহস্তিসূরি, আর্য্য সুস্থিট সূরি, ইন্দ্রদীন সূরি, দীপ্ত সূরি, সিংহগিরি সূরি, বজ্রস্বামী সূরি নামক দশ-পূর্ব্বি দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর পরে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রুতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রুতকাবলি ও দশপূর্ব্বিগণ জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। তাহার পরে আচার্য্য হেমচন্দ্র এই ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন।

আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈননীতির স্থূল স্থূল বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা অর্হৎ। ইনি দক্ষিণ কর্ণাট নিবাসী এবং বেঙ্কটগিরির অধীশ্বর। অর্হৎ নৃপতি ঋষভদেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত ধর্ম্মগুরু হইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মত তাঁহার পরে সৃষ্টি হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপে জৈনধর্ম্মের প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ঋষভদেবের বিষয় লিখিত আছে। ইনি হিন্দুদিগের মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা ইহাকে প্রথম আর্হৎ বলিয়া জানেন। অর্হৎ নৃপতি ঋষভদেবের চরিত্র আদর্শ করত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে আর্হৎ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে ঋষভদেব অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা।

জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন 'অর্হৎ'ই পরমেশ্বর। বীতরাগস্তুতি নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কর্ত্তাস্তি নিত্যো জগতা স চৈকঃ সসর্ব্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাস্ত হেয়াঃ কু বিড়ম্বনাঃ স্যুস্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্তম্॥"

এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা আছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্বাধীন, তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্য সমস্তই বিড়ম্বনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বিলসিত। হে অর্হন্! তুমি যাহার শাস্তা বা নিয়ন্তা নহ, এমন কোন বস্তুই নাই।

জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদান্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। জৈনেরা পরমেশ্বরকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখেন—

সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদিচ দেবোঽর্হন পরমেশ্বরঃ॥
(অহংচন্দ্র সূরিকৃত আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার)

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষজয়ী, ত্রিলোকমান্য, সত্যবাদী (অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ) অর্হৎ দেবই পরমেশ্বর।

ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তির সাধন! ধর্ম্ম দ্বারা বন্ধক্ষয় হইলেই জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাবপ্রাপ্ত হয়। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধ গমন। জৈনেরা এইরূপ বলেন, যথা—

"মৃত্তিকাবিলিপ্তমলাবু দ্রবাং জলেহধঃ পততি—
পুনরপেত মৃত্তিকাবন্ধং সৎ ঊর্দ্ধংগচ্ছতি
তথা কর্ম্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্ত আত্মা অসঙ্গত্বাং ঊর্দ্ধং গচ্ছতি।"

জৈন আচার্য্যবৃন্দের এই মতপ্রকাশক শ্লোক, যথা—

"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে আলোকাকাশমাগতাঃ।"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের আকাশ বা ঊর্দ্ধগতির সীমা আছে—তাহারাও ঊর্দ্ধগমন করে এবং পুনশ্চ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে, কিন্তু যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর নিম্নে প্রত্যাগত হয় না। আত্মার স্বভাবই সতত ঊর্দ্ধ গমন। দেহরূপ পাপভরে আত্মা অধঃপতিত আছেন—উহার খণ্ডন হইলে আত্মা স্বীয় স্বভাব ধারণ করে, সুতরাং অনন্ত আকাশ—উন্নতিও অনন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে যেমন অলাবু ফলকে মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অথবা গুরু বস্তু বাঁধিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভাসমান স্বভাব হইলেও নিম্নে ডুবিয়া যায়; পুনরায় সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বভাব জন্য অতলস্পর্শ সমুদ্রের নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। ইহাও ঠিক সেই মত।

এই মতে দুটী মাত্র মূলতত্ত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব। তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব আর অবোধাত্মক অজীব। এই দুই তত্ত্বের বিস্তার বহুবিধ; যথা পদ্মনন্দী বাক্য—

"চিদচিদ্‌ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্‌।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ঐ জীবাজীব পদার্থের ভেদ এইরূপ—জীব দ্বিবিধ—সংসারী জীব এবং মুক্তজীব। অজীব বহুবিধ যথা—অমনস্ক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্‌গল (শরীর), অস্তিকায় (তত্ত্ব) প্রভৃতি। জৈনেরা বৃক্ষলতাদিকেও জীবত্ব পদার্থ মধ্যে গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের মন নাই।

এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ত্ব ৭ "জীব, অজীব, আস্রব, সংবর, নির্জর, মোক্ষ, বন্ধ। এতন্মধ্যে আস্রব, সংবর, নির্জর এই তিন প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতেছে, অন্যগুলি স্পষ্টার্থ।

আস্রব—জঠরাগ্নি বা শারীরিক তাপবলে দেহের চলন হয়। তাহাতে আত্মাও সচল হয়। নিশ্চল নিষ্ক্রিয় আত্মার ঐরূপ চলন অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব ঘটনা হওয়ার নাম যোগ। এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আত্মা বদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ যোগভাবের নাম আস্রব। কেবল ঐ যোগভাব হইতেই নানাবিধ কর্ম্ম স্রবিত হয়। যেমন আর্দ্র বস্ত্রেই ধূলা জড়ায়, সেই মত আস্রবার্দ্র আত্মার নানাবিধ কর্ম্ম (পাপ) জড়ায়, সুতরাং আত্মা মলিন।

সংবর—যে কার্য্য দ্বারা আত্মার আস্রব অর্থাৎ আর্দ্রভাব নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সংবর।

নির্জর—যে কার্য্য দ্বারা আত্মার সংসার ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয়, তাহার নাম নির্জর।

জৈন তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন—

"সংসারবীজভূতানং কর্ম্মাণাং জরণাদিহ।
নির্জরা সংস্মৃতাদ্বেধা সকামা কামবর্জিতা
স্মৃতাসকামা কাঙ্ক্ষিনামকামাত্মদেহিনাম্‌।"

জৈনতত্ত্বজ্ঞানীরা বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, যথা—

"আস্রবো বন্ধহেতুঃস্যাত্‌ সংবরো মোক্ষকারণং।
ইতীয়মার্হতী মুষ্টিরন্যা দাস্যাঃপ্রপঞ্চনম্‌।"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আস্রবই জীবের বন্ধন হেতু এবং মুক্তির হেতু সংবর।

মুক্তি—"নিঃশেষ কর্ম্মবন্ধোচ্ছেদাদসংগতত্বেনাবস্থানম্‌ মোক্ষঃ"—

কর্ম্ম জন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে জীব যে আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অসঙ্গতভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ।

জৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্হতের বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষ পথ নির্দ্দিষ্ট আছে—

'সম্যগ্‌দর্শন জ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ'

সম্যগ্‌দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র এই তিনটী মোক্ষের পথ। ইহার বৃত্তিকর্ত্তা যোগদেব ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন—

"যেন রূপেণ জীবাদ্যর্থো ব্যবস্থিতাস্তেনরূপেণ অর্হতা প্রতিপাদিতেঽর্থে বিপরীতাভিনিবেশরাহিত্যরূপং শ্রদ্ধানং সম্যক্‌ দর্শনম্। যেন স্বভাবেন জীবাদয়ো ব্যবস্থিতাস্তেনৈব স্বভাবেন সংশয় সংমোহ জীবস্য গুরূপদিষ্ট শ্রবণ মননা-ভ্যাসপাঠবেন জ্ঞানিবরকাণাং পূর্ব্বোপপাদিত মিথ্যা দর্শনাবিরতি প্রমাদীনামুপ-শমে সতি স্বয়মেব সমূহেতি। সংসরণচ্ছেদায়োদ্যতস্য শ্রদ্দধনস্য জ্ঞানবতো জীবস্য পাপ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ সম্যক্‌ চারিত্রম্।

"এতানি সম্যক্‌ জ্ঞানাদীনি সমুদিতান্যেব মোক্ষকারণং।
নতু প্রত্যেকং। এতত্রয়ং চার্হতৈ রত্নত্রয় পদেন ব্যবহ্রিয়তে।"

অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ যেরূপ ব্যবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের যাহা ঠিক্‌ তত্ত্ব অর্হৎ অবিকল সেইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। অর্হতের উপদেশ যেরূপ, তাহার বিপরীত অনুভব না হইয়া যদি ঠিক অর্হৎ নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্যগ দর্শন বলা যায় এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহ রহিত হইয়া দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্‌ জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করা যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্‌ জীবের গুরূপদেশ অনুসারে শ্রব্যা মনন দ্বারা অভ্যাসপটু হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আচরণ যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দর্শন প্রভৃতি বিলয় হইলে তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতই উদিত হয়। সংসারের কর্ম্ম সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্যত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্‌ জীব যে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে তাহার নাম সম্যক্‌ চরিত্র। অতএব জীব সম্যক্‌ দর্শন, সম্যক্‌ জ্ঞান, ও সম্যক্‌ চরিত্র, এতত্ত্রিতয় বলেই মুক্তি লাভ করে। ঐ তিনটী মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি করার ক্ষমতা নাই। ইহাকেই আর্হতেরা 'রত্নত্রয় নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জৈনদিগের কয়েকখানি দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যানুযোগতর্কণার রচনা প্রাঞ্জল। দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার গ্রন্থকার আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তিকালে এই মাত্র লিখিয়াছেন—

"সংজ্ঞা সংখ্যা লক্ষণাভ্যো বিভাগঃ
দ্রব্যাদীনাং যো বিদিত্বা মিথোঽত্র।
বাচস্তে শ্রীতীর্থনাথ প্রণীতাং
শ্রদ্ধাং কুর্য্যাদ্বিস্তারস্য বোধঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ প্রণীত বাক্যে যাঁহারা শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদিগের নিশ্চল অর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উৎপন্ন হইবেক। এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট গ্রন্থকর্ত্তাকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনাথ প্রণীত বাক্য বোধ হয় অর্হৎ বাক্য লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি তাহা না হয় তবে গ্রন্থকারের নাম তীর্থনাথ। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ-কর্ত্তার স্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভোজ। ইহাতে লিখিত আছে—

"তেষাং বিনেয় লেশেন ভোজেন রচিতোক্তিভিঃ।
পরস্বাত্ম প্রবোধার্থং দ্রব্যানুযোগতর্কণা॥"

যাঁহারা জৈনমুনি—তাঁহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য ভোজ কর্ত্তৃক আপন এবং পরের আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা প্রকট করা গেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিত আছে 'ভোজেতি সঙ্কেতেন সন্দর্ভ কর্ত্তুর্নাম নিদর্শনমিতি।' অর্থাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভ কর্ত্তার নামও ভোজ। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

"শ্রীযুগাদিজিনং নত্বা কৃত্বা শ্রীগুরুবন্দনম্।
আত্মোপ কৃতয়ে কুর্ব্বে দ্রব্যানুযোগ তর্কণাম্॥"

শ্রীযুগ প্রভৃতি জিনকুলকে নমস্কার করিয়া শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিয়া আপনার উন্নতির নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা নির্ম্মাণ করিলাম। দ্রব্যানুযোগতর্কণা এবং তট্টীকাধৃত জৈনগ্রন্থের নামাবলী।

পঞ্চকল্প, (ভাষ্য গ্রন্থ) ধর্ম্মদাস, (গ্রন্থকার) তত্ত্বার্থ সম্মতি, ষোড়ষ বাক্, উপ-দেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তার, বিংশতি, সম্মতিগ্রন্থ, অর্হৎপ্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহগাথা, নয়চক্র, ধর্ম্মসংগ্রহণী সূত্র, হরিভদ্র সূরিকৃত ধর্ম্মসংগ্রহণী টীকা, তত্ত্বার্থ ভাষা, দ্রব্যাথিক নয়, সিদ্ধসেন ও দিবাকর, (গ্রন্থকার) আচার সূত্র, ঋজুসূত্র, উত্তরাধ্যায়ন, নয়গ্রন্থ, যোগদৃষ্টি সমুচ্চয়, মহানিশীথ সূত্র, বৃহৎকল্পগাথা।

দ্রব্যানুযোগতর্কণা ১৫ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতাম্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেন না ইহাতে দিগম্বর মতের খণ্ডন আছে এবং ঋষভনাথকে সমধিক মান্য করা হইয়াছে।

জৈনমতে দ্রব্য বা পদার্থ ৬, হিন্দুদার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন কেহ ১৬, কেহ ১৪, কেহ ৭, পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহারই বিভূতি এই জগৎ এই কথা বলেন। সেইরূপ জৈনেরা ৬ পদার্থ স্বীকার করত তাহারই বিভূতি বা বিস্তার এই জগৎ বলেন—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নভঃ কালো পুদ্গলোজীব ইত্যমী।
অথাঃ ষট্ সময়ে খ্যাতাজিনৈর্বাভত্ত বর্জিতাঃ॥"

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়)

ধর্ম্ম (১) অধর্ম্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনন্ত কাল (৪) পুদ্গল অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব এই ৬ প্রকার পদার্থ জৈন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ। এই পদার্থনিচয় আদ্যন্ত বৰ্জ্জিত অর্থাৎ নিত্য।

"সম্যকৃত্বংহি দয়াদান ক্রিয়ামূলং প্রকীর্ত্তিতম্।
বিনা তৎ সঞ্চরন্ ধর্ম্মে জাত্যান্ধ ইব খিদ্যতে॥"

(ঐ ১০ অ)

কথিত ৬ দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বিচার দ্বারা যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মা সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যকৃত্ব এই সম্যকৃতার মূল দয়া (জীব রক্ষা) দান (অভয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চধা ক্রিয়া। অতএব এই সম্যকৃত্ব ত্যাগ করিয়া যিনি ধর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি জন্মান্ধের ন্যায় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল চারিত্র মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

ঐ ৬ পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য ৫টির অস্তিকায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়— "অস্তরঃ প্রদেশাঃ তৈঃ কথ্যতে শব্দায়তে ইত্যস্তিকায়ঃ" এই বুৎপত্তির দ্বারা প্রদেশ সংঘাতবৎ বস্তু বুঝাইতেছে। তট্টীকা যথা—"নমু কালা খ্যাস্তি কারত্বং কথং নাস্তি— তত্রাহ অপত্র সিত্রকালে কালদ্রব্যস্থ প্রদেশ সংঘাতৌ ন বিদ্যতে যত একঃ সময়ঃ অন্যস্মাৎ সময়াৎ ন প্রশ্লিষ্ঠতে এব মন্যেষামপি"—যেহেতু একটি সময় অন্য একটি সময় হইতে বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয় না এজন্য উহার সংঘাত বা প্রদেশ নাই।

জৈনেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে দেহের এবং জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন না। যথা—

"পরিণামি গতির্ধর্ম্মো ভবেৎ পুদ্গল জীবয়োঃ।
অপেক্ষা কারণাল্লোকে মীনস্যেব জলং সদা॥"

(ঐ ১০ অ)

অর্থাৎ যে প্রকার মৎস্যের গতি সঞ্চারণ হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ পরিণামের হেতু এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্ম্মদ্রব্য ও অধর্ম্ম-দ্রব্য।

জীব মুক্ত এবং সতত ঊর্দ্ধগমন স্বভাব; সুতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ ঊর্দ্ধ-গমন স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্ম্ম যদি না থাকিত, তবে অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই উদ্গত হইত—নিবৃত্ত হইত না অর্থাৎ তাহা হইলে এই সংসারে আর কোন দেহীই থাকিত না; আর যদি অধর্ম্ম না থাকিত তাহা হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে। যথা—

"সহজোপগমুক্তস্য ধর্ম্মস্য নিয়মং বিনা।
ক্বাপি গমনেংনন্তে ভ্রমণং ন নিবর্ত্তয়েৎ॥
স্থিতিহেতুর্যদাধর্ম্মো নোচ্যতে ক্বাপি চেদ্বয়োঃ।
তদানিত্য স্থিতিঃস্থানে কুত্রাপি ন গতির্ভবেৎ॥
(ঐ ১০ অ)

এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যানুযোগকার স্বমতের পদার্থ সকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন। টীকাকার সেই সকল বিচার ও হেতুবাদগুলি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। এই টীকার মধ্যে বিবিধ প্রাকৃত বা চব্বা ভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে। যথা—

"সম্মত্তাসমুত্তান নম্মহ কয়বণ্ণবং মিপড়ি
য়াইইয়ংজীবো বিস সুত্তোন নম্মংগউচিসংসারে।"
(উত্তরাধ্যয়ন)

"গিয়চ্ছো কেবলী চতুব্বিতে জ্ঞাননেয় কপনেয়
উল্লেয়াগবেষ অনন্ত করেস্‌স বজ্ঝপ বা।"
(বৃহৎকল্পগাথা)

ইত্যাদি মহানিশীথ সূত্র, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত জৈন দর্শনশাস্ত্র হইতে পদার্থ বিচার করা হইয়াছে।

যোগদৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

"তাৎকালিক পক্ষপাতভাব শূন্যাচ যাক্রিয়া।
অনয়োরেতরঃ জ্ঞেয়ঃ ভানুখদ্যোতযোরিব॥"

যোগপক্ষ নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিয়া এতদুভয়ের প্রভেদ সূর্য্য ও খদ্যোতের প্রভেদের ন্যায়। জ্ঞান সম্বন্ধে দ্রব্যানুযোগটীকাকার লিখিয়াছেন।

"জ্ঞানংহি জীবস্য গুণো বিশেষো জ্ঞানং ভবাব্ধে স্তরণে সুপোতঃ।
জ্ঞানংহি মিথ্যাত্বতমো বিনাশে ভানুঃ কৃশানুঃ পৃথু কর্ম্ম কক্ষে॥
জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দ রসং রহস্যং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তং॥
বাহ্যাচার পরাশ্চ বোধরহিতা ইজ্যাখ্য যোগোদ্ধতাঃ।
যে কেপি প্রতি সেবনা বিধুরিতাস্তে নিন্দিতা শাসনে॥"

অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নৌকা জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্ম্মরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্য, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। যাহারা রহস্য আচারে রত, ইজ্যাযোগ উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞান বিরহিত, তাহারা জৈনশাস্ত্রসম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।

জিনদত্ত সুরিকৃত বিবেক বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদিগের অভিমত নীতি গ্রথিত আছে। বিবেক বিলাস হইতে কতিপয় জৈননীতির বিষয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

বসতি যোগ্য স্থান—

"গুণিনঃ সুনৃতং শৌচং প্রতিষ্ঠা গুণগৌরবং।
অপূর্ব্বজ্ঞান লাভশ্চ যত্র তত্র বসেৎ সুধীঃ॥"

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য।

"বালরাজ্যং ভবেত্তত্র দ্বৈরাজ্যং যত্রবা ভবেৎ।
স্ত্রীরাজ্যং মূর্খরাজ্যং বা যত্র স্যাত্তত্র নো বসেৎ॥"

বালক, স্ত্রী, মূর্খ, যেখানে রাজা বা যেখানে দুইজন রাজা সেখানে বাস করিবে না।

ভ্রমণ—"ন ব্রজে ন্নিষ্ফলং কচিৎ" অর্থাৎ নিষ্ফল গমন করিবে না।

"একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেন্নৈকাকীনো গৃহে।
নৈবোপরি পথিনাপি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি॥"

একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী শয়ন, একগৃহে শয়ন করিবে না। উচ্চ স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা একা কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবে না।

"ন ধার্য্যমুত্তমৈ র্জীর্ণং বস্ত্রং নচ মলীমসম্।
বিনারক্তোৎপলং রক্তপুষ্পঞ্চ ন কদাচন॥"

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার রক্তপুষ্প ধারণ করিবেন না।

"দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাজ্ঞৈর্বঞ্চনীয়া কদাচন।
ভাব্যং প্রতিভূবানৈব দক্ষিণে নচ সাক্ষিণা॥"

যদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগকে প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষি হইও না—।

"বহিস্তোহভ্যাগতো গেহমুপবিশ্য ক্ষণং সুধীঃ।
কুর্য্যাদ্বস্ত্র পরাবর্ত্তং দেহ শৌচাদি কর্ম্মচ॥"

বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবে।

"পেষনী খণ্ডনী চুল্লী গর্গরী বর্দ্ধনী তথা।
অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণো ধর্ম্মবাধকাঃ॥"

পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার, (কুম্ভ) বর্দ্ধনী (পয়ঃ পায়িকাদি) এই পাঁচ ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ ঐ সকল হিংসা স্থান, সাবধান থাকিলেও ঐ সকল স্থানে হিংসা ঘটে। কিন্তু—

"পদিতোস্তি গৃহস্থস্য তৎপাতক বিঘাতকঃ।
ধর্ম্মঃ স্ববিস্তরো বৃদ্ধৈরপ্রান্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

ঐ সকল অবশ্যম্ভাবী পাপবিনাশক ধর্ম্মরাশি বৃদ্ধেরা অনেক প্রকার বলিয়াছেন, অতএব মনুষ্য নিরন্তর ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

"দয়া দানং দমো দেবপূজা ভক্তি গুরৌ ক্ষমা।
সত্যং শৌচং তপোঽস্তেয়ং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্॥"

দয়া, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্যা, চৌর্য্যবিমুখ, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

"সারঃ পরোপকারশ্চ ক্রমোধর্ম্মবিধাময়ং।"

ধর্ম্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

ধর্ম্ম দুই প্রকার। পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রায়শ্চিত্ত) আর নির্ব্বাণোপকারক, পাপনাশক ধর্ম্মই এই—

"হীনোদ্ধরণ মদ্রোহো বিনয়েন্দ্রিয় সংযমে।
ন্যায়বৃত্তির্মৃদুত্বঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং পাপসংছিদি॥"

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম্ম পাপ নাশ করে।

"অতিথীনর্থিনো দুঃস্থান্ ভক্তিঃ শক্ত্যনুকম্পনৈঃ।
কৃত্বা কৃতার্থিনো পশ্চাদ্ভোক্তুং যুক্তং মহাত্মনাম্।"

অতিথি, যাচক, দুঃস্থব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করা যুক্ত।

"আর্ত্তস্তৃষ্ণা ক্ষুধাভ্যাং যো বিত্রস্তো বা স্বমন্দিরম্।
আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যোবিশেষেণ মনীষিণা॥"

পীড়িত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবেক।

"দুঃপ্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তৎকিঞ্চিদুত্তমৈঃ।
মুহূর্ত্তমেকমপ্যস্য নৈব যাতি যথা বৃথা॥"

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।

হিন্দুদিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ এই দুই সম্প্রদায় একদেশ ও একত্রবাসী এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

আমি বুড়া বয়সের কথা লিখি লিখি মনে করিতেছি কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,— আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আর আমার দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে, মিয়াদ অতীত হইল কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য, কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয় ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারেন না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে,

বিজ্ঞ হয় জানে।” তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতু বিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সে অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বুড়াই ভাল বাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অৰ্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্‌মা খানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে আমি বুড়া হইয়াছি কি না। বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে একটু চক্ষুর দোষ হৌক, দুই একগাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন—ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্যমাখা, হীরাবসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই কোমল, তেমনই সুন্দর আছে, আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি একথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন্ কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, পলে পলে, বয়শ্চোর আসিয়া এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হৌক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডল সকল ভাল বাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত, শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিষে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়! সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন সে বন্ধুহৃদয়

কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখ্‌সোদ। পৃথিবি! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃণ্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরবপীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি? আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাই গুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরই বন। কেন না হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু, সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া, আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ আহ্লাদকালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র, তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে লব্ধবয়ঃ, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহার স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাস,—হারাধন পোদ, গামছা কাঁদে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া, নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহজীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে সে গৃহের ইষ্টক সকল দামুঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাশীর মা পাচিকা, ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি?

সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে, যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম —এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দামু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত,—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাঁহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দামু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দামুমিত্রের শুষ্ক কণ্ঠ, পলিত কেশ, দন্তহীন, লোল চর্ম্ম, শীর্ণকায়। দামুর, একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দামু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন কানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা বিকটদশনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, কৃশাঙ্গিনী,—লোলচর্ম্ম, পলিত কেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশকণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে, স্থির, বনে যাওয়া হইবে না। তবে কি করিব—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং,
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং,
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যের এই ব্যবস্থা কালিদাস করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম, অজবিলাপে,—

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তববিশ্রান্তকথং দুনোতি মাং
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তর ষট্পদস্বনং।*

এটি যৌবনের কান্না।

তারপর রতিবিলাপে,—

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মা
মবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাম॥ †

এটি বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখতেন না। বিস্মার্ক, মোল্‌ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক উইলিয়ম বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্‌সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিমেণ্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অন্ন দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নন বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাশক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে, তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর

---

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রসুপ্তিত সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর গুঞ্জন রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্বাপিত [illegible]

কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তন পান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিওনা যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না— পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে, আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি, আপনার জন্য হৌক, পরের জন্য হৌক, বিষয় কার্য্যে নিয়ত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু, মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক, বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক্, আর মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার-সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে,—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলয়ে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশীথ মেঘাগমে—আমার

আর কে রাখিবে ? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে ? অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো ! চারিদিকেই অন্ধকার ! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে ?

১

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি?
আজি পারাবার সম, হায় ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে কেন ভালবাসি?

২

অনন্ত অতল সিন্ধু! পশি বারি তলে,
কেমনে বলিব বল, কোথা হতে নিরমল
বহিল সে ক্ষুদ্রস্রোত, পরিণাম যার,
আজি প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার।

৩

যে তরু জানিনা ছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে! কেমনে চিরিয়ে হিয়ে
দেখাব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায়?
কেন ভালবাসি হায়! বুঝাব তোমায়।

৪

হায় রে হৃদয় যবে, কিশোর কোমল,
প্রেমের প্রতিমা তায়, কেমনে অঙ্কিত হায়
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান শশধর;
কেন ভালবাসি, তুমি দাওনা উত্তর।

৫

তুমি কাল! জান তুমি, নিরাশা-অনলে
গোপনে হৃদয় মম, পুড়িয়া পাষাণ সম
করিয়াছ, খুদিয়াছ গভীর রেখায়
স্মৃতি-অঙ্গে, নিরুপম সেই প্রতিমায়।

৬

কত দিন কত বর্ষ! জান তুমি কাল!
এ হৃদয় যার তরে, জ্বলিয়াছে স্তরে স্তরে,
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন।।
কেন ভালবাসি তারে কহনা এখন।

৭

কেন বাসি ভাল? তুমি সচন্দ্র শর্ব্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি, এ হৃদয় বনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে।

৮

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
একটী নক্ষত্র তায়, ভাসিত, সে চিত্ত হায়।
কেন মরুময় আজি পিপাসা লহরী?
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্ব্বরি।

৯

শর্ব্বরি! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি, তীব্র জ্বালা রাশি;
শর্ব্বরি! কহ না তুমি কেন ভাল বাসি।

১০

তব অন্ধকারে সখি, খুলিয়া হৃদয়,
দেখেছি অন্তরান্তরে, নিত্য যে বিরাজ করে
দেখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন;
হৃদয়-বাসিনী মম জীবন-জীবন।

১১

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল,
সমুজ্জল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমা খানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি
দেখিয়াছ কহ তবে কেন ভালবাসি।

১২

সে কেশ আঁধারে সেই রূপ কহিনুর,
সে বদন চন্দ্র ? না না, সে আনন পদ্ম ? তা না,
পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডিত মধুর।
প্রসন্ন সজল নেত্র, হায় তৃষ্ণাতুর !

১৩

এ হৃদয়ে নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
যেই দৃষ্টি-সুধাপান, মাতিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ
করিয়াছে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল !—
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল।

১৪

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্ত্তি, ধন, মান,
তৃণবৎ ঠেলি পায়, আসিনু উন্মাদ প্রায়
যার কাছে ; হায় ! তার মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তারে ?

১৫

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্ব্বস্ব আমার
অক্ষরে অক্ষরে-পত্রে, রেখায় রেখায়-চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া কত কাঁদিয়াছি হায় !
কেন ভালবাসি আহা বলনা তাহায়।

১৬

কেন ভাল বাসি প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি, মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যার সম্ভবে উত্তর।

১৭

কেনভাল বাসি যদি শুনিতে বাসনা,।
নিষ্ঠুর সংসার ধাম ; ছাড়ি বনে যাই প্রাণ,
সাজিয়া নবীন যোগী নবীন যোগিনী,*
প্রণয়-সঙ্গীতে ভাসি দিবস রজনী।

১৮

খাব বন ফল মূল, পরিব বাকল,
সাজাইয়া বনফুলে, বসি বন-স্রোত-কূলে,
কব বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি,
নির্ঝর কলকলে, কেন ভালবাসি।

১৯

চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জ্জনে,
রবিকরে মনোলোভা, দেখি দূর সিন্ধুশোভা,
প্রকৃতির সান্ধ্য শোভা নিরখি নয়নে,
কব কেন ভালবাসি প্রেমানন্দ মনে।

২০

কপোত কপোতী মত মুখে মুখ দিয়া,
তরুলতা আলিঙ্গিয়া বসিবে, চঞ্চল হিয়া
নাচিবে, সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া তোমায়,
কেন ভালবাসি, কবে নীরব ভাষায়।

২১

পারিবে না ? ভীমরবে পশিবে তথায়
সংসারের কোলাহল ? অতল জলধিতল
অগম্য তাহার—চল পশিগে তথায়,
কেন ভালবাসি প্রাণ ! কহিব তোমায়।

২২

না পার ; দাঁড়াও তুমি সংসার বেলায়,
প্রেমের প্রতিমা খানি, দেখিতে দেখিতে আমি
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি
চাহিও, বুঝিবে হায় কেন ভালবাসি।

---

* ভাই ত ! বং সং।

উপক্রমণিকা

(সময় তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা বিফল)

যেদিন হইতে সর উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদিত শকুন্তলা ইয়ুরোপে প্রচারিত হইল সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের ক্রনলজি বা সময়তালিকা নির্ণয়ার্থ চেষ্টা হইতেছে। সর উইলিয়ম জোন্স নিজে, উইল্‌সন কোলব্রুক মাক্সমূলর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ কেহ জ্যোতিষগণনা, কেহ পুরাণ, কেহ ভোজপ্রবন্ধ, কেহ বা তাম্রফলকাদি লইয়া এই সময়তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। আজি একজন মহামহোপাধ্যায় "অমোঘযুক্তি" "অভ্রান্ততর্ক" এবং "অকাট্য প্রমাণ" বলে "এ বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না, ইহাতে কোনরূপ ভ্রম নাই" এইরূপ জোরে জোরে লিখিয়া এক পূর্ণতালিকা দিয়া গেলেন, কালি আর একজন উঠিয়া সেই অমোঘযুক্তি অভ্রান্ততর্ক ও অকাট্য প্রমাণ বলে সেইরূপ জোর জোর কথায় তাহার সব উল্টাইয়া দিলেন। অথচ উভয়েরই যুক্তি এক, প্রমাণ এক ও তর্ক এক। এইরূপ ৭০।৮০ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কত মত যে প্রচারিত হইল বলা যায় না। কিন্তু যাহা হইবার নয় তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে না, দিগ্‌গজ পণ্ডিতে চেষ্টা করিলেও হইবে না। গ্রীক সময়তালিকানির্ণয় চেষ্টা ২০০০ বৎসর পরে বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

(পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় চেষ্টাও বৃথা)

ইহাদের মধ্যে একদল আর দিন মাস বৎসর নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন না। কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থাৎ কে কাহার পরে বা পূর্ব্বে নির্ণয় করিবার জন্য মাত্র প্রয়াস পান। ইহাদের দ্বারা কতক উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাদেরও নির্ণয়প্রণালী অপূর্ব্ব। আজি কালিদাসের মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটী কবিতা পাইয়া একজন বলিলেন "কালিদাস ভবভূতির পর।" কালি আর একজন (যিনি আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন "ভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অনুকর্ত্তা।" কে সত্য কে মিথ্যা জানিবার কোন উপায় নাই অথচ উভয়েই প্রাণ দিবে সেও স্বীকার

মত ত্যাগ করিবেন না। যেমন কাব্যাদিতে তেমনি দর্শনেও। আজি গৌতমসূত্রে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম, গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কালি হয় ত বৌদ্ধসূত্রে ন্যায়শাস্ত্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব। সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় প্রভৃতি প্রাচীন সূত্র সমূহে পরস্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় কিরূপে হইবে?

(মতোন্নতি পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় সম্ভব নহে)

আর একদল একটু ঘুরাইয়া বলেন যে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় না হউক মনুষ্যের মানসিক উন্নতি, মতের উন্নতি লইয়া কতকটা সময় তালিকা নির্ণয় হইতে পারে। তাঁহারা ইয়ুরোপের মানসিক উন্নতির ইতিহাস জানেন ভারতবর্ষে সেই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সময়তালিকা উদ্ধার সম্ভব এই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইয়ুরোপের নিয়ম ভারতবর্ষে খাটিবে কি?

(এইরূপ নির্ণয় চেষ্টায় কি উপকার দর্শিয়াছে)

এইরূপে প্রায় ১০০ এক শত বৎসর পৃথিবীশুদ্ধ লোক সময়তালিকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না—কিন্তু বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে একেবারে নির্গুণ ও নিষ্প্রয়োজন জগতে কিছুই নাই। এই নির্ণয় প্রস্তাবে অনেক নূতন সংবাদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঈশপের গল্পে যেমন ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ না পাওয়া গেলেও প্রচুর শস্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ সময় নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও উহাতে সুধাময় ফল উৎপাদন করিয়াছে।

(আমরা জানিয়াছি আমাদের দুইটী গৌরবের দিন ছিল)

এই সমস্ত নূতন খবর ও পুরাতন যাহা ছিল একত্র সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে ভারতবর্ষের মনের গতি কোন দিকে ধাবিত। সমাজের গতি রীতিনীতি কোন পথে চলিয়া আসিয়াছে। বরাবর কোন একটা সময় তালিকা ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আমাদের দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা কোন কালেই একেবারে বন্ধ ছিল না ইহাদের বুদ্ধির চালনা কখন রহিত হয় নাই। হয় দর্শন, নয় স্মৃতি, না হয় পুরাণ— কিছু না হয় কাব্য ব্যাকরণ গণিত বরাবর রচিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল দুই সময়ে এইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল হয়। ঐ দুইটীই ভারতবর্ষের প্রধান সময়, ইহাই আমাদের গৌরবের দিন। একটী হিন্দুস্থানের আর একটী দক্ষিণের। একটীতে মৌলিকতা পরিপূর্ণ—অপরটীতে প্রকৃষ্টরূপ চর্চ্চা মাত্র; মূলের দোহাই অধিক কিন্তু মৌলিকতারও কমি নাই। একটির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হয়, আর একটির প্রভাব ভারতবর্ষীয় জাতি মাত্রে পর্য্যবসিত। একটির চরম ফল উন্নতি, আর একটির ফল অধোগতি। তথাপি প্রথমটী দ্বিতীয়টির মূল, প্রথমটী না হইলে দ্বিতীয়টির নামও শুনিতে পাইতাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে তবে কিরূপে ফল দুই প্রকার হইল।

উত্তর। সমাজের অবস্থায়; কতকটা দৈবই বল আর অদৃষ্টই বল আর অমুল্লঙ্ঘনীয় সামাজিক নিয়মই বল, একটী হইতে সুধাময় অপরটি হইতে বিষময় ফল জন্মিয়াছে। প্রথমটি প্রবল অর্থাৎ সামাজিক উন্নতিই মূল পরমার্থ তত প্রবল নহে—অপরটিতে হাই চর্চ্চটোরি মত; উন্নতির গন্ধও নাই। সবই পরমার্থ—ইহলোকের নামও নাই।

এই দুইটি সময়ের বিশদ সবিস্তার বর্ণনা প্রদান করিলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের দুইটী অতি জটিল অংশ পরিষ্কার হইতে পারে। যে আর্য্য আর্য্য করিয়া দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্য্যনাম বঙ্গীয় যুবকের মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, সেই আর্য্যগণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল—এবং যে গৌরব তাঁহাদের উপর দিয়া আমরা তাহার অংশ আদায় করি, সে গৌরবের তাঁহারা কতদূর অধিকারী ছিলেন জানা যাইতে পারে। কোন জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা কোন বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের ইতিহাস উত্তমরূপে দেখিতে পারিলে তাহাদের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। বিপদের সময় নহিলে মনুষ্যের কত ক্ষমতা জানিতে পারা যায় না—সে কতদূর কাজ করিতে পারে, কতদূর চিন্তা করিতে পারে, কতদূর সহ্য করিতে পারে বলা যায় না। জাতীয় স্বভাবও ঠিক সেইরূপ।

সম্ভবতঃ এই দুইটী বুদ্ধিবিপ্লবের একটি যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৯০০ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া ৪০০ বৎসর সমান তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটি খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের পুনঃসংস্কার করে। প্রথমটিতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয়। দ্বিতীয়টিতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রথমটির প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, দ্বিতীয়টিতে একজাতির একাধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয় অথচ দুইটিতেই আমাদিগের সমান গৌরব। আমাদের সমান সম্মান। প্রথম বিপ্লবের কথা অনেকে বলিয়াছেন এজন্য এখানে সংক্ষেপে মাত্র বলিব। দ্বিতীয়টির বর্ণনার বিস্তার আবশ্যক যেহেতু সে কথার এ পর্য্যন্ত কেহ উল্লেখ করেন নাই।

প্রথম অধ্যায়

(প্রথম বিপ্লবের প্রাধান্য ও প্রয়োজন)

প্রথম বিপ্লবটী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উহার প্রভাব অসীম বহুকালস্থায়ী ও জগদ্ব্যাপী। উহার প্রভাব ভারতবর্ষবাসীদিগের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে, ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার শক্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ভারতচরিত্রে অনেক মলা পড়িয়াছে অনেক উন্নতিও

হইয়াছে (অনেকে যে বলেন কেবল অধঃপাতে গিয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করি না) কিন্তু আদত আজিও ঠিক আছে। উপরিউক্ত বিপ্লবে আমাদিগকে যাহা করিয়াছে আমরা আজিও তাঁহাই আছি। ভারতচরিত্রে ভারত অদৃষ্টে সেই সময়ে যে শিল পড়িয়াছে সেই মোহরের অঙ্ক আজিও বর্ত্তমান আছে। শুদ্ধ ভারত নয় এসিয়াও এই বিপ্লবের ফলভাগী। এসিয়ার অদৃষ্টও উহা হইতে ফিরিয়াছে, এসিয়ার সভ্যতাও ঐ বিপ্লবের ফল। এসিয়ার দুরবস্থাও ইহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইতে পারে। এমন কি এই তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ইউরোপও অনেক অংশে উহার নিকট ঋণী। এবং এই যে উনবিংশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া ইউরোপ এত জাঁক করেন, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার কি সেই উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী উন্নতির অন্যতম উদ্দীপন কারণ নহে ? যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে গ্রীক বিদ্যার প্রথম প্রচারে ও প্রথম আলোচনায় একটী প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হয় ; সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনাও ততদূর হৌক আর নাই হৌক, ইউরোপীয় উন্নতিকে দ্রুতগতি প্রদান করিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত বিজ্ঞান, সংস্কৃত দর্শনও উপরোক্ত বিপ্লব হইতে উৎপন্ন। অতএব সেই বিপ্লবের নিকট পৃথিবীশুদ্ধ ঋণী এজন্য উহার কারণ স্থিতি, উৎপত্তিফল ও প্রভাব সংক্ষেপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(বিপ্লবের পূর্ব্বতন অবস্থা)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্টের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে তাহার আগে আর্য্যসমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল জানা উচিত। জানিবার কিন্তু কোন উপায়ই নাই। কেবল অনুমান মাত্র। অনুমানে বোধ হয় ইহার পূর্ব্বে আর্য্যজাতি পঞ্জাবে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায়গত বিভিন্নতা ছিল বটে কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। কেহ পুরোহিত ছিলেন, কেহ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কেহ কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন কেহ বা অন্যান্য ব্যবসায় করিতেন। প্রথম পঞ্জাব আধিপত্য। আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হইল। পুরোহিতদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল। আর্য্যভূমি যাগযজ্ঞময় হইয়া উঠিল ; রাজসূয় অশ্বমেধ বাজপেয় সোমযাগ শ্যেনযাগ কারীর যাগ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞ হইতে লাগিল। পুরোহিতেরা ক্রমে একদল ক্রমে একজাতি ক্রমে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রাজারা কেবল যুদ্ধের সময় প্রাণ দিবার জন্য রহিল। ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন দেশ অধিকার আবশ্যক হইল। আর্য্যগণ পঞ্জাবসীমা অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইলেন। দিনকতক শতানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বসীমা হইল। শেষ তাহারও পূর্ব্ব পারে আর্য্যগণের বাস হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ মিথিলার পূর্ব্বে যে কখনও আসেন

নাই তাহা এক প্রকার স্থিরই। কারণ ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামও শুনা যায় না। ব্রাহ্মণেরা এই নূতন দেশে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু এ সকল দেশ ক্ষত্ররুধিরে অর্জ্জিত; তাহারা বিরোধী হইল। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের একটি কারণ। ব্রাহ্মণেরা যেমন একটি দল জাতি হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়েরাও নূতন দেশে তাহাই হইলেন। আর্য্যগণ তিন জাতিতে বিভক্ত হইল। পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধগণ ক্ষত্রিয়, অবশিষ্টগণ বিশ্ অর্থাৎ প্রজা। তাহার নীচে পরাজিত অনার্য্যগণ ছিল। চাতুর্ব্বণ বিভাগ হিন্দুস্থানেই হয়। পঞ্জাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি না সন্দেহ। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় আর্য্যগণ প্রথম যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেন তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে সমূলে বিনাশ করিতেন। পঞ্জাবেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে হিন্দুস্থানে হয় তাহার আর এক কারণ এই মনুর বর্ণধর্ম্মগ্রন্থে (মনুসংহিতায়) হিন্দুস্থানেরই প্রাধান্য অধিক। আমরা যে অনার্য্যদিগের নাম করিলাম তাহারাও নিতান্ত নির্ব্বিরোধী ছিল না। তাহাদের ধর্ম্ম ছিল, রাজ্যশাসনপ্রণালী ছিল, সভ্যতা ছিল। তাহাদিগের দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রতি লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল। এই অনার্য্যজাতির সম্পর্কই উপরিউক্ত বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ। ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে অনেকে পৌরহিত্য ত্যাগ করিয়া জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য উপাধ্যায় হইতে লাগিলেন। ঋষি মুনি হইতে লাগিলেন। আর একদল ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মনুতে ব্রাহ্মণদিগকে কৃষিবাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেওয়া আছে; যিনি যে ব্যবসায়ই করুন সকলেই স্বজাতির প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর। ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেকেও ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ। বিশেষ পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয়গণের ত ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের একটি প্রকাণ্ড দল হইল। অপরদিকে হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উৎপীড়িত অনার্য্যগণ আর একদল একেবারেই আর্য্য অধিকারের প্রতি দ্বেষবান্। বিশেষ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অভক্তি।

(বিপ্লবের কারণ)

ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ও অনার্য্য সভ্যতার সম্পর্ক, এই দুইটীই উপরিউক্ত মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। ঋষিদিগের কোন প্রণালীবদ্ধ শাসন ছিল না, সেও একটি কারণ। ঋষিরা আপন আপন তপোবনে আপন আপন মতানুযায়ী উপদেশ দিতেন। তাঁহাদের উপরে কাহারও তত্ত্বাবধারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে স্বজাতিদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত ক্ষোভ করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্যভাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যোগ দিতেন। জাবালি

মুনি যে উপদেশ দিতেন তাহা একপ্রকার চার্ব্বাক্‌দর্শন বলিলেও হয়। বশিষ্ঠাদি দশরথের সহিত, রাম পরশুরামের সহিত বিবাদ করেন, তাহাও পুরাণাদিতে শুনা যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখিবার কোন বাধাই ছিল না*। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই দুই একটী বিষয় ভিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত। সুতরাং তিন জাতিরই মানসিক উন্নতি যথেষ্ট হইত। কেবল যাগ যজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগেরই হস্তে থাকিত। জনক রাজা তাহাও করিতে দিতেন না। তিনি স্বয়ং সকল কার্য্য করিতেন। তিনি নিজে ঋষিদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতেন। এইরূপ অনেকগুলি ক্ষত্রিয় রাজর্ষিও ছিল। সুতরাং, যাগ-যজ্ঞাদি ভিন্ন সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অন্ততঃ একপ্রকার শিক্ষাই পাইতেন। অনার্য্যগণ যাহারা নূতন অধিকৃত হইয়াছিল তাহাদের অনেকেই আর্য্য-দিগের দলে ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অধিকাংশ শূদ্রনামে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অনেকে বনদুর্গ জলদুর্গ গিরিদুর্গ মধ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। শূদ্রদিগের মধ্যে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জাজ্বল্যমান ছিল। উহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে এমন কি সমস্ত আর্য্যজাতি-দিগকে ঘৃণা করিত। উহারা স্বতন্ত্র আইনে শাসিত হইত এমন কি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আজিও শূদ্রেরা আমাদের আইন অনুসারে চলে না। দায়ভাগে শূদ্রের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। উহাদের মধ্যে প্রবীণেরা অনে-কেই কেবল অবসর প্রতীক্ষায় ছিল। যে সকল অনার্য্যেরা অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ক্রটী করিত না। তাহারা আপন ধর্ম্মে রত থাকিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কর্ম্মের নানা ব্যাঘাত করিত এবং উপহাসাদি করিত। প্রতি বনে প্রতি পর্ব্বতে প্রতি দুর্গে অনার্য্যদিগের স্বাধীনতা ছিল। ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ সমাজনিয়ম তাহাতে বৃহৎরাজ্য স্থাপন একপ্রকার অসম্ভব। আর্য্যভূমি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রায় দেখা যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে সভ্যতা ও সুনিয়ম প্রবেশ করিলে শীঘ্র শীঘ্রই তাহার উন্নতিলাভ হয়।

(পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের প্রকৃতি)

এইরূপ মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে চিন্তা প্রবল হওয়া একান্ত সম্ভব। তাহাতে আবার দুই সভ্যজাতির বহুকাল ধরিয়া একত্র বাস। তুলনা - সামগ্রী লোকের চক্ষে দুই বেলা। এইখানে অনার্য্যগণ আমাদের অপেক্ষা ভাল এইখানে মন্দ। এই এই স্থলে আমাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক এই এই স্থলে আমাদের নিয়ম অনার্য্যগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই তুলনা একবার আরম্ভ হইলেই লোকের মানসিক প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বৈরীভাবহেতু সেই পরিবর্ত্ত সত্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে হিন্দুস্থানের আর্য্যগণ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিতে লাগিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা আর্য্যগণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত ভাল জানি না কেবল নানা শাস্ত্রীয় কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া অনুমান করি মাত্র। কিন্তু অনার্য্যসমাজের কোন সম্বাদই জানি না; জানিবার উপায়ও নাই। তবে এইপর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে দুই জাতির সংঘর্ষে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরিবর্ত্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। সে কাণ্ড পরে লিখিব। এখন সেই মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত, অধ্যাপক ও অন্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণসপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয় সংক্ষেপে, সমস্ত আর্য্য এবং অনার্য্যসমাজ কি আকার ধারণ করে তাহাই লিখিতেছি। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন সভ্যতার লক্ষণ দেওয়া বড় কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় সভ্যতার দুই মূর্ত্তি আছে (১) আন্তরিক (২) বাহ্যিক। উপরিউক্ত ভারতবর্ষীয় বিপ্লবের দুই মূর্ত্তিরই উন্নতি হয়।

(১) মানসিকবৃত্তির উন্নতি দুই প্রকার (ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও (খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতি।

(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দর্শনগণে প্রকাশ আছে। সময়তালিকা মাত্রেই দর্শনগুলিকে এই বিপ্লবকালে রচিত স্থির হইয়াছে। এই কয় শতাব্দীতে উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও সংগ্রহ। যুগপৎ সমস্ত হিন্দুস্থানে নানা মতের উৎপত্তি হয়। আজি একজন জগৎ শূন্যময় বলিলেন। কালি আর একজন বলিলেন ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র সত্য। পরশ্ব একজন প্রত্যক্ষবাদ সৃষ্টি করিলেন। আজি একজন বলিলেন চক্ষের জ্যোতি পদার্থে পড়িয়া পদার্থের উপলব্ধি হয়। কাল আর একজন ঠিক বিপরীত মত চালাইয়া দিলেন। এক অঞ্চলে আত্মার অনাদিনিধনত্ব প্রমাণ হইল আর এক অঞ্চলে আত্মা অনিত্য বলিয়া দেহের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেলেন। একেবারে শত শত মতের উৎপত্তি হইল। ক্রমে এই সকল মতের সংগ্রহ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ পক্ষীয়দিগের মত ছয়জনে সংগ্রহ করিলেন; ব্রাহ্মণেরা এই ষড়্দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; গোতমাদি নিজে সংগ্রহকার মাত্র। তাঁহাদের নিজের মতও তাঁহাদের পুস্তকে অনেক আছে। বিশেষ অনেক চলিত মতের তাঁহারা সমালোচনা করিয়া সমুদয় পুস্তকে এরূপ মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ করিলেন যে পরবর্ত্তী লোকে জানিল যে সকল মত তাঁহাদের নিজেরই। তাঁহারা নানামতের সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সকল গ্রন্থেই সকল মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাই। সুতরাং তাহা দেখিয়া সাংখ্য ন্যায়ের পর বা ন্যায় সাংখ্যের পর এরূপ বিবেচনা হইতে পারে না। এমন হইতে পারে ন্যায়সূত্রকার মিথিলায় বসিয়া বুদ্ধির নিত্যতা খণ্ডন করিলেন। সাংখ্যসূত্রকার পঞ্জাবে বসিয়া বুদ্ধিনিত্যতার উপর সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। বুদ্ধিনিত্যতা মত তাঁহাদের কাহারই

নিজের নয়। অথচ তৎকালে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের মধ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ সংগ্রহ হইল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধমতে কয়খানি দর্শন সংগ্রহ ছিল ও তাহাদের কি প্রকার ভাব জানিবার উপায় নাই। অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন করিলে অনেক দূর বলা যাইতে পারে কিন্তু ঐ সকল দর্শন আজিও মুদ্রিত হয় নাই। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা আর না করা ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন নির্ণয়ের উপায়। তোমরা যতদূর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করনা বেদের প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই ব্রাহ্মণেরা তোমাকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইবে। নচেৎ তোমাকে নাস্তিক বলিয়া বাহির করিয়া দিবে। মনু এবিষয়ের সাক্ষী।

> যোঽবমন্যেত তে মূলে (শ্রুতিস্মৃতী) হেতুশাস্ত্রাশ্রযাদ্দ্বিজঃ।
> ন সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ॥

(যে কেহ হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল শ্রুতি ও স্মৃতিকে অপমান করিবে সে নাস্তিক বেদ নিন্দক। তাহাকে সাধুরা সমাজচ্যুত করিবেন।) বেদের বিরুদ্ধে হেতু প্রয়োগ করিলেই নাস্তিক ও সাধুদিগের বহিষ্কার্য্য হইল। নচেৎ সকল মতেই ধর্ম্ম। এক্ষণে প্রমাণ হইল ষড়্দর্শন, ষড়্দর্শনের মূল উপনিষদ ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন এই কালের।

(খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতিও এই সময়ে যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন সমাজের হৃদয়বৃত্তির উন্নতি বর্ণন করিতে গেলে, 'পুথি বেড়ে যায়।" এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে এই কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি যাহা ছিল তাহা যাগ যজ্ঞ লইয়া এবং নরেশংস, পুরাকল্প প্রভৃতি পুরাণ ও গল্প লইয়া ব্যস্ত থাকিত। এই কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হয় তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, পুত্রের পিতা মাতার প্রতি, গৃহস্থের অতিথির প্রতি, রাজার প্রজার প্রতি, শিষ্যের গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি অনেক অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার করিতে শিখে। এমন কি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন মনুষ্যের প্রতি তেমনি পশুপক্ষীর প্রতি ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যাহা আজিও কোন ধর্ম্মে কোন দেশে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, সেই সর্ব্বভূত প্রতি দয়া প্রচার হয় এবং কার্য্যে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের নিজের স্বার্থরক্ষার্থ উহার অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন। সেই সকল বিশেষ নিয়মও এত অধিক যে সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হয়। তাঁহাদের বিরোধী সর্ব্বভূতে দয়া যেমন মুখে প্রচার করিতেন বিশেষ নিয়মও তেমনি অবজ্ঞা করিতেন। সুতরাং বাক্য ও কার্য্য উভয় প্রকারেই তাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে প্রধান বলিতেন, অবশিষ্ট মনুষ্যের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিতেন, শূদ্রদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণিহিংসা করিতেন। তাঁহাদের বিরোধীরা সর্ব্বমনুষ্যকে সমানাধিকার প্রদান করেন ও অহিংসা প্রচার করেন। এই পর্য্যন্ত আন্তরিক উন্নতি। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই হৃদয়বৃত্তিগত উন্নতি বিশেষ দৃষ্ট হয় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু যতদিন বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার না হয় ততদিন বলা যায় না সে উন্নতি কতদূর দাঁড়াইয়া ছিল। মনু একস্থানে লিখিয়াছেন যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যা বন্দনাদি না করিয়াও যদি লোকে সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জ্জব দশধা ধর্ম্ম আচরণ করে তবে সে স্বর্গলাভ করিবে। অর্থাৎ তিনি সমাজধর্ম্মকে পারত্রিক ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) বাহ্যিক উন্নতি সমাজবন্ধনকে বলা যায়। এই সময় আইনের * সৃষ্টি হয়। রাজনীতি দণ্ডনীতির সৃষ্টি হয় ঋণাদান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ পদের সৃষ্টি হয়। সমাজ আইন তন্ত্র হয়—আইনই প্রবল, আইনের রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা নহেন। রাজার ক্ষমতা অসীম কিন্তু তাঁহাকে আইনমতে চলিতে হইবে, নচেৎ নরকে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে রাজা অত্যাচারী হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট নাই প্রত্যুত দোষ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু তাহারই পরে লেখা আছে অমুক অমুক অত্যাচারী রাজার অদৃষ্টে অমুক অমুক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল সুতরাং যদিও প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করুন আর না করুন তাঁহারা অত্যাচারী রাজাকে অধিক দিন রাজত্ব করিতে দিতেন না। বৌদ্ধদিগের রাজশাসনের বিষয় ঠিক বলা যায় না কিন্তু বৌদ্ধসমাজ ব্রাহ্মণসমাজ হইতে অনেক অংশে উন্নত ছিল। একজন ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবিদ্ বলেন আর্য্য জাতির রাজশাসন অতি প্রাচীনকালে সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। কি গ্রীস্ কি জর্ম্মণি কি হিন্দুস্থান সর্ব্বত্র একজন রাজা, তাঁহার পর কতকগুলি জ্ঞানী বড়লোক, তাহার নীচে আর্য্যজাতীয় সাধারণ লোক তাহার নীচে দাস (আর্য্য ও অনার্য্য) দাস ভিন্ন সকলেরই রাজ্য মধ্যে কথা থাকিত। এরূপ সমাজে বৃহৎ রাজ্য স্থাপন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণসমাজে ঠিক এইরূপ ছিল। বৌদ্ধসমাজে বোধ হয় গোড়া হইতেই চীনের মত কোমল প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ঐহিক ক্ষমতা গ্রহণার্থ প্রসারিতহস্ত ছিলেন না। কিন্তু বৌদ্ধদিগের কথা আজি আমরা কিছু বলিলাম না।

---

* আমাদের স্মৃতিতে পারত্রিক ধর্ম্ম (religion) লৌকিক ধর্ম্ম (morals) ও দণ্ডনীত্যাদি তিনই উক্ত হইয়াছে। আধুনিক সভ্যসমাজে তিনের জন্য তিনটী প্রকার শাস্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদিতে পারত্রিক ধর্ম্মের উপদেশ আছে; লৌকিক ধর্ম্ম ও দণ্ডনীত্যাদি এই সময়েই রচিত।

সামাজিক ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। মন্বাদি গ্রন্থে জলপাত্র ভোজনপাত্র আহারীয় দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অনেক দূর উন্নতি হইয়াছিল। খাদ খননাদি কার্য্য, পথ নির্ম্মাণ ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে গণিত থাকায় রাজার আর প্যাবলিকওয়ার্কস্ বলিয়া একটি সর্ব্বভুক্ ডিপার্টমেণ্ট রাখিতে হইত না। এ বিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের উন্নতি অধিক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে তদানীন্তন হিন্দুস্থান সমাজকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, বুদ্ধিবিপ্লব উপলক্ষে সকলেই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সকল দলেরই লিখিত পুস্তক আছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ হইতে আমরা কল্প, গৃহ্য প্রভৃতি সূত্র পাই। উহা পারত্রিক ধর্ম্মে যাগযজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধানে নিযুক্ত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ষড়্দর্শন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাই। ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের দ্বারায় স্বীয় অবলম্বিত ব্যবসায়ে পুস্তক লেখা হইয়াছিল বলিতে সাহস করা যায়। আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, হস্তীশাস্ত্র কৌটীল্য কামন্দকীয় মূলস্বরূপ রাজনীতি এবং অর্থশাস্ত্র উহাদের দ্বারাই রচিত হয়। অর্থাৎ এই কালীন ব্যবসায়ীদিগের রচিত গ্রন্থাদি পরসময়ে সংগৃহীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদাদিরূপে পরিণত হয়। বৈদিক ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ব্যাকরণের দুই এক খানি গ্রন্থ এই কালে লিখিত হয়। ব্রাহ্মণপক্ষীয় ক্ষত্রিয় হইতে আমরা মোক্ষশাস্ত্র প্রাপ্ত হই। জনক রাজা উহার অধ্যাপক। ব্রাহ্মণবিরোধী ক্ষাত্র হইতে আমরা বুদ্ধাদিশাস্ত্র প্রাপ্ত হই। অনার্য্যদিগের রচিত কোন পুস্তক আমরা পাই নাই। পূর্ব্বাঞ্চলীয় অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচার বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। এমন কি বোধ হয় অনার্য্য সম্পর্ক ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ। এতৎকালীন অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মকেও যথেষ্ট পরিমাণে কলুষিত করে। ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলে উহাদের দেবতাদিগকে বৈদিক দেবতার সহিত একাকার করিয়াছেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্মশানে

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বসুন্ধরার ঘাটে একটি শবদাহ হইতেছিল। উপরে নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকা নিঃশব্দে ভাসিতেছে—নিম্নে জাহ্নবী নিঃশব্দে গাঢ় অন্ধকারে ভাসিতেছে। রজনী গাঢ় অন্ধকারময়ী, ভয়ঙ্করা, শব্দহীনা; কেবল কোন হতভাগ্যের ঐ চিতার অগ্নির পিট্ পিট্ শব্দ আর গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। ভীষণ অন্ধকারে স্বভাবের কিছুই লক্ষ্য হইতেছিল না। কেবল সেই সর্ব্ব-সংহারী সর্ব্বদেশ-ব্যাপী অগ্নি একটি নশ্বর হিন্দুদেহ ধ্বংস করিতেছে, ইহাই দেখা যাইতেছিল; আর তদালোকে তৎপার্শ্বে বসিয়া অনতিদূরে শবদাহককে দেখা যাইতেছিল। দাহকারী এক সুন্দর যুবা পুরুষ একদৃষ্টে অগ্নিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সে মুখমণ্ডল একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে,—সে রূপ নহে, সে মুখশ্রী নহে। কোন গভীর হৃদয়ঘাতিনী চিন্তাযুক্ত সে মুখমণ্ডল—তাহা একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে। সে মূর্ত্তি কেবল সেই নিবিড় অন্ধকারময়ী যামিনীতে সেই কল্লোলিনীর সৈকতোপরি শ্মশানোপযোগী। যুবক দুই জানুপরি ঈষৎ বক্রভাবে মস্তক রাখিয়া অগ্নির প্রতি চাহিয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মহাকাল অগ্নি সেই মনুষ্যদেহ ধ্বংস করিল—তাঁহাকে পথের কাঙ্গাল করিল। রজনীকান্ত কাঙ্গাল হউন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ তাঁহার অগ্নিতে যাহাকে পোড়াইল তাহা কি আর কখন দেখিতে পাইবেন না—প্রাণ দিলেও দেখিতে পাইবেন না, এ বিশ্বমণ্ডলে খুঁজিলে কি কোথাও পাইবেন না? আজি হউক কালি হউক দশদিন বিলম্বে হউক আর কি কখন দেখিতে পাইবেন না? অগ্নিতে পোড়াইলে কি কোন চিহ্ন থাকে না। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুর! ক্রমে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া আসিল, শবদেহ পুড়িয়া অঙ্গার হইল, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। রজনীকান্ত সেইপ্রকারে সেইখানে বসিয়া আছেন। একটি শবভুক্ কুক্কুর লোলজিহ্বা বহিষ্কৃত করিয়া শ্মশানের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল আবার ফিরিয়া গেল। রজনীকান্ত

এক দৃষ্টে সেই শ্মশান প্রতি চাহিয়াছিলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক ঈষৎ পরিষ্কার হইল। গঙ্গার হৃদয় হইতে ক্রমে অন্ধকার অন্তর্হিত হইতে লাগিল; সমস্ত রাত্রি নির্ব্বাত ছিল, এক্ষণে দক্ষিণদিক্ হইতে মৃদু মৃদু সমীরণ গঙ্গার হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল করিল। দুই একবার বসুন্ধরার ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানে ঠুন ঠুন শব্দ হইল। দুই চারিটি গ্রাম্য কুলকামিনী দ্রুতপদে মৃদুমধুর কথোপকথনে এবং কখন কখন মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে আসিতেছিল।

তৎপরে একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী আসিয়া জলে নামিল। এবং কিঞ্চিৎ পরেই শ্মশানপ্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"একি রজনী বাবু যে!" রজনীকান্ত ঐ চীৎকারে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ঘাটের দিকে আস্তে আস্তে মস্তক ফিরাইলেন। দেখিলেন, যামিনী প্রভাত হইয়াছে, এবং জলে দাঁড়াইয়া কতিপয় অবগুণ্ঠনবতী ও একজন তাঁহার প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। রজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় অবশ হওয়াতে দাঁড়াইতে অক্ষম হইলেন। নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন। ইতাবসরে সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "রজনী বাবু আপনার বেশ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনি পিতৃ অথবা মাতৃহীন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ত বহুদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন। তবে আজ আপনার এ বেশ কেন?" রজনীকান্ত অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আজ আমি মাতৃহীন হইলাম।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে কি আপনার—" রজনীকান্ত কোন প্রশ্ন করিতে হস্তোত্তলন করিয়া নিষেধ করিলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে শ্মশানের নিকট যাইয়া পরিশিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া বসুন্ধরার ঘাটের দিকে স্নান করিতে চলিলেন। অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে মস্তক নত করিয়া চলিলেন। রজনীকান্তের চক্ষে জল নাই—কিন্তু প্রতি পদবিক্ষেপে যে কত কান্না কাঁদিতেছেন তাহা কেবল যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল তাহারাই বুঝিয়াছিল। রজনীকান্ত যত নিকটবর্ত্তী হইতে ছিলেন ততই তাঁহার মুখমণ্ডল পরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হইতেছিল। তাঁহার মুখশ্রীর ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবগুণ্ঠনবতীদিগের মধ্যে একজন কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে সময়ে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। রজনী আসিয়া জলে নামিলেন। হঠাৎ রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। স্থিরচক্ষে একটি রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন কিন্তু আর সে ঘাটে নামিলেন না। দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রমণীদিগের মধ্যে এক-জন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমুদিনি, রজনীকান্ত অমন করে ফিরে গেল কেন?" কুমুদিনী উত্তর করিল, "বোধ হয় আমাকে—আমাদের দেখে।" তখন কুমুদিনী কাঁদিতেছিল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থকারের জীবনীসম্বলিত।*

কয় বৎসর হইল বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে পকাশ করিয়াছিলেন যে, ৺দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী তাঁহার তত্ত্বাবধারণে পুনর্মুদ্রিত করিবেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু অনবকাশ-বশতঃ নিজকৃত অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ কর্তৃক সেই সকল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু কেবল গ্রন্থকারের একটি জীবনী লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, এই সংগ্রহে দীনবন্ধু বাবুর কতকগুলি নূতন রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুরধুনী কাব্যের প্রথম ভাগ দীনবন্ধু বাবু প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় ভাগ এই প্রথম প্রচারিত হইল। এতদ্ভিন্ন "পোড়া মহেশ্বর" নামে একটী গদ্য প্রবন্ধ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে মনে করিলে দীনবন্ধু বাবু অতি উৎকৃষ্ট গদ্য রচনা করিতে পারিতেন। "প্রভাত" নামে পদ্য, এবং "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" ইত্যাখ্যেয় গদ্য প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর লিখিত জীবনী মধ্যে পাঠকেরা "জামাই ষষ্ঠী" নামে একটি পদ্যের উল্লেখ দেখিবেন। উহা প্রথমে প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পরে প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। উহাকে কতকটা অশ্লীলতাদোষে দূষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে হাস্যরসের অবতারণায় যুবা কবির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে। বোধ হয় দীনবন্ধুর কোন পদ্য রচনায় এতটা হাস্যরসের আধিক্য নাই। প্রথম প্রকাশকালে, ঐ কবিতা বঙ্গসমাজে এতাদৃশ সমাদৃত হইয়াছিল যে, সেই সংখ্যক প্রভাকর খানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত তাহা প্রতি খণ্ড আট আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

---

* রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। গ্রন্থকারের জীবনীসম্বলিত। তৎপুত্রগণ কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত। কলিকাতা। গিরিশ বিদ্যারত্ন। ১৮৭৭।

পঞ্চম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রত্যেক জাতির মধ্যে একপ্রকার সাধারণ সহানুভূতি থাকে, উহাই জাতীয় বন্ধনের মূল। সেইপ্রকার বিশেষ সহানুভূতি এক জাতীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেরূপ থাকে, তাঁহাদের সহিত অপর কোন জাতির সেরূপ থাকিতে পারে না। সেই সহানুভূতি বশতঃই তাঁহারা পরস্পরের সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিতে, ও সকলে মিলিয়া এক রাজশাসনের অধীন থাকিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রকার ভাবকে জাতীয় ভাব বলা যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কি কারণে এই জাতীয় ভাব বা জাতীয় বন্ধনের উৎপত্তি হয়। আলোচনা দ্বারা কয়েকটি কারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জাতিবন্ধনের একটী কারণ ধর্ম্ম। এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে পরস্পরের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মানুগত সহানুভূতির যে কি প্রকার আশ্চর্য্য বল, মনুষ্যজাতির সমগ্র ইতিবৃত্ত তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম্ম সকল কি অদ্ভুত পরাক্রম সহকারে লক্ষ লক্ষ মানবকে এক দুরতিক্রমণীয় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কোন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ কোন কালে বুদ্ধিকৌশলে যাহা করিতে সক্ষম হন নাই, শাক্যসিংহ, ঈশা ও মহম্মদ তাহা স্ব স্ব প্রচারিত ধর্ম্মমত দ্বারা সংসিদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মজনিত সহানুভূতির বল, দেশ ও কাল উভয় সম্বন্ধেই পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে যে কয়েকটি ধর্ম্মের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এ কথার সত্যতার বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ। মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে লক্ষ লক্ষ নরনারীর উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,—যে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা কখন কোনরূপ রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সংঘটিত হয় নাই। শত শত রাজ্য ও রাজার অভ্যুদয় ও বিনাশ হইয়াছে, নব নব সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, বিবিধ দার্শনিক মতের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, অসংখ্য ঘটনাবলী পৃষ্ঠে বহন করিয়া শত শত শতাব্দী নদী-স্রোতের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, তথাচ অদ্যাপি পৃথিবীতলে মুষা ও মহম্মদ, শাক্যসিংহ ও ঈশার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জাতি-বন্ধন সম্বন্ধে ধর্ম্ম যে একটী প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই।

ভাষা আর একটী কারণ। পরস্পরের নিকট পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে যাদৃশ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে, অন্য প্রকারে কখনই সে প্রকার সহানুভূতি জন্মিতে পারে না। এক বংশে জন্ম অপর কারণ। এক বংশে যাঁহাদিগের জন্ম তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অনুভব করেন, এবং সেইজন্য তাঁহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে এক প্রকার যোগ নিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। বাসস্থানের প্রাকৃতিক সীমা চতুর্থ কারণ। নদী পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা কোন ভূখণ্ড সীমাবদ্ধ হইলে তদন্তর্গত অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা জন্য যাদৃশ যোগ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, উক্ত সীমার বাহিরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের সহিত তাদৃশ নিকট সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একত্ব জাতিবন্ধনের পঞ্চম কারণ। যাঁহাদের পুরাবৃত্ত এক অর্থাৎ যাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা এক কার্য্যে একত্রে যোগ দিয়াছিলেন, একপ্রকার ঘটনা যাঁহাদের সম্পদ্ ও বিপদ্, সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়াছিল, তাঁহারা পরস্পরের সহিত সহজে যুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের কার্য্যের গৌরব বা হীনতা স্মরণ করিয়া এক সাধারণ সুখ দুঃখ, অহঙ্কার ও লজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। সামাজিক আচার ব্যবহার জাতিবন্ধনের ষষ্ঠ কারণ। একপ্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার হইলে লোকে সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে পরস্পর মিলিত হইতে পারে; সুতরাং তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই নৈকট্য সংস্থাপিত হয়। প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ সপ্তম কারণ। এক এক জাতির এক এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ অধ্যবসায়শীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও অর্থলিপ্সু। ফরাসি আমোদপ্রিয়, সরল, ক্ষীণপ্রতিজ্ঞ। বাঙ্গালি চতুর, কোমলহৃদয়, ভীরু। শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিগত একতা, জাতীয়ভাব সংরক্ষিত ও দৃঢ়ীকৃত করিয়া থাকে।

জাতীয়ভাবের যে সকল কারণ ও লক্ষণ প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে উল্লিখিত হইল, তাহা উহাদের গুরুত্ব ও কার্য্যকারিতার পরিমাণ অনুসারে করা হয় নাই। ঐ কয়েকটি কারণের প্রত্যেকটিই জাতীয়ভাবের মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাই কেবল বলা হইল। উহাদের আপেক্ষিক কার্য্যকারিতার বিষয় বিচার করা হইতেছে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে ভারতবাসিগণকে একজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় কি না। ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভূখণ্ডকে এক দেশ না বলিয়া এক মহাদেশ বলাই যেন অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপ হইতে রুসিয়াকে ছাড়িয়া দেও; যে অবশিষ্ট অংশ রহিল, ভারতবর্ষের আয়তন তদপেক্ষা অধিক ক্ষুদ্রতর হইবে না। এমন বৃহৎ দেশে বিংশতি কোটির

অধিক অধিবাসিগণের মধ্যে জাতীয় একতা সম্বদ্ধ হওয়া যে সহজ নহে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে যাহা হউক, জাতীয়ভাবের লক্ষণ কয়েকটির সহিত মিলাইয়া দেখা যাউক যে, চীন বা রুসিয় প্রভৃতি জাতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটী জাতি আছে কি না। দুই প্রকার হইতে পারে, প্রথম, ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ, উহার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ একটী দেশ এবং উহাতে ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া এক বিশেষ জাতি বাস করিতেছে। এ দুইএর মধ্যে কোনটী সত্য? প্রথমতঃ ধর্ম্ম লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। সাঁওতাল, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতি সকলকে ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে তাঁহারা বিভক্ত রহিয়াছেন। উক্ত দুই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর সঙ্গে তুলনা করিলে প্রায় এক পঞ্চমাংশ হইবে। কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহা হিন্দুধর্ম্ম নামে সর্ব্বত্র আখ্যাত হইলেও বাস্তবিক উহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় যাহা ধর্ম্ম, পঞ্জাবে তাহা ধর্ম্ম নহে, আবার পঞ্জাবে যাহা ধর্ম্ম, মান্দ্রাজে তাহা ধর্ম্ম নহে। কেবল সামান্য সামান্য বিষয়ে যে প্রভেদ লক্ষিত হয় এরূপ নহে, অতি প্রধান ও গুরুতর বিষয়েও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। বঙ্গদেশে অন্নব্যঞ্জন অগ্নিপক্ক হইলে উহা উচ্ছিষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—বস্ত্রের সহিত উহার সংস্পর্শ হইলে সে বস্ত্র ধৌত করা আবশ্যক। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই উক্তরূপেব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল অগ্নিপক্ক অন্নের সহিত বস্ত্রাদির সংস্পর্শ কোন দোষাবহ বলিয়া মনে করা হয় না। কিন্তু এ দৃষ্টান্তটিও অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয় সম্বন্ধে হইল। বাস্তবিক, অতি গুরুতর বিষয়েও যে এই প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল বঙ্গদেশবাসী হিন্দু কখন পঞ্জাবে গমন করেন নাই, তাঁহারা শুনিলে অবাক্ হইবেন যে, উক্ত প্রদেশে শূদ্রে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করে, ব্রাহ্মণে তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিয়া থাকেন তাহাতে কোন দোষ হয় না। লাহোরে গিয়া দেখ বাজারে কাহার জাতিতে অন্নব্যঞ্জন পাক করিতেছে, অতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণেও তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কাশ্মীরে যদি মুসলমান অন্ন বহন করিয়া লইয়া আইসে তাহা অতি শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণেরও পরিত্যাজ্য হয় না। মৎস্যভোজন বাঙ্গালির নিকট অতি নির্দ্দোষ দৈনিক কার্য্য, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীর নিকট উহা যারপরনাই ঘৃণিত, অশ্রদ্ধেয় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য। কোন হিন্দুস্থানী মৎস্য ভোজন করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে

হয়। আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালি হিন্দুদিগের নিকট কুক্কুট মাংসাহার যে কি বিষম দোষাবহ ব্যাপার, কতদূর ধর্ম্মহানিকর ও ঘৃণিত কার্য্য তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে যাও সেখানে আর এক অবস্থা দেখিতে পাইবে। সেখানে ব্রাহ্মণজাতি নিরামিষভোজী; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকল জাতিই অম্লানবদনে অতি উপাদেয় জ্ঞানে কুক্কুট মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। কেহ তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না, তজ্জন্য কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার বিষয়ে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল; বাস্তবিক তদ্বিষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মবিষয়ক মতের বিভিন্নতা যে কতদূর অধিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ, ভাষা সম্বন্ধেও সেই প্রকার বা ততোধিক। আর্য্য ও অনার্য্য কত প্রকার ভাষাই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। এমন একটী ভাষাও নাই যাহা সমস্ত ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দি ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকদ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ প্রদেশ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই উক্ত ভাষায় কথা বলিলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে।

বংশ সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসিগণ বিভিন্ন বংশ (race) হইতে সমুৎপন্ন। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই প্রধান বিভাগে ভারতবাসিগণ বিভক্ত। অনেকে মনে করেন যে এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ অনার্য্য বংশসম্ভূত। বাস্তবিক তাহা নহে। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন; তাঁহারা যে কোন কারণে হউক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পারস্য ও আফগানস্থান হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও আর্য্যবংশীয়। কেবল যাঁহারা আরব ও তুর্কিস্থান হইতে সমাগত তাঁহারাই অনার্য্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। সেই অল্পসংখ্যক মুসলমান ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক অনার্য্য বংশজাত লোক ভারতবর্ষে বাস করিতেছে। গারো প্রভৃতি অনার্য্য অসভ্য জাতির কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুসভ্য হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও শত সহস্র লোক অনার্য্য বংশজাত। ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মান্দ্রাজ প্রদেশবাসিগণের, আর্য্যবংশীয় বলিয়া গৌরব করিবার অধিকার নাই। তাঁহাদের আকৃতি আর্য্যবংশীয়দিগের মত নহে উহা সম্পূর্ণরূপে অনার্য্যদিগের তুল্য। উক্ত প্রদেশে দুইটি ভাষা প্রচলিত আছে, তেলেগু ও তামিল। ঐ দুটিই অনার্য্য ভাষা। সংস্কৃতের সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা বাঙ্গালায় বলি "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন।" হিন্দুস্থানীরা বলেন "আপ কাঁহাসে আতে হেঁ," ইত্যাদি ভারতপ্রচলিত আর্য্য ভাষা মাত্রেই সংস্কৃতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মান্দ্রাজীরা বলিবেন,

"তাঙ্গড় ইয়াপড়ুহু ইন্দিড় হিড়।" পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মান্দ্রাজীরা রামায়ণবর্ণিত মহা ঘটনার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে আর্য্যজাতির সহিত সংমিলিত হইয়াছে। বংশ অনুসারে বলিতে গেলে মান্দ্রাজ প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়গণ আমাদের নিকট কুটুম্ব। ভাষাবিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইংরেজ, জর্ম্মান, ফরাসি, হিন্দু প্রভৃতি জাতি সকল এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন।

ভারতবর্ষের চতুঃসীমা এরূপ দুর্ভেদ্যরূপে পরিবেষ্টিত যে বিদেশীয় জাতির সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশের অধিবাসিগণের অধিক সংশ্রব হয় নাই। কিন্তু আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যেও কোন কালে পরস্পরের অধিক সংশ্রব সংঘটিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশ সকল এত দূরবর্ত্তী ও তত্তৎস্থলে গমনাগমনের এত অসুবিধা যে, উক্ত সকল প্রদেশবাসিগণের মধ্যে আলাপ পরিচয় হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। রেলওয়ে সংস্থাপনের পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ হইতে পঞ্জাব যাত্রা যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুবৃহৎ স্রোতস্বতী, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, ভয়ঙ্কর অরণ্য পর্য্যটকগণের গতিরোধ করিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে বর্ত্তমান। সুতরাং দূরপ্রদেশনিবাসী ভারত সন্তানগণের মধ্যে এতদূর বিচ্ছিন্নভাব সমুপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়া অল্পে অল্পে এই শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

ভারতবাসিগণের মধ্যে পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় ঘটনার একতাও নাই। হিন্দুদিগের মূল ইতিহাসের একতা আছে। সকল হিন্দুই সমভাবে গৌরব করিয়া বলিতে পারেন, আমাদের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির, আমাদের ব্যাস ও বাল্মীকি, আমাদের ভবভূতি ও কালিদাস, আমাদের আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য। ভারতবর্ষের যেখানে ইচ্ছা যাও, দেখিবে, প্রাচীন আর্যপিতৃপুরুষগণের নামে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত হিন্দু-সন্তানমাত্রেরই মস্তক অবনত হইয়া থাকে। সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের নামে যাহা বলিবে তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে আঘাত করিবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তের মধ্যে একতা নাই। শিখ, মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত, বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতিসকলের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদিগের সহিত ঐতিহাসিক একতা ত কিছুই নাই। আমাদের আদি গৌরবের ক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্ত; তাঁহাদের আরব দেশ। আমরা বিজিত, তাঁহারা বিজেতা।

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ দর্শিত হইল, সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সেইরূপ। ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক

প্রথা সম্বন্ধে যারপরনাই ভিন্নতা। ধর্ম্মানুগত আচার সম্বন্ধে যে প্রকার ঘোরতর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল সামাজিক প্রথার বিষয় বলা যাইতেছে। বিবাহ সামাজিক কার্য্য সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই বিবাহ সম্বন্ধে অতিশয় প্রভেদ লক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্য সামান্য প্রভেদের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান প্রধান দুই একটির কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থানবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে পতিবিহীনা রমণীগণের পক্ষে পুনঃপরিনয় যারপরনাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস রহিয়াছে; চিরবৈধব্যই তাঁহাদিগের অবশ্য বহনীয় ও প্রতিপাল্য কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতেছে। তথাচ দেখুন উড়িষ্যা প্রদেশে এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে বিবিধ সম্প্রদায় মধ্যে অনেক তারতম্য ও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মাঙ্গালোর, কোচিন, কালিকট প্রভৃতি মলবার উপকূলস্থ অনেক স্থানে বিবাহবন্ধন যারপরনাই শিথিল। নেয়ার, বেলোয়ার প্রভৃতি জাতি সকলের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এই এক চমৎকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে পুত্র না হইয়া ভাগিনেয় বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি-ছাড়া প্রথার যুক্তি এই যে, ভাগিনেয়ের শরীরে যে বংশের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে ইহা নিশ্চিত; কিন্তু দাম্পত্য বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ পুত্র সম্বন্ধে সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কে কাহার সন্তান স্থির হওয়া কঠিন বলিয়াই এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের দেশের চৈতন্যবৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে কি প্রকার প্রথা সকল প্রচলিত আছে, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সামাজিক প্রথাসম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা একপ্রকার নহে। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে অবরোধ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। পঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে অবরোধপ্রথা নাই বলিলেই হয়। বিন্ধ্যাচল অবরোধ প্রথার সীমা। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ভদ্রমহিলাগণ প্রকাশ্যরূপে রাজপথ দিয়া গমনাগমন করেন, তাহাতে কেহই দোষ মনে করেন না। তথায় অবগুণ্ঠন দিবার নিয়ম নাই; এবং অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও নিষেধ নাই।

প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষন অনুসারে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যে প্রকৃতিগত একতা নাই। ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তাঁহাদেরও সেইরূপ মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সবলকায় ও সাহসী পঞ্জাবী; অধ্যবসায় ও

উদ্যমশীল মহারাষ্ট্রীয়; বুদ্ধিমান্, দুর্ব্বলদেহ ও ভীরু বঙ্গবাসী ইত্যাদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের প্রকৃতির ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে।

জাতীয়ভাবের লক্ষণ কয়েকটি লইয়া দেখান হইল যে, তাহার কোনটাই সাধারণভাবে সকল ভারতবাসীর মধ্যে বর্ত্তমান নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, আমাদের (ভারতবর্ষীয়গণের) কোন বিশেষ জাতীয় ভাব আছে? যখন সকল বিষয়েই অনৈক্য, তখন এক ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া পরিচয় দিবার আমাদের অধিকার কোথায়? কোন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলেন যে, জাতীয়ভাবের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ভাষাই সর্ব্বপ্রধান। সে ভাষা সম্বন্ধেও যখন এতদূর ভিন্নতা, তখন একতাসূত্রে বদ্ধ হইবার আমাদের আশা কোথায়? এই প্রস্তাবলেখক একবার মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার কোন আফিসে জনৈক তৎপ্রদেশবাসীর সহিত ইংরেজী ভাষায় আলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ইংরেজ আসিয়া বলিলেন, "আপনারা কি পরস্পরকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া মনে করেন?" তাঁহারা সে কথায় হাঁ বলিয়া উত্তর করায়, সাহেব বলিলেন, "তবে কেন আপনারা আপনাদের মাতৃভাষায় কথাবার্ত্তা বলুন না।" সাহেব প্রকৃত অবস্থা জানিতেন বলিয়া ও-কথাটি বিদ্রূপ করিয়াই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষেও বাস্তবিক ইংরেজী ভিন্ন অন্য কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় পরস্পর আলাপ করা অসম্ভব ছিল। মান্দ্রাজী যদি হিন্দি জানিতেন তাহা হইলেও একপ্রকার চলিতে পারিত। শিক্ষিত বাঙ্গালি ও শিক্ষিত মান্দ্রাজীর পরস্পর আলাপ করিতে হইলে ইংরেজী ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সমগ্র ভারতে কখন এক ধর্ম্ম ও এক ভাষা প্রচলিত হইবে কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নহে। যিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্যের জয় এককালে হইবেই হইবে, তিনি নিজে যে ধর্ম্মাবলম্বী তাহাই সমস্ত ভারতের,—কেবল ভারতের কেন —সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা এ স্থলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ক্রমে ইংরেজী ভাষাই ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে। যাঁহারা সে প্রকার বিশ্বাস করেন করুন, আমরা কিন্তু সে কথায় হাস্য না করিয়া থাকিতে পারি না। শত শত যোজন দূরবর্ত্তী সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ বিশেষের ভাষা যে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর সাধারণ ভাষা হইবে, ইহার তুল্য অসম্ভব কথা কিছুই হইতে পারে না। সংসারে যদি কিছু অসম্ভব থাকে তবে উহাই সে অসম্ভব। মানবজাতির পুরাবৃত্তে এবম্বিধ ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কোন প্রকার যুক্তিতেও উক্ত বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি হয় না। এক সময়ে অনেক মের্জা সাহেবও পারস্যভাষা ভারতীয় সকল ভাষা লোপ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রচলিত দেশীয় ভাষা সকলের মধ্যে যদি কোন ভাষার পক্ষে ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা হিন্দি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। কেন না ভারতে হিন্দি ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। হিন্দি যে স্থানের প্রচলিত ভাষা নহে সেখানকার লোকও সহজ হিন্দিতে কথা বলিলে বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে প্রকার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে হিন্দি ভাষার পক্ষে সে প্রকার না হওয়া অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। বাঙ্গালার ন্যায় হিন্দির উন্নতি হইলে শতগুণ অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সেখানকার লোক হিন্দি বলিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না।

তবে কি ভারতবাসিগণের একতাসূত্রে বদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই? এমন কি কোন সাধারণ ভূমি নাই যেখানে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন? অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় ভারতবাসিগণ কখনই একতাবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবেন না। তাঁহারা বলেন যে, এ দেশে কোন কালে যাহা হয় নাই তাহা এক্ষণে কি প্রকারে হইবে! কোন বিষয়েই যাঁহাদের মিল নাই তাঁহারা কেমন করিয়া পরস্পর সংমিলিত হইবেন! ভারতের ভাবী মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা এই সকল ব্যক্তির ন্যায় একবারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ নহি। এক সাধারণ একতাসূত্রে সকল ভারতসন্তানের বদ্ধ হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব আমরা এরূপ মনে করি না। ইহা সত্য বটে যে, সমগ্র ভারত কোন কালে একতাবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে নাই। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ এই ত্রিবিধ রাজশাসনকালের মধ্যে কোন কালেই সমগ্র ভারত কোন সাধারণ ভাবে সমবেত হইতে পারে নাই;—চিরকালই বিচ্ছিন্ন ভাব। কিন্তু পূর্ব্বে কখন একতা হয় নাই বলিয়া যে ভবিষ্যতেও কখন হইবে না এমন কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ভারতের যে অবস্থায় একতা সংস্থাপিত হইতে পারে নাই, ঠিক সেই অবস্থা যতদিন থাকিবে ততদিন নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নভাবও থাকিবে; কিন্তু যদি সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে সে প্রকার বিচ্ছিন্নভাবও চলিয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক ইতিমধ্যেই কি অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয় নাই? হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে দুই একটি অতি প্রধান বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। প্রথম, ভারতের সমুদায় অধিবাসিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। পূর্ব্বে কোন কালে এ প্রকার ঘটে নাই। বৌদ্ধ শাসনকালে অশোক প্রভৃতি কোন কোন রাজার সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান এক রাজশাসনের অধীন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এখন যেমন হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত এক বৃটিশ সিংহের করকবলিত হইয়াছে,—এক রাজদণ্ডকে বিংশতি কোটী ভারতসন্তান বিনম্র মস্তকে

অভিবাদন করিতেছে এ প্রকার পূর্ব্বে কখন হয় নাই। দ্বিতীয়, এক্ষণে লৌহবর্ত্ম ও তাড়িতবার্ত্তাবহের সৃষ্টি হওয়াতে, ভারতবর্ষের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের অধিবাসিগণের মধ্যেও আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভারতবাসিগণ পরস্পরের নিবাস প্রদেশে আসিয়া পরস্পরের সহিত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দা বর্দ্ধন করিতেছেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালি পঞ্জাবে গিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তৎপ্রদেশবাসিগণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার করিতেছেন, বোম্বাই গমন করিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আপনাদের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আবার বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিতেছেন। জাতিতে জাতিতে এ প্রকার সম্মিলন অল্প অল্প আরম্ভ হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচার অতি আশ্চর্য্যরূপে ভারতের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে। মান্দ্রাজ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোত সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দিকে প্রধাবিত। পূর্ব্বে কখন এ প্রকার হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষা এখনই অল্প অল্প বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, একতাবন্ধন ভিন্ন আমাদের উন্নতির আশা নাই। যিনিই কেন যাহা বলুন না, আমরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে একটী আশা করিতে পারি যে, ভারতবর্ষ অন্যান্য সহস্র বিষয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন থাকিলেও সকল ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক একতা সংস্থাপিত হইতে পারে। ভারতবাসিগণ এক্ষণে এক রাজার প্রজা, সকলকেই এক প্রকার রাজনৈতিক মঙ্গলামঙ্গলের অধীন হইতে হইতেছে। সুতরাং অন্য সহস্র বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও আমাদের মধ্যে এই একটী সাধারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা ভ্রাতৃভাবে পরস্পরের হস্তধারণ করিতে পারি। অন্যান্য বিষয়ে প্রভেদ সত্বেও আমরা সাধারণ রাজনৈতিক কষ্ট ও অভাব বিদূরিত করিতে, এবং সাধারণ উন্নতি সংসাধন করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইতে পারি। পৃথিবীর সুসভ্য জাতি সকলের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথা কখনই বলিতে পারেন না যে, এ প্রকার রাজনৈতিক সম্মিলন অসম্ভব। সুইজরলণ্ড, বেল্‌জ্যাম ও জর্ম্মনির ইতিহাস এ কথার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। সুইজর্লণ্ডের রাজনৈতিক একতা বিলক্ষণ রহিয়াছে, অথচ উহার ভিন্ন ভিন্ন কাণ্টনবাসিগণের মধ্যে ধর্ম্ম, বংশ ও ভাষা এই তিন প্রধান বিষয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। জার্ম্মেনিতে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘোরতর অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে—রোমান্ কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই সম্প্রদায়ে অধিবাসিগণ বিভক্ত; অথচ তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক একতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। বেল্‌জ্যামদেশে ফ্লেমিস্ ও ওয়ালুন নামক প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে বংশ ও ভাষাসম্বন্ধে ভিন্নতা রহিয়াছে, অথচ তাঁহাদের মধ্যে

জাতীয় একতার ভাব বর্ত্তমান। অপরাপর বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও রাজনৈতিক একতা যে সম্বদ্ধ হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয়ভাবের যে সকল কারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কার্য্য সকল অবস্থায় অলঙ্ঘনীয় নহে। নতুবা ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রধান প্রধান কারণ সত্বেও উপরিউক্ত কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক একতা বদ্ধমূল হইতে পারিত না।

রাজনৈতিক একতা সংস্থাপন করিতে হইলে, ভাষাবিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিহার হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত হিন্দিভাষা প্রচলিত, সুতরাং এই প্রথম বিভাগ। উড়িষ্যা, বাঙ্গালা ও আসাম এই তিন প্রদেশের ভাষা প্রায় একই, অতএব এই দ্বিতীয় বিভাগ। মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য, অতএব উহা তৃতীয় বিভাগ; এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে তেলুগু ও তামিল বহুল সাদৃশ্যবিশিষ্ট অনার্য্য ভাষাদ্বয়, অতএব এই চতুর্থ বিভাগ। এই চারি বিভাগে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া চারিটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইতে পারে; এবং ঐ চারিটি রাজ্য এক হইয়া একটি মিলিত রাজ্য (Federal Government) হইতে পারে।

যে সকল সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতে হয়, এস্থলে তাঁহাদের একটী অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার বুঝা যাইতেছে। যাহাতে উক্ত প্রদেশবাসী ব্যক্তিগণের সহিত সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদাই যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি অল্পসংখ্যক লোকই সেইরূপ যত্ন করিয়া থাকেন। এমন কি অনেক স্থলেই বাঙ্গালি বাবুদিগের অসদাচার জন্য হিন্দুস্থানিগন তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তৎকালে যে দুই একজন বাঙ্গালি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন তাঁহারা সম্মানিত হইতেন।

এস্থলে মুসলমানদিগের বিষয়ে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষবুদ্ধি চিরকালই ভারতের অশেষ অকল্যাণের কারণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই যত্নশীল হওয়া যারপরনাই আবশ্যক। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ভিন্ন কোন ক্রমেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সংসিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গালা কবিতা-লেখক ও নাটককারগণের মধ্যে অনেকেই এই বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহাতে ক্রমাগত ইন্ধন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "যবন যবন"

করিয়া অনেকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র যে সকল "না টক না মিষ্ট" নাটক প্রতিদিন প্রসব করিতেছে, তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ কোন ইষ্ট হউক আর নাই হউক অনিষ্ট নিতান্ত অল্প হইতেছে না। রঙ্গভূমি সকল "ভারতে যবন" "ভারতের সুখশশী যবনকবলে" ইত্যাদি নাটক সকলের অভিনয় কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। এখন যবনদিগকে গালি দিয়া দেশের কোন উপকার নাই, অনুপকার বিলক্ষণ আছে। এখন যবনদিগের সহিত সদ্ভাব করিবার সময়। "হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ! তোমাদের পুরাতন বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া এখন নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় প্রীতি ও সদ্ভাবের সহিত পরস্পরের সংমিলিত হও। বর্ত্তমান প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ভূতকালের বিষয় ভুলিয়া যাও।" হিন্দু হউন কি মুসলমান হউন যিনি দেশের প্রকৃত কল্যাণ প্রার্থনা করেন তিনি এই কথাই বলিতে থাকুন। কবিতা, সঙ্গীত ও বক্তৃতায় এই কথা হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতে থাকুক।

"শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই;
দেশের দুর্দ্দশা দেখ হল ঢের,
তোরা তো সন্তান প্রিয় ভারতের;
সে শত্রুতা ভুলে, আয় প্রাণ খুলে,
পুঁতে রাখ কথা মন্দের কাজের,
বল শুধু,—'মোরা প্রিয় ভারতের,'
ভারতের তোরা তোদের আমরা,
আজ পূর্ণ হল আনন্দের ভরা!
সবে একদশা তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর।
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘোষিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,
আমাদের মাতা বাঁচিল আবার।"

পুষ্পমালা

আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম যে, জাতীয়ভাবের সাতটী কারণ বা লক্ষণ—ধর্ম্ম, ভাষা, বংশ, বাসস্থানের প্রাকৃতিক সীমা, ঐতিহাসিক ঘটনার একত্ব, সামাজিক প্রথা, ও প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ কয়েকটি লইয়া বিচার করিয়া দেখা হইল যে, ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে ঐ কয়েকটি লক্ষণের প্রায় কোনটিই সাধারণভাবে বর্ত্তমান নাই। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন কালেই জাতীয়ভাব বদ্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবাসিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে এক

সাধারণ সম্বন্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যেও এক্ষণে গমনাগমনের সুবিধা হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে যোগ সংস্থাপনের সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ে অনৈক্যসত্বেও সুইজরলণ্ড জার্ম্মেনি প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের ন্যায় রাজনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উপসংহারকালে সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণকে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহারাই পাশ্চাত্য জ্ঞানোপার্জ্জনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জ্ঞানানুসারে দায়িত্বের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে সকল কল্যাণের নিদানস্বরূপ জাতীয় একতা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তজ্জন্য অপ্রতিহত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করা তাঁহাদেরই যারপরনাই কর্ত্তব্য। ইংরেজী ভাষা দ্বারা যাহা হয় হউক, কিন্তু হিন্দি শিক্ষা না করিলে কোনক্রমেই চলিবে না। হিন্দিভাষায় পুস্তক ও বক্তৃতা দ্বারা ভারতের অধিকাংশ স্থানের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন, কেবল বাঙ্গালা বা ইংরেজীর চর্চ্চায় হইবে না। ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী কয়জন লোক বলিতে বা বুঝিতে পারেন? বাঙ্গালার ন্যায় যে হিন্দির উন্নতি হইতেছে না ইহা দেশের মহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। হিন্দি ভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাঁহারা ঐক্যবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত ভারতবন্ধু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সকলে চেষ্টা করুন, যত্ন করুন; যতদিন পরেই হউক মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে।

নঃ নাঃ

হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র

বৈদিক কাল হইতেই আর্য্যেরা পাশ, বজ্র, শিলা, চক্র, ধনু প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধের সময় অন্যান্য নানাবিধ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণের মতে এই সকল অস্ত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত। এ সকল অস্ত্র ভিন্ন আগ্নেয় অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা কি প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র ইহার বিশেষ বিবরণ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। উইলসন্ সাহেব শতঘ্নী নামক যন্ত্র আগ্নেয় যন্ত্র অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি প্রকার ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহা ভিন্ন হিন্দুগণ মহাযন্ত্র নামক একপ্রকার আগ্নেয় যন্ত্র যুদ্ধকালে ব্যবহার করিতেন।

অদ্য আমরা সেই পূর্ব্বকালের আগ্নেয় যন্ত্রের বিবরণ শুক্রনীতি নামক সংস্কৃত-নীতিশাস্ত্র হইতে নিম্নে লিখিলাম। এই গ্রন্থ শুক্রাচার্য্য প্রণীত। ইহার উল্লেখ অগ্নিপুরাণ ও মুদ্রারাক্ষস নাটকে আছে। ইহাতে নালিক যন্ত্র ও অগ্নিচূর্ণ বিষয় যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আমরা প্রাচীনকালে বন্দুক ও বারুদ-গোলা ব্যবহার করিতাম।

(নালিক যন্ত্র)

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকং॥

নালিক দুই প্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। কিঞ্চিৎ বক্র এবং ঊর্দ্ধ অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ বিতস্তি পরিমাণ ও মূলস্থানে ছিদ্রযুক্ত।

মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবচূর্ণধৃৎ মূলকর্ণকম্।

তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষ্যভেদ-সূচক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে, এবং মূলে ছিদ্রস্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাণ থাকিবে; অগ্নিজনক প্রস্তর সেইস্থানে যন্ত্রাবদ্ধ থাকিবে।

সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্ ।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণ সন্ধাত্রী শলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্ ।

এই নালিকাস্ত্রটি উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গে গ্রথিত এবং তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি বা ধারণ করিবার স্থানও কাষ্ঠনির্ম্মিত। মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এরূপ বিল অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্র থাকিবে। তাহার গাত্রে অগ্নিচূর্ণের সংঘাতকারী শলাকা আবদ্ধ থাকিবে।

লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ ।
যথা যথাতু ত্বক্ সারং যথাস্থূল বিলান্তরম্ ।
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা তথা ।

ইহার নাম লঘুনালিক। ইহা পদাতি সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরা ধারণ করিবে। এই লঘু নালিকের ত্বক্ অর্থাৎ বেধ যেমন পুরু হইয়া থাকে, ছিদ্রও তদ্রূপ লম্বা ও দূরভেদী হইয়া থাকে।

মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্য সম সন্ধানভাজি যৎ ।
বৃহন্নালিক সংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতম্ ॥

এইরূপ নালিকাস্ত্র যদি স্থূল হয় এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত বুধ্ন অর্থাৎ মূল বা ধরিবার স্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম বৃহন্নালিক।

প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্ ।

ইহা এত বৃহৎ হইতে পারে যে, তাহা শকটাদি দ্বারা বহন করিতে হয় এবং ইহা বিজয়প্রদ শোভন-অস্ত্র।

(অগ্নি চূর্ণ)

সুবর্চিলবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাৎ পলম্ ।
অন্তর্ধূম বিপক্কার্কস্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্ ।
শুদ্ধাৎ সংগ্রাহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসেনাস্য শোধয়েদাতপেন চ ।
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু ॥

সুবর্চি লবণ অর্থাৎ যবক্ষার বা সোরা ৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূম বন্ধ করিয়া দগ্ধ করা অর্ক অর্থাৎ আকন্দ স্নুহী অর্থাৎ সীজ প্রভৃতি কাষ্ঠের অঙ্গার ১ পল, সংশোধিত ও চূর্ণ করিয়া তাহা সীজ কি অর্ক রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে তাহা শর্করার ন্যায় চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণের নাম অগ্নিচূর্ণ। ইহা নালাস্ত্রে ব্যবহার করিবে।

গোলো লোহময়ো গর্ভগুটিকঃ কেবলোঽপি বা ।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা ।
লোহসারময়ং চাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্ ।
নিত্যসম্মার্জনস্বচ্ছমস্ত্রং পত্তিভিরাবৃতম্ ।

লোহময় গোল, তাহার গর্ভে অল্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা কি কেবল অর্থাৎ নিরেট

ইহা বৃহন্নালাস্ত্রের ব্যবহার্য্য। লঘুনালের জন্য সীসনির্ম্মিত গুটিকা কি অন্য ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নির্ম্মাণ করিবে। লৌহের সার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ কি তদ্বিধ অন্য ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত নালাস্ত্র নিত্য মার্জ্জন দ্বারা স্বচ্ছ রাখিবে। পদাতি ও অশ্বারোহিগণ তাহা ব্যবহার করিবে।

ক্ষিপন্তি চাগ্নি যোগাচ্চ গোলং লক্ষ্যেষু নালগম্।
নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দত্তাত্তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত দণ্ডেন নালমূলে তথা দৃঢ়ম্।
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
কর্ণ চূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ।

নালাস্ত্রগত গুলিকা অগ্নিসংযোগ দ্বারা লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার বিধান এইরূপ—প্রথমতঃ নালাস্ত্রটি শোধন করিবে, অর্থাৎ মলিনতা রহিত করিবে, পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ প্রদান করিবে, তাহা দণ্ডদ্বারা নালমূলে দৃঢ় প্রোথিত করিবে। তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিকা নিক্ষেপ করিবে। কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ দিবে, সেই কর্ণস্থ অগ্নিচূর্ণে অগ্নি প্রদান করিবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিকা লক্ষ্যে নিপাতন করিবে।

লক্ষ্যভেদী যথা বাণো ধনুর্জ্যা বিনিয়োজিতঃ।
ভবেত্তথা তু সন্ধায়—

ধনুকের জ্যা দ্বারা বাণ যেমন বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইমত বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে।

সমং ন্যূনাধিকৈ রংশৈরগ্নিচূর্ণান্য নেকাশঃ।
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদিমন্তিচ।

অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বকথিত দ্রব্য এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের ন্যূনাধিক বশতঃ অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ হইয়া থাকে। তাহা তদ্বিদ্যাবিশারদেরা কল্পনা করিয়াছেন—তাহা চন্দ্রিকাতুল্য দীপ্তিযুক্ত।

(শুক্রনীতি ৪র্থ প্রকরণ)

এই বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় ইউরোপীয়গণ বিশেষ আশ্চর্য্য হইবেন। কামান বন্দুক বারুদগোলা গুলি প্রথমে ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তথাকার অধিবাসীরা কতই আত্মগৌরব বর্দ্ধন করেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা দেখুন এ সকলই আমাদের ছিল। তাঁহাদের বহুকাল পূর্ব্বে এ সকলই আমরা ব্যবহার করিয়াছি।

শুক্রনীতির এই শ্লোকগুলি সহসা আধুনিক বলিতে কেহ বোধ হয় প্রস্তুত নহেন, তবে ইহার আনুষঙ্গিক বলবৎ প্রমাণাভাবে আপাততঃ এ বিষয়ের যথাবিহিত বিচার করিতে পারিলাম না।

শ্রীরামদাস সেন।

১

কি সুখ স্বপন হায় ভাঙ্গিল আমার ?
দেখি নাই হেন স্বপ্ন দেখিব না আর,
জীবন আঁধারে হায় !
কেন বল দেখা যায়
এমন বিজলি খেলা,—সুখের সঞ্চার ?
কেন হেন সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার ?

সত্য, প্রিয়বর !
ভ্রমি আশা-মরুভূমে পিপাসা কাতর,
দেখিলাম চারু বন অতীব সুন্দর ;—
(কিন্তু কি যন্ত্রণা !
আবার পাষাণখানি কে চাপিল বুকে,
অবরুদ্ধ করি মম ভাবের প্রবাহ ?
দহ করিতেছে প্রাণ ; নাহি সরে মুখে
একটী বচন ; হায় ! একি অন্তর্দাহ ?)

৩

দেখিলাম, প্রিয়বর !
সে চারু কানন কোলে, রম্য সরোবর,
প্রেমবারি সুশীতল
করিতেছে টলমল
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার
হইল, পিপাসা মম পূরিল না আর !

৪

সেই মোহ স্বপ্নে,
হায় রে ত্রিদিব শোভা হইল বিকাশ,
শত চন্দ্র প্রকাশিল,
শত সিন্ধু উছলিল,
শত অপ্সরার কণ্ঠে সঙ্গীত ভাসিল,
সঙ্গীতে, সৌরভে, সখে ! হৃদয় ভরিল।

৫

হইনু উন্মত্ত আমি ; শিরায় শিরায়
ত্রিদিব মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া,
মাতিল পাগল প্রাণ,
হায় ! হারাইনু জ্ঞান,
শত চন্দ্র-করে স্নাত আকাশের পানে
চাহিলাম ; কি দেখিনু ? (নাহি সহে প্রাণে
ধর চাপি বক্ষ মম, কল্পনাও তার,
করিতেছে চিত্তে মম মোহের সঞ্চার)।

দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার,
আঁধারিয়া শত চন্দ্র, জ্যোৎস্নার হার
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার।
কি মূর্ত্তি ! কি শোভা !
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হায় ! কত রূপান্তর,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হায় ! রূপের সাগরে
কত লহরী সুন্দর।

৭

কিন্তু সেই রূপরাশি,
কোমল পর্য্যঙ্ক অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায়,
মরি কি অপূর্ব্ব চিত্র! মুক্ত কেশরাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা উপাধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে।
শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,
অস্তগামী পূর্ণশশী সিন্ধু নীলিমায়।

৮

কিন্তু প্রিয়তম!
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন;
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তৃত নয়ন,
আবৃত নিদ্রায়; সেই চারু রক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর;—
(সেই মদিরার স্মৃতি
এখনো করিছে মম অবশ অন্তর!)

৯

অতুল সে ভুজবল্লী; বক্ষ অনুপম—
পার্থিব ত্রিদিব! যেন চারু শিল্পকর
অতরল জ্যোৎস্নায় করেছে গঠন,—
মরি মনোহর!
সর্ব্ব শেষে—বলিব না, বলিব কি ছাই,
যাহার তুলনা নরচক্ষে দেখি নাই—
সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,
মম জীবন আলোক,
কত দীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
করেছে হৃদয় মম বিভাসিত হায়!—

১০

সেই বর্ণ,—না না সখে! পারিব না আমি
চিত্রিতে তোমার কাছে,—
সে যে বর্ণ জীবন্ত জ্যোৎস্না
দেখি নাই ইহ জন্মে, দেখিতে পাব না।
কিন্তু সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ,
দেখেছি দেখেছি যেন হইল স্মরণ।

১১

(দেও সখে সুরাপাত্র, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা,
তুমি মূর্খ!
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুভব,
সুরাপাত্র হায়! কত সন্তাপসংহারী)।

১২

কিম্বা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমারে,
এ নহে প্রথম হায়!
দেখিনু সে প্রতিমায়,
আন ছুরি চিরি বক্ষ দেখাই তোমারে
আন ছুরি চিরি বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ,
এ মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি, গোপনে, আদরে,
রাখিয়াছি কত কাল অন্তর অন্তরে।

১৩

গোপনে প্রণয়-পুষ্পে, নয়নের জলে,
পূজিয়াছি কত কাল হৃদয়বাসিনী;
প্রতিদিন বলিদান,
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ,—
আত্মঘাতী পূজা! হায়! তথাপি কখন,
দারুণ মন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন।

১৪

জানিতাম
হায়রে পাষাণময়ী দেবতা আমার,
জানিতাম
নন্দন কুসুমে শত উপাসক তার
পূজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে।
তবে কেন এই পূজা, আত্মবলিদান?
নাহি জানিতাম সখে! কিন্তু জানিতাম—
(দেও সুরাপাত্র হায়! বলিব এখন)—
এই উপাসনা মম জীবন মরণ।

১৫

আজি সখে সেই
জীবনের আরাধনা, তপস্যার ফল,
দেখিলাম নামিতেছে ত্রিদিব হইতে
আমি ভকত হৃদয়ে।
কাঁপিলেক থর থর,
এই ভগ্ন কলেবর,
অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হলো প্রসারিত,
ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল সম্বিত।

১৬

"প্রাণনাথ!—
জীবন সর্ব্বস্ব মম!—জীবন আমার!—
আমার জীবন!
দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে।"
কহিল মধুরে কর্ণে—
"প্রাণময়ি! প্রেমময়ি! তপস্বী তোমার।"
পড়িনু চরণপ্রান্তে; মনে নাহি আর।

১৭

পোহাল শর্ব্বরী,
প্রভাত কাকলি সহ প্রভাত সমীর
জাগাল আমারে, সখে! পাইনু চেতন,
কিন্তু কোথা সখে! মম তপস্যার ধন?
এ জনমে তারে আমি পাব কি আবার?
কেন হেন সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার?

১৮

স্বপ্ন!! না না সখে,
এই সুখ, স্বপ্ন যদি? জীবনে আমার
কোথায় প্রকৃত সুখ?
আমার জীবনে আমি,
এই এক সুখ জানি,
স্বপন বলিলে তারে ফাটিবে যে বুক!
নিষ্ঠুর কালের স্রোত; সর্ব্বস্ব আমার
নেও ভাসাইয়া তুমি, তাতে ক্ষতি নাই,
এই মুহূর্ত্তটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই।

১৯

ছাড় কর, প্রিয়তম,
ছাড় কর দেও ওই তীক্ষ্ণ ছুরিখানি,
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি,
কালের চরণে পড়ি,
সেই মুহূর্ত্তটী আমি ভিক্ষা মাগি আনি।

২০

আবার পাষাণখানি চাপিয়াছে বুকে,
আবার দারুণ জ্বালা জ্বলিল আমার,
হুহু করিতেছে প্রাণ,
সংসার শ্মশান জ্ঞান,—
কি পিপাসা! আন সুরা, আন বিষ, ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা যন্ত্রণা পাসরি।

শ্রীনঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর, শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে—ছি!

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন, আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। একদিকে তাঁহার নাসিকা, নাদ সুরে গমকে গমকে তান মূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগ রাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর একদিকে, তাঁহার মন, অহিফেন প্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে, ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া, তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে—এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, "জ্যেঠামহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে "জ্যেঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?" এমত সময়ে কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যেঠামহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল, হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল, এবং নল,

বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মিলন করিয়া দেখেন যে, কার্ত্তিকেয় যথার্থ ই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান্ স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যেঠামহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল?" বুড়া গোবিন্দলালকে বড় ভালবাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।"

এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পান-বাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না—মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদ-মুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারির কথা পাড়িল—জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকর্দ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায়?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া মুখে কিছু মাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল ?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল—"আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে হরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল—কিন্তু গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, নোটগুলির উপর পা রাখিয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না! আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির! এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাইত, যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া, নোট গুড়াইয়া লইয়া, দ্বার খুলিয়া আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষু"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর? আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু—রাখিব কি প্রভু—হে দেবতা!

হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখন ভাবিল গরল খাই, কখন ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি, কখন ভাবিল পলাইয়া যাই, কখন ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি, কখন ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে নোট ফিরাইয়া দিল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?"

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র যে আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন, স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন, চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাব্‌ছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কাল রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল "সে কি? আমায় ভাব্‌ছ না? আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি? আমি অন্য মানুষ ভাব্‌তেছি।

ভ্রমর, তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে, জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ—কাকে ভাব্‌ছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌ব—বল না।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌বো এখন—বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে?

গো। তা কি জানি?

ভ্র। জান—বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্র। না। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে। আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাস্‌তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ—যা কর্‌তে নাই তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্লনীলোৎপলদলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া মৃদু মৃদু, অথচ গম্ভীর, কাতরকণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।"

তীব্রবেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী—মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মানিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "—দূর তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম।

আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—আমাকে আর দেখিতে না পায়। খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভ্র। তার পর?

গো। তার পর সে রাজি হইল না।

ভ্র। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভ্র। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা, "ক্ষীরি! ক্ষীরি" করিয়া একজন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটাসোটা গাঁটা-গোটা—মল পায়ে গোট পরা—হাসি চাহনীতে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি,—রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পারবি?"

ক্ষীরি বলিল, "পারব না কেন? কি বল্‌তে হবে?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বলিলেন, তুমি মর।"

"এই? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে আমায় বলিয়া যাস্।"

"আচ্ছা" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভ্র। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভ্র। তবে আবার যা। বলিয়া আয়—যে বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস্?"

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভ্র। সে কি বলিল?

ক্ষী। বলিল যে, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা।"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যেজন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান ভ্রমণ জীবনে একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারিবার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যান মধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকা মধ্যে একটী শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী প্রতিমূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,—তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে, উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃণ্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাব—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধী দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালবাসিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কখন কখন ভ্রমরকে উদ্যান ভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখন কখন আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত—কখন কখন গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখন কখন তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাঁধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান পরম্পরায় রোহিণী কলসী কক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া, গাত্রমার্জ্জন করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিষেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা

পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সেই জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এই মাত্র জল লইতে আসিয়াছিল। তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, "বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে।" মনে পড়িল যে রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল, কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষা জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষে গোবিন্দলালের প্রমোদগৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখন সে গৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল দীর্ঘ বিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদিত; কিন্তু সেই মুদিত পক্ষের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জা-ভয় বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা বুঝা যাইবে।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদগীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটী কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন যাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্দারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে। মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়। সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুংকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়; তখন সেই ফুৎপ্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটী বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুংকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য, রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুংকার দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, আমি ইহার হাত দুইটী তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি?

মুখে ফুঁ! সর্ব্বনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফু— তা হেবে না অবধড়!

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামের উপর পা দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে দিলে দিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই জগন্নাথে মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, "মু ত পারিবে না অবধড়!"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তারপর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া, আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুরপো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি,

বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক-অ পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীলজলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল, তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে, ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরের কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধিবিপ্লবের ফল

(পূর্ব্ব প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তার্থ)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা, উহার কারণ, প্রকৃতি এবং উহার দ্বারা আন্তরিক ও বাহ্যিক যে সকল উন্নতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের একত্র বাস বিপ্লবের কারণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ তাহার উদ্দীপক। বিপ্লবকালের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতেই আমরা গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সময়ে দর্শনের সৃষ্টি আইনের সৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষণে উহার ফলগুলি একটু বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিব।

(প্রথম ফল যাগ যজ্ঞের বিরল প্রচার)

বিপ্লবের পূর্ব্বে লিখিত ব্রাহ্মণ নামক বেদের অংশগুলি নানারূপ যজ্ঞকাণ্ডের নিয়মে পরিপূর্ণ। উহাতে মাসব্যাপী, বৎসরব্যাপী, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী, বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের কথা আছে। ব্রাহ্মণ সকল ছাপা হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই জগতের যাবতীয় দ্রব্যই যজ্ঞের প্রয়োজনে লাগিত। এক স্থানে দেখিয়াছি ইন্দুরমাটীও কাছে লাগিয়াছে। বিপ্লবের পর যাগযজ্ঞ ক্রমে কমিয়াছে। ইহার পর আর অশ্বমেধ গোমেধ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের নাম বড় একটা শুনিতে পাই না। যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বাজপেয়াদি যজ্ঞ হইয়াছে তথাপি ব্রাহ্মণকালের তুলনায় বিপ্লবের পর যজ্ঞ আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যজ্ঞতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই যে ব্রাহ্মণকালে যজ্ঞ ভিন্ন মুক্তি ও ভূতিলাভের উপায় ছিল না। বিপ্লবের সময় জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমে আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য মুক্তিপ্রদায়ক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যাগযজ্ঞের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

(বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি)

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় যজ্ঞের অসংখ্য পশুবধ দেখিয়া শুদ্ধোদন রাজার পুত্র মহামতি বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়া অহিংসাপরমোধর্ম্মঃ এবং জ্ঞানই মুক্তির উপায় এই দুইটি মতের প্রচার করেন। উহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আমরা দেখিতে পাই উপনিষদ্ সমূহেও ঐ দুই মত আছে; সুতরাং বোধ হয় উহারা এই বিপ্লবকালে উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নূতন মতের অন্যতম। পূর্ব্বাঞ্চলে বুদ্ধদেব ঐ মতদ্বয়ের প্রচার করেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল; তাঁহার মত সেখানে সাদরে গৃহীত হয়। দেখিতে দেখিতে মিথিলা মগধ কোশলা কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজারা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় রাজা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই ধর্ম্মেরই শ্রীবৃদ্ধি। রাজদরবারের লোক রাজার অনুগমন করে; ছোট লোকের কোন ধর্ম্মই নাই, তাঁহারা কিছুই বুঝে না, তাহারাও প্রায় রাজারই পশ্চাদ্গামী হয়। এইরূপ নূতন ধর্ম্ম অবলম্বিত হইলে কেবল প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত পুরোহিতগণ রাজার বিরোধী হয়েন। সৌভাগ্যক্রমে মগধ মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভালরূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তথাকার পুরোহিতগণ যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহা অনায়াসেই উপশমিত হইল। শেষ অনেক ব্রাহ্মণও বুদ্ধদেবের শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে গণ্য হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের জয় জয়কার হইল।*

(বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত একটি কথা)

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবামাত্র দেশের সকল লোক তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়। এই একটী সম্পূর্ণ ভ্রম। অশোক রাজার নিজ অধিকারকালেও সমস্ত মগধ বৌদ্ধ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কোন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ নির্ম্মূল হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী রাজারা উক্ত মত অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছিল। বস্তুতঃ যেমন হিন্দু, মুসলমান, তেমনি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের সকল দেশে সকল নগরেই বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা এখন যেমন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণা করেন, বৌদ্ধদিগকেও সেইরূপ করিতেন; বিশেষের মধ্যে এই চৈতন্য সম্প্রদায় কখনও রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, বৌদ্ধেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি যে উপরিউক্ত বিপ্লবের একটী সুধাময় ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

* অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন না; তিনিও গৌতমাদির ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মত অনেক পরিমাণে সত্য হইবার সম্ভাবনা। কারণ অশোক রাজার পূর্ব্বে আমরা বৌদ্ধদের কথা বড় একটা শুনিতে পাই না; তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হয়।

(মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি)

বুদ্ধদেবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এমন কি এক মিথিলা ও মগধেই দশ পনর জন রাজার নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। তার পর দুইশত বৎসরের ইতিহাস জানি না। সেকেন্দরের আক্রমণকালে শুনিতে পাই, মহানন্দ নামে একজন নন্দবংশীয় ভূপাল প্রাচী রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। দুইশত বৎসরের মধ্যে এরূপ সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তেমনিই আছে। সেকেন্দর একজনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, একজনকে জুয়াচুরি করিয়া হাত করিলেন, আর একজন আপনি শরণাগত হইল। অথচ সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল এক রাজার অধীন হইয়াছে, ইহার কারন কি? বোধ হয় পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত রাজারাই ব্রাহ্মণের বিরোধী ছিলেন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সন্ধি হয়; মিল হয়; শেষ দিলাসের রাষ্ট্র সমবায়ের* ন্যায় ঐ সন্ধিতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজারা শূদ্র ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল, পুরাণে লিখিত আছে। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন না। ইহাতে কি বোধ হয়? পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হওয়া হেতুকই পরস্পর একতাপাশে বদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। রাজকীয় একতার ফল মগধ সাম্রাজ্য, আর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতার ফল বৌদ্ধধর্ম্ম।

(মগধ সাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে)

মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান উপকার হইয়াছে। বিদেশীয় হস্ত হইতে ভারতের উদ্ধার ও দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আছে। সেইটি আমরা প্রথমে বলি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকা প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দের একমাত্র উপায়। আবার অনেকে আছেন তাঁহাদের মত বৃহৎ সাম্রাজ্যই উন্নতির হেতু। দুই মতেই আংশিক সত্য উপলব্ধি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য অসভ্য অবস্থায় ভাল। উহাতে শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতা বিস্তার হয়, সাক্ষী গ্রীস্ ও ইতালী। কিন্তু সভ্যতা, উন্নতি একবার বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্যই সুবিধা; রোম ও চীন এই দুই সাম্রাজ্যই প্রাচীন সভ্যতা বজায় রাখিয়া তাহার উন্নতি করিয়া গিয়াছে। মগধ সাম্রাজ্যের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্যরাজ্য করতলস্থ করিয়া মগধের উৎপত্তি। যতদিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল ততদিন প্রজাবর্গের সুখ ছিল। মাগধেরা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিত, চিকিৎসালয় বিদ্যালয় স্থাপিত করিত, বিদ্যার উৎসাহ দিত। মগধের দ্বারা কি উপকার হইয়াছিল,

* Delian Confederation.

মগধ ধ্বংসের পর ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা দেখিলেই জানা যাইবে। একজন ইতিহাসবিৎ লিখিয়াছেন পরাক্রান্ত রাজ্য ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষ সুখী; তাহার কারণ ইংরেজ পরাক্রমশালী। মোগলসাম্রাজ্যে যে ভারতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার কারণ মোগলেরা পরাক্রমশালী ছিল। মগধের রাজ্যে যে ভারতের এত গৌরব হয় তাহারও কারণ মগধ পরাক্রমশালী। বর্ম্মার মগেরা ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী হিন্দুরা মগধের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধের হস্তগত ছিল। ইংরেজ, মুসলমান ও মগধে প্রভেদ এই ইংরেজ ও মুসলমান বিদেশী, মগধ এ দেশী; এইজন্য আমাদের চক্ষে মগধের এত মান। হিন্দুদিগের সময় মগধের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যদিও হইয়া থাকে মগধের ন্যায় ভারতবর্ষের এত উপকার আর কাহার দ্বারাও সাধিত হয় নাই।

(গ্রীক্ হস্ত হইতে ভারত উদ্ধার)

পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একবার দারা সষ্তাস্প আর একবার সেকেন্দারের করতলস্থ হইল। সেকেন্দারের ইচ্ছা ছিল সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন। পুরুরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও সেকেন্দারের কিছু করিতে পারিলেন না। তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মগধ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেকেন্দর তাহাতে ভীত হইলেন; তাঁহার সৈন্যদলে প্রভুদ্রোহ ঘটিল, কাজেই সেকেন্দরকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইল। মগধ গর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সিলিউকস আবার অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার মগধ হইতেই ভারতের উদ্ধার হইল। ইহার পর চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া আর বিদেশীয় আক্রমণ শুনিতে পাওয়া যায় না। যতদিন মগধের এইটুকু বিক্রম ছিল ততদিন কেহ ভারতবর্ষে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই। সলিমান পর্ব্বতের ওপারে ভীমবলী পারদ রাজ্য ছিল। কই পারদীয়ানরা ত একবারও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই; অতএব ভারতবর্ষ যে সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় গ্রীকের অধীন হয় নাই এবং পনর শত বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিবিপ্লব বৌদ্ধধর্ম্ম ও মগধ সাম্রাজ্য।

(দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার)

অশোক রাজা দক্ষিণদেশীয় লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথম ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়েন। তাহার দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও দাক্ষিণাত্যে স্বধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টা পান। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাই অধিক হয়, তাহার কারণ বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য স্থাপনেরও চেষ্টা পাইত। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

ফুরাইতে না ফুরাইতে যতি হইলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাবের আধিক্য দেশের মঙ্গলকর হয় না।

(মঠের সৃষ্টি)

মঠের সৃষ্টি বিপ্লবের একটী কুফল। বৌদ্ধেরা সর্ব্ব প্রথমে মঠের সৃষ্টি করেন। বুদ্ধের সখা পাটলীপুত্ররাজ স্বীয় রাজধানীতে প্রথম মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মঠের ইতিহাস পরে বর্ণনীয়।

(উপরি উল্লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত)

আমরা বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষদশায় দেশের কি ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিষয়ের কয়েকটী কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইব। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষদশায় দেখা গেল সমাজ পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দুইটী পরিষ্কৃত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদিক্ ব্রাহ্মণবিরোধী অনার্য্যপ্রধান। পশ্চিমদিক্ আর্য্যপ্রধান, ব্রাহ্মণশাসিত। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অত্যাচার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ আজিও গুপ্ত পুস্তক আছে, সাধারণের জন্য এক সেট্ নূতন স্মৃতিপুস্তক হইয়াছে। স্মৃতি প্রায় বেদের তরজমা মাত্র, ভাষা নূতন। স্মৃতির ভাষা আর বুদ্ধগ্রন্থের ভাষা প্রায়ই এক, কেবল স্মৃতিতে বৈদিক প্রয়োগ অধিক, বৌদ্ধগ্রন্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক; দেশীয় চলিতভাষার উদ্ধৃত কথা অধিক। ব্রাহ্মণ বিরোধিগণের মধ্যে একজন দলপতি পাইলেন, তাঁহার নামে তাঁহাদের নাম হইল; ব্রাহ্মণেরা আপন ধর্ম্ম কাহাকেও দিতেন না, উহারা সকলকেই সমানরূপে স্বধর্ম্ম দান করিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে একারণ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল; ব্রাহ্মণবিরোধিগণ আবালবৃদ্ধবণিতা একদল হইল, ইহাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা অধিক হইল, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের দেশেও আধিপত্য বিস্তার করিল। ব্রাহ্মণেরা অনেকে পলাইয়া দক্ষিণাপথে জঙ্গল আশ্রয় করিলেন, অনেকে কথঞ্চিৎ স্বধর্ম্ম লইয়া দেশে রহিলেন। বন্য জাতীয়দিগকে ক্ষত্রিয়ত্ব দিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মের সহিত আপনার ধর্ম্ম মিশাইয়া আর এক নূতন আধিপত্যের নূতন সভ্যতার, এবং নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। মালব গুজরাটের পূর্ব্বাংশে রাজবারার দক্ষিণাংশে পুরাণাদির উৎপত্তি, নাগকুল অগ্নিকুলের উৎপত্তি ও পৌরাণিকতা ও বর্ত্তমান সভ্যতার উৎপত্তি। ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষিত করিবার প্রণালী অতি চমৎকার। আমরা জানি হিন্দুধর্ম্মে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন হিন্দুরা সাঁওতাল পরগণায় গ্রামকে গ্রাম হিন্দু করিয়া লইতেছে। একজন ব্রাহ্মণ একটি গ্রামে গেল; সেখানে পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিল; সাঁওতালেরা তাহার

কাছে পীড়ার ঔষধ প্রভৃতি লইতে আসিল; ক্রমে কালী পূজা করিতে শিখিল; রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিল; তাহারা হিন্দু হইল। পাদরীরা তাহাদের আর কিছুই করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ সাঁওতালের ব্রাহ্মণ বলিয়া নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইল। দাক্ষিণাত্যে প্রায় এইরূপই ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শূদ্র ও অন্ত্যজ লোকই অধিক। এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আর্য্য আধিপত্য বিস্তার হইল।

(বিপ্লবের কুফল)

বিপ্লবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈরাগ্যের আধিক্য। ঐহিক বিষয়ে ইহাদের তাদৃশ মনোযোগ নাই। এ জগৎ ত মায়া, ভ্রম; যাহা উৎকৃষ্ট তাহা এ জন্মের পর; সুতরাং এ জন্মের কাজে তত মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। সকলেই পরকালের জন্য অধিক চিন্তিত। কেহ প্রমাণ প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগমের চেষ্টা করিতেছেন কেহ প্রকৃতি পুরুষের সূক্ষ্মতম বিবেকখ্যাতি নামক ভেদ নিরূপণ করিয়া দুঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, কেহ জড়জগৎকে অবিদ্যাবিরচিত মনে করিয়া ব্রহ্ম ও আমি এক, এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বীরাসনে উপবেশন করিয়া প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু রোধ করত আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ঐহিকের উপর বিষয়ী লোকেরও বাসনা অল্প। বৌদ্ধদিগের ভিক্ষুনামে একদল লোক শুদ্ধ পারত্রিক চিন্তার জন্য স্বতন্ত্র থাকিত। বিপ্লবের পূর্ব্বে ঐহিক পারত্রিক প্রায় সমান ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পরলোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত। বিপ্লবের পর সকলেই যতি। যিনি ব্রহ্মচারী তিনিও যতি যিনি গৃহস্থ তিনিও যতি। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল তিন আশ্রম না কাটাইলে যতি হইতে পারিবেন না। শেষ দেখি বৌদ্ধেরা বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, সিংহলের অনার্য্যদিগকে বৌদ্ধ করিলেন, ব্রাহ্মণেরা মালবকেন্দ্র হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় কেরল, পৌরাণিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।* এই ভাবে ভারতবর্ষ রহিল। ইহার পর হইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত পরে বর্ণনীয়। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নূতন আর্য্যগণ আসিয়া মিলিতে লাগিল, হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে বড় ঘৃণা করিত। অনার্য্যগণ একেবারে বৌদ্ধ হইল না। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশে আজিও অনার্য্যধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যে সকল জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে অথচ ব্রাহ্মণ পুরোহিত মানে না, তাহারাই অনার্য্যধর্ম্মাবলম্বী। যেমন আমাদের দেশে ডোম, পোদ

* দক্ষিণেও ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সকল দেশেই ছিল। যে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণক্ষমতা অধিক সেই স্থানেই ইলোরের মন্দির আছে।

ইত্যাদি। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণপুরোহিত আছে তথাপি ত্রিপুরা-পুরোহিতদিগের প্রভুত্ব আজিও কমে নাই। প্রতি বৎসর কয়েকদিন ধরিয়া উহাদের প্রতাপে কাহারও বাহির হইবার যো থাকে না। একবার রাজা বাহির হইয়াছিলেন। বিচারে তিনি দণ্ডনীয় হন। এইরূপে বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ অবস্থায় তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দৃষ্ট হইল, অনার্য্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধদিগের নূতন ধর্ম্ম; তাহাদের ঐক্য অধিক, তাহাদিগের ক্ষমতা অধিক। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। অনার্য্য প্রায়ই পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ধনেই কি সুখ ?

ইহার পর যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। রজনীর কাছে, কুমুদিনীর কথা বেদবাক্য। শরতের বিষয়, শরৎকে দিয়া, রজনীকান্তের সেই জীবনের আশ্রয়-স্থল, মনোরম অট্টালিকাও শরৎকে দিলেন। আপনি গ্রামপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র মৃন্ময়গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা অপ্রসন্ন দেখিয়া, কেহও তাঁহার সঙ্গে দেখা করে না। রজনীর ইচ্ছা নাই দেশে আর বাস করেন। একটি উদ্দেশ্য ছিল—শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহ দেখিবেন। দেখিয়া, দেশ পরিত্যাগ করিবেন। যথাসাধ্য মাতৃকৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন।

এদিকে শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য শরৎকুমার কুমুদিনীর পিতার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। হরিনাথ বাবু বলিলেন, "আমার কন্যা বয়ঃস্থা। তাহার অনভিমতে আমি তাহার বিবাহ দিব না। তুমি তাহার মন জানিয়াছ ?"

শ। এক প্রকার।

হ। সম্মত ?

শ। বোধ হয়।

হ। তবে তুমি গিয়া আবার তাহার সম্মতি লইয়া আইস। বলিয়া আইস, যে এই মাসে বিবাহ হয়, তোমার এমন ইচ্ছা। কি বলে আমাকে বলিয়া যাইও।

শরৎকুমার অন্তঃপুরে কুমুদিনীর কাছে গেলেন—আত্মীয় স্থলে শরৎকুমারের অবারিত দ্বার—বিশেষ হরিনাথ বাবুর সাহেবি মেজাজ। হরিনাথ বাবুও সেই কথা মনে মনে ভাবিতেছিলেন—মনে মনে বলিতেছিলেন, "বড় ভাল লক্ষণ

দেখিতেছি! দেখ, আমার বাড়ীতে বিলেতি কোর্টসিপ। আমরা সাহেব হইয়া উঠিতেছি। আমাদের দেশের জন্য ভরসা আছে।"

শরৎকুমার গিয়া দেখিলেন, কুমুদিনী একটা নেংটা ছেলের ঘাড় ধরিয়া ভাত গিলাইয়া দিতেছে। ঠিক বিলাতি মিসের চরমোৎকর্ষ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। যাহাই হউক, সকল সময়ে কুমুদিনী তাঁহার কাছে সুন্দরী, সকল সময়েই তাঁহার আরাধ্যনীয়া। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে কুমুদিনীর অধরপ্রান্তে—অধরপ্রান্তে কি কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারি না—হাসির একটু লক্ষণ দেখা দিল। তখনই তাহা মিলাইয়া গেল। তখনই আবার তাঁহার মুখ গম্ভীরকান্তি ধারণ করিল। শরৎকে দেখিয়া কুমুদিনী হাত ধুইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমায় কি খুঁজিতেছ?"

শ। হাঁ, তোমাকেই।

কুমুদিনী তখন অন্তরালে দাঁড়াইলেন। শরৎকুমার সেইখানে আসিলেন। কুমুদিনী বলিলেন, "কেন?"

শ। আমার সুখের দিন কবে হইবে?

কু। সে আবার কি?

শ। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

কুমুদিনী মুখ একটু অবনত করিলেন। একটু ব্রীড়াবিকম্পিত স্বরে বলিলেন,— "কাহাকে?"

শ। কাহাকে আবার? যে আমাকে কামিনী কুঞ্জবনে বাঁচিতে হুকুম দিয়াছিল, তাহাকেই।

কুমুদিনীর মুখকান্তি, অতিশয় গম্ভীর, স্থির চিন্তাযুক্ত হইল।

কুমুদিনী বলিলেন, "তুমি বোধ হয়, আমারই কথা বলিতেছ। তোমায় বাঁচিতে না বলিবে, এমন পামরী পামর জগতে কি আছে? যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে—সেই কি—"

কুমুদিনীর মুখে আর কথা সরিল না। মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে কোর্টসিপ কি চলে গা?

শ। কি, সেই কি, কুমুদিনি?

কুমুদিনী ঢোক গিলিয়া, ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া, হাঁপাইয়া, বলিলেন, "তাকেই কি বিবাহ করিতে চাহিবে?"

শরৎকুমারের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন, "এ কি তামাসা কুমুদিনি?"

"তামাসা কি?"

শ। আমায় রক্ষা কর।

কু। কি প্রকারে?

শ। আমায় বিবাহ কর।

কুমুদিনী আবার ঢোঁক গিলিতে আরম্ভ করিলেন—আবার ঘামিতে আরম্ভ করিলেন। অতিকষ্টে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিলেন, "বিধবার কি আর বিয়ে হয়?"

তখন শরৎকুমার বহুবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া কুমুদিনীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে।

কুমুদিনী বলিলেন, "আমি মেয়ে মানুষ অত বুঝি না। আমাকে অত বুঝাইও না।"

শরৎকুমার হতাশ হইয়া বলিলেন, "কুমুদিনি! তুমি ত তোমার পিতার কাছে স্বীকার করিয়াছ যে আবার বিবাহ করিবে।"

কুমুদিনীর রাগ হইল। সে বাবার কাছে যাই স্বীকার করুক না, সে জোরে জোর করিবার শরৎকুমার কে? সে ত আজও স্বামী হয় নাই। রাগের সময় লজ্জা একটু খাট হয়—কুমুদিনী লজ্জা একটু খাট করিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, "আমি বাপের কাছে এমন স্বীকার করি নাই যে, তোমাকে বিবাহ করিব।"

শরৎকুমার অপ্রতিভ এবং বাথিত হইলেন। বলিলেন, "কুমুদিনি, তুমি আমাকে একদিন আশা দিয়াছিলে?"

কু। যদিই দিয়া থাকি!

যদিই দিয়া থাকি? কি নিষ্ঠুর কথা! শরৎকুমার বলিলেন, "এ কি কুমুদিনি! তুমি থাক বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি সংসারে আছি।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, "শরৎকুমারের কি অন্যায়! আমি কি ইহাকে ইতিমধ্যে জীবনসর্ব্বস্ব লেখা পড়া করিয়া দিয়াছি! যাহা হৌক ইহাকে অনর্থক মানসিক কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্পষ্ট কথা বলাই আমার ধর্ম্ম।" তখন কুমুদিনী বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি, তাহা ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। যদি তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হইয়া থাকি—তবে সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হও।"

শ। কেন, কুমুদিনি? কেন, আমাকে প্রাণে মারিবে?

কু। যখন তুমি নির্ধন ছিলে, তখন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম। এখন তুমি ধনী—এখন তোমায় আমায় বিবাহ হইলে লোকে বলিবে কি জান? লোকে বলিবে হরিনাথ বাবু কেবল ধনের গৌরবে অন্ধ হইয়া জাতি ত্যাগ করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিল। আমি যদি পিতার অনুরোধে কখন বিবাহ করি—তবে দরিদ্রকে। ধনীকে আমি বিবাহ করিব না।

শরৎ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন, "দরিদ্রকে বিয়ে করিবে, কুমুদিনি! বুঝিয়াছি তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে।" শরৎকুমার ক্রোধে, অভিমানে, এবং দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতগমনে বাহিরে গমন করিলেন।

কুমুদিনী কিছু অপ্রতিভ, কিছু দুঃখিত, কিছু রুষ্ট হইয়া, অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। কুমুদিনী ভাবিতেছিলেন, "শরৎকুমারের অন্য যে গুণ থাকুক, শরৎকুমার বালকস্বভাব বটে। আমার মনে বিশ্বাস ছিল, শরৎকুমার আমার স্বামী হইলে আমি সুখী হইব। এখন আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ। রজনী?—আর যাহাই হউক রজনীকান্ত বালকস্বভাব নহে। হৌক বা না হৌক—রজনীকান্ত দরিদ্র। আমার স্বর্গের স্বামী, আজি আমার কথার উপর নির্ভর করিয়াই এ দারিদ্র্য স্বীকার করিয়াছে। আমি, তাহার ঐশ্বর্য্য শরৎকে দিয়া, যদি এখন শরৎকে বিবাহ করি—সেই ঐশ্বর্য্যের আপনি অধিকারিণী হইয়া বসি—তবে রজনী কি মনে করিবে? ছি! ছি! শরৎ-কুমারকে কখনই বিবাহ করা হইবে না।

কে যেন কুমুদিনীর মনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কাহাকে বিবাহ করিবে? তুমি যে বাপের কাছে স্বীকার করিয়াছ বিবাহ করিবে।" কুমুদিনীর মন উত্তর করিল, "কাহাকে বিবাহ করিব? কি জানি কাহাকে?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কিছুতেই সুখ নাই

ফাল্গুন মাস প্রায় অবসান হইয়াছে। অদ্য দোলপূর্ণিমার রাত্রি, নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারাগণবেষ্টিত নব বসন্তের পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছে। তন্নিম্নে পাপিয়ার আকাশব্যাপী ঝঙ্কার পৃথিবীতে বসন্তসমাগম প্রচার করিতেছে। তন্নিম্নে অর্থাৎ সুবর্ণপুরের রাজপথে, ঘাটে, নদীকূলে, দেবমন্দিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের আনন্দসূচক ধ্বনিতে বুঝা যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রে সুবর্ণপুরে কোন আনন্দজনক কার্য্য আছে। নবপ্রস্ফুটিত মাধবীলতা সঞ্চালিত করিয়া, নব বসন্তপবন গৃহস্থ কুলকামিনীদিগের অল্প অল্প স্বেদবিজড়িত অলকদাম চঞ্চল করিতেছিল। যুবতীদিগের এতদিন দুরন্ত শীতের দৌরাত্ম্যে দিবারাত্র কুঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইত, রাত্রে গৃহের বাহিরে আসিতে হইলে, কুণ্ঠিত, কুঞ্চিত ভাবে এবং শীতবসনে লাবণ্য আবৃত করিয়া আসিতে হইত, কিন্তু আজ এই মধুমাসের মধুর জ্যোৎস্নালোকে প্রাসাদোপরি পদ-প্রসারণ করিয়া বসিয়া ঈষৎ অলসাবেশে মস্তকের এবং শরীরের কিয়দংশ স্খলিত-বসন করিয়া কতিপয় সুন্দরী লাবণ্য বিকীর্ণ করিতেছিল। দুশ্চরিত্র পাপিয়ার আর স্থান নাই; এই প্রাসাদ বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার সেই আকাশভেদী কখন কখন

হৃদয়ভেদী চীৎকার করিতেছিল। প্রাসাদ হইতে জ্যোৎস্নাময়ী জাহ্নবী দূরে ধূমপ্রান্তে মিশাইতেছে, তাহা লক্ষ্য হইতেছিল, এবং সন্নিকটে একটী বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকার শ্রেণী চন্দ্রালোকে চিত্রপটে চিত্রিতবৎ দেখাইতেছিল। তাহার বাতায়ন পথ দিয়া শত শত দীপমালা দেখা যাইতেছিল, এবং ঐ অট্টালিকাশ্রেণী হইতে কখন কখন মধুর সঙ্গীত এবং কখন কখন উচ্চ হাসি শুনা যাইতেছিল। যুবতীগণ প্রাসাদোপরি বসিয়া সেই বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য সঙ্গীত বন্ধ হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই নির্ল্লজ্জ পাপিয়া আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। যুবতীদিগের মধ্যে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি পাখীটে অমন করে একশবার ডাক্‌চে কেন?" যুবতীগণ সকলেই হাসিয়া উঠিল। সকলের বয়োজ্যেষ্ঠা চন্দ্রমুখী নাম্নী একজন বলিল, "বিনোদিনি, তোমাকে দেখে ও চাঁদকে দেখে, পাখীর বড় আমোদ হয়েছে, তাই এত ডাক্‌ছে।"

বিনোদিনী লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিল; কোন উত্তর করিল না। অট্টালিকাশ্রেণী হইতে পুনরায় সঙ্গীতধ্বনি হইতে লাগিল। যুবতীগণ নিস্তব্ধে শুনিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর চন্দ্রমুখী বলিল, "কি অদৃষ্ট!"

বামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"

চন্দ্র। শরৎকুমার কাল কি ছিল আর আজ কি হলো!

বামা। অদৃষ্ট বুঝা যাইত, যদি রজনী কাঁচা ছেলে না হত এক কথায় বিষয় ছেড়ে দিলে, বল কি!

চন্দ্র। দেবে না কেন, যার বিষয় তাকে দিয়াছে।

বামা। কে বলিল শরতের বিষয়?

চন্দ্র। রজনীর মা মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গিয়াছে।

বামা। আমি নিশ্চয় জানি রজনীর মার সহিত রজনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল তাহারই নিকট তাহার মা এ কথা বলিয়াছিল। রজনী তাহারি নিকট শুনিয়া বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে।

চন্দ্র। তা কি মানুষে পারে? যে ব্যক্তির নিকট শুনিয়া রজনী বিষয় ছাড়িয়াছে, সে যদি দেবতা হয় তা হইলেই ইহা সম্ভব।

বামা। কে জানে ভাই, সে মানুষ কি দেবতা, আমাদের সে কথায় কাজ নাই। কিন্তু রজনী কি অদৃষ্ট করিয়াছে—আজ আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য পরকে দিয়া আপনার একখানি বাতাসার সঙ্গতি রাখে নাই।

যেমন তারাগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করে, সেইরূপ রমণীদিগের মধ্যে একটী যুবতী বসিয়া অনন্যমনে এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। সে কুমুদিনী।

কুমুদিনী বামাসুন্দরীর এই শেষ উক্তি শুনিয়া অতি মৃদু অথচ ব্যগ্রতাব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকান্তের কি জ্বর হইয়াছে ?"

বামা। আজ তিন দিন জ্বর হইয়াছে।

কুমু। খুব জ্বর হইয়াছে কি ?

বামা। তা জানি না। রামের মা বলিতেছিল আজ তিন দিন আপন হাতে রেঁধে বড় জ্বর হইয়াছে। অঘোর হইয়া রহিয়াছে ; একটু জল দিবার লোক নাই, একখানি বাতাসার সঙ্গতি নাই।

বয়ঃকনিষ্ঠা সরল-হৃদয়া—বিনোদিনী কাঁদিয়া উঠিল। কুমুদিনীকে বলিল, "বড়দিদি, রজনী আমাদের ভগিনীপতি—আমাদের বাড়ীতে আনাও না কেন ? আমরা সেবা করিব।" কুমুদিনী বলিল, "আমাদের বাড়ী আসিবেন না—আমার সেবা লইবেন না।"

বিনোদিনী। কেন ?

কুমুদিনী। কেন তা জানি না। বলিয়া কুমুদিনী অন্যমনস্কা হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন ; তাহার পিতৃব্যকন্যা সরলা বিনোদিনী সেই স্থান হইতে দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া তাহার পিতৃব্যের নিকট কি বলিতে লাগিল। এবং তৎক্ষণাৎ একটী পরিচারিকা সমভিব্যাহারে খিড়কির দ্বার খুলিয়া কোথায় গমন করিল।
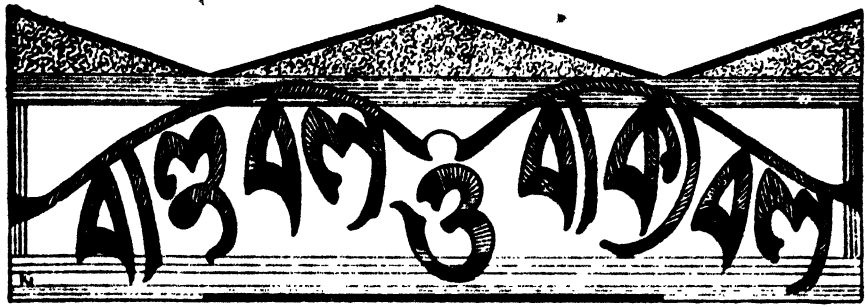
প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক দুঃখ

সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত—বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে, আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা বলিবার পূর্ব্বে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ, জড়পদার্থের দোষ-গুণঘটিত। বাহ্যজগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তি-কর্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্যজগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল নিয়মাধীন, মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিলে, রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্য জগতের ন্যায়, অন্তর্জগৎও আরও একটী মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য, সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পরের অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই। হিন্দুবিধবার যে দুঃখ, সে সামাজিক দুঃখ।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল—যথা দারিদ্র্য। যেমন আলো হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ

হইলেই, দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।* এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখন সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্য ফল নহে; তাহা নিবার্য্য এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ জন্য, বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি এই দুইটী শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বাধীনতার হানি, একটী দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য সমাজসম্ভুক্ত, আমি সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন—এবং সমাজের কর্ত্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটী সামাজিক নিত্য দুঃখ।

স্বানুবর্ত্তিতা, একটী পরম সুখ, স্বানুবর্ত্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদিত রাখিলাম—তবু চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি আমি কখন কখন বা কোন কোন বস্তু সম্বন্ধে চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হইলাম—দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না—তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিই আমার সুখ। যদি আমি বুদ্ধির মার্জ্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধি সম্বন্ধে দুঃখী। সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না—সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না—অথবা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও স্বানুবর্ত্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক নিত্য দুঃখ।

---

* আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে সুখ আছে দুঃখ নাই। কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্পিত, অস্তিত্বশূন্য।

দারিদ্র্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফল মূল বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য, নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয় শরীর ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যতদিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, ততদিন এ সকল ফল নিবার্য্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য্য। হিন্দুবিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ—নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটী সামাজিক দুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না; ইহা আর একটী নিবার্য্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য, যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সশিয়ালিষ্ট কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল "Liberty" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন—অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ গণ্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে—যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব, এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখ সকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য্য ফল—সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলি

কোথা হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে—নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসর্গিক শক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে; তাহার কখন আধিক্য নাই, কখন অল্পতা নাই; বিধিবদ্ধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এরূপ স্থিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে, এবং অবিহিতও হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটী সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ। তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত প্রয়োগ। বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শত্রুবধ হয়, অবিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার।

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে, সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থ যাহারা সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই কি পরস্পরে উৎপীড়ন করে?

তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে যে শক্তিরই অত্যাচার, যাহার হাতে সামাজিক শক্তি সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিণ্ড মাত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি শাসনশক্তি—সামাজিক কেন্দ্র রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তৃগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক। সকলেই শাসনকর্ত্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশক্তির—সামাজিক কেন্দ্র। তাঁহারাই অত্যাচারী। তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও তাঁহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্ত্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ তাঁহারা সমাজের প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আর্য্যসমাজকে, তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন আর্য্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্য্যসমাজ সেই শিকল পরিত। তাঁহারা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচারী ছিলেন। মধ্যকালিক ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন—রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্ত্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ, ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেন্ট, লিও বা আড্রিয়ান, ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চতুর্দ্দশ লুই, অষ্টম হেনরি বা প্রথম চার্লস্ ততদূর করিতে পারেন নাই।

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্ম্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন—শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডে, সম্বাদপত্রলেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের সম্বাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার।

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্ত্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধর্ম্মশাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্ত্তার শাসন নাই—সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই—কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ ঐকমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্পাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া দিবে—বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবায় বিবাহ দিতে পারিবে না, বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্পাংশের মত

বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ড দর্শন পরম ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করে,—বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিকাংশকর্ত্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্ত্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার।

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টভক্ত, এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী, বা খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তিশূন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লিমেণ্টে অভিষেক কালে অনেক বিঘ্নবিব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত; এক সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ; দ্বিতীয় সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষ্যের সাধ্য, এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে?

দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল।

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব, এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
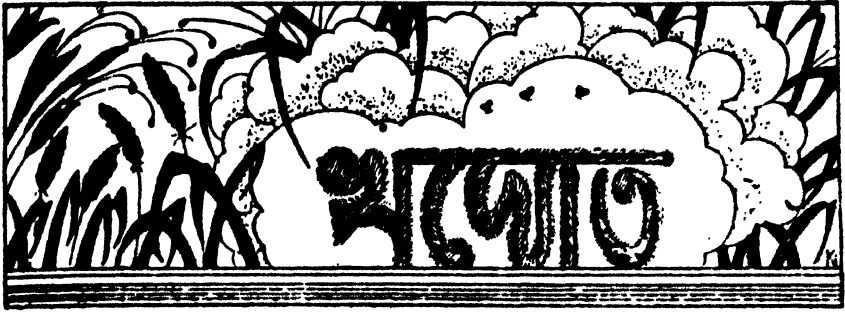
খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় চন্দ্র সূর্য্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেই-খানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক অধিক হউক কিছু আলো আছে—কই আমাদের ত কিছুই নাই। এই অন্ধকার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে বলিয়াছে, এসো ভাই চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল' ঐ আলো দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার! এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তখন পথ চলি—নহিলে পারি না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কিছু আলো করে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই না। চন্দ্র সূর্য্যও সুদিনে—দুর্দ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, একে রাত্রি, তাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে "Hora non numero nisi serenas!" কেবল তুমি খদ্যোত,—ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হনা, সর্ব্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকার দুর্দ্দিনে বর্ষা-বৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভালবাসি।

আমি তোমায় ভালবাসি, কেননা, তোমার অল্প, অতি অল্প আলো কাছে—আমিও মনে জানি আমারও অল্প, অতি অল্প, আলো আছে—তুমিও অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ—তুমি বল দেখি? যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে—চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে—আর তুমি আছ—তখন, বল দেখি অন্ধকারে কি সুখ নাই?—সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশস্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান

অসহ্য সংসারের পরিবর্ত্তে, সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার, আর মুদিত কামিনী-কুসুম জলনিসেকতরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি ভাই, সুখ আছে কি না?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি ঐ বন্যান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে, এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না—অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব; অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি কঠিন—অতি গূঢ়, অতি ভয়ঙ্কর—ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী,—কোন পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না—কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,—কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি, এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমায় সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন—তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড় ছাঁদে—অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে, গড়িলেন কেন? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের—উভয়ই জগদীশ্বরপ্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য; আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য। এসো কাঁদি।

এসো কাঁদি, বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য;—বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেইজন্য কাঁদিতে চাহিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমার, আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাঁদিয়া তাঁহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি; মেঘগর্জ্জন শুনিয়া, সর্ব্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন স্মরণ করি;—বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া, কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর, ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম; কাঁদিবার কথা নাই। আইস নীরবে জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে, সকল সহ্য করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কতবার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি আমি জানি। জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ ; কিন্তু হায় ! আমরা খদ্যোত ! এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না ! কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জ কিসলয়কৃত অন্ধকারমধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য-খদ্যোত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পূর্ব্বকালে অগ্নি মহাপরীক্ষক ছিলেন। মনুষ্যের চরিত্র পর্য্যন্ত অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইত। যাহার স্বভাবে অণুমাত্র মলা থাকিত অগ্নির নিকট তাহা ধরা পড়িত। বানরপতি শ্রীরামচন্দ্র অগ্নিদ্বারা সীতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও অনেক অরণ্যপতি সাধুত্বের পরীক্ষা সেইরূপে লইয়া থাকেন। অগ্নিদ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষা অতি সুন্দর হয়, সকলেই তাহা নিত্য দেখিতেছেন। অতএব অগ্নিদ্বারা আমাদের কতকগুলি বাঙ্গালাগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অন্ততঃ নাটক প্রহসন উপহসন প্রভৃতি আধুনিক রসিক-রঞ্জন গ্রন্থগুলিকে এই পরীক্ষাধীন করিলে ভাল হয়। গ্রন্থের পক্ষে এ পরীক্ষা নূতনও নহে। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই পরীক্ষা প্রবল ছিল ; গ্রন্থ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যদি পুড়িয়া যাইত রাজসভাসদ্গণ সিদ্ধান্ত করিতেন যে গ্রন্থখানি অবশ্য অসার ছিল নতুবা পুড়িবে কেন! আমরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া একখানি প্রহসন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গ্রন্থ পুড়িয়া গেল। কি করিব গ্রন্থকার কিছু মনে করিবেন না। গ্রন্থকারের নাম হরিহর নন্দী।

মাধবিকা। এই নাটকেরও ঐরূপ পরীক্ষা করিতে আমাদের বড় ইচ্ছা হইয়াছিল ; কোন বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে আপাততঃ তাহাতে বিরত হওয়া গেল। এক্ষণকার নাটকমাত্রেরই যদি ঐরূপ পরীক্ষা হয় তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষতি হইবে না। যতই নাটক দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় সকল গুলিতেই একজাতীয় কারিগরের হস্ত লক্ষিত হয়, সকল রচয়িতার সংস্কার যে নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা লিখিতে পারিলেই নাটক রচনা হইল। আবার পাঠকেরও সংস্কার যে উত্তর প্রত্যুত্তর পাঠ করিতে পাইলেই নাটক পাঠ করা হইল। সে যাহাই হউক এবার অবধি আমরা গ্রন্থবিশেষের নিমিত্ত অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত করিলাম।

বাঙ্গালা শিক্ষা। বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কৃত বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ আমাদের দিয়াছেন। প্রথম পত্রে দেখিলাম ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত

সকল বর্ণগুলি ডবল গ্রেট্ টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। কোন বর্ণ ভুল হয় নাই। দ্বিতীয় পত্রে য ফলা, তৃতীয় পত্রে ব ফলা প্রভৃতি সকল ফলা আছে। কোনটিই ভুলেন নাই, আশ্চর্য্য ক্ষমতা। বিজ্ঞাপনে বাবু লিখিয়াছেন যে "এরূপ পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া আমাকে এই অভাব পূরণ করিতে অনেকে অনুরোধ করেন।" আবার জানাইয়াছেন যে, এই অভাব মোচনের নিমিত্ত একা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, "শ্রীযুক্ত মিয়াজান রহমান মহাশয় সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।" হিন্দু মুসলমান একত্র হইলে যে ভারতের কতদূর উন্নতি হয় তাহার এই এক অদ্ভুত উদাহরণ।

অপরিচিত গ্রন্থ। কোন গ্রন্থকার একখানি অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠান নাই। অনুরোধ পত্রে গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে কিন্তু গ্রন্থের নাম নাই ; তাহা নাই থাকুক আমরা সমালোচনার ক্রটি করিব না। বিশেষতঃ ভাল বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি অতএব আমরা এক্ষণকার বাজার চলিত সমালোচনা অনুকরণ করিয়া বলিলাম, গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে "এরূপ পুস্তক যতই হয় ততই দেশের মঙ্গল।" কোন পাঠক যদি গ্রন্থ খানির নাম জানিতে চাহেন তবে অনুরোধ করি গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া তাহার নাম অবগত হইবেন।

পুরাতন গ্রন্থ। ছয় বৎসর গত হইল দেশহিতৈষী কোন গ্রন্থকার জ্ঞানদীপে বাঙ্গালা জ্বালাইবার জন্য একখানি চারি আনা মূল্যের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট বশতঃ কেহই গ্রন্থখানি ক্রয় করে নাই। এক্ষণে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় তাহার ব্যয় বাঁচাইবার উদ্দেশে গ্রন্থখানি সমালোচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। অনেকে জানেন সমালোচিত হইলে বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া যায়। অতএব গ্রন্থকারকে সে ফল দেওয়া গেল না!

সভ্যতার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত, শ্রীদেবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ভবানীচরণ দাসের লেন, দাস এণ্ড কোম্পানীর বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে। গ্রন্থখানি কোন সনে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ নাই, বোধ হয় সম্প্রতির মুদ্রাঙ্কন নহে। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং অপরিচিত নহেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবু জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং স্মরণ হইতেছে এই ইতিহাস জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তৎকালে অনেকেই ইহা পাঠ করিয়াছেন, এইজন্য আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। কিন্তু তথাপি ইহার মর্ম্মবোধার্থ প্রথম অধ্যায়ের সূচীপত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। মনুষ্য কি? শরীরসহ কি সম্বন্ধযুক্ত?

২। স্বকীয় ও সামাজিক সভ্যতা।

৩। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সভ্যতা।

৪। প্রকৃত সভ্যতা।

৫। উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজের সভ্যতা।

৬। বক্তুর মত।

৭। বক্তু সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ।

৮। মানসিক ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির একত্র উন্নতি।

৯। এতৎ সম্বন্ধীয় আপত্তি।

১০। গ্রীক ও রোমেয়।

সুধীরঞ্জন। ৺দ্বারকানথ অধিকারী প্রণীত, তৎপুত্র শ্রীনীলরতন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বারকানাথ বাবু যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় বালকদিগের নিমিত্ত এই পদ্যগুলি প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন যে, "পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থকারের নাম দেখিয়াই ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক পুস্তকখানি পরিত্যাগ করিবেন না অনুগ্রহ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন।" কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বহুকালের পর আবার সুধীরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার পুত্র লিখিয়াছেন যে, "আমার স্বর্গীয় পিতার এক অতুলকীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় দেখিয়া উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এখানে পিতৃভক্তি অতি প্রবল, সমালোচনার আর স্থান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সময় দ্বারকানাথ বাবু সরল কবি বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, বালকেরা তাঁহার কবিতা পড়িতে ভালবাসিত। এখন ভালবাসিবে কি না, আমরা নিশ্চয় অনুভব করিতে পারিতেছি না।

এক মরণে দুইজন মরিত, ইহা আমাদের পক্ষে প্রায় কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন যে, অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এরূপ মৃত্যু সচরাচর সংঘটিত হইত। ইংরেজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রথাটা রহিত হইয়া গিয়াছে বটে,—মুসলমান রাজত্বকালেও অনেকস্থানে সহগমন নিষিদ্ধ ছিল; আবে দুবোয়া দাক্ষিণাত্যের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা আপন আপন শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন না, এবং আর্য্যাবর্ত্তে এ ব্যবহারের বহুল প্রচার হইলেও দাক্ষিণাত্যে বিরল প্রচার ছিল;—ইংরেজের অধিকার মধ্যে রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্য সকল হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সে দিনও মৃত জং বাহাদুরের ভার্য্যারা সহগমন করিয়াছেন।

প্রথাটা কত কালের, তাহা স্থির করা দুষ্কর। অনেকের মতে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সতীগমনের অনুমতি আছে; কিন্তু উইল্‌সন, মক্ষমূলর, কাউয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উক্ত বিধির পাঠের সত্যতায় সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, যেখানে 'অগ্নে' আছে, সেখানে 'অগ্রে' পড়িতে হইবে। সে যাহাই হউক, অনুগমনের অনুকূল বিধি বেদে থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অঙ্গীরা, ব্যাস, পরাশর পত্যনুগমনই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদিগেরই যখন কালনির্ণয় হয় না, তখন ইঁহাদের বচনের উপর নির্ভর করিয়া প্রথাবিশেষের মূলানুসন্ধান কিরূপে হইতে পারে? তবে, ভিন্নদেশীয় সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে। দিওদোরস্ এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইউমিনিসের সৈন্যমধ্যে সতীদাহ হইয়াছিল। অতএব ইহা একরূপ সিদ্ধ যে, সতীদাহ প্রথাটা সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ বা অত্যধিক কালের।

প্রথাটির মূল নির্ণয় করা আরও কঠিন। এ সম্বন্ধে লিখিত কিছুই নাই, সুতরাং

ইহার উপর অনুমান ব্যতীত আর কিছু চলিতে পারে না। অনেকে অনেক অনুমান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুই চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

দিওদোরস্ বলেন, পত্যনুগমনের মূল কারণ, হিন্দুসমাজে বিধবার দুর্গতি এবং দুরবস্থা। এ অনুমানটি সঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সামাজিক নিয়মানুসারে বিধবার যে দুর্গতি, তাহা বিধবামাত্রেরই—দুই চারিজনের নহে। বৈধব্য দুঃখই যদি সহমরনের কারণ হইত তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবা পতিবর্ত্মগা হইত। তাহা হয় নাই। সতী যাওয়া যখন অত্যন্ত প্রচলিত, তখনও অনুগামিনী বিধবার সংখ্যা শতকরা একজনেরও ন্যূন—ঊর্দ্ধসংখ্যা, হাজারে পাঁচজন। এতও বটে কি না, সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, বৈধব্যনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা নীচজাতীয়ার অপেক্ষা উচ্চজাতীয়ার অধিক—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে সতীদাহ হইত, সে সকল স্থানেই নীচজাতীয় সতীসংখ্যা অপেক্ষা উচ্চ জাতীয় সতীসংখ্যা অবশ্য অধিক হওয়া উচিত ছিল, কেননা উচ্চজাতীয় বিধবার দুর্গতি অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সর্ তামস্ ষ্ট্রেঞ্জ বলেন, আর্য্যাবর্ত্তে না হউক, অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা নীচ জাতির মধ্যেই অধিক। দিওদোরসের অনুমানের সঙ্গে এ কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব ইহা একরূপ নিশ্চিত যে বৈধব্যদুঃখ সহমরণের একমাত্র কারণ ত নহেই, প্রধান কারণও নহে।

তবে কি স্বর্গলাভের জন্য? তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; কেননা চিতারোহণ অপেক্ষা এমন অনেক সহজ কার্য্য আছে, যাহা করিলে শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ হয়। কিন্তু স্বর্গের জন্য সে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ কাজও লোকে করে না। যদি স্বর্গের জন্য সুকরতর কার্য্য না করে, তবে সেই স্বর্গের জন্যই যে এমন দুষ্কর কার্য্য করিবে—জ্বলন্ত বহ্নিতে জীবন্তে পুড়িয়া মরিবে—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাও বুঝা গেল যে কেবল স্বর্গের জন্য সতীরা পুড়িত না।

বুঝি ভালবাসার জন্য। তাহাও বোধ হয় না। স্বামীকে ভালবাসে বলিয়া, স্বামি-বিরহ-দুঃখ অসহ্য বলিয়া যে প্রাণত্যাগ করিতে চায়, তাহার চিতারোহণ করিয়া পুড়িয়া মরিবার আবশ্যকতা রাখে না—সে অন্য উপায়েও মরিতে পারে। সত্য সত্যই মরিবার ইচ্ছা থাকিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। যমালয়ের পথ অসংখ্য। রাজবিধি একটা প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সকল পথ বন্ধ করা রাজবিধির সাধ্যাতীত। প্রকাশ্যরূপে, ধূমধাম করিয়া, ধূপধূনা জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া চিতারোহণ করা যেন রহিত হইল, কিন্তু তেমন ইচ্ছা থাকিলে, অন্য পথও আছে—গলায় দড়ি দেওয়া যাইতে পারে, বিষ খাওয়া যাইতে পারে, জলে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে—ধ্বংস-পুরের শত সহস্র দ্বার। তবে, যেদিন হইতে ১৮২৯ সালের ১৭ আইন জারি হইয়াছে, সেই

দিন হইতে আর কেহ পতি-বিরহে প্রাণত্যাগ করে না কেন? আরও একটা কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নারীধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। হিন্দু-ললনার ধর্ম্ম, পতিভক্তি—পতিপ্রেম নহে। হিন্দুসমাজ হিন্দু-ললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী দেবতা, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদ খাইতে হইবে, তাঁহার পাদোদক সেবন করিতে হইবে,—তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, এ শিক্ষা হিন্দুসমাজের নহে। এই অপরিবর্ত্তনীয় জাতিভেদপ্রপীড়িত বৈষম্যপূর্ণ দেশে সাম্য-নীতি নাই, সুতরাং প্রেম-শিক্ষাও নাই। যদি কিঞ্চিৎ প্রেম-শিক্ষা আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে। অতএব, কেবল ভালবাসার জন্যও সতীরা পুড়িত না। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, পূর্ব্বতন হিন্দু-ললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল না। আমাদের একমাত্র বক্তব্য যে, যাহা ছিল তাহা এত প্রবল নহে যে আগ্নেয় পথ দিয়া মৃত্যুর দ্বারে লইয়া যাইতে পারিত।

তবে কেন? কারণাভাবে কার্য্য হয় না। আমরা দেখিলাম যে পূর্ব্বলিখিত কারণ নিচয়ের মধ্যে বিশেষ কোনটিই প্রকৃত কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, সতীদাহের নিন্দা প্রশংসায় সকলগুলিরই দাবি আছে। প্রথমতঃ, এই চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত। কিন্তু স্বর্গ হইলেই যথেষ্ট হইল না;

> যার যেথা ভালবাসা,　　তার সেথা চির আশা
> সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

অতএব বাঞ্ছিতকে চাই, নতুবা বিমল খাঁটি সুখ হইল না। সতী যাইলে সে সুখও পাওয়া যাইবে। স্বামীর যদি পাপ থাকে—এ সংসারে কাহার নাই? তাহাও এই আত্মবিসর্জ্জনে ধুইয়া যাইবে। হিন্দু-ললনার এ সংসারে সুখ স্বামী লইয়া। স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের সুখ, সংসারের সুখ, উভয় সুখই পাওয়া গেল। অতএব দ্বিতীয়তঃ, স্বামিলাভ। তৃতীয়তঃ, দুঃখ নিবৃত্তি; বৈধব্য এবং দুঃখ আমাদের দেশে একই কথা। চতুর্থতঃ, গৌরবলাভ; যে সাধ্বী পত্যনুগমন করিল, সে ইহলোকেও ধন্য পরলোকেও ধন্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে মত প্রকাশ করিলাম, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের সেই মত।

এই স্থলে সহমরণপ্রথার দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। এতদুদ্দেশে আমরা প্রথমে সতীদাহের প্রতিকূল তর্ক সকলের সমালোচনা করিব তৎপরে অনুকূল তর্কের অবতারণা করা যাইবে।

সহমরণের বিরুদ্ধে প্রথমে আপত্তি এই যে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং যাহারা আত্মহত্যার সহায়তা বা অনুমোদন করে তাহারাও মহাপাতকী। যতদূর সাধ্য, এ পাপপ্রবাহ রোধ করা উচিত।

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ফলনিরপেক্ষ পাপপুণ্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহা পাপ, তাহা সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল অবস্থাতেই পাপ, যাহা পুণ্য, তাহাও তেমনি সকল অবস্থায় পুণ্য; এ মতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের বিশ্বাস যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে দুষ্কর্ম্ম, স্থানান্তরে এবং অবস্থান্তরে তাহা সৎকর্ম্ম হইতে পারে। সুতরাং বিষয় বিশেষকে সাধু বা অসাধু বলিতে হইলে তাহার সুফল কুফল দেখান চাই। নতুবা কেবল সাধু বা অসাধু বলিলে বিচার্য্য কথাটা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক। অতএব দেখা যাউক, সহগমনে সমাজে কোন অমঙ্গল আছে কি না।

দুই চারি দশজন মনুষ্যের মৃত্যুতে যে সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে ইহা আমরা বোধ করি না। পুরুষের মৃত্যু, সমাজকর্ত্তৃক অনুভূত না হইলেও তাহাতে পরিবারবিশেষের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ সংঘটিত হইতে পারে। এ দেশীয় স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে অসুবিধাটুকুও নাই। কেবল সাংসারিক অসুবিধার কথা বলিতেছি, মানসিক সুখ দুঃখের কথা পরে বলিব।

যাহারা পৃথিবীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন, মহান্ সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, চিন্তার জন্য নূতন পথ খোদিত করিয়াছেন, মনুষ্যজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, তাঁহাদের অপগমেও সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই। নিউটন না থাকিলেই যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইত না, এমত নহে। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্য গালিলীয় না জন্মিলেই যে চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত, এমত নহে। হর্বি না জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত, টরিচেলি বাল্যে মৃত্যুকবলিত হইলেও বায়ুর ভার স্থিরীকৃত হইত; তবে কি না, দশ দিন পূর্ব্বে হইল, না হয় দশ দিন পরে হইত। নিউটন অথবা কেপ্লর, গালিলীয় অথবা বেকন, বিস্তৃত ক্ষেত্রপার্শ্বস্থ উচ্চশির গিরিশৃঙ্গ মাত্র;—সূর্য্যালোক ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে অবশ্য তাঁহাদের মস্তকে পড়িবে, কিন্তু তাঁহারা না থাকিলেও সূর্য্যালোক ক্ষেত্রে আসিত।

সকলই সময়ে করে। নিউটনের পূর্ব্বে কি ইউরোপে বুদ্ধিমান্ লোক ছিল না—তত্ত্বানুসন্ধায়ী লোক ছিল না, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই কেন? ইহার একমাত্র সদুত্তর, তখন সময় হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে যে সকল সত্যের আবিষ্কার এবং প্রচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সে সকল আবিষ্কৃত

এবং প্রচারিত হয় নাই। যে সময়ে এবং সমাজের যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত।* নিউটন না করিতেন, আর কেহ করিত; কেবল—বলিয়াছি ত, দশ দিন অগ্র পশ্চাৎ। তাহাতেই বলি কাহারও সমাগমাপগমে সংসারের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে ক্ষতি, তাহা অপূরণীয় নহে। যে বৃদ্ধি তাহা অবশ্যম্ভাবী।

নিউটন অথবা কেপ্লরের, কোমৎ অথবা বিষার অভাবে যদি জগতের বিশেষ এবং অপূরণীয় ক্ষতি না থাকে, তবে মুগ্ধা, প্রণয়বিহ্বলা, বিরহকাতরা, সন্তাপদগ্ধা, অন্তঃপুরবদ্ধা হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে কি ক্ষতি? বিদ্যায় যে বর্ণজ্ঞানশূন্যা, ভূয়োদর্শন যার স্বামিমুখ পর্য্যন্ত, সংসারজ্ঞান যার শয়নমন্দিরের চতুঃসীমাবদ্ধ, ঘর হইতে আঙ্গিনা যার বিদেশ—হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি?

এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুর স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত এই দুর্দ্দশা—সকলেই নিরক্ষর, অজ্ঞান, অন্তঃপুরবদ্ধ—তবে সধবা, বিধবা অথবা সকলেই মরিবে কি?

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুবিধবার যে অবস্থা, সেই অবস্থা যাহারই হইবে তাহাকেই মরিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি নাই। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে তাহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীয়তঃ কুমারী এবং সধবা যে সমাজের কোন উপকারে লাগে না, তাহা কে বলিল? সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের উপর নির্ভর করে। তাহারা মরিলে গর্ভধারণ করিবে কে? নূতন জীবের সমাবেশ না হইলে, যেমন যেমন প্রাচীনেরা ইহলোক ত্যাগ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লুপ্ত হইবে। কিন্তু এ কার্য্যকারিতা বিধবার নাই। বিধবার বিবাহই যখন নিষিদ্ধ তখন গর্ভধারণের ত কথাই নাই। যদি কোন হতভাগিনী অবৈধ উপায়ে গর্ভধারণ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হয়, নতুবা তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

আরও একটা তর্ক আছে। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মনুষ্যও জীবিতচেষ্টানিবন্ধন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর জীবিতচেষ্টা দ্বারাই হইতে হইবে। জীবিতচেষ্টা যত কঠোর হইবে, উন্নতিও তত অধিক হইবে। আবার জীবিত চেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্য এবং বৃদ্ধি। যে কোন প্রথা জীবসংখ্যা হ্রাস করে, সুতরাং জীবনসংগ্রামের বেগ হ্রস্ব করিয়া দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকেই অবশ্যই দোষাবহ বলিতে হইবে। অতএব সহমরণ প্রথা মন্দ।

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের উত্তর নাই। ভারতবর্ষে আছে।

---

* নিউটন যে সময়ে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করেন ফ্রান্সে অন্য এক ব্যক্তি সেই সময়ে উক্ত নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা অতি অল্প। যাহা কিছু আছে আমেরিকায়। ইউরোপে তদপেক্ষা অল্প। ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব পূরণের ভার লইতে হয় না। পিতা বা ভ্রাতা, তৎপরে স্বামী, তৎপরে পুত্র, এ সকলের অভাবে আত্মীয়,—ইহারাই তাহাদের অভাবপূরণের ভার লইয়া থাকেন। যাহাকে নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে হয় না, তাহার আবার জীবিতচেষ্টা কি ?

স্ত্রীলোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা না করিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে যে জীবিত-চেষ্টার সাহায্য করে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য—তাহারা গর্ভধারণ করে বলিয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এদেশীয় বিধবায় গর্ভধারণ করে না, কেননা বিধবাবিবাহই নিষিদ্ধ। সুতরাং এদেশীয় বিধবা জীবিতচেষ্টার সাহায্যও করেনা। অতএব উপরিউক্ত তর্ক ভারতবর্ষে খাটিল না।

সতীদাহের বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি এই যে, সতীদিগের ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মীয় স্বজন অনেক সময়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। সহজে সিদ্ধকাম না হইলে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভয়প্রদর্শন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার, ছল, বল, কৌশল, —এ সকলও অবলম্বিত হইত। সে অবস্থায় এ সকলের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধও হইত। একেই স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারান্ধা এবং সংসার-জ্ঞানশূন্যা, তাহাতে আবার তখন নব-বিয়োগবিধুরা, সুতরাং বীতসংসারানুরাগিণী ; এ অবস্থায় কৌশলে প্রতারিত করা অতি সহজ।

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটিলেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। হইতে পারে, কোন স্থলে কোন অর্থলোলুপ আত্মীয় বিষয়াধিকারিণী বিধবাকে পোড়াইয়া মারিবার যত্ন করিয়াছে। হইতে পারে, কোথাও কোন অনুদারপ্রকৃতি আত্মীয় ভবিষ্যৎ কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া নব-বিরহিণীকে জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দোষ প্রথার উপর দেওয়া উচিত নহে। আমি যদি কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কোন সদনুষ্ঠানকে আমার স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করি, সে পাপ আমার—প্রথার দোষ কি ? ধর্ম্মভাবের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠিত না হইয়াছে, জগতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ধর্ম্মভাবকে মন্দ বলিতে হইবে ? পশুপ্রকৃতি গোস্বামীদিগের চরিত্র দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিচার হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের চরিত্রের জন্য খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মকে দায়ী করা বিহিত নহে। ইহা মনুষ্যচরিত্রের দোষ, এই রক্তমাংসের দোষ ; এ দোষ ব্যক্তিবিশেষের, এ দোষ স্বভাবের—সহমরণপ্রথা তাহার দায়ী নহে।

যাঁহারা মনে করেন যে অধিকাংশ স্থলেই বলপ্রয়োগ অথবা প্রতারণার দ্বারা অবলাগণ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইত, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। ইংরেজে এরূপ মনে

করিতে পারেন,—চীনাবাজারের ফিরিওয়ালাদিগের চরিত্র দেখিয়া লর্ড মেকলে সমস্ত বাঙ্গালির মস্তকে গালিবর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমরা অধিক অভিজ্ঞ। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, অধিকাংশ স্থলেই পতিবিয়োগবিধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অনুগমন করিতেন। ইংরেজ-দিগের মধ্যেও যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাও এইরূপ বিশ্বাস করেন। এলফিনষ্টোন লিখিয়াছেন,—সকল স্থলেই না হউক, অধিকাংশ স্থলেই আত্মীয়েরা অকপট হৃদয়ে মরণোদ্যতা সাধ্বীকে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আপনারা অনুরোধ করিতেন, পুত্র কন্যায় অনুরোধ করিত, বন্ধুবান্ধব এবং পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইতেন, উচ্চ পরিবার হইলে স্বয়ং রাজা আসিয়া অনুরোধ করিতেন। হেনরি জেফ্রিস বুস্বি সাহেব, তাঁহার 'সতীদাহ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রায়ই বিধবারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিয়া থাকে,—কচিৎ ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 'সতীদাহের' এই স্থলটী এত সুন্দর যে আমরা লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া কতকটা উদ্ধৃত করিলাম।*

সতীদাহের প্রতিকূল কথা আমরা আন্দোলন করিলাম। এক্ষণে তদনুকূল কথার বিচার করা যাউক।

হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হয়। সে নিজে দুঃখিনী এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া আত্মীয় স্বজন দুঃখী। যাহার গৃহে বিধবা কন্যা, তাহার দুঃখের পার নাই। নৈদাঘ একাদশীতে প্রাণের অধিক ধন আকান করিয়া বেড়ায়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হয়—আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া মুখে তুলিয়া দিতে হয়। পাপ সমাজের এমনই নিদারুণ রীতি যে, তৃষ্ণায়

* With rare exceptions, the suttee is a voluntary victim. Resolute, undismayed, confident in her own inspiration, but betraying by the tone of her prophecies, which are almost always auspicious, that her tender woman's heart is the true source whence that inspiration flows. Her veil is put off, her hair unbound, and so adorned, and so exposed, she goes forth to gaze on the world for the first time, face to face, as she leaves it. She does not blush or quail. She scarcely regards the busied crowd who press so eagerly towards her. Her lips move in momentary prayer. Paradise is in her view. She sees her husband awaiting with approbation the sacrifice which shall restore her to him, dowered with the expiation of their sins, and ennobled with a martyr's crown. Exultingly she mounts that last earthly couch which she shall share with her lord. His head she places fondly on her lap. The priests set up their chaunt; it is a strange hymeneal, and her first-born son, walking thrice round the pile, lights the flame.

H. I. Bushby's Widow burning; London 1855.

ছাতি ফাটিলেও একবিন্দু জল দিবার যো নাই—পিতার প্রাণ ইহাতে কাঁদে না কি ? যাহাকে দশমাস দশদিন দেহাভ্যন্তরে করিয়া বহিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই সাগর-সিঞ্চিত ধন প্রতিনিয়ত বজ্রদগ্ধ স্মৃতিতরুমূলে নয়নবারি সিঞ্চন করিতেছে, বুকে করিয়া রাবণের চিতা বহিতেছে. আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—মায়ের বুক ইহা দেখিয়া ফাটে না কি ? তার উপর আশঙ্কা,—কোন দিন এই হতভাগিনী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইবে, মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, আর অমনি আত্মীয়স্বজনের মাথা হেঁট হইবে। এরূপ আশঙ্কা যে হয় না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে ? পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পিণ্ডান্থপিণ্ডশেষ প্রদত্ত হইতে না হইতে গ্রামে গ্রামে মেয়ের অনুসন্ধানে ঘটক বাহির হয়—ভয়, পাছে ছেলেটির দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যে এ আশঙ্কা হয় না, ইহা কেমন করিয়া বলা যায় ? স্ত্রীলোক কি মানুষ নহে ? তাহাদের রক্তমাংস কি অন্য উপকরণে নির্ম্মিত ? অবশ্য আশঙ্কা হয়, এবং আশঙ্কা দুঃখের ভাব। বিধবার মরাই ভাল। কেবল অন্যের দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া বলিতেছি না, কিন্তু বিধবার মরাই ভাল। তাহার মৃত্যুতেও আত্মীয়স্বজনের দুঃখ আছে, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিলে যত দুঃখ, মরিলে কি তত ? মৃত্যুনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা কালে মন্দীভূত হইয়া যায় ; কিন্তু বিধবার দুঃখ নিত্য নূতন সুতরাং যাহারা তাহার দুঃখে দুঃখী তাহাদের দুঃখও নিত্য নূতন।

আবার তাহার নিজের দুঃখ। হিন্দুবিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আহারে বল, ব্যবহারে বল, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল, হিন্দুবিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আবার, সুন্দর যায়, সৌন্দর্য্যোন্মাদ ত যায় না ; প্রণয়পাত্র চক্ষের বাহির হয়, প্রণয়তৃষ্ণা ত হৃদয়ের বাহির হয় না ; সুতরাং হৃদয়ের জ্বালা চিরদিন হৃদয়ের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। আবার দুঃখের উপর দুঃখ, স্ত্রীলোকের জন্য লজ্জার শাসন এতই কঠোর, যে বুক ফাটিয়া গেলেও মনের বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে হয়, মনের দুঃখ কেবল মন জানে, অন্তরের শ্বাস অন্তরে মিলায়, চক্ষের জল চক্ষে শুকায়,—আবার বলি, হিন্দুবিধবার জীবন বড় দুঃখের জীবন। এ দারুণ দুঃখ অপ্রতিকার্য্য, কেননা হিন্দুবালার বৈধব্য অনপনেয়। না মরিলে আর বিধবার যন্ত্রণা ফুরায় না। যে রোগের যে ঔষধ, সে রোগে তাহাই ব্যবস্থা। বিধবার মরাই ভাল।

দেখান গিয়াছে, বিধবার মৃত্যুতে সংসারের ক্ষতি নাই। দেখান গেল, বিধবার মৃত্যুতে দুঃখের হ্রাস আছে। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহা হইলেও বিধবার মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতাম না। কিন্তু আরও দেখান যাইতেছে যে, সহমরণে সমাজের লাভ আছে।

স্মাইল বলিয়াছেন এবং আমরাও বলি, দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই। যাঁহারা বলেন,—আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাহাই কর,—তাঁহারা মতিভ্রান্ত; তাঁহারা মনুষ্য চরিত্র বুঝেন না। এই পথে যাও,—এ কথায় কেহ যাইবে, কেহ যাইবে না। তুমি এই পথে যাও, আমি অন্য পথে যাইব,—এ কথায় হয় ত কেহই যাইবে না। কিন্তু আমি পথপ্রদর্শক হইতেছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলিলে অনেকে যাইবে। তোমার সঙ্গে সমস্ত পথ না যাইতে পারে, অনেক দূর যাইবে। অন্ততঃ কিয়দ্দূরও যাইবে। দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই।

আর স্বামীর জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত। পতিবিয়োগ-বিধুরা সতী, পবিত্রতার, সতীত্বের, ভালবাসার, আত্মবিসর্জ্জনের, সংসারে যাহা কিছু ভাল তাহারই বীরধ্বজা স্বর্গে উড়াইয়া, গভীর অনুরাগের, উৎকট মহত্ত্বের, অপার সহিষ্ণুতার দুন্দুভিনিনাদে জগৎ ভরিয়া, জ্বলন্ত চিতারোহণ করিলেন,—এ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর দেখিয়া কার হৃদয় গলিবে না?—ধর্ম্মে কার মতি হইবে না?—আত্মবিসর্জ্জনের মহত্ত্ব কার হৃদয়ঙ্গম হইবে না? ধর্ম্মের পথে পাদ-স্খলন হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন অনেক রমণী ভার ঠিক করিয়া লইয়া সেই পথে চলিবে। যাহাদের সতীত্বের গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝিবে,—পাপ পিশাচকে দূরে হইতে নমস্কার করিয়া পতিপদারবিন্দে মন স্থির করিবে। রমণীর, ধর্ম্মে আস্থা হইবে। পুরুষের, রমণীর প্রতি ভক্তি হইবে। সহমরণে সংসারের লাভ বই ক্ষতি নাই।

আর একটি কথা আছে। এ কথাটি আমরা তুলিতাম না; কিন্তু অনেক কৃতবিদ্য লোকের মুখেও এরূপ আপত্তি শুনিয়াছি বলিয়াই এ কথার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যাহার প্রণয় এত গভীর, যাহার সহিষ্ণুতা এমন অপার, তিনি যদি না মরিয়া আবার অভিনব বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে জগতের আরও মঙ্গল।

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, আরও মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক হইতেছে না, কেননা তিনি বাঁচিয়া থাকিলেই বা আর বিবাহ করিতে পাইতেন কই? বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।* কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি ছিল না—অশাস্ত্র অনেক প্রথা সমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে,—কিন্তু ইহা দেশাচারবিরুদ্ধ; এবং আমরা হিন্দু-সমাজের কথা বলিতেছি।

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ইত্যাদি—পরাশর সংহিতার এ বচন বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষে, মৃতভর্তৃকার পক্ষে নহে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবলা, আমাদের এই এঙ্গলোবর্ণেকুলের সমাজের মতানুসারে, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যে স্থলে পুরুষের দুইবার বিবাহ হইতে পারে, সে স্থলে স্ত্রীলোকেরও হওয়া উচিত। আপনারা যে নিয়মের বাধ্য হইতে পারি না, সে নিয়মে অন্যকে বাধ্য করা অন্যায়। জানি, বুঝি, মানি; কিন্তু যখন আদৌ বিবাহই হইতে পারে না, তখন অনর্থক ধরিয়া রাখিবার ফল কি? দুঃখভোগের জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিবার তুমি কে? তবে যে সহমরণ প্রথার জন্য হিন্দুসমাজের এত দুর্নাম, শাস্ত্রকারদিগের এত অখ্যাতি, ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা যায় না। স্বীকার করি, ভারতে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে—কোথায় নাই?—কিন্তু সতীদাহ তাহার অন্তর্গত নহে। দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্যা বালিকার পরিণয়, অবশ্য অত্যাচার। কুলীনকন্যার চিরকৌমার্য্য, অবশ্য অত্যাচার। মৃতভর্ত্তৃকার চিরবৈধব্য অবশ্য অত্যাচার। কিন্তু সহমরণ অত্যাচার নহে। মৃত্যুতেই যার যাতনার অবসান, মৃত্যুতেই যার শান্তি, মৃত্যু তাহার পক্ষে অমঙ্গল নহে। যে স্থলে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, সে স্থলে সহগমনের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

শাস্ত্র এমন নহে যে বিধবামাত্রকেই বলপূর্ব্বক পোড়াইতে হইবে। শাস্ত্র এমন নহে যে বিধবামাত্রকেই স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে হইবে। যার ইচ্ছা হয়, সে মরুক;—ইহাতে অত্যাচার কি?

তবে শাস্ত্রকারদিগের কলঙ্ক এই যে, বিধিটা একতরফা করিয়াছিলেন। পরাশর যেমন লিখিয়াছিলেন যে, সহমৃতা বিধবা সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে,* তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখিতেন যে সহমৃত পুরুষ সাড়ে তিন শত কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে, তাহা হইলে এত কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ উঠাইয়া দিয়া ভাল করিয়াছেন কি? বেণ্টিঙ্ক সাহেবকে আমরা এ সদনুষ্ঠানের জন্য আশীর্ব্বাদ করিব, না অভিসম্পাৎ করিব? চসমা চোখে সমাজসংস্কারক বাবুর মনে কি আছে, তা তিনিই জানেন; আমরা বলি, গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্য ভাল হয় নাই।

ভাল হয় নাই; কেননা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভাল হয় নাই, কেননা বেন্থামের হিতবাদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সতীদাহে দোষাধিক্য দেখা যায় না। ভাল হয় নাই, কেননা হর্বট স্পেন্সরের সমস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ইহাতে দোষ দেখা যায় না। বরং রাজবিধির

---

*তিস্রঃ কোট্যার্দ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
পরাশর সংহিতা।

দ্বারা ইহা রহিত করায় দোষ দেখা যায়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, যে সকল কার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রধানতঃ কেবল নিজের, তাহার উপর সমাজের অথবা রাজবিধির হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। যে সকল বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্যের অনিষ্ট নাই, তাহা স্ব স্ব প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত। সহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে?—তাহাদের দুর্দ্দশার কি তারতম্য হইয়াছে? এই মাত্র যে তখন এক দিন পুড়িত, এখন সমস্ত জীবন পুড়িতে থাকে। তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত,—এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না।‡

---

‡ এই প্রবন্ধে যে সকল পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতে অনেক স্থানে অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু বঙ্গদর্শনে সকলপ্রকার মত সমর্থিত ও সমালোচিত হউক, ইহা আমাদিগের ইচ্ছা; স্বাধীন সমালোচনা ভিন্ন উন্নতি নাই। সে জন্যও বটে, এবং লেখকের লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও বটে, আমরা এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম। বং সং।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বেদপ্রচার ও বেদ এই দুইটি প্রস্তাবে আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থের সারমর্ম্ম বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে প্রাচীন ঋষিগণ বেদবিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "চরণব্যূহ" ও "আর্য্যবিদ্যাসুধাকর" হইতে সংক্ষেপে নিম্নে অবিকল সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইয়াও স্বতন্ত্ররূপে সঙ্কলিত হইল, কেন না ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিককালে ও পৌরাণিক সময়ে বেদশাস্ত্র যে কতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন। ইহার মধ্যে যে যে শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

ঋগ্বেদের পরিমাণ চরণব্যূহে উক্ত হইয়াছে যথা—

ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
ঋচামশীতিঃ, পাদশ্চ (১০৫৮০) তৎ পারায়ণমুচ্যতে।

অর্থাৎ ১০৫৮০টি ঋক্ একত্রিত আছে তাহার নাম পারায়ণ।

শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের পাঁচ শাখা যথা—

শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন, মাণ্ডুক। ইহার প্রমাণ—

ঋচাং সমূহো ঋগ্বেদস্তমভ্যস্য প্রযত্নতঃ।
পঠিতঃ শাকলেনাদৌ চতুর্ভিস্তদনন্তরম্।

(শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য।)

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ঋক্‌সমূহের নাম ঋগ্বেদ, ইহার সমস্তই সর্ব্বাগ্রে শাকলমুনি যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই চারিজন যথা—

"শাঙ্খ্যাশ্বলায়নৌ চৈব মাণ্ডুকো বাস্কলস্তথা।
বহ্বৃচাঃ ঋষয়ঃ সর্ব্বে পঞ্চৈতে একবেদিনঃ।

(শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য)

শাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডুক ও বাস্কল, ইঁহারাই ঋগ্বেদীদিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী।

শৌনকের মতে ইহারা ঋষি কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্যের মতে ইঁহারা আচার্য্য, ঋষি নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, ঋষি ও আচার্য্যদিগকে তর্পণ করিতে হইবে বলিয়া সূত্রদ্বারা রীতিবদ্ধ করিয়াছেন সে স্থলে ইঁহাদিগকে ঋষিমধ্যে গণনা না করিয়া আচার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তদ্ভিন্ন ঐতারেয়ী, কৌষীতকী, শৈশিরী, পৈঙ্গী, ইত্যাদি আরও কয়েকটী শাখা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধান শাখা না হইয়া প্রতিশাখ্যমতে উপশাখা বলিয়া পরিগণিত। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

"মুদ্গলো গোকুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ প্রবর্ত্তকাঃ ॥"

মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির, শিশির ইঁহারা শাকলের শিষ্য এবং শাখা-বিশেষের প্রবর্ত্তক। অতএব সর্ব্বসমেত ঋগ্বেদ ২১ শাখায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথা উল্লেখ আছে। যথা মহাভাষ্য—

"একবিংশতিধা বহ্বৃচাঃ"

এইরূপে অধ্যয়ন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শাকল প্রভৃতি আদি আচার্য্যদিগের ভিন্ন ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র ঋগ্বেদ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সমুদায় শাখা একত্র করিলে অত্যল্প মাত্র তারতম্য দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থ বোধক গ্রন্থ সকল যথা—

"অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্ব প্রবচনেষু চ" (মনু ৩ অঃ)

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"প্রকর্ষেণোচ্যতে বেদার্থএভিরিতি প্রবচনাঙ্গানি শিক্ষাদীনি"

ঋগ্বেদের সূক্ত এক সহস্র ১৭১২ সংস্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১০ মণ্ডল। ৮ অষ্টক।

সূক্তের লক্ষণ—

"সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে।" বৃহদ্দেবতা।

অর্থাৎ এই নিরাকাঙ্ক্ষ ছন্দোময় বেদবাক্যের নাম সূক্ত অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই সূক্ত।

এই সূক্ত তিন প্রকার। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত। ঋষি ও দেবতা সূক্তের লক্ষণ—

"ঋষিসূক্তানি যাবন্তি সূক্তা লোকস্ত বৈকৃতিঃ।
স্তুয়ৈতৈকাস্ত যাবৎসু তৎ সূক্তং দৈবতং—বিদুঃ।" (বৃহদ্দেবতা)

একজন ঋষির কৃত বা দেখা যতগুলি সূক্ত অর্থাৎ মহাকাব্য সেইগুলি ঋষিসূক্ত। ১ম অষ্টকের প্রারম্ভস্থ "অগ্নিমীড়ে" ইত্যাদি হইতে "ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধং" ইত্যন্ত

ঋক্ ভাগ (২০ বর্গাত্মক) একটি ঋষিসূক্ত, কেন না ঐ সমস্ত ঋক্গুলি একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক ঋষির কৃত, আর তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবসূচক ৯টি ঋক্ দেবতা সূক্ত, কেন না ঐ ৯ ঋক্ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ হইয়াছে।

একছন্দে নির্ম্মিত পর পর ক্রমে স্থাপিত হইলে তাহা ছন্দসূক্ত। যথা—ঐ অগ্নিমীড়ে হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋক্ গায়ত্রীছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহা ছন্দঃসূক্ত।

ঋগ্বেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন সম্প্রদায় পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা—

"য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।"

অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে ২য় মণ্ডলের সমুদায় সূক্ত গৃৎসমদের জ্ঞানে উদিত হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহার সংগ্রহ। এই সকল নির্ব্বাচন দেখিয়া বৈদিক অধ্যাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যথা—

"বহুঋষিদৃষ্টানাং বহূনাং সূক্তানাং একর্ষিকর্তৃকঃ সংগ্রহো মণ্ডলম্" ইতি।

অর্থ এই যে বহুতর ঋষির দৃষ্ট বহুতর- ঋক্মন্ত্র এক ঋষির দ্বারা সংগ্রহ হইয়া নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণ্ডল।

ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে অনেক মণ্ডল ব্যাসের পূর্ব্বেও সংগ্রহ হইয়াছিল। এবং ইহার রচনা কত কালের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের কথিত হইয়াছে এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিদিগের নাম আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে নির্ণীত হইয়াছে যথা—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রোঽত্রি র্ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাবমান্যাঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ-মহাসূক্তাঃ" ইতি।

শতর্চিযথা—

"মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃত্যোঽগস্ত্যান্তা আদ্যমণ্ডলে
যে সন্তি ঋষয়স্তে বৈ সর্ব্বে প্রোক্তাঃ শতর্চিনঃ।"

মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত ঋষিরা ১ম মণ্ডলের ঋষি। তাঁহারাই শতর্চি নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্চিগণ ১ম মণ্ডলের ঋষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ ঋষি (১০২) ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই শতর্চি হইতে পারেন কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা এত অধিক ঋক্ রচনা না করিলেও উঁহার সহচর ছিলেন, এজন্য তাঁহারাও শতর্চি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা—

"দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দোঽভ্যধিকং যদৃচাং শতম্।
তৎসাহচর্য্যাদন্যেপি বিজ্ঞেয়াস্তু শতর্চিনঃ।"

১১ মণ্ডলের ঋষিরা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত নামে প্রথিত। কেন না তাঁহারা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত সকল রচনা বা সংগ্রহ করেন। মহাসূক্তের লক্ষণ শৌনককৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্নীত আছে যথা—

"দর্শকতায়া অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ।"

দশঋকের অধিক ঋক্ দ্বারা যে সূক্ত বদ্ধ তাহা মহাসূক্ত। সুতরাং ১০ ঋকের ন্যূন হইলে ক্ষুদ্র সূক্ত এইরূপ মধ্যম সূক্ত জানিবেন।

এতাবতা কথিত গৃহ্যসূক্ত দ্বারা এইরূপ অর্থলাভ হইতেছে যে শতর্চি ঋষিগণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক, ২য় মণ্ডলের গৃৎসমদ, তৃতীয় বিশ্বামিত্র, ৪র্থ বামদেব, ৫ম অত্রি, ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ, ৭ বশিষ্ঠ, ৮ প্রগাথা, ৯ পাচমান্য, ১০ ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ।

অধ্বর্যু বা যজুর্বেদ—১০০ শাখা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উল্লেখ দেখা যায়।

চরণব্যূহ গ্রন্থে লিখিত আছে যজুর্বেদের ৮৬ শাখা, কিন্তু এই সকল শাখা আর এখন দেখা যায় না, নাম পর্য্যন্ত শুনা যায় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম পাওয়া যায় তাহা এই—

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্ঠলকঠ, চায়ারণীয়, বারতন্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপামন্যব, পাতাম্বিনেয়, মৈত্রায়ণীয় এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে। যথা—

মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়, শ্যামায়নীয়।

চরক শাখায় শাখায় শ্রেণী আছে—ঔখিয় খাণ্ডীকীয়। এই খাণ্ডীকীয় শাখাও ৫ প্রশাখায় বিভক্ত যথা।

আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢী, হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী।

বারতন্তবীয়, ঔখয়, এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনি সূত্রের "তিত্তিরি বরতন্তু খাণ্ডিকোখাচ্ছিণ্" দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

আপস্তম্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও (কলাপি বৈশম্পায়নন্তে বাসিভ্যশ্চ) ণিনিপ্রত্যয় নিষ্পন্ন।

যজুর্বেদের মন্ত্র পরিমাণ যথা—

"অষ্টাদশ সহস্রাণি মন্ত্র ব্রাহ্মণায়োঃ সহ। যজুংষি যত্র পঠ্যন্ত স যর্জুবেদ উচ্যতে।" (চরণ ব্যূহ) ইহা কৃষ্ণ যজুর পরিমাণ; শুক্ল যজুর স্বতন্ত্র যর্জুবেদ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ সহস্র গদ্যময় মহাবাক্য আছে।

শুক্ল যর্জুবেদের ১৫ শাখা। কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধেয়, শাকেয়, তাপনীয়, কাপীল, পৌণ্ড্রবংস, আচটিক, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয়, ঔধেয়, গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেয়ীও বলে। এই শুক্ল যর্জুবেদের পরিমাণ যথা।—

"দ্বে সহস্রে শতন্যূনে মন্ত্রা বাজসনেয়কে। তাবন্তাস্তেন সংখ্যাতং বালখিল্যং সশুক্রিয়ং। ব্রাহ্মণস্য সমাখ্যাতং প্রোক্ত মানচ্চতুর্গুণম্।" (চরণ ব্যূহ)

এক শতের ন্যূন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদের আছে। বালখিল্য শাখাও এই পরিমাণ। এই উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার ব্রাহ্মণ।

সামবেদ—পৌরাণিক মতে পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে—তাহা এই—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্রা, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ্দূলীয় কৌথুম, (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই) এই কুথুম শাখার ছয় উপশাখা। যথা—আসুরায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়, ইহার পরিমাণ—

"অষ্টৌ সাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।
উহ্যানি সহ্যানি সরহস্যানি চিতাতং সামগণঃ স্মৃতঃ॥ (চরণ ব্যূহ)

আট সহস্র ১৪ সাম এবং উহ ও রহস্য।

অথর্ব্ববেদ—ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত যথা—

পৌপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী, চারণবিদ্যা। ইহার পরিমাণ—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানিচ। গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শত পাঠকম্।" (চরণ ব্যূহ)

অথর্ব্ববেদের ১২ সহস্র ৩ শত মন্ত্র। একশত পাঠক (পরিচ্ছেদ) আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়্‌বিভাগ।

শিক্ষা—স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক শাস্ত্র। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচলিত। গৌতমীয়, নারদীয়, প্রভৃতি শিক্ষাগ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষাগ্রন্থ বিশেষ।

কল্প—বেদবিহিত কার্য্যকলাপের পূর্ব্বাপর কল্পনাব্যবস্থা শাস্ত্র। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন, ও শৌনক সূত্র। সামবেদের মশক, লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ সূত্র। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যসধঃ, হিরণ্যকেশীন্‌ মানব, ভারদ্বাজ, বাধুন, বৈখানস, লৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ, বরাহসূত্র। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন সূত্র। অথর্ব্ববেদের কুশীক সূত্র।

ব্যাকরণ—শব্দার্থ ব্যুৎপত্তি বোধক শাস্ত্র।

নিরুক্ত—বৈদিক পদ পদার্থ নির্ণায়ক শাস্ত্র। যাস্ককৃত ১৩ অং। প্রাঃ বাঃ—"সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ—"

ছন্দঃ—অক্ষরপ্রস্তাবনিরূপকশাস্ত্র। এক্ষণে পিঙ্গলকৃত ছন্দঃগ্রন্থই প্রাচীন।

ইহার প্রারম্ভ বাক্য—"ধী শ্রী স্ত্রী ম্" জ্যোতিষ—কালবোধক শাস্ত্র। গর্গাচার্য্য ইহার প্রথম নির্ম্মাতা। তাহার প্রারম্ভ বাক্য—

"পঞ্চ সংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষম্ প্রজাপতিম্" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন উপাঙ্গ যথা—

"ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণাঞ্চ মীমাংসা ন্যায় এবচ।"

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় এই ৪টী উপাঙ্গ নামে বিখ্যাত।

শ্রীরামদাস সেন।

১

অই কুহরিল পিক ললিত উচ্ছ্বাসে !
হিম-ঋতু অবসান, আকুল পাখীর প্রাণ
হৃদয়ের বেগ তার হৃদিতটে রয় না !—
হায় ! বঙ্গহৃদি কেন অইরূপে বয় না ?

২

কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে না পারি !
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিসলয়ে সাজি,
হাসির তরঙ্গ তোলে, অধরেতে ধরে না !—
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসে না ?

৩

শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলি
অচেত মলয় বায়, সেও রে ছুটিল হায়,
ছুটিল কুসুম রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না !—
অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না ?

৪

তুমিও কি সরোবর অই কুহু-স্বরে
চলেছ লহরি তুলে মুঞ্জরিত তরুমূলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায় ?—
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায় ?

৫

কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিনি,
ছুটেছ সাগর পাশে, মাতিয়া কি, অই ভাবে ?
বলো না লো কি আশ্বাসে, বল সে কাহিনি ?
শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চির ঋণী ?

৬

জড়ে চেতনের ভাব বুঝিয়া চেতিল !
কি বলিছে কুহুস্বরে, কে বুঝায়ে দিবে নরে
ধরণী চঞ্চল করে' কি কথা এমন ?—
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন !

৭

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায়,
সঞ্চারি আশার লতা, শুনায় অমনি কথা,
অমনি নিগূঢ় ভাবে ?—নাহি কি অমন
হৃদয়-ক্ষেপানো কথা কাহার (ও) গোপন ?

৮

হাসি, কান্না, কি উল্লাস নাহি কিহে আর
কাহার (ও) হৃদয়মাঝে ? অমনি ধ্বনিতে বাজে
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া ?—
হাসে, কাঁদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে মাতিয়া !

৯

কে আছে হে কবিকুলে গভীরহৃদয় !
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক গণি,
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস ;
ঘুচায়ে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ ।

১০

উচ্চ তারে বঙ্গপ্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,
প্রাচীন যুবকজনে লও হে আশার বনে ;
উন্মত্ত করিয়া প্রাণে কুহক দেখাও ; —
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও !

১১

বধির বঙ্গের শ্রুতি শুনাও বিদারি
পরস্পরে রাখি তর পাষাণে পাষাণান্তর,
কিরূপে "মিশরস্তম্ভ" মিলনের জোরে
বিরাজে অনন্ত-কোলে বিনা অন্য ডোরে !

১২

ভূধর করিছে চূর্ণ সিন্ধুর সলিল !
বলো হে কিসের বলে সে সলিল-কণা চলে
দিনে দিনে, পলে পলে—না হয়ে শিথিল ;
জলে জলকণা বাঁধে, কি গভীর মিল !

১৩

কার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায় ।
দেখাও হৃদয় খুলে গউড় যাউক ভুলে
সে তরঙ্গ-স্রোতে মিলে ভাসুক তেমতি,
শুনে ও কোকিলধ্বনি প্রকৃতি যেমতি !

১৪

না যদি ভাসাতে পারো উৎসাহে তেমন,
হাসাও হে বঙ্গে তবে নিগূঢ় রহস্য রবে,
বঙ্গের হৃদয়শিলা করি উন্মোচন !—
হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের (ও) মন !

১৫

সে রসে হাসাতে পারো হাসাও উচ্চেতে ;
যেন সে হাসির সনে হাসে সবে ফুল্লাননে,
হাসে যথা কুহুস্বরে মহী পাগলিনী !—
কে জানো হে, বঙ্গ কবি, গাও সে কাহিনি !

১৬

যে হাসি—মধুতে নাই বাসির আঘ্রাণ !
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরী
যে হাসি তরঙ্গে ভাসি, কালের পাথারে—
যে হাসি ভাসিত "রোমে" "হেলেসের" তারে !

১৭

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয় দরশন,
করে চারু শস্য, তরু, গহ্বর, কানন !—
তেমতি হাসিতে ফুল্ল কর বঙ্গজন ।

১৮

না যদি হাসাতে পারো সে গভীর বেগে,
শুনায়ে করুণ রব পরাণে কাঁদাও সব—
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিশুক কাঁদিতে !
প্রাণভরে' হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তুলিতে !

১৯

ভেবো না হে বঙ্গনারি, নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারুফাঁদ-নেত্রকোলে অর্দ্ধছায়
অস্ফুট অর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি !—
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না না জানি ।

২০

ভেবো না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাসো যাহা
যে হাসি হাসিয়া তব পরাণ যুড়াও ;—
যুবতী, প্রবীণা কিম্বা কিশোরে ভুলাও !

২১

ভেবো না জানি না আমি কি বা সে মধুর
শিশুর অধরতলে হাসির অমিয়া ছলে
ঢলে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে !—
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে ।

২২

ভেবোনা জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক তাপ ভরে
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীরহার !—
প্রচুর বঙ্গের মাঝে সে শোক সঞ্চার !

২৩

না চাহি সে কান্না, হাসি, সে উৎসব রোল !
মাদকতা নাহি তার ! বসুধার না ঢলায় !
হৃদয়পাথার তার উথলিত হয় না !
দেবখাতে বিনা গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ নীর বয় না ।

২৪

আমার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয় !
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে
নী জানে উৎসাহ বানে প্রাণের প্রলয় !—
জগৎ ভাসানে বেগ বঙ্গেতে কোথায় ?

২৫

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহার হৃদয়ে !
গাও হে তবে সে গীত, শুনায়ে করো জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবায়ে !
রংস্ত, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসায়ে !

২৬

এসো ভ্রাতঃ, কবিকুলে আছ কোন জন,
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে !—অমনি কীর্ত্তন
না লিখিবে যত দিন, ছেড়োনা বাদন।

২৭

হে কামিনীকুল, মৃত বঙ্গের পীযূষ !
কর পণ শিখাবারে পতি, পুত্র, তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন ;—
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী-বাঁধা-পণ !

২৮

ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুল না আমায়।
হৃদয়ে গাঁথিয়ে মালা দিলাম বৈশাখী ডালা
বাসি বলে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায়।—
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায় ?

২৯

হে বঙ্গদর্শনপ্রিয় ভামিনী যতেক !
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার ?
বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয় রাকায়,
সমর্পি তাঁহার (ই) করে তুলিয়া মাথায় !—
ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায় !

আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটী লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবার্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে, ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে সভ্যতা কাহাকে বলে আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না; আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরমসোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের আচার ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন; কেহ ইংরেজদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে ইংরেজদিগের অনুকরণে আমাদিগের অবনতি হইবে; কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন যে, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃণ্ময় দীপের আলোকে লেখা পড়া করি।* শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কলিকাতার লালবাজারের মদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তুত; কিন্তু ধুতীচাদরপরা নিরামিষভোজী নির্ম্মল জলপায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও অসভ্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে আমরা এক্ষণে দুইটি প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা এবং (২) বিলাতী শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে একদিকে লইয়া যাইতেছে; বিলাতী শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে, এতদ্দেশীয়

---

* "It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it necessary to cover his body, and reads under the light of the primitive earthen lamp" — Mr. Manomohun Ghose on English Education.

প্রাচীন রীতিনীতি, চিরাগত আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড উত্তম। বিলাতী শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষরোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্য রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহিমা পুরাতন প্রণালীসম্ভূত। বিলাতী শিক্ষা বলিতেছে যে পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে কেহ দেশীয় স্রোতে, কেহ বা বিলাতী স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে তদনুযায়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি উদিত হয় না; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে পবিত্র "ধর্ম্মের" নামে ভূমণ্ডল শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে "স্বাধীনতার" পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতা ফ্রান্স প্রভৃতি কতদেশে রাজত্ব করিয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য জাতিদিগকে "সভ্য" করিবার ছলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল বা দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে।

ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানী পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সক্রেতিস্ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন তিনি দেখিতে পাইতেন যে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আথেন্স মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিয়া যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্ব্বিত উনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের বুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থের আভাস কিয়ৎ-পরিমাণে পাওয়া যায়। বুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে "পক্ষী" শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং "উরগ" বলিতে বুকের উপর ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে "সভ্যতা" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে সমাজ বাচক "সভা" শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, যাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের বুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। বুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে "তৈল" বলিতে প্রথমে তিলের

নির্যাস বুঝাইত ; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিসার তৈল, বাদামের তৈল, মাস তৈল, ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্যাস না বুঝাইয়া নানা প্রকার নির্য্যাস বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে "অম্লজান" শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অম্ল উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই "অম্লজান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে। যে এমন অনেক অম্ল আছে যাহাতে উক্ত অম্লজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া "অম্লজান" শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার দোহন-বোধক দুহ্ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি ; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহু সন্তান সত্ত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনাম প্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি ; সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্রিত হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয় ; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বাহুল্য। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপলক্ষ ব্যতিরেকে অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকে একত্র হইয়া থাকিতেও ভাল বাসে না ; সভ্যজাতি-দিগের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাপ্রবৃত্তি বলবতী, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বত্বরক্ষাজন্য আইন, আদালত বা রাজশাসন নাই ; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধনের সূত্রপাত মাত্র হয় নাই। এবং অদ্যাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাঁহারা সামাজিক অবস্থার সর্ব্বোচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে সামাজিক ভাবের তারতম্যানুসারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায়

একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসনসূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ, তাহাতে অন্যের দুঃখ। এইরূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজবন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু যত সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম্ম রীতি ও নীতিসম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোক সাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্ব প্রকৃতিমণ্ডলী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সমাজমধ্যে কার্য্য-বিভাগ আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার প্রয়োজন মত সমুদয় কার্য্য করে। একই ব্যক্তি সূত্রধার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মৎস্যজীবী, শিকারী, গৃহনির্ম্মাতা, ইত্যাদি। ইহাতে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকেই উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। এইরূপে পরস্পর সাপেক্ষতাগুণে কার্য্য-বিভাগদ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্য্যবিভাগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও মিসরে এইরূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশরক্ষা করিবেন। বৈশ্য বা বণিক্ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। শূদ্র বা দাস অন্যশ্রেণীর লোকের সেবা শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু এগুলিও কেবল মোটামোটি বিভাগ। ভারতবর্ষে যে সকল বর্ণসঙ্কর জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্মকার, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী, ইত্যাদি। এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়। যে যাহা শিখিত আপন সন্তান সন্ততিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত। ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনটী অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; (২) অন্যশ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নূতন

বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল; (৩) যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এইরূপে যে সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতার গুণে কার্য্য বিভাগ প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঈদৃশ গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ এবং মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়তঃ, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে একটী সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরুলতা পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, করুক। নিঃশব্দে বসন্ত-বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণপ্রভাবে মহীরুহব্যূহের স্বনন শুনিয়া তদনুকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক। নীরব ভাবুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিরূপে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয়ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্যের নিকটে অভাব পূরণার্থে মনের কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই; বাক্যদ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালনদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। কিন্তু এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবর্ত্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্যের দোষমার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা যেরূপ একটি সামাজিক গুণ, বিপন্নকে সাহায্য করাও তদ্রূপ আর একটি। ঘটনাসূত্রে কত লোক বিপত্তি-জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়া

তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতানুযায়ী কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা লাভ প্রত্যাশাই সমাজবন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই; একজনের বা এক অঙ্গের দুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষা জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ যেখানে নাই, সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের দুঃখে রাজপুরুষদিগের দুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদ সংস্থাপন নিবন্ধন একতাহ্রাস তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্র্য বিলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে, সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবন ধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধন কার্য্যে দেহ মন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খৃষ্টভক্ত দূরে এই "মিলিনিয়ম" দেখেন; দেখেন যে সমুদয় মনুষ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক পরিবারভুক্ত হইয়াছে এবং অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন যে সমাজের উন্নতিসহকারে সর্ব্বহিতকরী নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্গিক নির্ব্বাচন প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূরবর্ত্তী নীহারিকাবৎ সামান্য দৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে এখনকার সুসভ্য ভদ্রলোক হয় ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না; যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি; এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মীসর, কি কাল্ডিয়া,—কি ফ্রান্স, কি জর্ম্মনী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে

দৃষ্ট হউক, সেখানেই আমরা সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাল্মীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র—গৌতম, আরিস্ততল, বা বেকন—আর্য্যভট্ট, টলেমি, বা নিউটন,—যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অন্য সাক্ষী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে সভ্যতা বলিতে কেবল "সামাজিক সম্বন্ধ বর্দ্ধনই" বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্টবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"যদিও সমাজ অন্য স্থানের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্যত্ব অধিকতর মহিমা ও প্রভাবসহকারে বিরাজমান। অনেক সামাজিক অধিকার বিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার বিস্তার ঘটিয়াছে; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্জ্বল্যমান বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প তাহাদিগের প্রভাবিকাশ করিতেছে। যেখানে মনুষ্যজাতি মানবপ্রকৃতির ঈদৃশ মহিমাপ্রদ এই সকল মূর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে।" *

মনুষ্য সভ্যতাবর্ত্মে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রকৃতিকে স্বীয় করতলস্থ করিতে পারিতেছে। মনুষ্যের যত জ্ঞান ও একতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই জগতের উপর তাহার কর্তৃত্ব বাড়িতেছে। যে সকল নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখে মূর্খ অসভ্যজাতি ভীত ও হতবুদ্ধি, বিদ্যালোক সম্পন্ন সভ্যজাতি বিজ্ঞান ও একতার বলে সে সকল শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন। সংকৌশল ও সমবেত মানবচেষ্টায় হলণ্ডের ন্যায় নিম্ন দেশ সমুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে, বালুকাময় সুয়েজ যোজক বাণিজ্যসুগমতাসম্পাদক পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, এবং দুর্লংঘ্য আল্পস পর্ব্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীররূপ ধারণ করিয়াছে। দুস্তর জলনিধি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া যে সকল জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা জলযাননির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। পুরাকালের অগ্নিদেব এখন মনুষ্যের পাচক ও যানবাহক, বায়ুদেব যন্ত্রপেষক ও যানবাহক, সূর্য্যদেব চিত্রকর, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎ সংবাদতরঙ্গবাহিনী দাসী। কবি কল্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ রাবণের প্রতাপে তাহার সেবা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যের জ্ঞানপ্রভাবে দিক্‌পালদল সত্য সত্যই তাঁহার সেবা করিতেছে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজলেখক বাকল সাহেব বিবেচনা করেন যে ইউরোপখণ্ডের বাহিরে

* Guizot's Civilization in Europe.

যে সকল প্রদেশ সভ্য হইয়াছে, সে সকল প্রদেশে মনুষ্য বাহ্য জগতের কর্ত্তা না হইয়া তাহার অধীন ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ আছে, এবং এসিয়া ও আফ্রিকার অনেকস্থল হইতে সভ্যতা অন্তর্হিত হইয়াছে, সত্য ; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখা যায় না যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও অন্যস্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার প্রকৃতিগত বিভেদ আছে। যে হিন্দুরা ইলোরার পর্ব্বত কাটিয়া স্বর্গোপম কৈলাসসমন্বিত গিরিগহ্বরমালা প্রস্তুত করেন, যাঁহারা সঙ্কটসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করেন, যাঁহারা এই বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টিসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত উদ্ভাবন করেন, তাঁহারা যে নৈসর্গিক শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া তদনুবর্ত্তী হইতেন, এমন বোধ হয় না ; বরং ঋষিদিগের মধ্যে জগদ্বশীকরণের ইচ্ছা প্রবল দেখা যায়। এতদ্দেশে এবং চীন সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ থাকিবার কারণ বোধ হয় এই ; যৎকালে ভারতবর্ষের ও চীনের লোকেরা সভ্য হন, তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা এত অসভ্য ছিল যে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় স্বদেশপ্রচলিত মত ও অনুষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁহাদিগের অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই বহুকাল তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন নাই। কোন রাজ্য বা জাতির পতন সংঘটন দ্বারা এসিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্থানে সভ্যতার তিরোভাব বা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিপ্লব প্রায় সামাজিক কারণের ফল। প্রাচীন রাজ্যমাত্রেই বহুসংখ্যক দাস ছিল। যাঁহাদিগের হাতে আধিপত্য ছিল, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। এই উভয়ের মধ্যে পীড়িত ও পীড়ক প্রায় সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেখানে এ প্রকার গৃহবিচ্ছেদ সেখানে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। ঈদৃশ অবস্থায় বিষময় ফল সর্ব্বত্রই ফলিবে, ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা যেখানেই হউক না কেন। যেমন আফ্রিকায় মিসরের, এসিয়ায় ব্যাবিলন প্রভৃতির, তেমনই ইউরোপে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পতন ঘটিয়াছে। সত্য বটে, গ্রীস ও রোম পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছে। রোম তাহার আইন, গ্রীক তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের মঙ্গল সাধনার্থে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা কম নহে। ভারতবর্ষ প্রেমময় বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ আরবদিগকে দিয়া স্বীয় পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও রসায়ন ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে ; এবং ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই ভাষা তত্ত্ববিদ্যার মূল পত্তন হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রকৃতির শক্তি, আদৌ প্রবল হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধিসহকারে ক্রমশঃ কমিয়া যায়, যদিও উহা একেবারে শূন্যবৎ বা অগ্রাহ্য হইবার নহে। আদিম মনুষ্য, নিকৃষ্টজীবগণের ন্যায়, নৈসর্গিক নির্ব্বাচন স্রোতের বশবর্ত্তী ছিলেন। সেই আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহা কি কাজে লাগে কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদিগের দেহ আবরণ করিবার বস্ত্র ছিল না; এবং আশ্রয় লইবার আবাসগৃহ ছিল না। তাঁহারা যখন যেখানে থাকিতেন, তখন তত্রত্য স্বভাবজ ফল মূল আহরণ ও বন্যজীব হনন করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের ধাতুনির্ম্মিত কোন অস্ত্র ছিল না, এবং তাঁহারা কৃষিকার্য্যের কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করে এমন কোন সামাজিক সহযোগী বা পালিত জন্তু ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন উন্নতভাষার অভাবে ততটুকু অন্যকে দিয়া যাইতে পারিতেন না। ঈদৃশ অসভ্য-ব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের সম্বন্ধে বাহ্যশক্তির কার্য্য পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইতেন, এমন বোধ হয় না। এই নিমিত্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইত। পরিণামবাদী উয়ালেস সাহেব অনুমান করেন যে এইরূপেই বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। যে সময় হইতে মনুষ্যগণ অগ্নি, বস্ত্র, গৃহ, খাদ্য, প্রভৃতির গুণ অবগত হইয়া তৎসাহায্যে বহির্জ্জগতের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া যে সে মণ্ডলে বাস করিতে শিখিল, সেই সময় হইতে এই সকল জাতীয় লক্ষণের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই কারণেই তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে সকল জাতির মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অদ্যাপি চিনা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টিই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এতদ্দ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে ঐতিহাসিক প্রবাহের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। যদি সিন্ধুনদতীরে বা গ্রীস দেশে কাফ্রিজাতি বাস করিত, তাহারা যে আর্য্যজাতির ন্যায় সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রত্যয় হয় না। উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত জাতি সৃষ্টি ব্যতীত, সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি আর এক দিকে অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোকে অবসর না পাইলে মানসিক উন্নতি করিতে পারে না, এবং যেখানে স্বভাবতঃ ভূমি এত উর্ব্বরা যে অল্প পরিশ্রমেই পর্য্যাপ্ত আহার্য্য উৎপন্ন হয়, সেখানে সহজেই অবসর মিলে। এই কারণেই অতি প্রাচীনকালে নীল, ইউফ্রেতিস্ ও সিন্ধুনদের তীরে সভ্যতার আবির্ভাব। কিন্তু যদিও এইরূপে বাহ্যবস্তুর প্রভাব সভ্যতার উদয়ের সহায় হইয়া থাকে, তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও সমাজের নিয়ম অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে শিখে, সেই পরিমাণে আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে।

আমরা দেখিয়াছি যে সভ্যতার ত্রিবিধ মূর্ত্তি, সামাজিক বা নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ও বাহ্যিক। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত আমাদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয়ে আমাদিগের যে প্রকার জ্ঞান, নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের উপর আমাদিগের যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের সভ্যতার পরিমাণ নির্ণীত হয়। ধর্ম্মের মহৎক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী, ও শিল্পের অধিকার বিস্তার, এ সকল সভ্যতার উন্নতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড স্বরূপ। কিন্তু আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী জানিতে পারি, সেই পরিমাণেই আমরা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। আমাদিগের সামাজিক কার্য্যও বিশ্বাসের অনুগত এবং নূতন কিছু না জানিলেও বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং বাহ্যজগতের উপর কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি উভয়ই জ্ঞানোন্নতিসাপেক্ষ। এই নিমিত্ত যাঁহারা কোন দেশে সভ্যতাবৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হন।

আদিম মনুষ্য যে ঘোর অসভ্য ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক কয়েকখানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদিগের "সত্যযুগের," গ্রীকদিগের "স্বর্ণযুগের," এবং য়ীহুদীদিগের "নন্দনোদ্যানের" উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের মত সমর্থন করিতে চাহেন। এ প্রকার তর্ক সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে পূর্ব্বকালীন হিন্দু, গ্রীক্ ও য়ীহুদীদিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সত্য; কিন্তু বোধ হয় আদিমকালের প্রকৃত ইতিবৃত্তের অভাবে অনুমানের সাহায্যে অতীতের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গিয়া তাঁহারা বৃদ্ধবয়সের বিজ্ঞতা ও তপস্বীভাব প্রাচীনকালের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, আসিরিয়া, গ্রীস, ইতালী, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ আপন আপন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণের ইতিবৃত্তও এই প্রকার। অদ্যাপি পৃথিবীতে এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এখনও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রব্যবহার করে, যাহারা এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে পারে নাই, এবং যাহারা এখনও বিবাহ বন্ধন জানে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা দেখাইতেছে যে মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র, পরে তাম্র, পিত্তল বা কাংস্য নির্ম্মিত অস্ত্র, এবং পরিশেষে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্যাও ক্রমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল শব্দ এক্ষণে উন্নত মানসিক ভাববোধক, সে সকল আদৌ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবাচক ছিল। এইরূপে চারিদিকে উন্নতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষকে সকল জ্ঞানের

মূল বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে একটি মঙ্গলকর তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে মানবসমাজের কতকালের পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং কত আস্তে আস্তে মনুষ্যের উন্নতি হইয়াছে। সত্য বটে, সময়বিশেষ বা দেশবিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কোন কোনস্থলে অবনতি দেখিতে পাই; কিন্তু কিঞ্চিদধিককাল ব্যবধানে সমগ্র মানবজাতির প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিলে উন্নতিই দৃষ্টি হয়। জাতিবিশেষের উদয়াস্ত আছে, কিন্তু একজাতির হস্ত হইতে অপরজাতি উন্নতিনিশান গ্রহণ করিয়া নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীননেতা ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্যভূখণ্ডের প্রাচীননেতা মিসর। মিসরের হস্ত হইতে পশ্চিমের নেতৃত্বভাব ক্রমে ক্রমে ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোমের হাতে যায়। পরে আরবেরা ইউরোপ ও ভারতবর্ষ উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া পূর্ব্বপশ্চিম উভয় খণ্ডের নেতা হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগণ এক্ষণে আরবদিগের পদে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন সমুদয় জাতি অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সমাজনীতি-সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পণ্ডিতগণের মতগুলি প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে; কিন্তু এই মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদিগের যে কতকাল লাগিবে বলা যায় না। এই কারণেই বলি যে সভ্যতার চরমসীমা হইতে তাঁহারা অদ্যাপি অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

রা, কৃ।
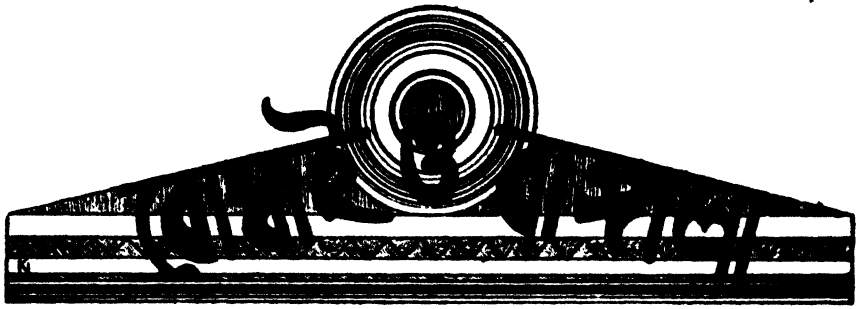
প্রথম প্রস্তাব

আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এই এক রোগ আছে যে, তাঁহারা স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাব এবং বাল্যকালাবধি ইংরেজী চর্চ্চা এই প্রকার মানসিক অবস্থার প্রধান কারণ। যখন ইংলণ্ডীয় সৈন্যদ্বারা, স্পেনদেশীয় যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হইবার সংবাদ আসিল, তখন মহারাণী এলিজেবেথ হংসমাংস ভোজন করিতেছিলেন; এই ঘটনাটিকে অতি গুরুতর জ্ঞান করিয়া যাঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন, তাঁহারা হয় ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধাধিকারের বিষয় কিছুই জানেন না; কেন্ না মার্শম্যান সাহেব তদ্বিষয়ে অধিক কিছুই বলেন নাই। জানেন না কেবল তাহা নহে, জানিবার লালসাও অল্প। মনুষ্য আশৈশব যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, তাহার প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ সেই দিকে অধিক ধাবিত হয়।

পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যেমন, দেশের অন্যান্য বিবরণ সম্বন্ধেও সেইরূপ। ইংলণ্ডের প্রত্যেক কাউণ্টির লোকসংখ্যা পর্য্যন্ত যাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন, তাঁহারা হয় ত বোম্বাই, মান্দ্রাজ কিম্বা পঞ্জাবের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একবার দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে এক বাঙ্গালি সংবাদপত্র-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিবে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে বঙ্গদেশ কতটুকু স্থান তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকুর বাহিরে দুর্গোৎসব কোথাও নাই, অথচ সম্পাদক মহাশয় অক্লেশে লিখিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ উৎসবে উন্মত্ত হইবে!

বোম্বাই প্রদেশ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী অদ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে বোম্বাই সম্বন্ধীয় সকল কথা, এমন কি অতি প্রয়োজনীয় কথা সকলেরও স্থান সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইলে দুই একটী গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

বোম্বাই নগর অতি মনোহর স্থানে সংস্থিত। কলিকাতা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত ভ্রমণ কর, বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না।

তাহার কারণ এই যে, পর্ব্বত, সমভূমি ও সমুদ্র তথায় এই তিনই বর্ত্তমান, তিন প্রকার সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ হইয়া সাতিশয় রমণীয় ও তৃপ্তিকর হইয়াছে। একদিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তরে গণনাতীত নারিকেলাদি তরুকুল অরণ্যাকারে হরিদ্বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতেছে, অন্যদিকে মলবার পর্ব্বতশ্রেণী সমুন্নতমস্তকে মূর্ত্তিমান্ গাম্ভীর্য্য-রূপে দণ্ডায়মান; আবার তরঙ্গসঙ্কুল সুনীল সমুদ্র, রবিকিরণে সমুজ্জলিত হইয়া, হিরকখচিত অসীম প্রসারিত মখমলের ন্যায় শোভমান হইতেছে।

কলিকাতার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে, বোম্বাই ভিন্ন সমগ্র ভারতবর্ষে এমন নগর বোধ হয় আর নাই। কাহার মতে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ, কাহার মতে কলিকাতা; আমাদের পক্ষ হইতে ঐ প্রকার কোন মত না দিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উভয় নগরের তুলনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক শোভা সম্বন্ধে বোম্বাই অতি মনোহর স্থান। প্রশস্ত নদীতীরবর্ত্তিতা প্রযুক্ত কলিকাতায় প্রাকৃতিক শোভার অসদ্ভাব নাই। তথাচ সে সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের নিকট কলিকাতা দাঁড়াইতেও পারে না। জলবায়ুর স্বাস্থ্যকারিতার বিষয় বিচার করিলেও কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতর স্থান। এমন কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল স্থান না হউক, অনেক স্থান স্বাস্থ্যকারিতা সম্বন্ধে বোম্বাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট! সুনির্ম্মল সমুদ্রবায়ু, বোধ হয়, এই স্বাস্থ্যকারিতার প্রধান কারণ।

আর একটি বিষয়ে বোম্বাই নগর কলিকাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মিউনিসিপালিটির অনুগ্রহে কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী সকলের এমনি ভয়ঙ্কর অবস্থা যে, অনেক স্থানে বিলক্ষণ রূপে নাসারন্ধ্রে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া না দিলে, অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।* সহরের দক্ষিণাংশে যেখানে আমাদের বিজেতা মহাপুরুষেরা বাস করেন, সে স্থান সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না। উত্তরাংশের কথা বলা হইতেছে। দক্ষিণ ও উত্তরাংশের তুলনা করিলে "ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ" এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যের সার্থকতা অনুভব করা যায়। বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন নগর। আর একটি বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই নগরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়; কলিকাতার ন্যায় তথায় সঙ্কীর্ণ গলি নাই। বোম্বাই নগরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে কলিকাতার চৌরঙ্গির ন্যায় স্বতন্ত্র ইংরেজপল্লী নাই। দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল অধিবাসিগণ নগরের সর্ব্বত্র একত্রে বাস করিতেছেন। সুতরাং মিউনিসিপালিটি সহরের সকল ভাগেই দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হয়। ইংরেজেরা যে কলিকাতাকে "প্রাসাদময়ী নগরী" বলেন, সে কথা যথার্থই বটে। বারাণসী বল, দিল্লী বল, আর

---

* এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, কলিকাতা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। তথাচ এখনও নগরের অনেক স্থানে দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী সকল বর্ত্তমান।

লাহোর বল, কলিকাতার ন্যায় এমন সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণী আর কোথায় দেখিতে পাইবে না। বোম্বাই নগরে ভাল ভাল বাড়ী আছে বটে, কিন্তু কলিকাতার সঙ্গে তুলনায় বোম্বাইকে নিশ্চয়ই হারি মানিতে হয়। বোম্বাইয়ের অট্টালিকা সকল বড় বড়; কিন্তু কলিকাতার ন্যায় এত সুন্দর নয়।

বোম্বাই নগরে মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী পার্সি প্রভৃতি অনেক জাতি বাস করে। মহারাষ্ট্রীয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক বোম্বাই মহারাষ্ট্রীয়েরই দেশ।

বোম্বাই গমন করিলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। মনে হয় যে, শৈশবকালে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে বর্গির কথা শুনিয়া ভীত হইতাম আজ সেই বর্গির দেশে আসিয়াছি! "বর্গি এল দেশে"র পরিবর্ত্তে, "এলাম বর্গির দেশে" মনে হইতে থাকে। কেবল তাহাদের দেশে আসিয়াছি এমন নয়, তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতেছি, তাহাদের সহিত বন্ধুতা-সূত্রে বদ্ধ হইতেছি। কেবল তাহাই নহে। যে বর্গির হাঙ্গামায় ভীরু বঙ্গবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যাহাদের উপদ্রবে তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইত, হাঁড়ি মাথায় করিয়া পুষ্করিণীর জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া থাকিতে হইত, যাহাদের অত্যাচার নিবারণে অক্ষম হইয়া বাঙ্গালার নবাব স্বীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ করস্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ সেই বর্গিদিগের দেশে আসিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কথা বলিতেছি। কেবল তাহাই নহে, আবার সেই বর্গিদিগের দেশে একজন আমাদের বাঙ্গালি আসিয়া "জজ সাহেব" হইয়াছেন।

উপরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা বলিয়াছি। পাঠকবর্গ তদ্বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী হইতে পারেন। সুতরাং একটি নিমন্ত্রণের কথা বলিতেছি। যাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাঁহার দ্বারদেশে পৌঁছিয়া দেখি যে, আমাদের এখানে লক্ষ্মীপূজার সময় যেমন আলিম্পন দেওয়া হইয়া থাকে সেইরূপ আলিপনা রহিয়াছে। কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে বসা হইল। আমাদের এখানকার ন্যায় তথায় অন্তঃপুর ও বহির্বাটী আছে। নিমন্ত্রিতদিগের সন্তোষসাধন জন্য একজন মহারাষ্ট্রীয় তম্বুরা সহকারে তদ্দেশীয় ভাষায় কতকগুলি গান শুনাইলেন। তাম্বুলচর্ব্বণ ও ধূমপান চলিতে লাগিল। এ সকলই আমাদের ন্যায়। মনে হইতে লাগিল যেন বাঙ্গালির গৃহে নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। ক্রমে গাত্রোত্থান করিবার অনুরোধ হইল। আমরা অন্তঃপুরে চলিলাম। গিয়া দেখি যে, আহারের স্থানটী নানাবর্ণের গুঁড়া দ্বারা অতি সুন্দররূপে চিত্র বিচিত্র করা হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে, স্ত্রীলোকেরা আমাদের সম্মানের জন্য উহা করিয়াছেন। দ্বারদেশে আলিপনারও সেই অর্থ। ভোজনে

কলা হইল। পাঠকবর্গ শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে, একখানা প্রকাণ্ড, অখণ্ড কদলীপত্র সম্মুখের দিকে লম্বা করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে অন্ন ও লুচি এবং প্রায় ২০।২৫ প্রকার ব্যঞ্জন সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যঞ্জন এত দূরে দূরে যে আনিতে লোক পাঠাইতে হয়! আমাদের যেমন ভাত, সেইরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান খাদ্য রুটি। সকলেই জানেন যে, আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় বাঙ্গালিগণ অতি ভয়ানকরূপে লঙ্কা খাইয়া থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় বঙ্গবাসিগণ সে বিষয়ে তাঁহাদের কাছে চিরকালই পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পিতারও পিতা আছেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজবাসিগণের নিকট আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভ্রাতৃগণকেও হার মানিতে হয়। পুণার বাজারে ভ্রমণ করিবার সময় সেখানে অতি প্রকাণ্ড স্তূপাকার রাশি রাশি লঙ্কা দেখিলাম। জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন যে, সেইরূপ সাতটি স্তূপাকার লঙ্কা হইলে এক গৃহস্থের সম্বৎসর চলে! আমাদের আহারের বিষয়েও লঙ্কার ব্যাপারটা অতি ভয়ানক হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয়ও ভোজন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই একটী রীতি আছে যে, সুতার কাপড় ছাড়িয়া পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আহার করিতে হয়। আর একটি অতি সুন্দর প্রথা আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বাটীর গৃহিণীর অভ্যর্থনা করা আবশ্যক। হস্ত ধারণ অথবা মিষ্টালাপ দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে এরূপ নহে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলে, গৃহিণী আসিয়া কোন একটি ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেই অভ্যর্থনা হইল। সেরূপ অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আপনাকে যারপরনাই অপমানিত মনে করেন। জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণকালে যে যে ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন তথায় উক্ত প্রকার অভ্যর্থনা বিষয়ে ত্রুটি দেখিয়া, (যত দিন না তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল) আপনাকে অতিশয় অপমানিত মনে করিতেন। আমাদিগকেও উক্ত রীত্যনুসারে গৃহিণী আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে যে সকল পদার্থ দেখিয়া চমৎকৃত ও আমোদিত হইতে হয়, তন্মধ্যে শিরস্ত্রাণ একটি প্রধান।

পার্সিরা যে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা এদেশীয় অনেকেই দেখিয়াছেন। উহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিলাতি হ্যাটের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উহা আদৌ পার্সিদিগের নহে, গুজরাটি বণিক্‌দিগের উষ্ণীষ; পার্সিরা তাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। কেবল শিরস্ত্রাণ কেন, পার্সিরা গুজরাটি ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত গুজরাটি ও পার্সি উষ্ণীষে বিশেষ কিছু চমৎকারিত্ব নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উষ্ণীষই বাস্তবিক অদ্ভুত পদার্থ। এ প্রকার প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, বোধ হয়, পৃথিবীতলে আর কোথাও নয়নগোচর হয় না। দেড়হস্ত পরিমিত

ব্যাসবিশিষ্ট উষ্ণীষ দ্বারা কেহ কেহ উত্তমাঙ্গের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন! কিন্তু কেবল শোভার জন্যই যে উক্তরূপ অদ্ভুত উষ্ণীষ ধারণ করা হয়, এমত নহে। উহা না করিলে মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। মর্য্যাদা রক্ষার দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকে ঐ বিষম ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষ কেবল উহার সুবৃহৎ আকারের জন্যই বর্ণনীয় এরূপ নহে। তদপেক্ষা অনেক গুণে উহার অধিকতর মাহাত্ম্য আছে। উহা জ্ঞানরত্নে মণ্ডিত! উহাতে ভূগোল ও পুরাবৃত্ত বর্ত্তমান। পরিহাস করিতেছি না, যথার্থ কথাই বলিতেছি। যাঁহারা উষ্ণীষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির উষ্ণীষ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে তিনি কোন্ প্রদেশের লোক। ইন্দোর, কি গোয়ালিয়র, কি পুণা কি অন্য যে কোন স্থানের লোক হউক না কেন, উষ্ণীষ দেখিলেই তাহার নিবাসস্থানের বিষয় জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই উষ্ণীষনিহিত ভূগোলবিদ্যা। আবার উষ্ণীষ দেখিয়া বলা যায় যে, কে কোন্ বংশ বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উষ্ণীষ পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় দিয়া দেয়। ইহাই উষ্ণীষের পুরাবৃত্ত। পাঠকবর্গকে ইহা বলা অনাবশ্যক যে, বিভিন্ন বংশগত বা বিভিন্ন স্থানবাসী ব্যক্তিবর্গের উষ্ণীষবন্ধনের প্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়াই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষ দেখিয়া যে কোন জাতীয় লোককে অবাক্ হইতে হয়। কোন প্রকার মস্তকাবরণবিহীন বাঙ্গালির পক্ষে অধিকতর চমৎকৃত হইবারই কথা। বাঙ্গালির ন্যায় সম্পূর্ণরূপে মস্তকাবরণশূন্য আর কোন সভ্যজাতি জগতে আছে কি না জানি না। শুনিয়াছি মহারাজা হোলকার একবার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় জাতি সকলের মধ্যে বাঙ্গালিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানালোকসম্পন্ন হইল কেন? এই জন্য যে তাহাদের মস্তকে কোন প্রকার আবরণ না থাকাতে আলোক সহজেই মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে।" এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই স্বীয় স্বীয় উষ্ণীষের কলেবর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করিয়া লইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির তরঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষে গিয়াও লাগিয়াছে।

পূর্ব্বে একস্থলে অন্তঃপুর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহাতে পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, বোম্বাই প্রদেশে বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় অবরোধ-প্রণালী বর্ত্তমান। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত নাই। বিন্ধ্যাচল অবরোধপ্রথার সীমা। বোম্বাই নগরের রাজবর্ত্মে অতি সদ্বংশজাত মহিলাগণও উন্মুক্ত শকটে বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথে গিয়া দেখ, ভদ্র-মহিলাকুল দলে দলে, পদব্রজে বা শকটে সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন।

বোম্বাই প্রদেশে প্রত্যেক ভদ্রগৃহস্থের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বহির্গত হইয়া যথা তথা গমন করিতে পারেন। ভদ্রযুবতীগণ পথ দিয়া চলিয়া যান, অনেক সময় সঙ্গে একজন লোকও থাকে না। অবগুণ্ঠন দিবার নিয়ম নাই। সধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় দেন না, বিধবারা দিয়া থাকেন ইহাই প্রচলিত প্রথা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইংরেজদিগের মধ্যে যে প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতা, বোম্বাই প্রদেশে ঠিক সেইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইংলণ্ডীয় রমণীগণের স্বাধীনতা এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের স্বাধীনতার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় নারীগণের ও ইংলণ্ডীয় নারীগণের স্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। বোম্বাই প্রদেশে কুলবধূগণ যদিও বিনা অবগুণ্ঠনে প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম দিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে গমন করিয়া থাকেন, তথাচ শ্বশুর বা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করেন না। ইংলণ্ডীয় যুবতীগণ যে প্রকার অসঙ্কুচিত ভাবে পুরুষদিগের সহিত আহ্লাদ আমোদ ও নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকেন বোম্বাই প্রদেশে সেরূপ কিছুই নাই। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও তাঁহাদের কথা কহিতে নিষেধ নাই, কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না হইলে তাঁহারা প্রায়ই কথা কহেন না।

পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বোম্বাই প্রদেশের রমণীগণের স্বাধীনতা, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা এই উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মন্দিরেও প্রায় সকল স্ত্রীলোকে যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করেন। কিন্তু বোম্বাই প্রার্থনাসমাজে স্ত্রীলোকদের যবনিকা ও অবগুণ্ঠণ কিছুই নাই। তবে তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হন না, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

এ স্থলে একটী অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আর্য্যাবর্ত্তে বহুকালাবধি যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে ইহার মূল কারণ কি? প্রাচীন ভারতবর্ষে যে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্র সকল যাঁহারা অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এ কথার যথার্থ্য পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবেন।

গ্রামেষ্বাত্মবিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু যজ্বনাম্।
অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তাবর্ঘ্যানুপদমাশিষঃ॥
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানিপৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥

রঘুবংশ, ১ম সর্গ।

কোন স্থানে যাজ্ঞিকেরা যূপচিহ্নিত তাঁহারই প্রদত্ত গ্রাম সমুদায় হইতে

আগমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলে, তাঁহারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া অমোঘ আশীর্ব্বাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। কোন স্থানে তাঁহারা ঘোষবৃদ্ধদিগকে সদ্যোজাতঘৃতহস্তে আসিতে দেখিয়া পথের পার্শ্বস্থ বন্যপাদপ দলের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে মহারাজা দিলীপ রাজ্ঞীর সহিত বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতেছেন ও তাঁহারা উভয়েই চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থনিচয় দেখিতেছেন ও সমাগত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতেছেন।

কবিগণ সাধারণের রুচিবিরুদ্ধ বর্ণনায় কখন প্রবৃত্ত হন না। রাজ্ঞীর সহিত উন্মুক্ত রথে রাজার গমন, এবং উভয়ে মিলিয়া রাজপথের লোকদিগের সহিত আলাপ দেশীয় প্রথা ও রুচিবিরুদ্ধ হইলে মহাকবি কালিদাস কখনই সে প্রকার বর্ণনা করিতেন না। কেবল রঘুবংশের ন্যায় কাব্য সকল কেন, বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুমহিলাগণকে অন্তঃপুরবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। তবে এই অবরোধ প্রথা কোথা হইতে আসিল? মুসলমানদিগের অত্যাচার বা দৃষ্টান্ত অথবা উভয়ই যে এই প্রথার মূল কারণ তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু সদ্বিদ্বান্ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে একথা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশেরই এই মত যে, মুসলমানেরাই উক্ত রীতির প্রকৃত কারণ। কিন্তু কেবল সুশিক্ষিত মুসলমান নহেন, সুশিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণের মধ্যেও এমন লোক আছেন যাঁহারা উক্ত কথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল কি না? যদি থাকে কি পরিমাণে ছিল? বর্ত্তমান অবরোধপ্রথা কোথা হইতে আসিল? যাঁহাদের মনে এই সকল ঐতিহাসিক প্রশ্নের আন্দোলন হইয়া থাকে, বোম্বাই প্রদেশ দর্শন করিলে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে সংশয় মোচন হইতে পারে। মুসলমানেরা যে বাস্তবিকই অবরোধপ্রথার কারণ, দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত থাকাতে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের প্রতাপ ও আধিপত্য যতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে কখনই সে প্রকার হয় নাই। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইতে পারে নাই। আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই, কিন্তু তত্রত্য মুসলমানদিগের মধ্যে উহা বিলক্ষণ আছে। ইহার কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে আদৌ উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল না, মুসলমানেরা উহা সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না?

স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয় বলিতে গেলে, স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদের কথা সহজেই আসে। আমাদের বঙ্গবাসিনী মহিলাগণ যেরূপ সূক্ষ্ম ও অসম্পূর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া

থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ভদ্রসমাজে বাহির না হওয়াই ভাল। হিন্দুস্থানী ঘাঘ্‌রা ও ওড়না এ দেশের সূক্ষ্ম শাড়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর ও ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ। বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ কিরূপ তাহা পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা ঘাঘ্‌রা বা ওড়না ব্যবহার করেন না, শাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তাঁহাদের পরিচ্ছদ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়, এমন নহে। আমাদের স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদে শোভাসম্পাদন হয় সত্য, কিন্তু বস্ত্রপরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ তদ্বিষয়েই ত্রুটি হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন তাহাতে পরিচ্ছদধারণের প্রধান উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ এবং আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য যে শোভাসম্পাদন এ উভয়ই সম্পাদিত হয়। বোম্বাই শাড়ী আমাদের "শান্তিপুরে" ও "ঢাকাই" অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট পদার্থ। বোম্বাই শাড়ী রেশমে নির্ম্মিত ও দেখিতে অতি সুন্দর। সেখানকার ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকেরা তুলার কাপড় পরিধান করিয়া কখনই বাটীর বাহির হন না। হয় উক্তরূপ বোম্বাই শাড়ী নতুবা অন্য কোন প্রকার পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রকাশ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। বস্ত্র পরিধান করিবার নিয়মও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের হইতে স্বতন্ত্র প্রকার। ১৫।১৬ হস্ত দীর্ঘ শাড়ী কুঞ্চিত করিয়া বেড় দিয়া পরিধান করেন ও কাছা দিয়া থাকেন। কাছা দিবার কথা শুনিয়া আমাদের পাঠিকা ভগিনীগণ, বোধ হয়, কিঞ্চিৎ ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া একটু ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের রীতি অপেক্ষা কাছা দেওয়া যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রপরিধানপ্রণালীর একটী বিশেষ দোষ এই যে, উহার বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। কাছা দিলে বস্ত্র শরীরের উপর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকেই বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বোম্বাই, বঙ্গদেশকে পরাস্ত করিয়াছে। বোম্বাই গিয়া সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিলাম, তাহাতে উক্ত বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। কোন স্থানের সাধারণ শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার স্থির করিতে হইলে, দুটি বিষয় অনুসন্ধান করিতে হয়;—শিক্ষার বিস্তৃতি ও গভীরতা। বিস্তৃতি-সম্বন্ধে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। তথায় কোন কোন বালিকাবিদ্যালয়ে ২৫০। ৩০০ বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। আমাদের এখানে অন্যান্য বালিকাবিদ্যালয়ের ত কথাই নাই, বিডন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বোধ হয় ৮০।৯০ জনের অধিক হইবে না। অল্পবয়স্কা বালিকাগণের বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিয়া বিচার করিলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বোম্বাইকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশে

অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা যে কতদূর প্রবেশ করিয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার উপায় নাই। এমন দেখা যায় যে, অতি সামান্য পল্লীগ্রামের ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতিসম্বন্ধে বোম্বাই ও বাঙ্গালার অবস্থা তুলনা করিয়া অসংশয়িতচিত্তে নিশ্চয়রূপে কোন কথা বলা যায় না। নিশ্চয়রূপে বলা যায় না সত্য, কিন্তু অনুমানে বোম্বাইকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়!

শিক্ষার গভীরতার বিষয়ে কোন ক্রমেই বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যায় না। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য বোম্বাই নগরে যে বিদ্যালয় আছে, তাহার নাম "আলেকজান্দ্রা স্কুল।" উক্ত বিদ্যালয়ে বালিকা ও যুবতী উভয় লইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। প্রথম শ্রেণীতে যে পুস্তক পাঠ হইতেছে তাহা চতুর্থ ভাগ ইংরেজী রিডারের সমান হইবে। সুতরাং শিক্ষার পরিমাণসম্বন্ধে "আলেকজান্দ্রা স্কুল" যে আমাদের কলিকাতাস্থ বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কলিকাতার "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" ও "দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নর্ম্যাল স্কুল" (Native ladies' normal school) এই উভয় বিদ্যালয়েই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় সকল পাঠ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কোন কোন বুদ্ধিমতী রমণী কোন স্ত্রী-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও এতদূর উন্নতি করিয়া থাকেন যে, দেখিলে যারপরনাই আনন্দ হয়। দিবাভাগে সাংসারিক কাযকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার পর স্বামীর নিকট গোপনে অতি মৃদুস্বরে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এমন সুন্দর গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে পারেন যে, দেখিলে যথার্থই অত্যন্ত প্রীত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়। "ভুবনমোহিনী" প্রতিভার কথা এখন কিছু বলিব না। উক্ত পুস্তক ছাড়া স্ত্রীলোকের লিখিত এমন পুস্তকও দুই একখানি প্রকাশিত হইয়াছে যাহা কোন ইউরোপীয় মহিলা লিখিলেও তাঁহার পক্ষে প্রশংসার বিষয় হয়। "দীপ-নির্ব্বাণ" একখানি সেইরূপ গ্রন্থ। দুই একজন শিক্ষিতা রমণী যেরূপ সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়াছেন, এবং জনৈক বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান্ মহিলা যে প্রকার ইংরেজী ভাষায় মধ্যে মধ্যে কবিতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন, আমি যতদূর জানি বোম্বাই প্রদেশে এ পর্য্যন্ত সে প্রকার কিছুই হয় নাই। সুতরাং শিক্ষার গভীরতা সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশ যে, বঙ্গদেশকে পরাস্ত করিয়াছে এ বাক্যে কোন ক্রমেই সায় দিতে পারিতেছি না। বোম্বাই নগরের "আলেকজান্দ্রা স্কুলের" একটি বিষয় দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। উক্ত বিদ্যালয়ে একজনও হিন্দুছাত্রী নাই; সকল গুলিই পার্সি।

ন, না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়ন পথে পরিভ্রমণ করিতেছে—একদিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর একদিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। একদিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল হস্তপ্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর একদিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল,—"আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যে যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?"

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন। বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা ?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন, "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে—আমার প্রাণ গেল! রোহিণীর পাপরূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখন কি থাকি না?

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া,আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন ?

গো। তুমি এখন বালিকা ; সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব ?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না ভ্রমর।

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও। আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে ? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন, তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ড পড়িল তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমিদারীর কিরূপ অবস্থা তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন। তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাপ হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ।

আপাতত বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল, তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শ্বাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশদিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এদিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাস খেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে, ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত—ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময়ে ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল—আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে। শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি। বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যার জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা একদিনের জন্য ভাবেন? তুমি মরতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছে থেকে উঠিয়া যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখে চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচিনা। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সেদিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে, চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না, কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর, ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই করগে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি, যে আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

তখন সকাল বেলা, উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া, ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এদিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!"

তার মনের ভিতর যে মন, যে মন হৃদয়ের লুক্কায়িত স্থান কেহ কখন দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিল স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিল, যে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে। হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

এক ছড়া মালা গাঁথিতে বড়ই সাধ হলো। সূর্য্যমুখী এতক্ষণ মুখ তুলিয়া আকাশপানে চাহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইল দেখিয়া আস্তে আস্তে মস্তক অনবত করিল; আমিও মালা গাঁথিবার জন্য একগাছি সূতা লইয়া বাগানের দিকে চলিলাম। মুক্ত দ্বার দিয়া কাননে প্রবেশ করিলাম। এই কানন ভ্রমণে কাহারও নিষেধ নাই; সাধারণ সকলের জন্যই বাগানটি প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ধ্যাব মন্দ সমীরণে উদ্যানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের পাতাগুলি অল্পে অল্পে দুলিতে লাগিল আর কেমন এক প্রকার চিত্তসন্তোষজনক শব্দ হইতে লাগিল। বহির্জ্জগতের সহিত আমাদের অন্তরাত্মার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সমীরণভরে দোদুল্যমান বৃক্ষপত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও দুলিতে লাগিল; ঝিল্লিগণের ঝিঁ ঝিঁ রব বড় মধুর বোধ হইল, আর সেই সঙ্গে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আমি যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন কোন দ্রব্য হারাইয়াছি কিন্তু কি যে সে দ্রব্য তাহা স্মরণ করিতে পারিলাম না। অনেক প্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম কিংশুকে যদি গন্ধ থাকিত, সুপক্ক ফল যদি না পচিত, বিদ্যুতের আলোক যদি নয়নস্নিগ্ধকর হইত, আর আমার যদি এই সকল পুষ্পের ন্যায় ভুবনমোহিনী শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় দেখি কতকগুলি ফুল শুকাইয়া ভূপতিত হইল। পতনকালীন সরসর শব্দে যেন বলিতে লাগিল—'memento horœ novissimœ.' এই উপদেশ বাক্য আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার শেষের দিন স্মরণ করিলাম; তখন বুঝিলাম যে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আজি হউক দুদিন পরে হউক, ঐ বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। না না—পুষ্পের সহিত আমার তুলনা কোথায়? পতনকালে ফুলটি যেন হাসিতেছিল, যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে, সদ্গন্ধ দানে কত লোকের চিত্তসন্তোষ করিয়াছে, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া ধ্বংস হইল, এ ধ্বংসে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি—আমি সদ্গন্ধ বিতরণে কয়জনের চিত্তসন্তোষ করিয়াছি, কাহার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছি?

কাহারও নয়। তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম? যখন আমার এই জীবনবুদ্বুদ কালস্রোতে মিশাইবে তখন কি হাসিতে পাইব না? যাহা হউক আর ভাবিব না, মিছা ভাবনায় সব ভুলিয়া গিয়াছি। হাতের সূতা হাতে রহিয়াছে; মালা ত গাঁথা হয় নাই।

মালার জন্য ফুল তুলিতে চলিলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি ফুল ফুটিয়াছে, আর কতকগুলি ঈষৎ হেলিয়া ঢুলিয়া ফোটে ফোটে হইতেছে। মল্লিকা সুন্দরী দেখিল যে, ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর লজ্জা কেন? এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন মোচন করিল—আপনার গন্ধে আপনি ঢলিয়া পড়িল। ঐ ঢলেপড়া ভাব আমি বড় ভালবাসি। নিজের গুণ মনে মনে জেনে যে নম্রভাব ধরে, তারে বড় ভালবাসি। মল্লিকে! ক্ষুদ্র বৃক্ষে তোমার জন্ম—ঐ বিদেশী অরোকেরিয়া, উহার পাতার ন্যায় তোমার পাতার সৌন্দর্য্য নাই; সুন্দর পলাশের ন্যায় বর্ণও নাই, কিন্তু তবু আমি তোমারে বড় ভালবাসি—তোমার ঐ সৎগন্ধ আর ঐ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগিয়াছে। কখন জানি না, কিন্তু শুনিতে পাই সরল মনের সহিত সরল মনের বিনিময় সহজেই হয়;—আমার নিজের মন আমি চিনিতে পারিলাম না—জানি না সরল কি গরলময়—কিন্তু বোধ হয় তোমার উপর যেরূপ সাদা, অন্তরও সেইরূপ, নহিলে তোমার ঐ ঢলে পড়া ভাব থাকিত না। তুমি গর্ব্বিতা হলে তোমার সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার নিকট এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম না; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তুমি সেরূপ নও সেই জন্যই তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি, মল্লিকে, আজি আমার কৌতূহল নিবারণ করিতে হইবে।

মল্লিকে বল দেখি জগজ্জনমনোহর ঐ সৎগন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ? ঐ গন্ধে বিভোর হইয়া মানবগণ নন্দন কাননের সুখ এই ভূমণ্ডলে ভোগ করিবে এই জন্যই কি তুমি তোমার গন্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছ? কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? যথার্থ স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া পরের সুখবর্দ্ধন করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?

মনে ভাবিলাম, মধুর হাসি হাসিয়া মল্লিকা বলিল—তোমার ন্যায় সরল লোকেই আমার উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপর জ্ঞান করে। গন্ধবিতরণে আমার নিজের লাভ কি? তবে বলি শুন—এ সংসারে তুমি একা—সংসারবন্ধনে বদ্ধ না হয়ে উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ন্যায় কামিনীগণের মনের ভাব তোমায় কিরূপে বুঝাইব? আমরা চাই—জগৎশুদ্ধ সকলে আমাদের ভালবাসিবে, মানবগণ নিজ নিজ হৃদয়কাননে আমাদের যত্নসহকারে রোপণ করিবে, তাহাদের জলসেচনে পরিবর্দ্ধিত হইব; এখন বল দেখি আমার ঐ গন্ধটুকু না থাকিলে কে

আমায় আদর করিত, কে আমায় ভালবাসিত? ঐ অপরাজিতা সুন্দরী ভুবন-মোহিনী নীলিমায় অঙ্গ সাজাইয়া কানন শোভা করিতেছে, স্বীকার করি উহারও আদর আছে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য—শুকাইলে উহাকে আর কে ভালবাসে? কিন্তু আমি শুকাইয়া যাই আর যাহাই হই না কেন, যতক্ষণ গন্ধ থাকে ততক্ষণ সমান আদর পাই—এইটি যখন মনে হয় তখন আমার কত আমোদ, নিজের গন্ধে নিজে যখন মুগ্ধ হই, তখন আমার কত সুখ তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে। সকলে, ভালবাসিবে—ঐ সুখের আশা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি আমি এরূপ গন্ধবিতরণ করিতাম? আপনার গর্ব্ব আপনার মনে আপনি বলিয়া যদি মন না উছলিত তবে কি নিজ শরীরে ঐ গন্ধ ধরিতাম? বোধ হয়—না। আমার অভিপ্রায় স্বার্থপর বোধে ঘৃণা করিও না। স্বার্থশূন্য এ জগতে কেহই নাই।

স্বার্থশূন্য কি কেহই নাই—হতেও পারে। গ্রামের মধ্যে বড় লোক—বড় পরোপকারী শশীবাবু অতিথিশালা করেছেন, প্রতিদিন কত অতিথি প্রতিপালন করিতেছেন—কেন? নিজে প্রশংসা পাবেন বলে, আর নিজের মনের সুখসাধনের জন্য। এই যে পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অন্নের গ্রাসটি আদর করিয়া মুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু মুখের কি উদরের উপকারের জন্য নয়। যদি অন্যরূপে হাতের পুষ্টিসাধন হইতে পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণহস্তের সহিত সুচিকণ দন্তাবলীপরিবেষ্টিত মুখের প্রণয় থাকিত কি না বলিতে পারি না।

যেখানে যাই সেইখানে দেখি সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত; আমিও নিজের তুষ্টিসাধনের জন্য মালাটি গাঁথিয়া শেষ করিলাম। মালাটি নিজে পরিয়া নিজের অঙ্গের শোভা বাড়াইব স্থির করিলাম। এমন সময় দেখি রামধন ঘোষাল—শশীবাবুর একটী পারিষদ—ব্লু ভেলভেটে অঙ্গ সাজাইয়া বাগানের দিকে আসিতেছেন। সংসারকাননে ইনি একটী অপরাজিতা। উভয়েই গন্ধহীন। অপরাজিতা সূর্য্যরশ্মি থেকে ৭টি রং লইয়া কেবল নীল রংটি বাহিরে প্রকাশ করে, ঘোষাল মহাশয়ও শশীবাবুর কিরণ থেকে অন্ন বস্ত্র আভরণ এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ* এই সাতটি রং লইয়া কেবল ব্লু বসনের আভা বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন। রামধন ঘোষালকে দেখিলেই আমার মনে মনে কেমন একরকম ঘৃণার উদয় হয়, কেন তা জানি না—যাহারে ভালবাসি তার সব ভাল, কিন্তু যাহারে দেখিতে পারি না তার সকল কাজই ঘৃণাজনক, কারণ তাহার কাজগুলি নিজের মনোমত নয় বলিয়াই তাহারে আমরা ভালবাসি না। রামধন বাবুর অঙ্গসজ্জা আমার চক্ষে বিষতুল্য, আজি তাঁহাকে

* শেষোক্ত ৪টি রং শশীবাবুর কিরণে আছে কি না বিজ্ঞান বলে এখনও তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। পারিষদগণ শশীবাবুকে দেবতার ন্যায় স্তব করে দেখিয়া ও কয়টি অনুমান করিয়া লইলাম।

দেখে আমার অঙ্গ সাজাবার বাসনা দূর হয়ে গেল। আমার মালা পরা সাধ একেবারে ঘুচে গেল। নিজের অঙ্গ সাজাইয়া পরের মন হরণ করিতে আর বাসনা রহিল না। এখন ভাবিলাম—নিজের নয়নের তৃপ্তিসাধনার্থে পরের অঙ্গ সাজাইব, হাতের মালা পরের গলে দিয়া নয়ন ভরিয়া তাহার শোভা দেখিব—মনে মনে বড়ই বাসনা হলো। কিন্তু হরি হরি—এ মালা কার গলে পরাইব, এ মালা গলে পরিলে কার শোভা বাড়িবে? অন্ধকারে বসিয়া মোটা সূতায়, কি ফুল তুলিতে কি ফুল তুলিয়া যে মালা গাঁথিলাম, এ মালায় ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে না। তবে পরের গলে মালা দিয়া কি লাভ হইবে? আর পরেই বা আদর করিয়া আমার এ মালা কেন পরিবে? আদর—আদর কথাটি বড় মিষ্ট; আমি আদর বড় ভালবাসি। যে আদরে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মায়ের গলা জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে, স্বামীর যে আদরে প্রণয়িনীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় আর মুখে মধুর হাসি দেখা দেয়, বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে যে আদর মাখান তিরস্কার করিয়া থাকে, সেই আদর-ভরা হাতে কে আমার হাত হইতে মালাটি লইবে? সেই আদর মাখা বচনে কে আমায় বলিবে, ও ফুলটির বদলে আর একটি ফুল বসাও, ও ফুলটি ছিঁড়িয়া ফেল, এই স্থানটী বেশ হইয়াছে, ওখানটি ভাল হয় নাই, কে ঐরূপ আদর করিয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবে? আমার মালাকে আদর করে এমন কি কেহই নাই? থাকিতেও পারে। যখন তেমন লোক পাইব, তখন তাহাকে মনের মত মালা গাঁথিয়া পরাইব—এখন, এই সূত্রনিবদ্ধ কাননকুসুমনিচয়কে মাতা বসুমতীকে সমর্পণ করিব। ফুলগুলি খুলিয়া মাটীতে ছড়াইলাম।—

কৃ—

(অবতারণা)

অশোক রাজার সময়ে—মৌর্য্যবংশের অধিকার কালে—মগধ সাম্রাজ্যের উন্নতির মুখে—খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়—যখন বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিত্র, বাদরায়ণ প্রভৃতি বেদপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম ঢাকিয়া ফেলে—যখন ব্রাহ্মণগণও আমাদের সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে ঐ অল্পসংখ্যক হীনবল, বীর্য্যহীন, বিচার-পরাজিত ব্রাহ্মণ-গণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন—আবার তাঁহাদিগেরই গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত হইবে। বোধ হয় কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই; সকলেই ভাবিয়াছিলেন আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরেই হউক, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি শক্তি ছিল। যে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোকের মার নাই সেই শক্তি ছিল; যে শক্তিবলে ইহুদিরা আজিও ইহুদি আছে—গৈবীরেরা আজিও গৈবীর আছে—সেই শক্তি ছিল। যদি পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত হইত না। সে শক্তিটী স্বশ্রেণীহিতৈষিতা। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা (patriotism) বলিয়া একটি শক্তি জন্মিতেছে—তেমনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-জাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) ঐক্য এবং ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য একটি প্রবৃত্তি ছিল। স্বীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহঙ্কার, ব্রাহ্মণমাত্রেরই চিরকালই আছে। এই কয়টি শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। এই শক্তি ছিল বলিয়াই দুর্দ্দমনীয় মুসলমানের অসির আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে আমরা যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহাতে

বৌদ্ধের সহিত সংগ্রামে বহুশতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কি উপায়ে জয়লাভ করিয়াছেন তাহাই দেখান যাইবে।

(ধর্ম্মপ্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়বলী)

আমাদের গৌরবের প্রথম সময়ে—গভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে—যখন উচ্চদরের দার্শনিক মত সকল চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেবের অমানুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণিহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার অনুগামী হয়—তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উহাদের উন্নতির কারণ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানতঃ তিন দলে বিভক্ত ছিল। একদল মঠে থাকিত উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষাদ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত—এবং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ধ্যান ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হত, বোধিসত্ত্ব নাম হইত। উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোন মত বিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখান হইতেই তাহার মীমাংসা হইত। বড় বড় রাজারা ধর্ম্মমত মীমাংসা করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন। দ্বিতীয় দল বিষয়ী লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। তাহারা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ইহাদের নাম শ্রাবক। একজন শ্রাবক শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "যাহারা শুনে; কিন্তু বাস্তবিক শ্রুধাতু ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রাবক পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহারা শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা বলে, ও যাহারা শুনায় তাহারাই শ্রাবক।* এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি করিত না। তৃতীয় দল বিষয়ী লোক। ইহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বৌদ্ধদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ম্ম করে। তাহাদের চেষ্টা এই যে লোকে চিন্তা করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য, নির্ব্বাণের জন্য, চেষ্টা করুক—কিন্তু তাহা হইলে জগৎ চলে না। অতএব কতক লোক সংসার লইয়া থাকুক, তাহারা শুনিয়া যেটুকু ধর্ম্মশিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্য্যন্ত; সুতরাং তাহারা ইতর সাধারণের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আয়ত্ত করিয়াছিল। দেখ উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারকদিগের উপর তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকিত; ধর্ম্মোন্নতির জন্য এই দুই দলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্ম প্রচার হইয়া পড়িল। বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদিগকেও ধর্ম্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ তাহারা বৈদিক ক্রিয়াশক্ত; স্ত্রী ও শূদ্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়াতে একেবারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণও বড়

* কনিংহাম যেরূপ বলেন যদি শ্রাবকেরা সেইরূপই ছিল, যদি তাহারা কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বুদ্ধদিগের সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারাই মঙ্ক যদি বা মোহন্ত হইল, তবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকলেই কি মোহন্ত ছিল? তবে অশোক রাজা বৌদ্ধ হইলেন কিরূপে?

একটা যাগযজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।

(ব্রাহ্মণদিগের উপায়)

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে সেই ধর্ম্মেরই গর্ব্ব অধিক। একে বৌদ্ধ ধর্ম্মরাজার ধর্ম্ম, তাহাতে ধর্ম্মপ্রচার জন্য লোক নিযুক্ত, তাহার উপর আবার বৌদ্ধগণ যে কেবল ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক এমন নহে—যে কোন জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে* সুতরাং অনেক লোক ঐ ধর্ম্মে আসিয়া পড়িল। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান ; ব্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন ; তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; যেখানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই—সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ; অনার্য্যদিগের দেবতা আপন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবতা উপাসনা বলিলে প্রায়ই পৌত্তলিকতা বুঝাইত না। জৈমিনী বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন যে তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোন জীব পদার্থ নাই ; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার ব্রাহ্মণেরা কার্য্যগতিকে সাকার উপাসক হইলেন, তাঁহাদের মত হইল "সাধকানাংহিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্ম বুঝিতে পারে না ; অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা আবশ্যক।

(অন্ত্যজ বর্ণ)

অনার্য্যগণ যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই—কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ণ পাঁচটি—এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় উহাদের নিষাদ নাম দিয়াছেন ; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ এক পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত। আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই একদল শূদ্রের জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন, আর একদলের করেন না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায়, তাহারা সৎশূদ্র, যাহাদের না যায়, তাহারা অন্ত্যজ। আহীরি গোয়ালা

* বুদ্ধদেবের প্রধান শিক্ষামণ্ডলী মধ্যে রাহুল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন বৈশ্য ও উপলি শূদ্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপলি যদিও শূদ্র তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যখন বুদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্মসভা হয়, বুদ্ধ উপলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন উপলিই বিনয় ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনয়ধর্ম্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপলি ধর্ম্ম ভ্রাতা কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নে সম্যক্ উত্তর করিয়াছিলেন।

সৎশূদ্র, দেশী গোয়ালা অন্ত্যজ। চাষার মধ্যে সদেগাপ সৎশূদ্র, কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ, ছুলে প্রভৃতি ছোটলোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে।

(জাত্যভিমান)

একণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ব্রাহ্মণেরা এত ঘৃণা করিলেও এই সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে রহিল কেন? তাহার এক কারণ এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আসিবামাত্র উহাদের একটু জাত্যভিমান জন্মে, একজন ছুলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম সেও বলিল মুচি মুসলমান হইতে ছুলে উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে উহাদের এই জাত্যভিমানটুকু জন্মিয়াছে।

(কোথায় অনার্য্যদীক্ষা আরম্ভ হয়)

অনার্য্যদিগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায় নিষধ বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে, সে পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও নিষধ একই শব্দ) তাহাতে বোধ হয় প্রথম অনার্য্য প্রবেশ এইখানেই ঘটে। দক্ষিণ রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্মণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ এখনও দেখা যায় শৈবদিগের একটি প্রধান দুর্গ রাজবারা। এইরূপে আপন ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করাইবামাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া উঠিল।

(ব্রাহ্মণদিগের উৎসব)

অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যত সুবিধা বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণধর্ম্মের বারটি সংস্কার আছে। একটি ছেলে হইলে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের বিবাহ পর্য্যন্ত লোকে বারবার আমোদ করিতে পারিবে এবং ঐ বারটী সংস্কারই তাহারা সমস্ত জীবনের মধ্যে সুখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের এরূপ ছিল কি না সন্দেহ। শেষ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু সে এক বুদ্ধের উপাসনা মাত্র—হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা দেশ ভেদে ভিন্ন। যে দেশের লোক যে দেবতা চায় সে সেই দেবতা উপাসনা করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥

শিবভক্ত শিব উপাসনা করিল—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাসনা করিল—অথচ ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্র মান্য হইল। উপরিউক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে ইতর লোককে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য বাহ্যিক যে সকল আড়ম্বর আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক।

(ভক্তি শাস্ত্র)

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোক মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য

ঘটিয়া উঠিল। বৈদিক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভের উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবের সময় জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সালোক্য, না হয় নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায় পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শাণ্ডিল্যদেব বেদ উপনিষদাদিতে নিঃশ্রেয়স্ লাভের উপায় না দেখিয়া এই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয়। ভক্তি কাহাকে বলে শাণ্ডিল্যের প্রথম সূত্র এই—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরে অর্থাৎ যে কোন দেবতায় পরম অনুরাগই ভক্তি—সকলের সার ভক্তি; মুক্তি তার দাসী। পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্য্যগণ মোহিত হন এমন নহে—ভক্তিতে অনেক খাটী বৌদ্ধও গলিয়া দেবোপাসক হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্য নিবারণের প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটককার তাঁহার আশ্চর্য্য রূপক গ্রন্থে চার্ব্বাক্, মহামোহ, বৌদ্ধপ্রভৃতি যে সকল হিন্দুধর্ম্মবিরোধী পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয় যে, যোগিনী বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য্য কি?

(বেদীতে বসিয়া ধর্ম্ম প্রচার)

হিন্দুরা প্রচার কার্য্যও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধেরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিত। হিন্দুরা শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। পুরাণে পাই যে, নৈমিষারণ্য বা আর কোন স্থানে পরাশর বা অন্য কোন ঋষি এই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঋষির নাম করিয়া আপনারা পুরাণ প্রচারকার্য্যে রত হন।

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদিগের পুরাণ পাঠের মোহিনী শক্তিও অবশ্য অধিক। বৌদ্ধেরা বলিলেন দান কর—ব্রাহ্মণ বলিলেন দান করিয়া বলি রাজার সর্ব্বস্ব গেল। শেষ আত্মদেহ পর্য্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন সত্য কথা কও—ব্রাহ্মণ বলিলেন, যুধিষ্ঠির একটি অর্দ্ধ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই পাপে নরকদর্শন যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

এই পুরাণ প্রচার আরম্ভ হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

(ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্য্যদক্ষতা এবং অনুরাগ)

উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ ও পুরাণ প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর আর একটী কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম চালাইবার লোক কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশূন্য ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্ম্মের প্রচার সময়ে ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। উঁহারা প্রাণপণে ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টায় রত ছিল। সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণপণে ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ধর্ম্মার্থ উৎকট যত্ন কালসহকারে নষ্ট হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের অতুল ঐশ্বর্য্য হইল, তখন আর ধর্ম্মপ্রচার কে করে। নিয়মমত কার্য্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত। ওদিকে ব্রাহ্মণদিগের বড় সুবিধা—তাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনোপায়। একজন ব্রাহ্মণ যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং একদিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম আর দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ইহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

(শ্রমণের হীনবল হইবার আর একটী কারণ)

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলবান্, বৌদ্ধেরা যদি প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরীভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শত্রু বিনাশ না করিয়া, যে সকল লোক ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট শ্রম করিয়াছে ও করিতে পারে, এমন সকল লোক বাছিয়া বাছিয়া বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় তাহাতে ক্ষতি হয় নাই; যেহেতু নূতন দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলই সমান উদ্যোগী। কিন্তু শেষ যাহারা কার্য্যক্ষম তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল। এই সকল প্রচারকেরা বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও অনেক অগষ্টিন্ স্কোয়ার্টজ্ ডফ সাহেব ছিল। ইহারা বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বীল সাহেবের চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যায়।

(বৌদ্ধ ধর্ম্মনাশের অপর কারণ)

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার যখন আরম্ভ হয় তখন যে উঁহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহিতই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে। প্রথম বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণবিরোধী অথচ বৌদ্ধ শত্রু আর এক দল লোক ছিল। তাহারা তৈর্থিকোপাসক, আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক একজন তৈর্থিকের নাম দেখিতে পাই। প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে যখন বৌদ্ধেরা বিধর্ম্মী বলিয়া

আপন দলের অনেক লোককে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বৌদ্ধ সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে লাগিল, তখন তৈর্থিকোপাসকেরা উঁহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দুর্ব্বলতার আর একটি কারণ হইল। বৌদ্ধগণ আর এক দোষ করিতেন তাঁহারা দলাদলি বড় ভালবাসিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক না, সবই উঁহাদের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ; হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্ত-লিঙ্গোপাসক পর্য্যন্ত এক রাজনৈতিকসূত্রে বদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সেটি ছিল না। 'তুমি লবণ খাইবে আমি খাইব না' এই লইয়া উঁহাদের একবার বড় দলাদলি হয়। ইউরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে। কাথলিকেরা পোপ মানিলেই আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রটেষ্টণ্টেরা ফি হাত ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে আপন চর্চ্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল।

(ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের শেষদশা অন্তর্জ্জগতে)

কনিঙহাম বলেন সেকন্দর সাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় হয়। ফাহিয়নের সময় শুনিতে পাই, দুইই সমান; বৌদ্ধেরা যেন একটু অধিক বলবান্। হিয়ানসাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কনিঙহাম যাহা বলিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কারণ-সমূহের বলে অনেক বৌদ্ধসংসারী হিন্দু হইয়া গিয়াছেন, যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারে পোষণ হইত, সে সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে সম্মত নহে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমীদারী প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল, অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই সকল বিহারে বৌদ্ধদিগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেইখানে শঙ্করাচার্য্য শিষ্যেরা শুদ্ধাদ্বৈত মতানুযায়ী একপ্রকার পৌত্তলিক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি ছিল ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচার সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচারকালে তাহারাও ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ। কিন্তু বোধ হয় তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল হয় নাই। প্রবোধ চন্দ্রোদয়াদি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৫ শতাব্দীতে যে নানা

প্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, ঐ সময়ে উহার যা কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারিশত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

(বাহ্যজগতে)

অন্তর্জ্জগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল তাহার কথা উক্ত হইল। বাহ্যজগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু আইন করিয়া প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত উঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক, কনিঙহামের এনসেন্ট ইণ্ডিয়ায় দেখি ৭ম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক ; বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। বুন্দেলখণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্নিকট, বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে একজনও বৌদ্ধ রাজার নাম নাই।

বৌদ্ধেরা এ দেশে না থাকুক আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য কর্ম্ম মধ্যে নিতাই দেখিতে পাই।

আজ কাল আমাদের দেশে নাস্তিকতার কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কৃতবিদ্যমণ্ডলীমধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন, তাঁহারা প্রায় নাস্তিক। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা প্রায় পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করেন। এই কারণে, যাঁহারা কৃতবিদ্য নহেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেখাদেখি উদাসীন অথবা আস্থাশূন্য।

যাঁহাদের কিছুমাত্র লেখা পড়া বোধ আছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য। কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, অহঙ্কার এবং আত্মাদরের খাতিরে মৌখিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্ম কলহের উপযুক্ত নহে* বলিয়াই আমরা উহার বন্ধু। হিন্দুধর্ম্ম দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ, নিরাশ্রয় বলিয়াই আমরা উহার সহায়। আর ব্রাহ্মেরা উহার শত্রু, অশুভাকাঙ্ক্ষী, উচ্ছেদাভিলাষী, এজন্যও অনেকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ—যুক্তিদ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করিতে প্রস্তুত। নতুবা, শ্রদ্ধা বা আস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আপনার সুখের, স্বার্থের, বা আমোদের প্রতিকূল হইলে প্রায় কাহাকেও হিন্দুধর্ম্মের মুখ রাখিতে দেখা যায় না। হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডও কতক কতক শিক্ষিত দলের আছে, কিন্তু সে অন্য কারণে। তাঁহারা দেবদেবীকে প্রকাশ্যে প্রণাম করেন, কতকটা উদাসীন ভাবে, কতকটা পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ, কতকটা হয় ত লোকের চক্ষে ধূলা দিবার অভিপ্রায়ে। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করেন, কতকটা পিতা মাতার খাতিরে, কতকটা বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে,

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' ইত্যভিধেয় পুস্তকের বিশমোল্লায় গলৎ আছে। তিনি যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম যে কি, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোন স্থলে যে কোন মত পাওয়া যায়, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের অংশ। এবং সংস্কৃতের বিশাল সাহিত্যে নাই হেন কথা নাই, নাই হেন মত নাই। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম কি, তা বলা দায়। রাজনারায়ণ বাবু যে সকল মত লইয়া বিচার করিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত মতও হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া পরিগৃহীত। রাজনারায়ণ বাবু যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগরের একটা ঢেউ মাত্র। এখনকার হিন্দুসমাজ যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহাতে সে ঢেউয়ের নাম গন্ধও নাই।

কতকটা আমোদের জন্য, আর কতকটা—ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বোধ হয় যেন শ্রীচরণকমলযুগলের ভয়ে। কেহ না মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, শ্রদ্ধার উপযুক্ত কি না, সে কথা আমরা বলিতেছি না; সমাজমধ্যে ধর্ম্মভাবের কিরূপ অবস্থা তাহাই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভক্তি শ্রদ্ধা দূরের কথা, অনেক ভদ্রলোকে ব্রাহ্ম বলাইতে লজ্জা বোধ করেন, ব্রাহ্ম বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মে এতই যে কি লজ্জা বা অপমানের কথা আছে, তাহাও বুঝা যায় না। সে যাহাই হউক; লজ্জা থাক বা না থাক, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর লোকের আস্থা নাই। যাঁহারা নাম লেখাইয়া কুলত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র,—তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আবার গোময় খাইয়া সমাজে ফিরিয়াছেন, দেখা গিয়াছে;—কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজকর্তৃক সমাদৃত নহে। অশিক্ষিত লোকে পূর্ব্বাবধিই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এক্ষণে আবার কৃতবিদ্যেরাও ইহার প্রতিকূলে। দুই চারি দশ জন কৃতবিদ্যের আস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু দুই চারি জনের কথা ধর্ত্তব্য নহে। আর নূতন করিয়া ব্রাহ্ম হইতেও প্রায় দেখা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের দিন কাল গিয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা প্রকাশ্য, নাম লেখান, রেজেষ্টরি করা ব্রাহ্ম, তাঁহাদের মধ্যেও সকলে আস্থাবান্ নহে। অনেকে ব্রাহ্ম, কেবল লঘু গুরু ভেদ উঠাইবার জন্য, কেবল ছত্রিশ জাতি লইয়া কুক্কুটমাংসের মহোৎসব করিবার জন্য, কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য সমাজে যাতায়াত করেন, কেহ আমোদ দেখিতে, কেহ গান শুনিতে, কেহ সময় কর্ত্তন করিতে, কেহ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে, কেহ প্রধান আচার্য্যের মন রাখিতে। এ স্থলেও বলিতেছি, কেহ না মনে করেন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পাইল না, তাহার কতকগুলি কারণ দেখা যায়। একতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশীয় ধর্ম্ম—বঙ্গদেশেই ইহার উৎপত্তি। থিওডোর পার্কার, ইহার সেণ্ট পল বাটন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। যেখানে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, সেখানে সে ধর্ম্ম প্রায় প্রবল হয় না। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল নাই; থাকিলেও দৃঢ় নহে। হিন্দুর বেদ আছে, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল আছে, মুসলমানের কোরাণ আছে, পারসিকের জেন্দ আবেস্তা আছে—ব্রাহ্মের কি আছে? তিনি কিসের দোহাই দিতে পারেন? তাঁহার দোহাই দিবার জিনিষ দুটি—প্রকৃতি এবং সহজ-জ্ঞান। কিন্তু তিনি যেরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তেমন ঈশ্বরের কথা প্রকৃতি কিছু বলেন না। সহজজ্ঞানও এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে ঈশ্বর লইয়া এত মতভেদ হইত না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এ দেশে স্থান পাইল না, তাহার আর একটি কারণ বোধ হয় আমাদের আত্মাদর। পরের শিষ্য হইতে গেলেই আপনাকে একটু ছোট হইতে

হয়। যদি কাহারও অনুসরণ করিতেই হয়, তবে না হয় স্পেন্‌সর, কোমৎ, মিলের অনুসরণ করিব। নতুবা যার তার মতে ডিটো দিয়া, যাকে তাকে গুরু স্বীকার করিয়া আপনাকে ছোট স্বীকার করিব কেন? এইরূপ নানা কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইতে পারিল না। তাহার সকলগুলি নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই হয় কঠোর নাস্তিক, নয় কঠোরতর উদাসীন। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাদের দোহাই দিয়া ইঁহারা নাস্তিক, তাঁহারা কেহই ঠিক নাস্তিক নহেন। ঈশ্বর নাই, এমন কথা কেহই বলেন না। মিল ঈশ্বর স্বীকার করেন। বাইবেলের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বটে, স্রষ্টা স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু নির্ম্মাতা স্বীকার করেন। জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার সেই নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই নির্ম্মাতার শক্তির সীমাবদ্ধতা সংস্থাপন করিয়াছেন, কেননা কৌশলাবলম্বন শক্তির অভাবের পরিচায়ক। সে যেমনই হউক, মিল নাস্তিক নহেন। ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে যদিও নির্ম্মাণকৌশল তর্কের খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, তবু ডারুইন নাস্তিক নহেন। তিনি স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন। স্পেন্‌সরও নাস্তিক নহেন। প্রচলিত ধর্ম্ম সকল যে ভ্রমাত্মক, তাহা তিনি বলেন বটে, কিন্তু এই সকল ভ্রান্ত ধর্ম্মের মূলে যে সত্য আছে, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার ঈশ্বর—বিশ্বব্যাপী অজ্ঞেয় শক্তি। বৈজ্ঞানিকেরা এত দিন আলোক, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি দ্বারা বিশ্বকার্য্যের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু অধুনাতন সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, এ সকলও চরম শক্তি নহে—বিশ্বব্যাপী এক মহান্ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বিশ্বব্যাপী শক্তিকে স্পেন্‌সর ঈশ্বর বলেন। কোমৎ আস্তিক নহেন বটে, কিন্তু নাস্তিকও নহেন। ঈশ্বর নাই, এমন কথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, জগতের ঘটনাপরম্পরা দেখ, এবং এই ঘটনাপরম্পরা যে নিয়মে বদ্ধ তাহাদের অনুসন্ধান কর। এতদতিরিক্ত আর কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই—তাহা অজ্ঞেয়—সুতরাং তাহার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। নাস্তিক হওয়া দূরের কথা, বরং নাস্তিকদিগকে তিনি মতিভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তবে ইঁহারা নাস্তিক হইলেন কেন? কিন্তু ইঁহারাও উত্তর দিতে পারেন,—নাস্তিক না হইবই বা কেন? তোমার স্পেন্‌সর, কোমৎ, মিল কিছু বেদ নহেন যে, শ্রীমুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে তাহাই অভ্রান্ত। তাঁহারা এক একজন মহা পণ্ডিত বটেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে, যতটুকু বলিবেন ঠিক ততটুকুই বিশ্বাস করিতে হইবে এমনই বা কি শাস্ত্র

আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাইতে চাও, তাহার প্রমাণ দাও—কেবল ইহার উঁহার নামে কে বিশ্বাস করিবে? প্রমাণ কিছু আছে কি?

এ কথার সচরাচর এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে;—ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং ঈশ্বর নাই, এ দুইটি প্রতিজ্ঞায় অনেক প্রভেদ। যাহা কিছুরই অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তাহাই নাই, এ কথা বলা যায় না। আর,—ঈশ্বর যে নাই তাহারই বা প্রমাণ কি?

নাস্তিকেরা সহজে নিরস্ত হইবার লোক নহেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নাই, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এ দুইটা এক কথা নহে বটে, কিন্তু সচরাচর কিরূপ করিয়া থাকেন? ইহাই সচরাচর দেখা যায় যে, যতক্ষণ কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহার নাস্তিত্বেই লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। চতুর্ভুজ মনুষ্য যে নাই, তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন না, তবে তাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন? কেবল এই কারণে, যে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেই বা অন্য প্রণালী অবলম্বন করিব কেন? ঈশ্বর নাই, এ কথারও কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রমাণ চাহিবারও কাহারও অধিকার নাই। আমরা প্রমাণ দিতে বাধ্য নহি। যিনি অস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করিবেন, প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর থাকা উচিত এবং যুক্তিসঙ্গত। সে প্রমাণ যতক্ষণ দিতে না পারিবেন, ততক্ষণ আমরা মানিব না, মানিতে বলিতেও পারেন না।

এ বিবাদের মীমাংসা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই—সাধ্যও নাই। যাহা বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ, উভয় জগতের কারণ, উভয় জগতের আধার, তাহা বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ হইতে অবশ্য বৃহত্তর, সুতরাং বাহ্যজগত তাহাকে কেমন করিয়া পাইবে—অন্তর্জগৎ তাহাকে কেমন করিয়া ধরিবে? যাহার অজ্ঞেয়ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা এক প্রকার বেকুবি, কেন না বাক্যব্যয় করিলেই তাহার অজ্ঞেয়ত্ব পাকতঃ অস্বীকার করা হয়।

নাস্তিকেরা আরও বলেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ঈশ্বরের বিশ্বাস ধর্ম্মের একটা অঙ্গ, এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরলোকের সঙ্গে, ইহলোকের সঙ্গে নহে। ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির। অতএব লোকে ধর্ম্মে আস্থাবান্ হউক বা না হউক, তাহাতে সমাজের কিছু অনিষ্ট নাই।

ঈশ্বরে বিশ্বাসাবিশ্বাসে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট নাই, ইহা আমরাও স্বীকার করি। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রত্যেকের নিজের কথা। তুমি যদি ঈশ্বর না মান, তাহার ফল তুমিই ভোগ করিবে—অন্যকে করিতে হইবে না। যদি নরকে

যাইতে হয়, তুমিই যাইবে, অপর কাহাকেও যাইতে হইবে না। নাস্তিকতা সামাজিক পাপ নহে। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট যদিও নাই, গৌণ সম্বন্ধে আছে। তাহা আমরা দেখাইতেছি।

সংসারে ইহাই সচরাচর দেখা যায় যে, যখনই আমরা কোন প্রাচীন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া নূতন তত্ত্ব অবলম্বন করি, তখনই কিয়ংপরিমাণে পরিত্যক্ত তত্ত্বের শত্রু হইয়া উঠি। পূর্ব্বে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তখন অযথা ঘৃণা করি। সহানুভূতিজনিত অনুরাগ বিরুদ্ধানুভূতিজনিত বিরাগে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আদর করিয়াছি, পরে তাহাকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া অশ্রদ্ধা করি—অমূল্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, মূল্যহীন বলিয়া ঘৃণায় বর্জ্জন করি—হয় ত প্রকাশ্য অবমাননা করি। এবং এই শত্রুতার বেগ প্রায় পূর্ব্বানুরাগের বেগানুযায়ী হইয়া থাকে। পিউরিটানেরা পূর্ব্বতন ধর্ম্মমন্দির সকলকে ঘোড়া বাঁধিবার আস্তাবল করিতেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় লোকে 'মাস'—পুস্তকের পাতা ছিঁড়িয়া বন্দুকে দিবার কাগজ করিত, 'চালিসে' করিয়া মদ্যপান করিত, গির্জ্জার মধ্যে সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া বেলেল্লাগিরি করিত। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণসন্তান এবং হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান্ ছিলেন। সেই কালা-পাহাড় মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া জগন্নাথদেবকে পোড়াইলেন।

ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, পরিত্যক্ত ধর্ম্মে যদি কিছু সত্য থাকে—থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—তাহাও দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহি না—হয় ত দেখিয়াও দেখি না। তাহাতে যদি কিছু ভাল থাকে—থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—তাহারও উপেক্ষা করি—হয় ত মন্দ মনে করি। যাহাকে দেখিতে পারি না, তার সব মন্দ।

এই কয়টি মনে রাখিয়া দেখা যাউক, নাস্তিকতায় কোন অনিষ্ট আছে কি না। প্রায় সকল সমাজেই ধর্ম্ম এবং নীতি একত্র সম্বদ্ধ দেখা যায়; ধর্ম্মনির্লিপ্ত নীতিশাস্ত্র বা নীতিনির্লিপ্ত ধর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত কারণে, ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে প্রায়ই নীতিরও অপচয় ঘটে। নীতির অপচয় যে সামাজিক অমঙ্গল, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

আর একটা অনিষ্ট এই ঘটে যে, ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখনই আমরা ভ্রান্ত বলিয়া পূর্ব্ববিশ্বাস পরিত্যাগ করি, তখনই ভাবিয়া লই যে, এই ভ্রমের সঙ্গে সত্য বা ভাল কিছু নাই—থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপকারিতা পর্য্যন্ত উপেক্ষা করি। বঙ্গের নাস্তিক দলে তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। অনেকে ধর্ম্মবিশেষের সঙ্গে ধর্ম্মভাবও উড়াইতে চাহেন। অনেকের ভরসা আছে যে, কালে ধর্ম্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে।

সমাজমধ্যে এরূপ মতের বহুল প্রচার হইতে দেখিলে আমরা বাস্তবিকই ভীত হই। কোন সমাজমধ্যে ধর্ম্মভাবের অপচয় হইতে দেখিলে আমাদের মনোমধ্যে সমাজের অনিষ্টাশঙ্কা উপস্থিত হয়। ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত অমূলকও নহে। প্রাকৃতিক পরিণতিবাদের* সাহায্যে ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতা সংস্থাপন করা যায়। নিম্নতর জীব সকলের ধর্ম্মভাবের অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মভাবটা চৈতন্যের স্বভাবপ্রদত্ত, অবশ্যস্থাতব্য অংশ নহে। জীবের ক্রমপরিণতিতে উহা মানবমানসে আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধ যে, মনুষ্য-জীবনের প্রয়োজননিচয়ের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপযোগিতা আছে। সুতরাং উহা মানবের সুখবিধায়িনী, শুভপ্রসূতি এবং কল্যাণদায়িনী।

ধর্ম্মভাবের উপকারিতা অন্য রকমেও দেখা যায়। আজি, এই নাস্তিকতার মধ্যেও ধর্ম্মভাব অনেক সংকার্য্যের মূল; অনেক সংকীর্ত্তির উত্তেজক, অনেক দেশহিতকর ব্যাপারের প্রাণ। আজি, এই বিজ্ঞানপ্রধান, বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই ধর্ম্মভাব, অনেকের পক্ষে অনেক বিপদে ভরসা, অনেক দুঃখে সান্ত্বনা, অনেক শোকে জুড়াইবার স্থান, অনেক তাপিত হৃদয়ের শান্তিসলিল।

যাঁহারা মনে করেন, কালে ধর্ম্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে, তাঁহাদিগকে আমরা গুটি দুই কথা বলিতে চাই। কোমৎ বলিয়াছেন বটে যে, কোন বিষয়ের মূলানুসন্ধান করা বৃথা—তাহা মানবের অজ্ঞেয়। কিন্তু বৃথা হউক, অবৃথা হউক, ছাড়ান ত যায় না। অনেক সময় মনের ভিতর হইতে প্রশ্ন হয়—আমি কে?—আমি ছাড়া সংসারে যাহা আছে তাহা কি?—কোথা হইতে আসিলাম?—কোথা হইতে আসিল? হর্বট স্পেন্সর, পরমাণু লইয়া এবং আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তিদ্বয় লইয়া অপূর্ব্ব জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ডারুইন বৃক্ষের বানর খাড়া করিয়া মনুষ্যজাতির পিতৃনিরূপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোল ত মিটিল না—এক পদ সরিয়া গেল মাত্র। তার পর লাপ্লাসের জগতে জীবসঞ্চার ব্যাখ্যা। তিনি অপূর্ব্ব এক চিত্র আঁকিলেন। আমরা মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই চিত্র দেখিলাম। দেখিলাম—অপার, অনন্ত, নীল সমুদ্র, তাহার গর্ভ, তাহার উপকূল, তথায় কর্দ্দমরাশি—সেই সমুদ্রের উপরে, উপরের নীল সমুদ্রে, তাড়িতপ্রবাহ ছুটিতেছে—আর সেই সমুদ্রের গর্ভে, সেই উপকূলের কর্দ্দমরাশির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়া কিল্‌কিল্ করিয়া নড়িয়া উঠিতেছে—এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া মোহিত হইলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের জ্ঞানও সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। কিন্তু জ্ঞান এবং চিন্তা সমদূরগামী নহে—যাহা জানি না,

* Evolution theory.

হয় ত জানিতে পারিও না, তদ্বিষয়ক চিন্তাও মনে আসে। এই জ্ঞানাতীত বিষয়ের চিন্তাই ধর্ম্মভাবের মূলভিত্তি। সুতরাং চিন্তা যতদিন জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ না হয়, ততদিন অন্ততঃ ধর্ম্মভাবের লোপ হইতে পারে না। কিন্তু চিন্তা কোনকালে জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ হইবে কি? ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে জ্ঞান বৃদ্ধিশীল —বিজ্ঞানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন যে কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুসন্ধেয় বিষয়ের মানসিক অস্তিত্ব—অহম্প্রতীতির অবস্থাবিশেষরূপে স্থিতি—অনুসন্ধানের পূর্ব্বগামী;—যাহার ভাব মনে নাই, তাহার অনুসন্ধান হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে ইহা আবশ্যক যে চিন্তা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবে। এবং চিন্তা যতদিন জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবে, ততদিন ধর্ম্মভাবের লোপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে, এমন কথা উঠিতে পারে যে, যখন মনুষ্যের জ্ঞান সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তখন অবশ্য জ্ঞানাতীত চিন্তা থাকিবে না, কেননা জানিতে আর কিছু বাকি থাকিবে না, সুতরাং ধর্ম্মভাব লুপ্ত হইবে। কিন্তু মনুষ্যজ্ঞান কোন কালে সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বদর্শী হইবে কি? স্পেন্সর* বলেন—না।

আর একদল নাস্তিক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে ধর্ম্মভাবও তত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। এ মতেরও আমরা অনুমোদন করি না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অব্যভিচারিতায় দৃঢ় আস্থা জন্মাইয়া দেয়। ভূয়োদর্শনে বৈজ্ঞানিকের মনে জাগতিক ঘটনারাজির অচল সম্বন্ধে, কার্য্যকারণের অচল সাহচর্য্যে, সুফল কুফলের অবশ্যম্ভাবিতায়, অটল আস্থা বদ্ধমূল হইয়া যায়। ভ্রমবুদ্ধিপরবশ হইয়া সাধারণ লোকে, যে পুরস্কার পাইবার, যে শাস্তি এড়াইবার আশা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতে, তাহাতে আস্থা রাখিতে পারেন না বটে, কিন্তু তিনি দেখিতে পান যে, বিশ্বরচনা এমনই চমৎকার যে পুরস্কার অথবা শাস্তি, কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। দেখিতে পান যে, অবাধ্যতার বিষময় ফল অপরিহার্য্য। দেখিতে পান যে, মনুষ্য যে সকল শক্তির অধীন, তাহা ক্ষেমঙ্কর এবং অব্যভিচারী। দুঃখ যেমন অবাধ্যতার অনিবার্য্য ফল, বাধ্যতার অবশ্য প্রাপ্তব্য ফল তেমনি অধিকতর সম্পূর্ণতা, উচ্চতর সুখ। সুতরাং তিনি অবাধ্যতার যারপরনাই বিরোধী। সুতরাং তিনি নিজে বাধ্য এবং অপরকে বাধ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং বিজ্ঞান ধর্ম্মভাব প্রসবিনী। অতএব যথার্থ জ্ঞান, প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের বিরোধী হইলেও, ধর্ম্মভাবের বিরোধী নহে—বরং পরিপোষক। স্পেন্সরের বিশ্বাস এইরূপ।

মানব-লভ্য জ্ঞানের সীমা আছে। সে সীমা যে মনুষ্যশক্তির অনতিক্রম্য

* First Principles. The unknowable.

তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয়। বুঝাইয়া দেয় যে, এ বিশ্বের চরম কারণ, মূল শক্তি, মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। সুতরাং দেখাইয়া দেয় যে, মনুষ্যশক্তি অতি ক্ষুদ্র। যে মহান্‌শক্তি বিশ্বের আধার—প্রকৃতি, জীবন, চিন্তা যাহার মূর্ত্তিপরম্পরা মাত্র—সে শক্তি যে কেবল মাত্র জ্ঞানের অতীত নহে, ধারণারও অতীত, তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। নম্রতা, আপনার ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান, বিশ্বশক্তির মহত্ব জ্ঞান, এ সকল যদি ধর্ম্মভাবের অংশ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান অবশ্য ধর্ম্মভাবের পরিপোষক। গল-শিষ্য স্পুট্‌জাইম বলেন, ভক্তিই ধর্ম্মভাবের সার। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্মভাবপোষণানুকূল আর কি? কেননা বিশ্বশক্তির মহত্ব জ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে অমন আর কি? অতএব জ্ঞান, ধর্ম্মবিশেষের অথবা প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীসমূহের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মভাবের প্রতিকূল নহে। যে কোমং সর্ব্বধর্ম্মবিরোধী, সেই কোমংই আবার নবধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান গৌরব।

অধ্যাপক হক্সলি এ সম্বন্ধে একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছিলেন;—"যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম্ম, যমজা ভগিনী; এক হইতে অপরের পার্থক্য উভয়েরই মৃত্যুর কারণ। জ্ঞান যে পরিমাণে ধর্ম্মজীবন, জ্ঞানের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি; ধর্ম্মও যে পরিমাণে প্রমামূলক, ধর্ম্মের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি। জ্ঞানানুরাগীদিগের মহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল, ততটা তাঁহাদের বুদ্ধির ফল নহে, যতটা সেই বুদ্ধির ধর্ম্মভাব নির্দ্দেশিত গতির ফল। তাঁহারা যে সকল সত্যের আবিষ্কার, যে সকল তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, সে সকল, ততটা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন নহে, যতটা তাঁহাদের সহিষ্ণুতা, তাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহাদের একচিত্ততা, তাঁহাদের ত্যাগ স্বীকার নিবন্ধন।"

ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগকে আর একটা কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের শেষ করিব। তাঁহারা সমাজকে ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহেন, ভালই, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মবন্ধনের পরিবর্ত্তে আর কোন্ কার্য্যের বন্ধন তাঁহারা সংস্থাপিত করিতে পারেন?—ধর্ম্মব্যতীত আর কি বন্ধন বাঁধিতে চাহেন? সমাজের জন্য একটা বন্ধন যে আবশ্যক, তাহাতে বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সন্দেহ করিবেন না। আমাদের কার্য্যমূলা বৃত্তি সকল অন্ধ এবং চিন্তাশূন্য। যখন তাহারা আবেগ-প্রস্পন্দিত হয় তখন কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে। সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক যে, এই বৃত্তিনিচয়ের উপর একটা শাসন থাকে। ধর্ম্মশাসনের স্থানে আর কোন্ শাসনকে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাই না। সত্য, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, কেহ কেহ ধর্ম্মবন্ধনকে পদদলিত করিয়াও পৃথিবীর প্রভূত

উপকার করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্ম মানেন নাই, অথচ সাধুতায় জগতের দৃষ্টান্ত স্থল, জগতের অনুকরণীয়। কিন্তু সকলেই কিছু কোমৎ* বা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নহে। সকলেরই জ্ঞানার্জ্জনৈকচিন্ততা কিছু এত প্রবল নহে যে, অধিকাংশ জীবনী আকর্ষণ করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে হ্রস্বতেজঃ করিয়া ফেলিতে পারে। সকলেরই মানবহিতপরায়ণতা কিছু এত প্রশস্ত নহে যে, রিপুগণ তাহার তলে ছায়ান্ধকারমজ্জিত হইয়া ক্রমে শুকাইয়া উঠে। সাধারণের জন্য একটা শাসন চাই। সাধারণকে সংপথে উৎসাহিত করিতেও একটা উত্তেজনা চাই—মনুষ্যমানসের স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে।

ধর্ম্মশাসন ব্যতীত আর ত্রিবিধ শাসন আমরা কল্পনা করিতে পারি,—বিবেচনা শক্তি, রাজবিধি, এবং সাধারণের মত। ইহাদের কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথম, বিবেচনাশক্তি। নীতিসূত্রনিচয়ের প্রাকৃতিক মূল অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা কয়জন বুঝে? কার্য্যবিশেষের ফলাফল কয়জন গণনা করিতে পারে? কয়জন গণনা করে? সমাজের অধিকাংশ লোকেরই কার্য্যে বিবেচনার ভাগ অতি অল্প। যত কেন উন্নত, যত কেন সভ্য সমাজ হউক না, লোকের কার্য্য অভিনিবেশ-পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে প্রায় ইহাই বোধ হয়, যেন যতদূর পারা যায় চিন্তা না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অধিকাংশ লোকের উদ্দেশ্য।† অতি সামান্য দৈনন্দিন কার্য্য, যাহাতে অতি অল্প বিবেচনা আবশ্যক, তাহাও প্রায় কেহ বিবেচনা করিয়া করে না; অথচ এ সকল কার্য্যে কোন বলবান্ নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনা নাই। তবে, যেখানে নিকৃষ্টবৃত্তির উত্তেজনা আছে, সেখানে যে লোকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? নৈতিক আজ্ঞার ধর্ম্মশাসনে হৃতবিশ্বাস হইয়া, প্রাকৃতিক মূল নির্ব্বাচন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে, ইহা কেমনে বিশ্বাস করিব?

নীতিসূত্রের প্রাকৃতিক মূল নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য করিতে পারিবার পূর্ব্বে অনেক কথা বুঝা আবশ্যক। এই কার্য্যের প্রকৃতি ভাল, এই কার্য্যের প্রকৃতি মন্দ, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে কেবল তত্তৎকার্য্যের অব্যবহিত ফল পর্য্যালোচনা করিলে চলিবে না, গৌণ ফল সকলও দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, ইহাতে নিজের লাভালাভ কি?—অন্যের লাভালাভ কি?—সমাজের লাভালাভ কি? অনেক কার্য্য

* কোম্তের নাম, মানেম জ্যোতিষদ দে ভোর নামের সঙ্গে যাঁহারা মন্দভাবে জড়াইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা নিন্দুক মনে করি।

† Indeed, it almost seems as though mott made it their aim to get through life with least possible expenditure of thought. *H. Spencer*.

আছে, আশু অনিষ্ট করে না কিন্তু পরিণামে সর্ব্বনাশ করে। অনেক কার্য্য আছে, নিজের লাভ হয় কিন্তু পরের সর্ব্বনাশ হয়। এরূপ অবস্থায় অভ্রান্তবিচার কয়জন করিতে পারেন ? এত বিচার করিয়া কে কার্য্য করিতে পারে ? এত বিচারই বা কয়জন করিতে পারে ? আবার বিপদের উপর বিপদ, যাঁহারা ফলাফল বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই বা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন কি ? অতি পণ্ডিত, অতি বড় জ্ঞানী, অথচ জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া শত শত অনিষ্টকর কার্য্য করেন; তাঁহার ফলভোগ করেন। যতদিন কষ্টভোগের স্মৃতি মনোমধ্যে জাজ্বল্যমান থাকে ততদিন হয় ত নিবৃত্ত থাকেন; আবার যেমন কালের ছায়ান্ধকার সেই স্মৃতির উপর পড়িয়া তাহাকে অপরিষ্কার করে, অমনি যে সেই।

আসল কথা, মনুষ্যের কার্য্য, মনুষ্যের বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই বিবেচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না; অনুভূতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অতএব বিবেচনাশক্তি ধর্ম্মের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহে। এ উপযুক্ততা বিবেচনাশক্তির যখন হইবে, সে দিন এখনও আসে নাই, আসিতে বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, রাজবিধি। রাজবিধি যে ধর্ম্মের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না, তাহার একটা কারণ এই যে, রাজবিধি কার্য্যসমুৎপাদিকা শক্তি নহে। রাজবিধির অধিকার নিবৃত্তির দিকে নহে। এই এই কার্য্য করিও না, রাজবিধি কেবল ইহাই বলে,—তাহাও স্পষ্টতঃ বলে না, প্রাকচঃ বলে। এই কার্য্য কর, এমন কথা রাজবিধি বলে না। পরের কুৎসা করিও না, পরের গায়ে হাত দিও না, পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিও না, এই সকল রাজবিধির আজ্ঞা। দুঃখার্ত্তকে সান্ত্বনা কর, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান কর, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দাও, ইহা রাজবিধি বলে না। সুতরাং আমাদের উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উপর রাজবিধির অধিকার নাই। আবার নিবৃত্তির দিকে যে অধিকার, তাহাও অতি সংকীর্ণ। রাজবিধি বলিলেন,—'দেখ বাপু, অন্ধকার রাত্রে গৃহস্থের মেয়ের ঘরে প্রবেশ করিও না; যদি কর এমন জানিতে পারি, তাহা হইলে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দিব।' উত্তর—'যে আজ্ঞা, আপনি যাহাতে না জানিতে পারেন তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ থাকিব।' রাজবিধির কার্য্যকারিতা মিটিয়া গেল। অতএব রাজবিধিও ধর্ম্মের সিংহাসনে বসিতে পারে না।

তৃতীয়, সাধারণের মত।* মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল, তাঁহার 'ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তাবত্রয়' ইত্যভিধেয় গ্রন্থে এই শাসনের কার্য্যকারিতা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যেন অসদাচার অবলম্বন করিয়া কথাটা বুঝাইয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, ব্যভিচারে যে পাপ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য সমান। কোন

*Public Opinion.

ধর্ম্মই এমন শিক্ষা দেয় না যে, স্ত্রীলোক পরপুরুষগামিনী হইলে তাহার অদৃষ্টে চৌষট্টি রৌরব হইবে, আর পুরুষ পরস্ত্রীগামী হইলে তাহার ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গ হইবে। যদি নিরয়ে পচিতে হয়, উভয়কেই হইবে। অথচ ব্যভিচারদোষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিক লিপ্ত; কেন সাধারণের মত উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য করে—ব্যভিচারিণীর যে নিন্দা, যে কলঙ্ক, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা, ব্যভিচারীর তত নহে। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, পাপ হইতে বিরত রাখিতে ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা সমাজশাসনের (সাধারণের মত) কার্য্যকারিতা অধিকতর। মনুষ্যকে ধর্ম্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে না, সমাজশাসন সেই পাপ হইতে সে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। অতএব সাধারণ মতের কার্য্যকারিতা ধর্ম্মশাসনের অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অধিক।*

মিলের যুক্তিতে দুটি ছুই ছিদ্র আছে বলিয়া বোধ হয়। সিদ্ধান্তটি ঠিক করিয়া করা হয় নাই বা ঠিক করিয়া লেখা হয় নাই। মিলের তর্ক হইতে ঠিক সিদ্ধান্ত এইরূপ হয়,—একদল মনুষ্যকে ধর্ম্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে, আর একদল মনুষ্যকে সমাজশাসন সেই পাপ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। ইহার উপর আমরা এই বলিতে চাই যে, সমান অবস্থায় দুইটি শক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহাদের বল তুলনা হইতে পারে বটে, কিন্তু যে স্থলে অবস্থার সমতা নাই সে স্থলে হইতে পারে না। মিলের যুক্তির দোষ এই যে, অবস্থার সমতা অভাবেও তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, উভয়েই মনুষ্য বটে, কিন্তু মনুষ্যজাতির অন্তর্গত বলিয়া কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন নির্দ্দেষ্টব্য প্রভেদ নাই? যদি থাকে, তবে ইহাদের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা কখনই শক্তিদ্বয়ের বল তুলনা হইতে পারে না। মনুষ্যও জীব, বানরও জীব; কিন্তু জীবশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া কি মনুষ্য এবং বানর এতদুভয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কার্য্য দেখিয়া, সেই শক্তিগণের বলের ন্যূনাধিক্য নির্দ্দেশিত হইতে পারে? যদি না হয়, তবে স্ত্রীলোকও মানুষ পুরুষও মানুষ বলিয়াই বা কেন হইবে? মিলের তর্কের ভ্রান্তি সুস্পষ্টতর করিবার জন্য আমরা ঐরূপ আর একটা যুক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি। গোবর্দ্ধন দাস মনুষ্য; বেতাল পঞ্চবিংশতির রাজমহিষীও মনুষ্য, রাজমহিষীর গাত্র চন্দ্রকরস্পর্শে দগ্ধ হইয়াছিল; গোবর্দ্ধন দাস মধ্যাহ্ন সূর্য্যাতাপেও ক্লিষ্ট নহে; অতএব সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা চন্দ্রকিরণ অধিকতর তাপযুক্ত। যদি যুক্তিতে, এ সিদ্ধান্তে ভুল থাকে, তবে মিলের যুক্তিতে, মিলের সিদ্ধান্তেও আছে।

* J. S. Mill, Utility of Religion. মিলের গ্রন্থ আমাদিগের নিকট এক্ষণে নাই, থাকিলে স্থানটা উদ্ধৃত করিয়া দিতাম।

স্ত্রীপ্রকৃতি এবং পুরুষপ্রকৃতি যে একরূপ নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন রাখে না। শারীরতত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন, যাঁহারা শারীরতত্ত্ববিৎ নহেন তাঁহারাও জানেন যে, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক গঠন একরূপ নহে সুতরাং মানসিক গঠনও একরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহা সিদ্ধ যে, স্ত্রীপ্রকৃতি এবং পুংপ্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। মিলের যুক্তির আর একটা দোষ এই যে, যে স্থলে দুই তিনটি শক্তি কার্য্য করিতেছে, মিল সে স্থলে একটী মাত্র ধরিয়া বিচার করিয়াছেন—বাকীগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন, নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। পুরুষে স্ত্রীলোকে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে সমাজশাসনের কঠোরতা ব্যতীতও স্ত্রীলোকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর জিতেন্দ্রিয়তা ভরসা করা যায়। পুরুষ প্রতিপালক; স্ত্রীলোক প্রতিপালিত। যে প্রতিপালিত, তাহাকে সুতরাং প্রতিপালকের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, প্রতিপালকের মন রাখিয়া চলিতে হয়, প্রতিপালকের বিরাগের ভয় করিতে হয়। যে কার্য্য করিলে প্রতিপালক বিমুখ হইবেন, সে কার্য্য করিতে প্রতিপালিত আর সাহস করে না। অতএব মিলের যুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল।

এই গেল মিলের মত সমালোচন। এক্ষণে একবার মিলকে অব্যাহতি দিয়া, অন্যরূপ বিচারমার্গ অনুসরণ করিয়া, সাধারণ মতের সহিত ধর্ম্মশাসনের তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

সাধারণের মতটা বাহ্যশক্তি। তাহার শাসন কেবল কার্য্যের উপর থাকিতে পারে। মনের উপর কোন অধিকার নাই। মনের দুরভিসন্ধি যতক্ষণ না কার্য্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহা সাধারণ মতের কার্য্যপথবর্ত্তী নহে। সুতরাং সাধারণের মত মনঃসংশোধনে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মত কার্য্যবিশেষের উপর শাসনরূপে প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা আবশ্যক যে, সেই কার্য্য সাধারণে জানিতে পারে। সুতরাং যে স্থলে প্রকাশসম্ভাবনা নাই, সে স্থলে সাধারণের মত অকর্ম্মন্য। অতএব দেখা গেল যে, সাধারণ মত মনঃসংশোধন করিতে অক্ষম এবং গোপনের পাপ নিবারণ করিতে অক্ষম। ধর্ম্মভাব আভ্যন্তরীণ শক্তি, সুতরাং তাহার এ কার্য্যকারিতা আছে। মানস সংশোধন করিতে সক্ষম, কেননা উহার কার্য্য মনের উপর। গোপনের পাপ নিবারণ করিতে সক্ষম, কেননা উহার কাছে কোন কার্য্যই গোপন থাকিতে পারে না—মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব সাধারণ মতও ধর্ম্মসিংহাসনে বসিবার অনুপযুক্ত।

আমরা যে বিচার করিলাম, তাহাতে বুঝা গেল যে ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। সমাজের হিতকর জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। পাপ হইতে বিরত রাখিতে, সৎপথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। ধর্ম্মভাবের

অপচয়ে সমাজের অমঙ্গল আছে। কোমৎ অথবা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নাস্তিক হইলে সমাজের অনিষ্ট না হইতেও পারে; কিন্তু রাধু বাবু, মাধু বাবু, যাদু বাবু যদি নাটক লিখিতে শিখিয়াই নাস্তিক হয়েন, তাহাতে অনিষ্ট আছে। তাঁহারা যে সমাজের অন্তর্গত, সে সমাজের বড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বঙ্গসমাজে এইরূপ লোকের কিছু বাড়াবাড়ি, অতএব বঙ্গসমাজের বড় দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

এ বিষয়ে অনেক কথা আমাদের বলিতে বাকী থাকিল। এ বিষয়ের পুনরান্দোলন করিবার ইচ্ছাও থাকিল। প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি দোষ পরিহারার্থে আমরা আজিকার মতন নিরস্ত হইলাম।

ইদানীন্তন সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ নিয়মানুসন্ধান। যেখানে সভ্যতার উন্নতি সেইখানেই নিয়মের সমাদর। অন্ততঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা নিয়ম সমালোচক বলিয়া বিজ্ঞান আলোচনা সভ্যসমাজের শ্রেষ্ঠতর অবলম্বন; বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি সাধিলে কার্য্যপ্রণালী কেবল দৈবাধীন বা মায়াপরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস থাকে না। ন্যায়সঙ্গত নিয়মাবলীর উন্নতিপ্রাপ্তির সঙ্গে সমাজকার্য্য ক্রমশঃ নিয়মেরই অধীন হইয়া থাকে; শাস্ত্রের বচন ও পুরাতন শ্লোকের একাধিপত্য হ্রাস হইতে থাকে ও সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যতীত অপর কথা ক্রমে অগ্রাহ্য হয়। একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনির মাংসপেশী বলব্যাপক উন্নতি ও আর একদিকে স্পেন এবং আমাদের হতভাগ্য ভারতভূমির অবনতি পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত কথার কিয়দংশে সত্যতার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র নৌকায় পদার্পণ করিবামাত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত যান স্বর্ণময় হইল, কংসারি শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিতেই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার গলদেশাভ্যন্তরে চিত্রিত দেখা গেল, ইব্রাহিমের বংশজাত মুসা লালসাগরে হস্তনিক্ষেপ করিতেই সমুদ্র শুকাইয়া গেল, এ সকল কথায় কোন সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস ও অন্যতর স্থানে অবিশ্বাস হয় কেন? ইহার মধ্যে এক সমাজেরই বা কেন ক্রমশঃ অবনতি অপরেরই বা কেন ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যায়?

ইহার সদুত্তর অনুসন্ধান করিতে হইলে দেশ-দেশান্তরের মানবসমাজের গঠনসৌষ্ঠব ও ধর্ম্মনীতির উন্নতি যত্নসহকারে স্থির মনে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতীয় মহত্ত্ব বা সামাজিক গৌরব-মন্দিরে জাতীয় ধর্ম্মভিত্তির উপর কিয়দংশে সংস্থাপিত। জাতীয় ধর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় সভ্যতার অঙ্গবিকাশ হইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম সপ্তসিন্ধুর আলেখ্যতুল্য রমণীয় পবিত্র তটে প্রশান্ত ব্রাহ্মণগণের পবিত্র ওষ্ঠ হইতে, নিদাঘনিশীতে হৈম চন্দ্রকরোল্লাসিত নির্ঝর রবের সঙ্গে সুমধুর গাথায় উচ্চারিত হইত; যাহাকে কেবল "শান্তি" "শান্তি" পরম সুখ বলিয়া গণ্য হইত, সেই ধর্ম্মসম্ভূত সমাজপ্রকৃতির অঙ্গসৌষ্ঠব

এক প্রকার। যে প্রশস্তমনা বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহের স্বর্গীয় সহৃদয়তায়, ইদানীন্তন* সরলচিত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ লজ্জা ও নম্রতা সহকারে আপন আপন নীতিপ্রণালী মলিন দেখেন, তাঁহার সমাজশ্রী আর এক প্রকার। পুনরায় সময়ান্তরে বাহুবলব্যাপ্তিকর খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মানুরাগী বলিষ্ঠ জাতিনির্ম্মিত সমাজমন্দিরের ভিন্ন গঠন দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় চিন্তা করিলে অনেকেই দেখিতে পাইবেন ইদানীন্তন সভ্যসমাজ এই দুই প্রকার ধর্ম্মেরই কিছু কিছু অনুকরণ করিতে অভিরত। যাঁহারা শান্তিময় খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অনুসরণ করেন তাঁহারাও ছয় দিবস সংসারযুদ্ধে নিমগ্ন থাকিয়া কাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বা তোপমুখে নিহত করিয়া সপ্তম দিবসে 'শান্তি শান্তি' বলিয়া ধর্ম্মাহুতি দিয়া থাকেন; কিন্তু রবিবারে যাহা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া জ্ঞান হয় সোমবারে তাহা স্মৃতিপথ হইতে একেবারে স্খলিত হইয়া পড়ে।

এইরূপ ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের কারণ আছে। যে কালে সমাজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আশ্রয়ে নিরাপদ ছিল, সে কাল বহুদূরগত। যে রাম শান্তিময় জগজ্জীবনের ছায়া মাত্র তিনিও মানবলীলা সম্পন্নহেতু চিরকাল সংহারকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত; যে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসন্তান, তিনি রাজসূয় যজ্ঞে ও রাজতিলক লালসায় দিগ্বিজয় অর্থাৎ সহস্র সহস্র প্রাণিবিনাশে মত্ত। এখনকার স্বদেশ-উদ্ধারকারী উইলিয়ম টেলের রমণীয় উপাখ্যান শুনিয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ড তাঁহাকে দেববৎ উপাসনা করিয়া থাকেন। টেল আপন দেশ অত্যাচারশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে নিরস্ত্র হারমেন জিশিয়রকে সতর্কহীন সময়ে তীক্ষ্ণ তীর প্রক্ষেপণে শমনভবনে প্রেরণ করেন, এজন্য তিনি সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রে পূজ্য; কিন্তু অপরদেশে কোন বীর সেই একই অভিপ্রায়ে কোন মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতির আশায় আপন বৈরনির্য্যাতনের অভিসন্ধি করায় চিরঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার নাম অকথ্য, অশ্রাব্য, দুষ্ক্রিয়ান্বিত (মিসক্রিয়াণ্ট) বলিয়া জগতে জাগিতেছে। স্কটলণ্ডে দেশ-হিতৈষী উইলিয়ম ওয়ালেস স্বদেশীয় সাহিত্যলেখকের লেখনীতে বীরত্বের ও মহত্বের উচ্চতর শিখরোপরি সংস্থাপিত; কিন্তু তত্তৎকালীন ইংলণ্ডদেশীয় চরিত্রচিত্রকরের করে তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ম বর্জ্জিত, সমাজ, শান্তির প্রধান শত্রু, অবশেষে নরহন্তা ও লুণ্ঠনপ্রিয় ডাকাইতদলের সর্দ্দার বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন। এইরূপ একই ধর্ম্মের দুই দুই অর্থ ও একই শ্রেণীস্থ লোকের দুই দুই আখ্যা আমরা প্রচার করিতে বিরত নহি। কিন্তু এই প্রকার দুই দুই ধর্ম্মাবলম্বনের ও দুই দুই বিচারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে।

যে সময়ে যোগস্তুতি, মুনিবৃত্তি অবলম্বনে, ফল মূল আহরণে জীবন ক্ষেপণ

* "It might be impossible for honest Christians to think over the career of this heathen Prince (Buddha) without some keen feeling of humiliation and shame." *Canon Siddon quoted by Spencer.*

করিয়া, তনুত্যাগ করা সহজ ছিল, সেদিন এক্ষণে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে; গিরি, নদী, বন, উপবন, সম্পত্তি নিয়মের অধীন হইয়াছে, জঙ্গল, অধীশ্বরের পক্ষরক্ষকের (কনসরভেটরের) করগত; ফল মূল সংগ্রহ, পত্রচ্ছেদন, সকলই রাজনিয়মাধীন, মূল্য দাও কিম্বা দণ্ড গ্রহণ কর—দণ্ডবিধি সর্ব্বত্র ব্যাপক। সকলই মালিকের মুলুক, দলিল দর্শাইয়া স্বত্ব সাব্যস্থ কর, নচেং যদি পার স্ববলে অধিকার সংস্থাপন কর। এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে কি প্রতীতি হয়? নিরীহতার কাল গত হইয়াছে, পশ্চাতেই বল বা অগ্রেতেই দেখ সত্যযুগ অনেকদিন গত বা আসিতে অনেক কাল বিলম্ব আছে। কেবল স্থিরভাবে বসিয়া ভাবিলে যে সময় লব্ধ হইবার নহে। সত্য, নীতি, ধর্ম্ম ও রাজ্য বিস্তার করিতে পার না পার, নিজস্বত্ব প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। নিজের সুখ ও সামাজিক সুখ এই উভয় সুখের জন্য আগ্রহাতিশয় লোভপরায়ণ লোকের আক্রমণ সর্ব্বদা প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। যে ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে, বামগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণ গণ্ড পুনরাঘাত করিবার জন্য ফিরাইয়া দাও, তাহা লৌকিক বা জাতীয় সম্ভ্রম বা স্বত্বসম্বন্ধে পরিণত করিলে কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়। নিরীহতার, শান্তচিত্তেরও সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" এ বিষয়েও সত্য। যেখানে প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপনে নিয়ত পদচালনা করিতেছে, সেখানে শান্তমনা, দৌর্ব্বল্য বলিয়া বুঝাইতে পারে; আপন স্বত্বে অবহেলা করিলে অপরের দুর্নীতি বৃদ্ধি হয়, সূচ্যগ্র হইতে ফালাগ্র শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। সেই জন্য আপন আপন জাতীয়ধর্ম্ম বা জাতীয় নীতির দৃঢ়পত্তন করা বিশেষ আবশ্যক।

যে সম্প্রদায়ের লোকবিশেষে উল্লিখিত মত তর্ক করিয়া থাকেন তাঁহাদের সমস্ত কথা এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা আরো কহিয়া থাকেন যে জাতীয় গৌরব বা জাতিপ্রতিষ্ঠা জন্য যুদ্ধচর্চ্চা আবশ্যক, জাতিসমুচ্চয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি বিগ্রহনিপুণ হওয়া উচিত। যুদ্ধ নৃশংস কার্য্য, বলবান্ জাতির সহিত নিকৃষ্টজাতির যুদ্ধ নিতান্ত ক্ষতিকর। শোক, অভাব, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ত আছেই; তার পর যুদ্ধে কোন কোন জাতির একেবারে ধ্বংস হওয়া সম্ভব, তথাপি যুদ্ধপ্রিয় লোকেরা কহেন যে, যে নিকৃষ্ট জাতি উচ্চতর সভ্য জাতির সহিত বলে বা কৌশলে সমকক্ষ না হইতে পারে তাহার জীবিত থাকিয়া নীচত্বের পরিচয় দিয়া কাজ কি? মহীতল হইতে রসাতল যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

তাঁহারা বলেন বিগ্রহ ও অস্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় সমাজ অনেক প্রকারে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ বীর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা ও ঐকমত্য। বনের পশু পক্ষী কিম্বা নগরের পুরবাসিগণের প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, আমরা নিশ্চয়ই দেখিব যে যাহারা অহরহঃ আক্রমণ করিতে কিম্বা অপরের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে

রক্ষা করিতে তৎপর তাহারা বিশেষ বিশেষ গুণের আস্পদ। ইংরাজিতে যাহাকে বুল ডগ (Bull dog) কহিয়া থাকে তাহারা পর্য্যায়ক্রমে যুদ্ধশিক্ষায় এরূপ উগ্রস্বভাবপ্রাপ্ত যে একবার কোন দ্রব্য তাহাদের গ্রাসে পতিত হইলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে অঙ্গচ্ছেদ করিলেও সেই পদার্থের নিষ্কৃতি নাই; সিংহের কথা আমরা ততদূর জ্ঞাত নহি, কিন্তু সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রশিকারের যেরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের চর্ব্বণে দৃঢ় লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রসকল কোমল ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় চর্ব্বিত হইয়া যায়। হস্তী বহু লোকের আক্রমণ ও অস্ত্রের আঘাত তৃণতুল্য জ্ঞান করে, কিন্তু ভয় দর্শাইতে সতত অক্ষম। পার্ব্বতীয় বাজপৌরি প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অনবরত আক্রমণে অভিরত তাহারা আপন আপন বৃত্তি পরিচালনায় ক্রমশঃ এরূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যোজনাধিক অতিক্রম করে, ও তাহাদের তীক্ষ্ণ নখাধারে অপেক্ষাকৃত গুরুতর জন্তু সকলকে উচ্চস্থ নীড়মধ্যে অবহেলায় উত্তোলন করিতে পারে। অপরদিকে তৃণজীবী পশুনিচয়, যাহারা প্রবলতর জন্তু হইতে প্রাণরক্ষায় ব্যাকুল তাহাদের ক্ষমতা কতদূর? ব্যাঘ্রের দ্বাদশ হস্ত ও মৃগের ত্রয়োদশ হস্তব্যাপক এক একটি লম্ফ। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, যাহাদের প্রস্থানই জীবনরক্ষার উপায়, তাহারা পলায়নেই পটু। এই পটুতা একদিনের শিক্ষা নহে, দ্রুত পদচালনা করিতে করিতে অনেক মৃগের প্রাণাবশেষ হইবার পর অবশিষ্ট যাহারা পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাদের সন্তান সন্ততিগুলিই পুরুষানুক্রমে এইরূপ দ্রুতপদ হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যসমাজেও ঠিক এইরূপ অবস্থা। যাহারা বিশেষ বিশেষ কোন গুণে নিপুন, তাহারাই জীবন-যুদ্ধে অপরকে পরাভব করিয়া জাতীয় সোপানে সভ্যতার মন্দিরে বিরাজমান। যাহারা নির্ব্বীর্য্য বা যুদ্ধে অক্ষম তাহাদের জীবনে কোন ফল নাই; এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেক জাতি এক্ষণে নাই, এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক লেখা অনাবশ্যক। যতদিন যুদ্ধ জাতিবিশেষের বিশেষ ব্যবসায় ছিল, যতদিন ক্ষত্রিয়কুল বীর্য্যই প্রধান পুরুষত্ব বলিয়া গণ্য করিতেন, ততদিন এই বিশাল ভারত ক্ষেত্র তাঁহাদেরই করস্থ ছিল। বোধ হয় বীরত্বেরই ধন এই ভারত। কিন্তু সেই বীরত্ব অদৃশ্য হইবার কারণ কি? বিখ্যাত বিচক্ষণ পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল কহিয়াছেন "সাহস আমাদের স্বাভাবসিদ্ধ প্রকৃতি নহে, ইহা সুশিক্ষার ও উৎকর্ষণের ফল।"* আমরা যত বিপদে পড়ি, অঙ্গচাতুরি, বল বা বুদ্ধিচালনায় যতবার উদ্ধার হই আমাদের সাহস ততই বৃদ্ধি হয়, জয়লাভে ততই উৎসাহ ঘটে এবং বিপৎপাতে ভীত না হইয়া বরং গৌরবলাভের ইচ্ছা প্রবল হয়। স্বভাবসিদ্ধ ভয়কে সুশিক্ষা

* "Consistent courage is always the effect of cultivation."—*Mill* on *Nature.* p. 47.

দ্বারা সংযম করিলে সাহসের আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে শিক্ষার শিক্ষালয় কোথায়? দেশীয় সমাজ। যতদিন দেশীয় সমাজে সাহসের আদর থাকিবে সাহসিক পুরুষ সমাদৃত ও ভীরুতা ঘৃণিত থাকিবে, ততদিন যুবাপুরুষগণ সাহস শিক্ষা অবিরত অভ্যাস করিবে। স্পার্টা দেশে, রোমরাজ্যে, মধ্যযুগ প্রতিষ্ঠিত ইউরোপখণ্ডের যোদ্ধ-বর্গে, বা ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কুল সমাজে, যেখানে দেখ, যথায় সাহসের শিক্ষা ও সমাদর তথায় বীরত্বের উন্নতি, যেখানে সাহসের অবমাননা তথায় ভীরুতার বৃদ্ধি। ভারতে আচার্য্যের দ্বারা শস্ত্রশিক্ষা ছিল, ইউরোপে প্রত্যেক প্রভুর দুর্গমধ্যে ব্যায়ামশালা ছিল। সম্মুখসমরে মৃত্যু যোদ্ধার স্বর্গারোহণের পন্থা ছিল; শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা রণে ভয়পরতন্ত্র হইয়া ভঙ্গ দিলে, তাহাদের কলঙ্ক শশাঙ্কের কলঙ্কের সম যুগে যুগে ঘোষিত হইত। আবার ইউরোপখণ্ডে "Chivalry" সংস্থাপনা দ্বারা যোদ্ধবর্গ একটি পবিত্র ও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। তাঁহাদের নিয়মাবলী অতি সুন্দর ছিল; সেই নিয়ম দ্বারা ভ্রাতৃভাব সম্পন্ন হইত, ও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা লাভের উদ্দেশে প্রত্যেক অঞ্চলের নাইটগণ ঐ নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ তৎপর হইতেন।

"ভগবান্‌কে সতত ভয় কর" "ধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ কর" "শতবার মৃত্যু ভাল তবু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অবিধেয়" "নারী ও কুমারীগণের প্রতি সতত শিষ্ট হও" "আপন প্রাণদানেও দুর্ব্বলেরে রক্ষা কর" "জীবন সংশয় হইলেও বাক্যের সত্যতা প্রতিপালন কর।" এই ধর্ম্ম রক্ষা করা যদিও দুরূহ, যদিও অনেক নাইটের বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তথাপি এই সকল সুনীতি যে মধ্যযুগে ইউরোপখণ্ডে কতকগুলি মহদভিপ্রায় মহাবীরের প্রসূতি তাহা সংশয়বিহীন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের বীরত্ব উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ ছিল; বীরগণ দুর্ব্বলা অবলাবান্ধব, দেবদুর্লভ সরলা সুন্দরীরা বীরপুরুষেরই ধন; সেই ধন সংগ্রহ বীরত্ব পরিচালনার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বীরত্ব প্রীতিসংযোগে সতেজ হয়, এবং সেই বীরত্বে বীরাঙ্গনা সম্মিলনলাভ অতি সুমধুর—ফুলধনুর উত্তেজনায় গাণ্ডীবের সংযোগ, ইহা প্রখর ও কোমলের মিলন—কিন্তু এই মিলন দীর্ঘ স্থায়ী,* চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল প্রথাদি বীরত্ব উত্তেজনার স্থল, তাহা মানবপ্রকৃতির অন্যান্য অনেকানেক সদ্বৃত্তিরও উৎস। যে যুদ্ধহ্রদে নরনাশের বিষ-বারি তাহাতেই আবার সদগুণের সুনীতিরও উৎপত্তি।

এদিকে আবার বীরত্বের নাশে স্বাধীনতার ধ্বংস; অধীনতার নীতিপ্রণালীও পৃথক্; দৌর্ব্বল্য প্রবল হইলে দুর্ব্বলের বুদ্ধিচাতুর্য্য একমাত্র আশ্রয়। "বলে না

---

* অতি বর্ব্বরলোকের মধ্যেও সাহস উত্তেজনার এইরূপ প্রথা দৃষ্ট হয়। নরমাংসাশী ফিজিয়ান জাতি সমাজে যোদ্ধৃবর্গ রণবিজয়ী হইয়া গৃহাভিমুখ হইলে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ সুন্দরীগণ তাহাদের হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া থাকে।

পারি ফিকিরে মারিব।” তখন চাণক্যের ও মাকিয়াবেলির প্রণীত বুদ্ধিচতুরতা সমাজের আশা বা দুরাশার স্থল হইয়া উঠে—শঠের সহিত শঠের মত আচরণ করিতে শিক্ষা হয়। ইউরোপে ইটালী, ও ভারতে বঙ্গদেশ এই শিক্ষার অভিনয় স্থান। এই উভয় প্রদেশের সমাজের অবস্থা ও তাৎকালিক নিয়মাবলীর সৌসাদৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রথমতঃ ইটালীর রোমরাজ্য বিধ্বংস হইবার পর পশ্চিমখণ্ডের অপর সমস্ত দেশে অরাজকতা। সে সময়ে পূর্ণ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ইটালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর সভ্যতার বীজভূমি। ভিনিস, জেনোয়া, রোম ও টস্‌কেনি অপেক্ষাকৃত শারীরিক সচ্ছন্দতার ও সামাজিক সুপ্রণালীর চিরন্তন রঙ্গভূমি; পুরাতন রোমরাজ্যের সভ্যতার কিছু কিছু কণিকা এ নগরচয়ে বিকীর্ণ ছিল। রোমনগর হইতে কৈসারগণের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও ইহা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী পোপদিগের সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র ধাম হইয়া উঠিল, ধর্ম্মতত্ত্ব চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে এখানেই আলোচিত হইতে লাগিল। পশ্চিমাঞ্চলের অসভ্যতা ও পূর্ব্বখণ্ডের সভ্যতার এই নগর সকল মধ্যবর্ত্তী হইয়া উঠিল। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ রাজ্যচয় মধ্যে বিনিস্ বাণিজ্যের প্রধানতম নগর বলিয়া বিখ্যাত হইল; বাণিজ্যের সহিত অর্থাগম, সুরুচি, জীবনের সুখপ্রদায়ক দ্রব্য নিকরের আবিক্রিয়া বা সংগ্রহ হইতে লাগিল। উচ্চতম আল্পস্ পর্ব্বতের উত্তর অঞ্চলে প্রজাসমূহের স্বাধীনতা যে ফিউডল প্রভুদের দৃঢ় চপেটাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছিল, তাহাদের অত্যাচার ইটালীর জনাকীর্ণ নগরে প্রবেশ করে নাই। স্বাধীনতা, বাণিজ্য ও অর্থসমাগমের সঙ্গে এই সকল নগরে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল; ইটালীর নিকটস্থ সাগরসমূহ পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ পোতমালায় সুশোভিত হইল।

ইটালীর প্রত্যেক নগরে হুণ্ডি প্রেরণ জন্য ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইল। একা ফ্লরেন্স নগরে অশীতি ব্যাঙ্কঘর ও পশমের বস্ত্র নির্ম্মাণার্থ দুই শত কুঠি সংস্থাপন, ও ঐ সকল কুঠিতে ত্রিংশ সহস্র লোক প্রাত্যহিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তিন লক্ষ করিয়া ফ্লোরিন (প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা) মুদ্রিত হইতে লাগিল। দুইটি রোকড়ের কুঠী হইতে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড তিন লক্ষ মার্ক মুদ্রা (প্রায় ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) কর্জ্জ পাইয়াছিলেন। ফ্লরেন্সরাজ্যে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হইত কিন্তু এইরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াও এ সকল রাজত্ব স্বল্পকাল মধ্যে অবনতিপ্রাপ্ত, স্বাধীনতাহীন ও মলিনশ্রী হইল।

স্ব স্ব নগরে শান্তিসুখসম্ভোগে পুরবাসিগণ শিথিলাঙ্গ, কোমলহৃদয়, আলস্যময় হইল। যাহারা উদরপূরণ কামনায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য, যাহারা প্রতিদিন জলযানে বা পদব্রজে হিংস্র জন্তুসহ যুদ্ধ করিয়া খাদ্য অর্জ্জন করিতে বাধ্য,

তাহাদের অঙ্গবল বা মানসিক সাহস এতাদৃশ বণিক্ নিকেতনে স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ; ক্রমে যুদ্ধে ইহাদের নিতান্ত অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। বিগ্রহ বর্ব্বরের কর্ম্ম বলিয়া ইটালী সমাজে পরিগণিত হইল। অস্ত্র-বিদ্যার হ্রাসের সহিত সাহসের হ্রাস হইয়া এই সুন্দর সুসভ্য দয়ার্দ্রচিত্ত ইটালিয়ান জাতিচয় অবনতিপ্রাপ্ত হইল। পরে কপটতা ও চাতুর্য্য ইহাদের প্রধান অস্ত্র হইয়া উঠিল ; নরহত্যা, ভিক্ষা, দুর্ভিক্ষ, হতাশা, দাসত্বে দেশ ব্যাপ্ত হইল।

আর এক দিকে বাঙ্গালার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। সময়সাগরে পুরাবৃত্ততরী যত উজান বহিয়া যাও ভারতক্ষেত্রে কোথাও সভ্যতা অপ্রতিহত দেখিবার নাই। বাহ্যিক সৌভাগ্যেরই বা হ্রাস কোথায় ? প্রান্তরে প্রচুর শস্যদায়ী ক্ষেত্র, নগরে প্রচুর শিল্পনিপুণ পুরবাসিগণ। সেই ভারত অন্তর্গত মহারাজ্য আদিমকাল হইতে সৌভাগ্যশালী। বেদ, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, পুরাণ যাহা ভারতের মানসিক ভাণ্ডার ও পৃথিবীর গৌরব তাহাতে বঙ্গদেশ স্বত্বাধিকারী। বৌদ্ধমতাবলম্বী পাল নৃপতিকুলের সময় হইতে পলাশিযুদ্ধের দিন পর্য্যন্ত, দুর্ভাগা, অত্যাচারপীড়িত হইয়াও আমরা কি কখন সভ্যতাবিরহিত ? স্বদেশজাত সামগ্রী ও স্ব স্ব শিল্প নৈপুণ্যে আমাদের নির্ভর ছিল। বিদেশীয় সামগ্রীতে আমাদের দৃষ্টি ছিল না ; অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র, ধাতুনির্ম্মিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অলঙ্কার, বিরামদায়ী তাবৎ দ্রব্যই গৃহজাত, বরং আমাদের উদ্বৃত্ত সামগ্রীসমূহ অপর দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা সমৃদ্ধির পরিপোষক ছিল। তখন আমাদের নগরগুলি লোকসমাকীর্ণ। অবনীবিখ্যাত গৌড় নগরের ত কথাই নাই ! ঢাকা, বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, তমলুক, বনবিষ্ণুপুর, কাশিমগঞ্জ, প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থল ছিল। এ কথা সাধারণতঃ প্রকাশ নাই যে এক চন্দ্রকোণা নগরেই ১৪০০০ হাজার তন্তুবায় বংশ অহরহঃ বস্ত্রনির্ম্মাণে ব্যস্ত থাকিত ; এখনও লোকে কহিয়া থাকে এ সহরে "বায়ান্ন বাজার ও তিপান্ন গলি" ছিল ; এক সময় ঐ চন্দ্রকোণার ঘনবুনন বসন সমস্ত বঙ্গরাজ্যে গৃহস্থের আচ্ছাদনের প্রধান সংস্থান ছিল। শিল্পীদের মধ্যে রেশম ও কার্পাস ও তন্নির্ম্মিত বস্ত্র জন্য বঙ্গদেশ চিরবিখ্যাত। যে সময়ে রোমরাজ্যে অরিলিয়ন (২৭০ হইতে ২৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) অধিপতি ছিলেন, তখন রোম নগরে বঙ্গদেশ-জাত রেশমী বস্ত্র স্বর্ণমুদ্রার সহিত সমান ওজনে বিক্রীত হইত। বাগ্দাদের খলিফা, পারসিয়ার সাহা বা দিল্লীর মোগল নৃপতিগণ এই বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্রে মোহিত ছিলেন ; নুরজিহান রাজ্ঞী যে কয়েকদিন আপন পূর্ব্বতন স্বামী সের খাঁ সহ বর্দ্ধমানে বাস করিয়াছিলেন সেই সময়ে বীরভূমের রেশমী বস্ত্রের এতদ্রূপ অনুরাগিণী হইয়াছিলেন যে দিল্লীশ্বরী হইয়াও ঐ বস্ত্রের কারুকার্য্য বা উন্নতিসাধনে অমনোযোগী হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাসাদে অন্তঃপুরে বীরভূমের তন্তুবায়হস্তনির্ম্মিত চেলির বসন ভিন্ন মোগল মহিলাগণের

অন্য কোন সজ্জা মনোনীত হইত না। ঢাকার "জলতরঙ্গিণী" কেবল গল্প নহে। একদিন আরঙ্গেব নৃপতি আপন কন্যার অঙ্গলাবণ্য সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করায়, কুমারী সলজ্জে উত্তর দিয়াছিলেন যে তাঁহার অঙ্গ সাতপুরু অঙ্গিয়ায় আবৃত! এতৎসম্বন্ধে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁয়ের সময়েও একটি কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া যায়। হরিত দুর্ব্বাদলময় প্রাঙ্গণে একখানি মলমলের চাদর বিস্তৃত ছিল। একজন তন্তুবায়ের গাভি ঐ বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া, ঘাসের সহিত তাহা গ্রাস করায় তন্তুবায় নগর বহিষ্কৃত হয়। অতি অল্পদিন হইল মেদিনীপুর প্রদেশের অন্তর্গত মনোহরপুর ও বর্দ্ধমান সন্নিদ্ধে বন পাশ (কামার পাড়া) পল্লিতে যেরূপ লৌহাস্ত্র, দা, কাটারি, চাকু ও পিস্তল নির্ম্মিত হইত তাহা শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয়স্থল ছিল। বীরভূম প্রদেশের ইলাম বাজারের গালার খেলনা, আলুন্দরের দরি ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত পুত্তলগুলি কেমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় তাহা অনেকে জানেন। অপর মূল্যবান্ স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কারের বিষয় এই বলিলেই হয় যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ সূক্ষ্ম গঠন কোন দেশেই এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। বিদেশীয় উচ্ছিষ্ট দ্রব্য সম্ভোগ রুচির জয় হউক! বিলাতি সামগ্রীর পক্ষপাত প্রবৃত্তির জয় হউক। আমাদের দেশীয় নগরে সমুদায় শিল্পনিপুণতার যদিও অবনতি দৃষ্ট হয় তথাপি সে সকল স্থান সভ্যতার আবাসভূমি বলিয়া এক্ষণেও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কারু-কার্য্যের যে এত অবনতি হইয়াছে তথাপি বঙ্গদেশজাত দ্রব্যাদি ইউরোপ খণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যপরিদর্শনে কলনির্ম্মিত, ষ্টীম-এন্‌জিন গঠিত সামগ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি পেরিশ ও ভিয়েনা উভয় নগরের শিল্পসামগ্রী পরিদর্শনে নিরপেক্ষ মহোদয়গণ ভারতবর্ষের শিল্পীদের* মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে আমরা একদিকে দাসত্বভার বহন করিয়াও চিন্তাশীলতা বুদ্ধির পরিচালনা, সামাজিক নীতি বা ক্রিয়াকলাপ শিথিল হইতে দিই নাই। নিজধর্ম্মে আস্থা, পরধর্ম্মে বিদ্বেষবিহীনতা ও শাস্ত্র আলোচনায় আমরা কখন পরাঙ্মুখ নহি, নিতান্ত দুর্ব্বল পরপীড়িত ও কুসংস্কারবিশিষ্ট হইয়াও আমাদের সমাজে বিদ্যার মার্জ্জনা ও ধর্ম্মের সংস্করণ মধ্যে মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কবিত্বের আদর,

* "The Emperor was especially struck with the beauty and novelty of the Indian Show, which the Arch Duke Charles Lewis declared in conversation with the Royal commissioner, to be the best in the whole building—*Opening of the Vienna Exhibition.*"

See also p. 99, of Dr. R. L. Mitra, Orissa vol. I.

প্রতি গণ্ডগ্রামেই। শাস্ত্রের, স্মৃতির, ন্যায়ের আলোচনা ঘোরতর দাসত্বের অন্ধকারও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, গৌরাঙ্গদেব বঙ্গভূমির মলিনমুখ মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উদার, মার্জ্জনাশীল, সমদুঃখগ্রাহী, সহৃদয়, শিষ্ট ও সুবুদ্ধি হইয়াও দুর্ব্বল, সাহসবিহীন। এই স্থানে ইটালিয়ান ও বঙ্গবাসিগণ সমকক্ষস্থায়ী। দুর্ব্বলের অস্ত্রকপটতা, চাতুরি ও বিপদে ভীতি ভীরুতাসম্ভূত পাপে কলঙ্কিত, একতার অভাবে জাতি প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অপারগ। যে মরিবার মরুক আমার কি? প্রতিবেশীর ঘরে ডাকাইতি ত আমার কি? আমার কপাট দৃঢ় অর্গলে বদ্ধ—নিদ্রা যাই! কিন্তু এরূপ চিন্তা পাপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান আছে। যাঁহারা কহেন যে, ইহা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ তাঁহারা কি সত্যবাদী? না আমাদের বিদ্বেষী বৈরী? এ সকল স্বভাবগত পাপ নহে, কেবল সমাজগত অবস্থাঘটিত চরিত্রদোষ। এই দোষাচরণ না করিলে দুর্ব্বলের সমাজ রক্ষার, প্রাণ রক্ষার, সম্ভ্রম রক্ষার আর কি উপায় ছিল? এই পাপ সংশোধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, যখন পাপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইয়াছে, তখন সংশোধন হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সুশিক্ষিত দূরদর্শী দেশমুখের নিকট আমাদের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, ভীরুতা পাপমোচনের উপায় কি? যাহারা সাহসে নির্ভর করিয়া লৌহাস্ত্রে ও শোণিত বিসর্জ্জনে রাজ্য-বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত, আজি তাহাদেরই উন্নতি দেখ, আর যাহারা শান্তিধর্ম্ম অবলম্বনে অনুবৃত্তিসাহায্যে ঋষি হইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদেরও দশা সন্দর্শন কর, যাঁহারা এই ঋষিধর্ম্ম ও বীরকার্য্য সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত সভ্য। আমরা জানি আমাদের সমাজের অনেক অনেক চূড়ামণি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, এ হতভাগ্য দেশের কোন আশা নাই: যে দেশে চোখ রাঙ্গাইলে অপরাধী হইতে হয়, সেখানে চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়স্কর; ভারত-উর্ব্বী নির্ব্বীর হইয়াছে; নির্ব্বীরই থাকিবে। কিন্তু যদি মহীতলে দুই এক শত বৎসর মধ্যে প্রলয় উপস্থিত হইবার সংবাদ থাকিত, যদি বঙ্গজাতির জীবন মিয়াদি পাট্টাভুক্ত হইত তাহা হইলে এ সংস্কার প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করিতাম। কিন্তু সংসার অপরিমেয় কালব্যাপী, সেই কালব্যাপ্তিতে যে গুণের উৎকর্ষণ কর সত্বর না হউক বিলম্বেও ফল ফলিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রথমতঃ আরমেনিয়ান জাতি এতদূর নির্ব্বীর্য্য ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ ছিল যে তাহাদিগকে পরাভব করিতে অধিনায়ক লুমিলিয়স ও পম্পি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তশত বৎসরে সেই দুর্ব্বল জাতির সন্তানেরা মহীতলে এতদ্রূপ বীর্য্যবান্ সৈনিক পুরুষ বলিয়া গণ্য হয় যে তাহারা বিনা সাহায্যে তত্তৎকালীন মহা পরাক্রমশালী পারস্ত

সাম্রাজ্যকে এককালীন বিধ্বংস করে। এখনকার ইটালিয়ান জাতির অবস্থা কি ? ধন্য গারিবল্ডি! যিনি উক্ত জাতিকে পুনরায় বীরের আসনে নীত করিয়াছেন। আইন যত কঠিন হউক আমাদের মানসিক কোন বৃত্তি পরিচালনার প্রতিরোধ করিতে পারে না। এক্ষণে ভীরুতা পাপ পরিত্যাগ করা, অল্প বয়স হইতে পুস্তকের পোকা না হইয়া যাহাতে দেশগৌরব জাতীয় প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধনে সক্ষম হওয়া যায় তাহারই আলোচনা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কবিগুরু বাল্মীকির অপেক্ষা ইদানীন্তন আমেরিকা রাজ্যহিতৈষী জনাথন ভায়ার বাক্য আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অহরহ স্মরণ রাখা চাই, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।"

এখন কোন কোন বচনের পরামর্শ শুনিয়া শস্ত্রপাণি পুরুষ দেখিয়া প্রস্থান করা, ঘোটকের শত পদের মধ্যে গমন না করা কর্ত্তব্য, কি ইতিহাসের, বিজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণে বীরধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত তাহাই চিন্তাশীল সুশিক্ষিতের বিচার্য্য।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রতি মেয়েট আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া, রঙ্গ করা গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর একজন পাচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর—আর বড় লোকের কাজ করা হল না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড় খানি বাঁ হাতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিলো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা—পাড়ার কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা কি আমরা চাকর বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগান বেড়াতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যাবে? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল! রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুইজনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর

গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথা পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে, ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী, যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থশরীরে প্রফুল্ল হৃদয়ে বারুণীর স্ফাটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারি, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল, যে রোহিণী হতভাগিনী মেজ বাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি, হে রটনাকৌশলপরকলঙ্ককলিতকণ্ঠ কুলকামিনীগণ! তাহা আমি, অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সম্বাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি লা?" ভ্রমর, একটু শুষ্কমুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সত্য ঠাকুর ঝি?" ঠাকুর ঝি, তখন ফুলধনুর মত দুই খানি ভ্রূ একটু জড় সড় করিয়া, অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া বলিল, "বলি, রোহিণীর কথাটা?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্য পান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও; পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে?"

ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি?"

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "পোড়া কপাল! এত লোক শুনিয়াছে—কেবল তুই শুনিস্ নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে।"

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে, সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে, একটা পুত্তলের মুণ্ড মুচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।"

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, শিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দীনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে, আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরাকে বলিল, "আশ্চর্য্য কি? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ?—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ। অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলো চুলে সম্বাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।"—কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর, পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্মাতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই আজি আমার সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন-হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

এখন ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল যে গ্রামে রাষ্ট্র যে গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে। নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী সাড়ী ও এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই। আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে ততটা নহে। লোকে বলে আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই সাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর নাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কার গুলিন একে একে কুড়াইয়া আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কীলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমরা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতাম, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয়ই নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই একথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেইজন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভালবাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখা পড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখা পড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না। কিন্তু আজ সে সকল কিছুই হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম" গুলা "স" র মত হইল—"স" গুলা "ম" র মত হইল—"ধ" গুলা "ফ"র মত, "ক" গুলা "থ" র মত "থ" গুলা "খ" র মত; ইকারের স্থানে আকার—আকারের এককালীন লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের এককালীন লোপ,—ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছে—

"সেবিকা শ্রীভোমরা" (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা) "দাস্যাঃ" (আগে দাস্‌সা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো—দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামাঃ" (প্র লিখিতে প্রথমে "স্র" তার পর "শ্র" শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিশেষ।" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই।)

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল—তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেকবার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে তাহা তিনি কখন বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে—তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।—যাহা হৌক-তোমার কাছে আমার নালিশ

—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব।

ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন।—ভ্রমর রটাইয়াছে ?

মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেইদিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্ণ মনে, গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

দেশান্তরে

সেই নিশীথে—সেই জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন। যেমন বসন্তপবন-সঞ্চালনে বৃক্ষের কুসুমপল্লবসমন্বিত শাখা সকল অতি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, অবগুণ্ঠনবতীদিগের ক্ষীণাঙ্গ সেই-রূপ দুলিতেছিল। রাজপথ জনশূন্য; চন্দ্রালোকে অতি সুন্দর, এবং পরিষ্কার দেখাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ভীম তরু সকল প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া শন শন করিয়া ধ্বনি করিতেছিল; চন্দ্রালোকবিচ্ছেদে বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছিল। যুবতীদ্বয় অতি সঙ্কুচিত চিত্তে দ্রুতপদে যাইতে-ছিলেন, মধ্যে মধ্যে অতি মৃদুমধুর স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন এবং কখন কখন পশ্চাদ্বর্ত্তিনী পরিচারিকাকে ডাকিতেছিলেন "বিধু চলে আয় না," আবার মৃদু মৃদু স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন।

বয়ঃকনিষ্ঠা কহিল, "দিদি তুমি অন্যমনস্ক হইতেছ কেন?" বয়োজ্যেষ্ঠা উত্তর করিল—"বিনোদ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এই শুনিলাম রজনীর বড় জ্বর হইয়াছে—অঘোর হইয়া আছে—এমন লোকটি তাহার নিকট নাই যে তাহাকে দেখে—সেই জন্য বাবাকে বলে আমরা তাড়াতাড়ি আসিলাম। কিন্তু তাহার ঘরে কেহ নাই—খালি রহিয়াছে; ঘরে চাবি দেওয়া নাই—খোলা রহিয়াছে—অথচ রজনী সেখানে নাই—ঘরের ভিতর একটি বিছানা পড়িয়া রহিয়াছে—একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—কিন্তু রজনী নাই!—বিনোদ, জ্বরগায়ে তবে রজনী এ রাত্রে কোথা গেল? তবে কি তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিল! আহা! কত কষ্ট পাইতেছে—সকলি এ অভাগিনীর জন্য।" বলিতে বলিতে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝা গেল যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। এই যে যুবতী রজনীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন ইনি কুমুদিনী।

তিনজনে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে চলিলেন। কুমুদিনীর কত কি মনে হইতে লাগিল,—পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল।—রজনীর সহিত গঙ্গাতীরে তাঁহার প্রথম সন্দর্শন—কি বিপদেই প্রথম সন্দর্শন!—সেই এক দিন রজনীর জন্য মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন—সে কত কষ্ট—তাঁহার উরুদেশে কত যত্নের সহিত রজনীর মস্তক রাখিয়াছিলেন।—সেই অবধি রজনীর প্রতি তাঁহার কিছু মনে মনে স্নেহ জন্মিয়াছে—কিন্তু সে স্নেহ কুমুদিনী কখন বুঝিতে পারেন নাই—তার পর রজনী তাঁহার ভগিনীপতি হইল—তাঁহার সোণার স্বর্ণপ্রভার স্বামী হইল—তখন সেই স্নেহ বদ্ধমূল হইল-রজনীকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন—সেই রজনীর এত কষ্ট?—এত কষ্টের কারণ কে? সে কারণ কুমুদিনীই। নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। আর এক দিনের ঘটনা তাঁহার মনে হইতে লাগিল—সেই বাপীকূলে—সেই জ্যোৎস্নাময়ী বাপীকূলে—সেই কুসুমিত কামিনী কুঞ্জবনে—রজনী তাঁহাকে কি বলিয়াছিল;—স্মরণে বড় লজ্জা হইল—সে যে ভালবাসার কথা;—রজনী তাঁহাকে ভালবাসিত;—কি লজ্জা! লজ্জায় মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল—মাথায় আরো কাপড় টানিলেন—সে সময়ে রজনী কি কথা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সকলই স্মরণ হইল। তিনি তাঁহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ তাহাও মনে হইল-প্রথমে হেসে হেসে আদর করে বলেছিলেন—ছিঃ অমন কথা বলিও না—তুমি আমার ভগিনীপতি—আমার স্বর্ণপ্রভার স্বামী—আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইতে পারি;—অমন কথা যদি আর বল, তা হলে এই কুসুমিত কামিনীবৃক্ষের ডালে আঁচল গলায় বাঁধিয়া মরিব।—তার পর আবার কি কথায় রাগ হইয়াছিল-সেই রাগে রজনীকে তাঁহার নিকট মুখ দেখাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে কত রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন—সেই অবধি একবার রজনীর সহিত ভাল করে দেখা করিবার বড় সাধ করিত—একবার মন খুলে কথা কহিতে সাধ হইত,—কত সাধ হইত—কিন্তু সে সাধ পূরিত না—রজনী তাঁহাকে দেখিলে সরিয়া যাইত—কুমুদিনীর বোধ হইত—যেন ঘৃণা করিয়া সরিয়া যাইত—তজ্জন্য কুমুদিনী কত দুঃখিত হইতেন—গোপনে কত কাঁদিতেন—এক এক দিন কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলে উঠিত।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রমণীত্রয় গঙ্গাতীরের রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। নদীর মৃদুমধুর জলকল্লোলনিনাদে ও নদীতীরস্থ শীতল নৈশ বায়ুস্পর্শে কুমুদিনীর স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সম্মুখে অনন্ত বারিরাশি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে নাচিতেছে আর দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী তরতর বেগে দক্ষিণাভিমুখে ধূমপ্রান্তে মিশাইতেছে, তাহার দাঁড়ের প্রক্ষিপ্ত জলকণা চন্দ্রকিরণে নাচিতেছে। কুমুদিনী মোহিতনেত্রে সেই নৌকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন কে এমন দুর্ভাগ্য আছে যে,

সকল ত্যাগ করিয়া এই মধুর জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে দেশান্তরে যাইতেছে—আহা, বোধ হয় ওর কেহ নাই!—অভাগার প্রতি দয়া হইল—সেই জন্য সেই নৌকাপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ কে তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল—অতি ভয়সূচক স্বরে বলিল, "দিদি দেখ।"

কুমুদিনী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

"ঐ দেখ, গাছতলায় কি নড়িতেছে।"

কুমুদিনী দেখিলেন নদীতীরে বৃক্ষের তলে নিবিড় অন্ধকারমধ্যে কি নড়িতেছে—মানুষ বলিয়া বোধ হইল—কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া রমনীগণ অতি দ্রুত চলিতে লাগিলেন। অনতিদূরে আসিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিল, অমনি বলিয়া উঠিল "ওগো কে দৌড়ে ধরতে আসচে।" প্রথমতঃ কুমুদিনী, বিনোদিনী ও তাঁহার পরিচারিকার ন্যায় দৌড়িয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোক। তাঁহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। কুমুদিনীর প্রথমে ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া সমভিব্যাহারীদিগের সঙ্গ লয়েন, কিন্তু দৌড়িতে লজ্জা হইল। দ্রুতপদে চলিলেন, ইতিমধ্যে পশ্চাৎ ধাবমানা রমনী তাঁহার সন্নিকট হইয়া তাঁহাকে ডাকিল, "দিদিঠাকুরুণ শোন শোন।" কুমুদিনী তাহাকে চিনিতে পারিয়া দাঁড়াইলেন। একটি পরমাসুন্দরী রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অতি দ্রুত দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিল এবং একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার রূপ দেখিয়া কুমুদিনী শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার আগুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বিত রুক্ষ এবং আলুলায়িত কেশরাশি সেই সুন্দর মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নাময়ী গভীর নিশীথে, নিঃশব্দ এবং নির্জ্জন রাজপথে কুমুদিনীর চক্ষে সে রূপ অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইল। তাহার কটাক্ষ ভয়ঙ্কর—তাহার মধ্যে মধ্যে রুক্ষ কেশরাশিবিশিষ্ট মস্তক নাড়া ভয়ঙ্কর—সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য কুমুদিনীর অসহ্য হইল। কুমুদিনী চক্ষু মুদিত করিলেন; আবার নদীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, নদীর রূপও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। সেই নৈশ সমীরণসন্তাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর নিনাদ ভয়ঙ্কর বোধ হইল, আর দূরপ্রান্তে সেই মোহিনীশক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরণীর দাঁড়ের প্রক্ষিপ্ত যে জলকণা চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করিতেছিল তাহাও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। রাজপথপ্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন সঙ্গিনীগণ অদৃশ্য হইয়াছে—মনে মনে এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল। ভয় নহে কিন্তু যেন ভয়ের সহিত কোন সংশ্রব আছে।—কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অতি কঠিন স্বরে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "কি চাও?—" রমণী উত্তর করিল "তিনি চলে গিয়াছেন ঐ দেখ যাইতেছেন," বলিয়া সেই ক্ষুদ্র

নৌকার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" আগন্তুক কহিল, "ঐ যাইতেছেন—জ্বরগায়ে যাইতেছেন—আমায় নিয়ে গেলেন না—উন্মাদিনী বলে নিয়ে গেলেন না—কিন্তু তাঁহাকে কে মানুষ করেছে—সে ত এই উন্মাদিনী—আমি কত কাঁদলুম তবু নিয়ে গেলেন না—কি হবে দিদিঠাকুরুণ কি হবে—কেমন করে বাঁচবেন—তিনি যে একাকী—সঙ্গে কেহ নাই, আবার তাতে বড় জ্বর—বল্লেন আর এ দেশে কখন আস্‌বেন না—আর আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না"—বলিতে বলিতে উন্মাদিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। "কে, কে" কুমুদিনী বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে অনেক ক্ষণের পর উন্মাদিনী বলিল, "আমার রজনীকান্ত!" শুনিবামাত্র কুমুদিনী বেগে তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া নদীর কূলে আসিয়া দাড়াইয়া একদৃষ্টে সেই মোহিনীশক্তিধারিণী নৌকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন, শেষে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ

প্রেম-উন্মাদ

রজনীকান্তের দেশান্তর গমনের সংবাদ কুমুদিনীর পিতা এবং মাতা শুনিলেন। শুনিয়া উভয়ে বড় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদিগের পুত্রসন্তান ছিল না—দুই কন্যা মাত্র, কুমুদিনী ও স্বর্ণপ্রভা। কুমুদিনী বালবিধবা, স্বর্ণপ্রভা মৃতা—বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই মৃতা, এই সকল কারণে তাহার স্বামী রজনীকান্ত তাঁহাদিগের পুত্রসন্তানের স্থান পাইয়াছিল। স্বর্ণপ্রভার মৃত্যু হইলেও রজনীর প্রতি তাঁহাদিগের স্নেহের হ্রাস হয় নাই। রজনীর হীনাবস্থা হইলে তাঁহারা রজনীকে তাঁহাদিগের পুত্রের ন্যায় গৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রজনী যাহাতে স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক রজনীর দেশান্তর গমনের সংবাদ শুনিয়া, কুমুদিনীর মাতা নিতান্ত কাতরা হইলেন। হরিনাথবাবু দেশে দেশে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। তাঁহার বাটীতে সকলেই নিরানন্দ—সকলেই নিরুৎসাহ;—হরিনাথ বাবু চিন্তিত, কুমুদিনী গম্ভীর, তাঁহার মাতা কাতরা; রজনীকান্তের জন্যই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহার মাতা দিন দিন অতিশয় কৃশ এবং দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, অবশেষে শয্যাশায়ী হইলেন। গ্রাম্য কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসা করিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না; সকলে ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু ভাল ডাক্তার ত সেখানে নাই—কি উপায় হইবে, কুমুদিনী

বড় ব্যস্ত হইলেন। হরিনাথ-বাবু কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, আত্মীয়দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, তাহাদিগের মধ্যে শরৎকুমার পরম আত্মীয়, সম্বন্ধে জামাতা,—সন্তানের ন্যায় স্নেহভাজন, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী; শরৎকুমারকে একবার আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। একদিন প্রাতে শরৎকুমার আসিলেন। হরিনাথবাবু তাঁহাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং তাঁহার সাহস বৃদ্ধি হইল। বলিলেন, "তোমার শাশুড়ী মরণাপন্না, ভালরূপ চিকিৎসার কোন উপায় দেখিতেছি না, তিনি কাশীধামে যাইতে নিতান্ত মানস করিয়াছেন। তুমি বাপু একবার কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া যা হয় একটা স্থির কর, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

যে দিবস কুমুদিনী শরৎকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হইয়া থাকি, তবে সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হও"—সেই দিবস হইতে শরৎকুমার আর কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন মনে হইতে লাগিল, হয় ত কুমুদিনী সত্য সত্য তাঁহাকে ভালবাসে,—কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে দিবস তাঁহাকে রূঢ় বাক্য বলিয়াছিল। রজনীকান্তের বিষয়ের তিনি অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া রজনীর প্রতি কুমুদিনীর দয়া জন্মিয়াছিল, সেইজন্য ক্ষণিক তাঁহার প্রতি অস্নেহ জন্মিয়াছিল; বোধ হয় এক্ষণে সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া থাকিবে, এবার হয় ত কত আদর করিবে—হয় ত বিবাহে সম্মতা হইবে। আবার ভাবিলেন, কুমুদিনী ধনবান্‌কে ভালবাসে না, দরিদ্রকে ভালবাসে—রজনী এখন দরিদ্র—হয়ত তাহাকে ভালবাসে, হয় ত তাহাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু রজনী ত দেশান্তরী—দেশান্তরী বটে, সেইজন্য ত আরো বিপদ; রজনী দরিদ্র, রজনী পীড়িত, রজনী মনোদুঃখে দেশান্তরী—কুমুদিনীর কি দয়ার শেষ আছে, রজনীর প্রতি কুমুদিনীর দয়া, স্নেহ উছলিয়া উঠিয়াছে। রজনী কুমুদিনীর আদরের ভগিনীপতি, সেই রজনীর বিষয় তিনি লইয়াছেন। তিনি কে? সম্বন্ধে ভগিনীপতি মাত্র—তাঁহার প্রতি কি আর কুমুদিনী চাহিয়া দেখিবে? কখন না। এখন তিনি দরিদ্র—রজনী ধনী—যে কুমুদিনীর ভালবাসা পাইয়াছে সেই ধনী!—রজনী—রজনী—রজনী—নামটা কি কর্কশ—রজনী দুই চক্ষের বিষ—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে শরৎকুমার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া একটি দ্বারপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন শরৎকুমার আসিতেন, তখন এই দ্বারের অন্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া, হাসিতে হাসিতে, মাথার কাপড় টানিতে টানিতে, কুমুদিনী আসিয়া দাঁড়াইতেন। কিন্তু আজ কুমুদিনী কোথায়? অবাক প্রতি চাহিলেন। কুমুদিনী সেখানেও দাঁড়াইয়া নাই।

ভগ্নহৃদয়ে তাঁহার মাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কেমন আছেন?" কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, আমি মরি—আমার উপায় কর—তোমরা আমার ছেলে—রজনী আমায় ত্যাগ করে গিয়াছে; এখন তুমি ছেলের কাজ কর—আমায় কাশী পাঠাইয়া দাও।" শরৎকুমার গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "কালই পাঠাইয়া দিব।" কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "কে নিয়ে যাবে? কর্ত্তা বৃদ্ধ, অপটু, আর আমায় কে নিয়ে যাবে—আর আমার কে আছে?" শরৎকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি লইয়া যাইব, কালই লইয়া যাইব।" কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শরৎকুমার হরিনাথবাবুকে সমুদায় পরিচয় দিলেন, স্থির হইল আগামী পরশ্ব কাশীযাত্রা করা হইবে। শরৎকুমার ইতিমধ্যে বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় গিয়া তৎপরদিবসে তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া কাশী যাইবেন। হরিনাথবাবু বড় সুখী হইলেন। কুমুদিনীর মাতা কাশী যাইবার উৎসাহে অনেক আরোগ্য বোধ করিলেন। শরৎকুমার সকলকে সুখী করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনীকে চকিতের ন্যায় একবার দেখিতে পাইয়াছিলেন; আহার করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিবার সময় দেখিয়াছিলেন, দোতলার একটি কক্ষে, কুমুদিনী ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া, একটী পরিচারিকার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। শরৎ একবার চকিতের ন্যায় দেখিয়া চক্ষু মুদিলেন, আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না—লজ্জায় চাহিতে পারিলেন না। যাহাকে ভালবাসা যায়, সে যদি ভালবাসা প্রত্যর্পণ না করে, তবে তাহার প্রতি প্রকাশ্যে চাহিতে লজ্জা করে। সেই জন্য কুমুদিনীকে দ্বিতীয়বার দেখিতে লজ্জা করিল। শরৎকুমার বাটী ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মন ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না—মন কুমুদিনীর নিকট রাখিয়া আসিলেন। যে দিবস গঙ্গাতীরে কুমুদিনীকে দেখিয়াছিলেন—স্নান করিয়া আগুল্‌ফ পর্য্যন্ত কেশরাশি আলুলায়িত করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সেই কুমুদিনী আজি তাঁহাকে চাহিয়া দেখিল না। শরতের মনে মনে কত দুঃখ হইল! কাহার জন্য চাহিয়া দেখিল না? রজনীর জন্য—আবার রজনী! রজনী—রজনী—রজনী—রজনী দিবারাত্র কি তাঁহাকে জ্বালাতন করিবে। দিবারাত্র কি তাঁহার হৃদয়ে কালসর্পের ন্যায় দংশন করিবে! রজনী তাঁহার পরম শত্রু—তাঁহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়া পরম শত্রুর কাজ করিয়াছে। কুমুদিনী বলিয়াছিল "তুমি এখন ধনী, তোমায় যদি বিবাহ করি লোকে কি বলিবে? বলিবে ধনলোভে কুমুদিনী বিবাহ করিয়াছে—আমি যদি কখন বিবাহ করি তবে দরিদ্রকে।" রজনী তাঁহাকে ধনী করিয়া আপনি দরিদ্র হইয়া কি বাদ সাধিয়াছে!

তিনি ত মনে করিলেই আবার দরিদ্র হইতে পারেন," তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কুমুদিনীর দয়া জন্মিতে পারে। কাহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিবেন, রজনীকে?—সে ত দেশে নাই—তবে কাহাকে—তবে আর কে এমন সম্পর্কীয় ব্যক্তি আছে?—আছে বই কি।

সেই দিবস রাত্রে জনরব হইল যে, রতিকান্ত বাঁড়ুয্যের উত্তেজনায় শরৎকুমার তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের পরিবর্ত্তে সমুদায় বিষয় ছাড়িয়া দিতেছেন। শুনিয়া হরিনাথ বাবু বড় দুঃখিত হইলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট সংবাদ দিলেন। বলিলেন, "আমি গিয়া একবার বুঝাইয়া আসি।" অনেক ক্ষণের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "শরৎকুমার উন্মত্ত হইয়াছে, সমস্ত বিষয় রতিকান্তকে লিখিয়া দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে।" কুমুদিনী ভাবিলেন, কেবল উন্মাদ নহে "প্রেমোন্মাদ।" হায়! শরৎকুমার তুমি কি দুর্ভাগ্য! তুমি কি এই কথাটির জন্য দরিদ্র হইলে? কি অদৃষ্ট!

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

কুমুদিনীর বিপদ

পরশ্ব আসিল। হরিনাথ বাবু পূর্ব্ব কথানুসারে সপরিবারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কুমুদিনী ও ভ্রাতৃকন্যা বিনোদিনী ও দুই জন পরিচারিকা চলিল। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া এক স্থানে বাসা লইলেন। পরদিবস সন্ধ্যার গাড়িতে কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে হাবড়ায় যাইয়া হরিনাথ বাবু একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি সমুদায় ভাড়া করিয়া আসিলেন। এই দিবসে শরৎকুমারের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু বেলা দুই প্রহর হইল, তথাচ তাঁহার দেখা নাই। বেলা একটার পর হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার হইল। এবং তৎপরেই মুসলধারে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। দুইটা, তিনটা, ক্রমে চারিটা বাজিল, তথাচ শরৎকুমারের দেখা নাই। অপরাহ্ণ হইল, এখনো মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু হরিনাথ বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সপরিবারে একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন, স্ত্রীলোকেরা ভগ্নোৎসাহে উঠিলেন। শরৎকুমারের না আসাতে বড় নিরুৎসাহ হইল, গাড়ি অতি কষ্টে যাইতে লাগিল। সহর জলময়—অট্টালিকাশ্রেণী সকল জলেতে ভাসিতেছে। রাজপথে কোমর সমান জল হইয়াছে, তথাপি অসংখ্য গাড়ি এবং পাল্কি যাতায়াত করিতেছে। ঘোড়াদিগের

বুক পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে, শিবিকাবাহকদিগের কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছে, অসময়ে অন্ধকার হওয়াতে বিলাতি দোকানে, ও বড় বড় অট্টালিকাতে আলো জ্বলিয়াছে, সেই আলোর প্রতিবিম্ব রাস্তার জলে পড়িয়াছে। অবিরত গাড়ির যাতায়াতে রাস্তার জলে ছপ ছপ শব্দ হইতেছে। আজ সহরের নূতন প্রকার শোভা হইয়াছে। কুমুদিনী ও বিনোদিনী কখন কলিকাতা দেখেন নাই। গাড়ির কপাট ঈষৎ খুলিয়া সহরের শোভা দেখিতে দেখিতে কুমুদিনী হঠাৎ চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে শরৎকুমার!" স্ত্রীলোকগণ মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, যে শরৎকুমার সেই মুসলধার বৃষ্টিতে অতি দীন দুঃখীর ন্যায় ভিজিতে ভিজিতে হাবড়ার দিকে যাইতেছেন। বৃষ্টির জল তাঁহার মস্তক বহিয়া পড়িতেছে। তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর রাস্তার জলে ডুবিয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে গমন করিতেছেন। হরিনাথবাবু "শরৎকুমার" "শরৎকুমার" বলিয়া ডাকিলেন। শরৎকুমার শুনিতে পাইলেন না—বায়ুসন্তাড়িত বৃষ্টিধারা তাঁহার মুখমণ্ডলে আঘাত করাতে মস্তক নত করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। হরিনাথবাবু গাড়ী থামাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকাতে শরৎকুমার শুনিতে পাইয়া, তাঁহাদিগের নিকট হাসিতে হাসিতে আসিলেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের চক্ষে জল আসিল। হরিনাথবাবু তাঁহার স্থান ত্যাগ করিয়া শরৎকুমারকে গাড়ির ভিতর বসিতে অনুরোধ করিলেন। শরৎকুমার কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না—বলিলেন, "আপনারা অগ্রসর হউন আমি ঠিক সময়ে আপনাদিগের সহিত মিলিব।" হরিনাথবাবু অতি কষ্টে তাহাই স্বীকার করিলেন। শরৎকুমার পদব্রজে চলিলেন। ঝড় বৃষ্টি আর গ্রাহ্য নাই, সেই গাড়িপ্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিলেন। দুই একবার দেখিলেন, কে যেন মুখ বাড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। শরৎ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। ঠিক সময়ে হাবড়ায় পৌঁছিলেন। হরিনাথবাবু স্ত্রীলোকদিগকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া, তাঁহার জন্য বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, শরৎকে গাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। গাড়ির ভিতরে গিয়া শরৎকুমারের কম্প ধরিল—শরীর অবশ হইল, হস্তদ্বারা যে শরীর মুছেন, এমন ক্ষমতা নাই। একখানি গামছা লইয়া কুমুদিনী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া, ঈষৎ মুখাবরণ করিয়া, মস্তক নত করিয়া অগ্রসর হইলেন। শরৎকুমার তাঁহার নিকট হইতে গামছা চাহিয়া লইলেন, কিন্তু হস্ত কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া হরিনাথবাবু কুমুদিনীকে গা মুছাইয়া দিতে বলিলেন। কুমুদিনী আরো মাথায় কাপড় টানিলেন, বাম হস্ত দ্বারা সলজ্জে শরৎকুমারের হস্ত ধরিলেন; যেন প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্মদলগুলির দ্বারা শরতের প্রকোষ্ঠ বেড়িল! আর দক্ষিণ হস্তে গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা তাঁহার গা মুছাইতে লাগিলেন। মরি মরি, শরৎকুমার! এ আবার তোমার কি সুখ! ক্রমে যখন বক্ষঃস্থল মুছাইতে হইল, যখন কুমুদিনীর

মস্তক শরতের মস্তকের নিকট আনিতে হইল, তখন কুমুদিনীর ব্রীড়াবিকম্পিত ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আসিল, সে হাসি কেবল শরৎকুমার দেখিতে পাইলেন। দুই জনের মাথায় মাথায় এক হইল, দুই জনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, নয়নে নয়ন পড়িল, লজ্জায় কুমুদিনী আবার ঈষৎ হাসিলেন। কুমুদিনী ঠিক বলিয়াছিলেন, যে "শরৎকুমার ছেলে মানুষ।" শরৎ সে হাসির প্রত্যুত্তরে আরো কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার কম্প দেখিয়া কুমুদিনী ব্যস্ত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা শরতের দুই বাহু চাপিয়া ধরিলেন, যেন হৃদয়ে তুলিয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া শরৎকুমারের মুখমণ্ডল মলিন হইল, ক্রমে অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই অচেতনপ্রায় কুমুদিনীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। কুমুদিনী অতি যত্নে তাঁহাকে অন্য স্থানে শয়ন করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরতের মুখপানে চাহিয়া সে চেষ্টা দূর হইল, আপনার ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। ভাল, কুমুদিনী, তোমার একি চরিত্র ? তুমি রজনীকে দেশান্তরিত করিলে, শরতের মাথা ঘুরাইয়া ফেলিলে, ছিঃ একি দৌরাত্ম্য !—তুমি কি একদিনও ভাবিলে না যে মনুষ্যহৃদয় এক বস্তুতে নির্ম্মিত, বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির হৃদয় অধিক কোমল। তুমিও যে একদিন রজনী কি শরতের স্পর্শসুখে মরিবে, সেদিন যে তোমার অতি নিকট ! ছি ! আপনার হৃদয় আপনি বুঝিতে পার না।

বড় হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল। বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বোধ হয় কিছু বুদ্ধি লইয়া ঘর করিতেন; বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যেদিন তিনি বলিলেন যে, আর গ্রন্থসমালোচনা করিব না—সেইদিন হইতে বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে, আর সেই সকল হরিত কপিশ নীল পীত রক্ত আবরণে রঞ্জিত, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু অবয়বধারী পুস্তক সকলের আমদানি কমিল। ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের আর বড় সম্বন্ধ রহিল না। ক্রিয়া বাড়ীতে লোকজনের ভোজনের পর স্থান পরিষ্কার হইয়া গেলে পর, গৃহের যেরূপ অবস্থা হয়, বঙ্গদর্শন পুস্তকালয়েরও সেই দশা হইল; ফলাহার সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া দুই একটী আহুত ভদ্রলোক ব্যতীত, অনাহুত, রবাহুত, ভদ্র অভদ্র প্রাঙ্গণে সম্মার্জ্জনীর ঘর্ষণ শব্দ শুনিয়া বিমুখ হইতে লাগিল—কেবল দুই একজন নাছোড়বান্দা ফকির দরওয়াজা ছাড়ে না। সাহিত্যসংসারের কাকের দল আলিসার উপর জুটিয়া অকালের ফলার বন্ধের পক্ষে ঘোরতর প্রটেষ্ট আরম্ভ করিল—আর যাঁহারা সাহিত্যসমাজের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীব তাঁহারা দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া উৎসৃষ্ট কদলীপত্রের উপর ক্ষুদ্র রকম কুরুক্ষেত্র আরম্ভ করিলেন। শেষে শান্তি উপস্থিত হইল।

অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া বঙ্গদর্শনের বর্ত্তমান সম্পাদক আবার পত্রমধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থের সাধারণতঃ সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি বঙ্গসাহিত্য সমাজে ঘোষিত হইল যে—সে বাড়ীতে আবার ফলার। আবার দেখিতেছি, ন্যায়ালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যানিধি, বিদ্যাকপীশ, টিকির উপর চাঁপা ফুল ঝুলাইয়া, নামাবলীর কোণে ভক্তিভাবে যান্ত্রিক বিল্বপত্র দূর্ব্বাদল বাঁধিয়া, সমালোচন ফলাহারে উপস্থিত। আবার দেখিতেছি সেই আহুত, অনাহুত, কাঙ্গালী, ফকির, আত্মগরিমার জলে আশা-কদলীপত্রখানি ধৌত করিয়া, যশোরূপ লুচিমণ্ডার আশায় পাত পাতিয়া বসিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, যে বড় হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সদ্‌গ্রন্থের সমালোচনার অপেক্ষা সুখ

আর নাই। কিন্তু যে স্তূপাকার ছাই ভস্ম প্রতিদিনের ডাকে, আমাদিগের আপিসে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সমালোচনা বড় দুঃখদায়ক—তাহার পঠন অপেক্ষা কষ্ট বুঝি আর নাই।

আমাদিগকে যে জ্বালা পোহাইতে হয়, তাহার দুই একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকের কিছু করুণা জন্মিতে পারে। কি শুভক্ষণে লর্ড লিটন ভারতেশ্বরীর নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিতে পারি না—কিন্তু সেইক্ষণ অবধি, কবিদিগের প্রাণ গেল। সেই অবধি "ভারতেশ্বরী" সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ মার্জ্জনা করিবেন, ক্ষুদ্রাশয় পাঠকদিগের জন্য আমরা একটী উপমা প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারি না। যে কেহ নৌকাপথে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই চরস্থিত পক্ষিগণের চরিত্র অবগত আছেন। এক এক চরে বহুসহস্র পক্ষী পালে পালে বিচরণ করিতে থাকে। কোন শব্দ নাই—কোন গোল নাই। কিন্তু যদি কোন অসতর্ক নৌপথিক দৈবাৎ, লোভপরতন্ত্র হইয়া একটী বন্দুকের আওয়াজ করেন—তবে বড় বিপদ—সেই সহস্র সহস্র পক্ষী এককালীন উড্ডীন হইয়া কিচির মিচির চিচির ছিছি প্রভৃতি চীৎকার করিয়া একবারে কর্ণরন্ধ্র বিদীর্ণ করে। তখন চিচি কুচি ছিছির জ্বালায় অস্থির হইয়া পথিক কোথায় পলাইবেন, পথ পান না। তেমনি, এই বঙ্গসাহিত্য মরুভূমিবিহারী কবিবিহঙ্গমণ্ডলীর শ্রুতিপথে, হঠাৎ লর্ড লিটন দিল্লীর কামান দাগিয়া, বড় কিচির মিচির রব তুলিয়া দিয়াছেন—আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

এই কিচিরমিচির কাকলী কললহরী মধ্য হইতে দুই একটী সুরতরঙ্গ পাঠক মহাশয়ের পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—পাঠক দেখুন—গায়ক শ্রীরাধাবল্লভ দে, কুমারখালি স্কুলের ছাত্র—

ভারতের জয়ধ্বনি,
শুভ আশীর্ব্বাদ বাণী,
ভীম, বজ্রনাদে ওই উঠিল গগনে;
অমর অমরীগণে,
ত্রাসে জয়নাদ শুনে,
কাঁপিল সভয়ে তারা মনে ভয় গণে;
মর্ত্ত্যলোক কাঁপাইল,
কাঁপাইল রসাতল,
কাঁপাইল সর্ব্বস্থল সর্ব্ব রাজপুরী;—
ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী!
গভীর গর্জ্জন করি,
অতি ভীম বেগ ধরি,

ব্রিটিসের জয়কারী কামান ছুটিল,
মহীধর হিমালয়,
মনানন্দ ঘোষণায়,
গঙ্গারূপে নয়নাশ্রু হরষে ত্যজিল;
সুখনীরে মগ্ন হয়ে,
সুখধ্বনি শব্দ পেয়ে,
প্রতিধ্বনি শব্দে বলে ওই বিন্ধ্যাগিরি;—
"ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী।"

অমর অমরীগণে যদি এমনই কথায় কথায় কাঁপিয়া উঠিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কেহ বিশেষ আপত্তি করিবে না; কিন্তু মহীধর হিমালয় "মনানন্দ ঘোষণায়" এত কালের পর গঙ্গারূপে নয়নাশ্রু ত্যাগ করিবেন, ইহাতে বিশেষ আপত্তি। একান্ত পক্ষে কুমারখালী স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের এত বিদ্যা দেখিয়া বিশেষ আপত্তি করিবেন আশঙ্কা করি।

এত গেল বীররস। তার পর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত চিত্তোন্মাদিনী নামে গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আদিরসের পরীক্ষা করুন।

(সখি!) আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগনে উদয় রে।
শরদেন্দু সুধাকরে,
লইয়া প্রকৃতি করে,
জীবন সঞ্চার করে,
মহীরুহকুলে রে।
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগনে উদয় রে॥
(সখি রে!) কহ্লার কুমুদ কত,
পদ্ম কোকনদ যত,
কিবা শোভে অবিরত,
জলজাত কুলে রে॥
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগনে উদয় রে॥

—ইত্যাদি।

দেখ কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

"শরদেন্দু সুধাকরে, লইয়া প্রকৃতি করে,
জীবন সঞ্চার করে, মহীরুহ কুলেরে।"

শরদিন্দুকে পদচ্যুত করিয়া শরদেন্দু, পক্ষীর স্থায় প্রকৃতির করে উঠিয়া, মহীরুহ-কুলের জীবন সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরদেন্দুর আশ্চর্য্য শক্তি বলিতে হইবে—একবারে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করিয়াছেন। যাহাই হউক দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় চিত্ত উন্মাদিনী পাঠকদিগের এমনি চিত্তের উন্মাদ জন্মিয়া দিবার সম্ভাবনা যে আমরা বিবেচনা করি, লেখক পথে ঘাটে সতর্ক হইয়া বাহির হইবেন। অনেকেই উন্মত্ত।

গীতিকাব্য ছাড়িয়া একবার নাটকে হাত দিয়া দেখা যাউক। যে নাটকখানি হাতে উঠিল তাহার নাম বীরেন্দ্রবিনাশ। এটী বিরাট পর্ব্বান্তর্গত কীচকবধবিষয়িণী অপূর্ব্ব কথা লইয়া রচিত হইয়াছে। নাটক-কুলগুরু সেক্ষপীয়র দেশকালের প্রভেদ বড় মানেন না; হৃদয়াভ্যন্তরের চিত্রে একাগ্রচিত্ত হইয়া বাহ্য সংস্কারে অনেক সময়ে অমনোযোগী। প্রাচীন "গল" বা প্রাচীন রোমানের মুখে অনেক সময়ে আধুনিক ইংরেজের মত কথা বসাইয়াছেন। বাঙ্গালী নাটককার সকলেই মনে করেন আমিরা একটী ক্ষুদ্র সেক্ষপীয়র, আমরাও ঐরূপ করিলে ক্ষতি নাই। বীরেন্দ্রবিনাশের আরম্ভে বিরাটমহিষীর দুই পরিচারিকার যে কথোপকথন আছে, তাহা হইতে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই আমাদের কথা প্রমাণীকৃত হইবে। কিন্তু পাঠকদিগকে সে দুঃখ দিতে পারি না; আমরা দয়ালুচিত্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

তার পর আর একখানি নাটক হাতে তুলিলাম—নাম সুকুমারী নাটক। এক স্থানে দেখিলাম, কেশববাবুর চরিত্র লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা—লেখক বোধ হয় মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে নাটক বিশিষ্ট প্রকারে নাটকত্ব প্রাপ্ত হইল। তার পর একস্থানে একটী কবিতা খুঁজিয়া পাইলাম। নায়িকা সুকুমারী আওড়াইতেছেন;—

দেখনা কেমন—শশী সুচিকন
জগত ভূষণ উঠেছে ঐ
উহার তুলনা, তুল না তুল না
জগতে ললনা অমন কৈ।

পড়িতে পড়িতে বদন অধিকারীকে মনে পড়িল—"ছিই! ছিই! চাঁদের তুলনা।" আমাদিগের একটী বন্ধু কবিতাটি আর একটু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যথা—তুলনা তুল না, বল না ললনা, করো না ছলনা, চিত্তচলনা, নলিনীললনা, ভোজন হলো না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকে বলে বাঙ্গালার সাহিত্য!

পঞ্চম বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা

সমালোচনার্থ বিশ্ববিষ চিকিৎসা* নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। সর্পবিষ চিকিৎসা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়, অতএব কেবল সেই বিষ চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

কয়েক বৎসর হইল সর্পবিষ লইয়া বহুল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় একা ডাক্তার ফেরার সাহেব প্রায় পাঁচ শত প্রকার পরীক্ষা করেন † তদ্ভিন্ন ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং মান্দ্রাজে ডাক্তার সর্ট সাহেব, অষ্ট্রেলিয়া দেশে ডাক্তার হেলফোর্ড সাহেব প্রভৃতি অনেকে অনেকরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায় মাত্রাভেদে সর্পবিষ নানা জন্তুর শরীরে নানা প্রকারে প্রবিষ্ট করাইয়া বিষের ক্রিয়া দেখা হইয়াছে। কখন পিচকারি দ্বারা শিরামধ্যে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছে, কখন বা জন্তুকে সর্প দ্বারা দংশিত করাইয়া শরীরে বিষ প্রবিষ্ট করান হইয়াছে এবং অনেক সময়ে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধও ব্যবহার করান হইয়াছে; কিন্তু ডাক্তার ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় কোন ঔষধ অব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। "নরবিষ" নামে এক গাছের পাতা অব্যর্থ বলিয়া মুঙ্গের অঞ্চলে কতক প্রসিদ্ধ, কিন্তু পরীক্ষায় তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সিংহল দ্বীপে দুই শত বৎসর অবধি একটী ঔষধ অব্যর্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ডাক্তার রিচার্ড ও ডাক্তার ফেরার সাহেব উভয়ে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশীয় সর্পবিষে ঐ ঔষধ কোন উপকার করিতে পারে না। ঝাঁন্‌সির কমিসনর এডওয়ার্ডস্‌ সাহেব পরীক্ষার্থ পুরিয়া পারু (Pooreya Paru) নামে পশ্চিমাঞ্চলের এক বন্যগাছ ফেরার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, সর্পবিষে ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য, তিনি তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় কোন গুণই

* শ্রীহরিমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

† Thanatophidia of India by J. Fayrer, M.D., C.S.I., F.R.S.E. 1872 price Rs. 80.

প্রকাশ হইল না। হিগিন্স নামে জনৈক সাহেব লেখেন ‡ যে, যে জাতির বিষ সেই জাতির পিত্ত তাহার অব্যর্থ ঔষধ কিন্তু পরীক্ষায় তাহাও সপ্রমাণিত হইল না। এইরূপে দেশী বিদেশী কোন ঔষধই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। শেষ এই প্রতিপন্ন হইল যে সর্পবিষের ঔষধ নাই।

কিন্তু সর্পবিষের ঔষধ নাই শুনিয়া কে নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে? ঔষধ প্রকৃত হউক অপ্রকৃত হউক প্রচলিত থাকিবে; যে কারণে একালপর্য্যন্ত ঔষধ প্রচলিত আছে সেই কারণেই প্রচলিত থাকিবে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষা সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি যে, তিনি কেবল কুক্কুট, কুক্কুর, বিড়াল, ছাগ প্রভৃতির দেহে ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, মনুষ্যদেহে করেন নাই। অতএব মনুষ্যশরীরে ঐ সকল ঔষধ কিরূপ ক্রিয়া করিত তাহা ফেরার সাহেব জানিতে পারেন নাই। তিনি এই মাত্র অনুভব করিয়াছিলেন যে যদি সর্পদষ্ট ছাগাদি ঐ সকল ঔষধে রক্ষা পাইল না তবে মনুষ্যও রক্ষা পাইতে পারে না।

ফেরার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুগণ যে মাত্রা বিষে মরিয়া থাকে বিড়াল ও বেঁজি সেই মাত্রা বিষ সহ্য করিতে পারে। কুক্কুর ও বিড়াল মধ্যে যদি এরূপ প্রভেদ থাকে তবে মনুষ্যের সম্বন্ধে যে কিছুই প্রভেদ নাই ইহার নিশ্চয়তা কি? কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে সর্পবিষে লবণাক্ত একপ্রকার দ্রব্য আছে (Sulphocyanide of potassium) এই দ্রব্য মনুষ্য নিষ্ঠীবনে পাওয়া যায়। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে সর্পবিষের ক্রম ছাগাদির শরীর অপেক্ষা আমাদের দেহে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। কেন না পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সবিষ সর্পদংশনে সবিষ সর্প সচরাচর মরে না।

‡ Mr. S. B. Higgins writing to the European Mail in 1870 says "All animal poisons have their specific antidotes in the gall of the animal or reptile in which these poisons exist. The bite of the Cobra or of any other poisonous snake or the reptile can be cured by administering a few drops of a preparation of the gall of the Cobra, which should be prepared as follows:—pure spirits of wine of 95 per cent alcohol or the best high wines that can be procured 200 drops; of the pure gall 20 drops; in a clean two ounce phial, corked with a new cork; give the phial 150 or 200 shakes, so that the gall may be thoroughly mixed with the spirits and the preparation is ready for use. In case of bite put 5 drops (no more) of the preparation into half a tumblerfull of pure water—pour the water from one tumbler into another backward and forwards several times that the preparation may be thoroughly mixed with the water and administer a large tablespoonfull of the mixture every three or five minutes until the whole has been given."

কেউট্যিার দংশনে কেউটিয়া কখন মরে না কিন্তু কেউটিয়ার দংশনে গোখুরা কখন কখন মরে। যাহার নিজের বিষ আছে সে জন্তু অন্যের বিষ কতক সহ্য করিতে পারে। আমরা এমন বলিতেছি না যে মনুষ্যের বিষ আছে বা সেই জন্য মনুষ্য সর্পবিষ সহ্য করিতে পারে; আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে যদি মনুষ্যমুখে পূর্ব্বোক্ত লবঁাক্ত দ্রব্য থাকে তাহা হইলে ছাগাদির দেহে বিষক্রিয়া যেরূপ হয় আমাদের শরীরে সেরূপ না হইতে পারে। ডাক্তার ফেরার সাহেব ছাগাদির শরীরে বিষক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাদের শরীরে যে সেই ক্রিয়া অনুভব করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত না হইলে না হইতে পারে। বিশেষতঃ, মনুষ্যের মধ্যে যাহারা অহিফেণ বা আফিং ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের শরীরে বিষক্রিয়া স্বতন্ত্র। তাঁহারা অনায়াসে কিয়দংশ বিষ সহ্য করিতে পারেন, এমন কি শুনা যায় তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন সন্ন্যাসী কৌটার মধ্যে সর্প পালন করিয়া থাকেন, যে দিবস আফিং সংগ্রহ করিতে না পারেন সেই দিবস সর্পকে উত্তেজনা করিয়া আপন শরীরে বিষ গ্রহণ করেন বিষের দ্বারা তাঁহাদের কেবল অহিফেণের অভাব পূরণ হয় মাত্র কোন অনিষ্ট হয় না। এই সকল কারণে বলিতেছিলাম ছাগাদির শরীরে বিষ পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদেহে তাহার ফল অনুভব করা অনুচিত।

এ স্থলে সর্প-ঔষধের সাপক্ষে এই তর্ক করা যাইতে পারে যে, যে ঔষধে ছাগ বাঁচিল না সে ঔষধে মনুষ্যও যে বাঁচিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? দ্রব্যগুণ সকল জন্তুর প্রতি সমভাবে খাটে না, যে দ্রব্যের কোন ক্রিয়া ছাগশরীরে লক্ষিত হয় না সেই দ্রব্য হয় ত কুক্কুর শরীরে বিষতুল্য, মনুষ্যদেহে ঔষধ হইতে পারে।

আর এক কথা আছে। সর্পদষ্ট হইলে কুক্কুট যত শীঘ্র মরে কুক্কুর তত শীঘ্র মরে না, আবার কুক্কুর অপেক্ষা ঘোটক আরও বিলম্বে মরে। অর্থাৎ বৃহৎ দেহের রক্ত বিষাক্ত হইতে বিলম্ব হয়, যে স্থলে রক্ত অধিক এবং বিষ অল্প সে স্থলে ঔষধের ফল কি হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বাকি আছে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় এ বিষয়ে গুরুতর দোষ আছে। কুক্কুর ও ছাগ যে মাত্রা বিষে বিনষ্ট হইয়াছে ফেরার সাহেব অনেক সময় সেই মাত্রা বিষ ক্ষুদ্র কুক্কুটের শরীরে প্রবেশ করাইয়া ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে যে ঔষধের যথার্থ পরীক্ষা হইয়াছে এমত বলা যায় না। সর্পদষ্ট কুক্কুট বিনা ঔষধে সচরাচর ১৫ কি ২০ মিনিটে মরে কিন্তু দেখা গিয়াছে বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ হইলে কুক্কুট ঐসময়ের দুই তিন গুণ বিলম্বে মরিয়াছে। এস্থলে বলিতে হইবে ঔষধের কিছু ক্রিয়া থাকিলে থাকিতে পারে।

টাঞ্জোর প্রদেশে এক প্রকার বটিকা প্রচলিত আছে। ডাক্তার রসল সাহেব আপনার গ্রন্থে তাহার প্রকরণ লিখিয়াছেন* এই বটিকা অতি প্রসিদ্ধ। কলিকাতার

---

* The following recipe of Tanjore Pills is given in Dr. P. Russell's work on Indian serpants.

স্কট টমসন ঔষধ বিক্রেতাদিগের মধ্যে একজন সাহেব এই বটিকা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার্থ ডাক্তার ফেরার সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও ফেরার সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ডাক্তার রিচার্ড সাহেব ঐ ঔষধ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বন হইতে প্রকাণ্ড কালীয় (কেউটা) সর্প আনাইয়া তাহার ফণা একটি ষাঁড়ের অঙ্গে সংলগ্ন করাইয়া দেন। সর্প অতি রাগভরে ষাঁড়কে এমত দংশন করে যে শেষ বলদ্বারা সর্পকে ছাড়াইয়া লইতে হয়। কিন্তু এ প্রকার দংশনেও ষাঁড় মরে নাই, টাঞ্জোর বটিকা পুনঃ পুনঃ সেবন করাইয়া ষাঁড় রক্ষা পাইয়াছিল। আর একটী ছাগ আনাইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। টাঞ্জোর বটিকাদ্বারা ছাগও রক্ষা পাইয়াছিল। পরে একটী কুক্কুটকে ঐ ঔষধ সেবন করান হয় কিন্তু কুক্কুট ৪৫ মিনিটের মধ্যে মরিয়া যায়।

এই সকল বৃত্তান্ত সর্প-ঔষধের সাপক্ষে আছে কিন্তু বাস্তবিক ইহা গ্রাহ্য কি না সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যে ঔষধ খাওয়াইতে হয়, তাহা বোধ হয় সর্পাঘাতের কোন উপকার করিতে পারে না। ঔষধ পাক-স্থলী হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে যে বিলম্ব হয়, সর্পাঘাতে তাহার সময় থাকে না। রক্তের সহিত বিষ ছুটিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ না ছুটিলে কোন ফল হইতে পারে না এ জন্য সর্পাঘাতে ঔষধ সেবন বৃথা। তবে যে এই মান্দ্রাজি বটিকা দ্বারা ষাঁড় ও ছাগ রক্ষা পাইয়াছিল তাহার প্রকৃত কারণ যে দংশনের পূর্ব্বে উভয়কেই ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল, ঔষধ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সময় পাইয়াছিল। নতুবা বৃথা হইত।

"মালবৈদ্যের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা" নামে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক দশ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক স্থানে লিখিত আছে যে সর্পৌষধ যত প্রকার প্রচলিত থাকুক মালবৈদ্যেরা তাহার কিছুই বিশ্বাস করে না।

Take white arsenic
,, roots of velle-navi
,, roots of Neri-vishana
,, roots of Nervelum
,, black pepper
,, quicksilver
of each equal quantities

,, Juice of the wild cotton (Madur) sufficient to make into a mass and divide into five grain pills, each pill contains a little over half grain of quicksilver and arsenic. These pills are given in doses of one or two; and at intervals of an hour in some cases not so frequently. A fowl's liver also to be applied directly to the bite which is to be scarified.

ডাক্তার ফেরার সাহেবও সেই কথা লিখিয়াছেন। "All the snakemen that I have seen admit that they have little or no belief in any medicines" সর্পব্যবসায়ীরা ঔষধ মানে না, অব্যবসায়ীরা তাহা মানেন। তাঁহারা পরস্পর সকলেই দুই একটি ঔষধ শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন। পল্লী-গ্রামে যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন তিনি একটা না একটা ঔষধ বলিয়া দিবেন; কেহ বলিবেন, "গোয়ালিয়া" লতা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ; কেহ বলিবেন নিমুখার মূল অব্যর্থ ঔষধ। এইরূপে তুলাটাপারি, আস্‌সেওড়া, হুড়হুড়ে প্রভৃতি বাঙ্গালার সমুদায় বৃক্ষ সমুদায় লতা সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইবে। আবার অনেকে বলিবেন তাঁহাদের ঔষধ বিশেষ পরীক্ষিত। তাহা সত্য হইতে পারে, সর্পাঘাত মাত্রেই মারাত্মক নহে; সকল দংশনে দন্ত বিদ্ধ হয় না, বিদ্ধ হইলেও সকল বার বিষস্খলন হইতে পায় না, হয় ত বিষকোষে পূর্ণ মাত্রা বিষ থাকে না। এ অবস্থায় মৃত্যুর আশঙ্কা নাই, ঔষধ ব্যবহার করা না করা তুল্য। এ অবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগীর উপকার যত হউক না হউক, রোজার উপকার হয়। ঔষধ বা মন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি হয়; লোকে মনে করে ঔষধে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

মালবৈদ্যের মতে সর্প চিকিৎসার যে গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কেবল একটী ঔষধের কথা আছে; সর্ষপ তৈলে তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। তৈল এবং তেঁতুল উভয়ই বিষঘ্ন সত্য, কিন্তু মালবৈদ্যেরা কেবল বমন করাইবার নিমিত্ত এই ঔষধ ব্যবহার করে। ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

বিশ্ববিষ চিকিৎসা গ্রন্থে, সেবন করিবার নিমিত্ত নয় প্রকার দেশীয় ঔষধ লিখিত হইয়াছে। যথা—

১। জিয়াল গাছের ছাল বা পত্রের রস।

২। কাঁটানোটের রস লবণ ও চিনির সহিত।

৩। দশটি রক্তজবার তাজা পাতা ও ধুতুরার মূল একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃত বা পানের রস অথবা দুগ্ধের সহিত।

৪। সেওড়ার পাতা, ডাঁটা, মূল।

৫। আমরুলের রস।

৬। সজিনার মূলের ছাল।

৭। তেলাকুচের পাতা গোলমরিচের সহিত।

৮। কুঁচের পাতা গোলমরিচের সহিত।

৯। ছোট শিমুল গাছের পাতার রস।

এই সকল ঔষধের উপর কেন নির্ভর করা যাইবে এবং ইহা কিরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার একেবারে লিখেন নাই। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিশেষ পারদর্শিগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সর্পবিষের ঔষধ নাই। তাঁহাদের পরীক্ষার পর বিশ্ববিষ চিকিৎসা লিখিত হওয়ায় আমরা মনে করিয়াছিলাম গ্রন্থকার তাঁহাদের মতখণ্ডন করিয়াছেন এবং সর্পবিষের যে ঔষধ আছে ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে আমরা নিরাশ হইলাম। গ্রন্থকার বোধ হয় পূর্ব্ব পরীক্ষার কথা অবগত নহেন। অথবা তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে তাঁহার লিখিত ঔষধ পূর্ব্বে পরীক্ষিত হয় নাই এই জন্য তাঁহার এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার অধিকার আছে। কিন্তু থানাটোকিডিয়া গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে—"To conceive of an antidote, in the true sense of the term, to snake-poison one must imagine a substance so subtle as to follow, overtake and neutralize the venom in the blood, or that shall have the power of counteracting and neutralizing the deadly influence, it has exerted on the vital forces. Such a substance has still to be found and our present experience of the action of drugs does not lead to hopeful anticipation that we shall find it." বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক কি মনে করেন যে, এই সকল গুণ তাঁহার লিখিত ঔষধে পাওয়া যাইতে পারে, অথবা এ সকল গুণ সর্পৌষধে অনাবশ্যক ?

ডোরবন্ধন, রক্তমোক্ষণ এবং বিষশোষণ সর্পাঘাতের প্রকৃত চিকিৎসা।

বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক ক্ষতস্থানের নিমিত্ত এক প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই প্রলেপ ব্যবহার করিলে বিষ ক্ষতমুখে আইসে; কিন্তু তাহা কতদূর সত্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। কোন শক্তি দ্বারা প্রলেপ রক্তের স্রোত হইতে বিষকে ফিরাইয়া আনিবে তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক প্রলেপ দ্বারা বিষ যদি ক্ষতমুখে আসিবার সম্ভব হয় তাহা হইলে চিকিৎসা অতি সহজ হইবে সন্দেহ নাই; ক্ষতমুখে বিষ আনীত হইলে রক্তমোক্ষণ করিলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে অথবা সেই সময় বিষশোষণ করিলেও হইতে পারে। কিন্তু বিষশোষণ নিতান্ত সহজ নহে; মুখ দ্বারা শোষণ করিলে অনেক সময় বিপদ সম্ভব। আবার শুনা যায় মুখে তৈল রাখিয়া বিষশোষণ করিলে বিপদের আর বড় আশঙ্কা থাকে না। বিষশোষণের নিমিত্ত একরূপ চুম্বক প্রস্তর ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে সচরাচর ইংরেজীতে snakestone বলে, বাঙ্গালায় বিষপ্রস্তর বলে। বাস্তবিক ইহা প্রস্তর নহে দগ্ধ অস্থি মাত্র, ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয় তাহা হার্ডি সাহেব সবিস্তারে লিখিয়া

গিয়াছেন। ভারতবর্ষে, সিংহল দ্বীপে, মেক্সিকো রাজ্য প্রভৃতি অনেক দেশে এই প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অনেক স্থানে ইহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে বিষপ্রস্তর বিষশোষণ করে। বাস্তবিক দেখা যায় ক্ষতস্থানে স্পর্শ করাইলেই বিষপ্রস্তর তথায় দুই তিন মিনিট পর্য্যন্ত সংলগ্ন থাকে, পরে রক্ত শোষণ করিলে রক্ত ভরে পড়িয়া যায়। ডাক্তার ফেরার সাহেব ইহার কতক সাপক্ষ; তিনি লিখিয়াছেন যে "There is a germ of possible truth in the idea, that these stones can be of use, for, if they absorb as they are said to do, no doubt some blood and poison mixed are taken by their pores." বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক এই প্রস্তর সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই; বোধ হয় বিষপ্রস্তরের কোন বিশেষ গুণ আছে কি না এ বিষয় সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নাই বলিয়াই ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিবেন। তিনি শোষণ বাটী বা সিঙ্গা বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিতে বলেন তাহা মন্দ নহে।

সর্পদংশনে প্রলেপের কথা বলিতেছিলাম। প্রলেপ যে একেবারে অগ্রাহ্য এমত কথা আমরা বলি না, অনেক দ্রব্য বিষঘ্ন আছে সন্দেহ নাই; বোধ হয় অম্ল মাত্রেই বিষঘ্ন, সামান্য বিষে ব্যবহার করিবামাত্র উপকার করিতে পারে। অনেক কবিরাজ ঔষধে সর্পবিষ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে লেবুর রস দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া লন। আমরুলের রস অম্লাক্ত এবং তাহা বোল্তাবিষে উপকার করে; আম্র আচার ভিমরুলের বিষে বিশেষ উপকার করে। কিন্তু তাহা বলিয়া অম্লরস, সর্পবিষ একেবারে নষ্ট করিতে পারে না অথবা যে পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে তাহাতে প্রাণরক্ষা হয় না। তৈলও বিষঘ্ন, তুলসী বিষঘ্ন, এইরূপ অনেক দ্রব্য বিষঘ্ন আছে। বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক তুলসীর উল্লেখ করেন নাই কিন্তু কবিরাজেরা তুলসীর দ্বারা সর্পবিষ শোধন করেন। সর্পাঘাত প্রতিকার নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে দুই আনা পরিমিত কৃষ্ণতুলসীর শিকড় শীতল জলের সহিত বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। যাঁহারা সর্পবিষে তুলসীর পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনা যায় যে তুলসীপত্রের রস চক্ষে, নাসারন্ধ্রে এবং ওষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মৃতবৎ ব্যক্তিরও চেতন হয় কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না ফলতঃ তুলসী যে আমাদের বিশেষ উপকারী তাহা বহুকালাবধি লোকের বিশ্বাস আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বয়ং বিষ্ণুর তুলসীপত্রে বিশেষ অনুরাগ। বিষ্ণু এই সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা, সকল ঔষধ বাছিয়া তুলসীকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তুলসী বিষঘ্ন ও জ্বরঘ্ন ইহা অনেকেই জানেন; ইহার রসে দদ্রু প্রভৃতি অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ ভাল হয়। আবার শুনা যায় তুলসী বাটীতে

রোপণ করিলে বায়ুর দোষ নষ্ট করে। তুলসীর মালা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ফলতঃ বোধ হয় অন্য অপেক্ষা তুলসীভক্ত বৈষ্ণবের স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হয়। কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের দ্বারা তুলসীর গুণাগুণ এ পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হয় নাই, যতদিন তাহা না হয় ততদিন আমরা সাহস করিয়া তুলসীসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। পূর্ব্বে তুলসী অনেক গৃহে পূজ্য ছিল এক্ষণেও তুলসীর প্রতি কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কতক শ্রদ্ধা আছে। সর্পবিষে তুলসী উপকারী না হউক অন্য বিষয়ে বটে।

এদেশে যে বৃক্ষকে মনসা বলিয়া লোকে পূজা করে তাহা সর্পবিষ সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার এ বিষয়ে তদন্ত করেন নাই, কেবল মাত্র এক স্থলে লিখিয়াছেন "যখন দেখিবে কসে খিল ধরিয়া মুখ বন্ধ হইতেছে তখন মনসাসিজের অর্থাৎ মনসাপাতা গরম করিয়া তাহার রস নাসিকা ও কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।" সর্পাঘাত প্রতিকার নামক গ্রন্থে মনসা বৃক্ষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, "পুরাণে মনসা নাম্নী নাগিনীকে আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকী সর্পিণীর ভগিনী ও জরৎকারু মুনির পত্নী বলিয়া উল্লেখ আছে এবং সেই দেবী সর্পগণের প্রধান মান্যা এ জন্যই এতদ্দেশীয়ের নিকট মনসাবৃক্ষের এতদূর মান। কিন্তু অনেকেই ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। এক্ষণে পরীক্ষিত হইয়াছে যে মনসাবৃক্ষের বিলক্ষণ বিষনাশিকা শক্তি আছে। সর্পদষ্ট স্থানে উত্তমরূপে মনসাবৃক্ষের আটা লাগাইয়া দিয়া উক্ত বৃক্ষপত্রের একছটাক রস রোগীকে পান করাইলে তাহাতেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে।"

সর্পাঘাত প্রতিকার নামক গ্রন্থলেখক ঔষধমধ্যে আম্বুলী অর্থাৎ আমরুলের রসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আমারও অনেক সর্পবৈদ্যের নিকট ঐ ঔষধের বিশেষ প্রশংসা শুনিয়াছি; বিশ্ববিষ চিকিৎসালেখকও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মালবৈদ্যের মতে চিকিৎসার লেখক বলেন যে মালবৈদ্যের মতে সর্পবিষের একমাত্র ঔষধ উদ্ভিদম্ল, যথা---তেঁতুল লেবু আমরুল। অতএব বোধ হয় ঔষধের মধ্যে আমরুলের রসই বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত। মন্ত্রও বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত। তাহার মূল কারণ "ধূলাপড়া"। অনেকেই দেখিয়াছেন তেজস্বী সর্প ফণা বিস্তার করিয়া হেলিয়া দুলিয়া ফুৎকার করিতেছে, এমত সময় কেহ ধূলা পড়িয়া সর্পের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে সর্প তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া পড়ে; আর রাগ থাকে না, গর্জ্জন থাকে না, সর্প মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা দেখিলে কে "ধূলাপড়ায়" বিশ্বাস না করিবে? সকলেই বিবেচনা করিবে মন্ত্রের অসীম ক্ষমতা। অদ্যাপি অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রের প্রতি সাধারণ লোকের যে এত বিশ্বাস তাহার মূল কারণ এই "ধূলাপড়া।" ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া

বিনামন্ত্রে সর্পমস্তকে ধূলা নিক্ষেপ করেন সর্প তৎক্ষণাৎ নতশির হইবে। আসল কথা সর্পচক্ষে কোন আবরণ নাই, সর্প চক্ষু মুদিত করিতে পারে না, ধূলা পড়িলে ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কঠিন মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ করিলে তাহা হইবে না, মৃত্তিকা বিশেষ করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ওঝারা মন্ত্র পড়িবার সময় হস্তে মৃত্তিকা বিশেষ করিয়া চূর্ণ করিতে থাকে।

চিকিৎসা সম্বন্ধে এক কথা বলিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। "অসারে জল সার" আমাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ আছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া পড়িলে, তাহার মস্তকে অনবরত জল ঢালিতে পারিলে প্রাণরক্ষা অসম্ভব নহে। মালবৈদ্যের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা লেখক বলিয়াছেন "সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলেও মালবৈদ্যেরা কিছু মাত্র হতাশ হয় না। বাহ্য পরীক্ষায় জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ পাওয়া যায় না, শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে, এরূপ রোগীও তাহারা অনেক আরাম করিয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে যত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। যাহা হউক রোগীকে এরূপ অবস্থায় হঠাৎ সমাধি দেওয়া কি দাহ করা কর্ত্তব্য নহে।" লেখক যাহা বলিয়াছেন আমাদের মধ্যে সেই প্রথা বহুকালাবধি চলিত ছিল। সর্পাঘাতে দাহ বহুকালাবধি নিষিদ্ধ আছে। বোধ হয় পূর্ব্বকালের লোকেরা বিবেচনা করিতেন যে, সর্পাঘাতে মরিলেও বাঁচিতে পারে, এজন্য মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা ছিল; বোধ হয় বিশ্বাস ছিল সর্পাঘাতে একেবারে মনুষ্য মরে না, জলে দেহ অনেকক্ষণ থাকিলে বিষ নষ্ট হইলে হইতে পারে, বেহুলার গল্প হইতে হয় ত এই প্রথাটি প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক জলসেবন যে সর্পাঘাতের শেষ চিকিৎসা এ বিষয়ে বহুকালাবধি বাঙ্গালির বিশ্বাস আছে। ফেরার সাহেব এ বিষয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু রোগীর মস্তকে জলধারা দিতে তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গৃহে সর্প প্রবিষ্ট হইতে না পায় এ বিষয়ে বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নির্ধূম অগ্নিতে কিছু হলুদ কয়েকটা লঙ্কামরিচ পোড়াইয়া, সেই ধূম গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া উচিত। বাটী ঘর প্রভৃতি সাজাইতে হইলে, বকুল ফুলের মালা বা পাতার দ্বারা সাজাইলে সর্প, বৃশ্চিক, প্রভৃতি আসিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে গৃহে কিছু ধুনা ও গন্ধক জ্বালাও।" হরিদ্রা ও লঙ্কা পোড়াইলে কি ফল হয় তাহা আমরা জানি না কিন্তু ধুনার প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কোন রাগান্ধ ব্যক্তি বিশেষ বৈরক্তি প্রকাশ করিলে আমরা বলিয়া থাকি যেন ধুনার গন্ধে মনসা নাচিয়া উঠিল। ধুনার গন্ধে সর্প বিরক্ত হয় এ কথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, এই জন্য মনসার পূজায় ধুনা দেওয়া হয় না। ধুনার গন্ধ পাইলে সর্প পলায়। আসাম অঞ্চলে

কোন নগরে বিলক্ষণ সর্পভীতি আছে ; তথায় অতি দীনহীন লোকেরাও সর্পভয়ে মাচা বাঁধিয়া বাস করে ; সকল গৃহে সর্ব্বদা সর্প দেখা যায়। কিন্তু একজন প্রাচীন মুন্সেফের গৃহে কখন কেহ সর্প দেখে নাই। তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুর নিকট আমরা শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধুনা দিতেন এবং ধুনার সহিত দুই একটি শুষ্ক পাট পাতা পোড়াইতেন। এক দিবসের নিমিত্ত ইহার অনিয়ম ঘটে নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ধুনা দিলে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার ক্রম থাকে, এই সময় মধ্যে কদাচ সর্প আসিবে না।

ছোট নাগপুরে আমরা যখন প্রথম যাই তৎকালে মনে করিয়াছিলাম সর্প হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে অতএব তথায় কতই সর্প দেখিতে পাইব। কিন্তু গিয়া শুনিলাম সেখানে সর্প একবারে নাই, তথায় কেহ কখন সবিষ সর্প দেখে নাই। আমরা বহুতর বৃদ্ধ লোকদিগের নিকট ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলাম, কেবল তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাল্যকালে একটি গোখুরা সর্পের কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহা দেখেন নাই। তিনি এই কথা বলেন যে, রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে পর তক্ষক মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে বাস করিলে, অন্য সর্পেরা তাহাকে দেখিয়া এস্থান হইতে পলায়ন করে, সেই অবধি আর এখানে সর্প নাই। বৃদ্ধকে এই সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, এক্ষণে তক্ষক নাই তবে অন্য সর্প কেন আইসে না ? বৃদ্ধ অতি গভীর ভাবে উত্তর করিলেন "এক্ষণে শীতলার নিমিত্ত সর্প আইসে না।" নাগপুরে বসন্ত রোগ প্রায় বার মাস সমান। বসন্ত রোগের নিমিত্ত প্রতি দিন প্রতি ঘরে ঘরে ধুনা পুড়িতেছে সর্প আর কাজেই আসিতে পারে না। আমরা হাসিয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলাম।

গোময় সর্প অবরোধক বলিয়া কতক প্রবাদ আছে। দশহরা অর্থাৎ মনসা পূজার দিবসে গৃহস্থেরা গৃহ বেড়িয়া গোময় লেপন করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে পর্য্যন্ত গোময়ের গন্ধ থাকে সেই পর্য্যন্ত সর্প সেস্থান ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সকল জাতীয় সর্পে তাহাও করে না।

ইসের মূল সর্প শাসন করে বলিয়া বড় প্রবাদ ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার কথা আর শুনা যায় না। কেহ আর বড় পরীক্ষাও করেন না।

বেলের মূল আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার গন্ধে সর্প একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই মূল নিকটে লইয়া গেলে সর্প মস্তক তুলে না, গৃহে রাখিলে সর্প গৃহপ্রবেশ করে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে বেলের মূল শুষ্ক হইয়া গেলে আর কোন ফল দর্শে না। শিবের স্কন্ধে সর্প আর মস্তকে বিল্বপত্র দিয়া শৈবেরা উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই সম্বন্ধটি নানা প্রকারে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

সর্প নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইংরেজী কারবলিক আসিড Carbolic acid ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মধ্যে মধ্যে গৃহের চতুষ্পার্শ্বে সিঞ্চন করিয়া দিলে প্রায়ই সর্পভয় থাকে না, বিষময় সর্পের পক্ষে কারবলিক এসিড মহা বিষ। উহা সর্পের মুখে স্পর্শ করাইলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সর্প মরিয়া যায়। যেখানে ইহার লেশ মাত্র গন্ধ পায় সর্প তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে দুটি প্রবলতর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। প্রথম, বাল্য-বিবাহ, দ্বিতীয়, অবরোধ প্রথা। ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালিকাগণ পাঠশালায় শিক্ষালাভ করে; তাহাতে বোধোদয় বা চারুপাঠ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত বয়সেই প্রায় উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া শিক্ষোন্নতির আশা ভরসাও প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মূল হইয়া যায়। প্রথম প্রতিবন্ধকটি বঙ্গদেশের ন্যায় বোম্বাই প্রদেশেও বর্ত্তমান। এই উভয় প্রদেশেই বালিকাগণ নিতান্ত অল্পবয়সে সন্তানবতী হইয়া সংসারের সহিত এমনি জড়িত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের জ্ঞানোন্নতিবিধান সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকটি বোম্বাই প্রদেশে বিদ্যমান নাই। সেই জন্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পথ অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক। মিস্ কার্পেণ্টর বঙ্গভূমিতে বয়ঃস্থা ভদ্রমহিলা-গণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কেন? অবরোধ প্রথাই তাহার মুখ্য কারণ। তিনি বোম্বাই প্রদেশে উক্তরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে সফলপ্রযত্ন হইলেনই বা কেন? তথায় অবরোধ প্রথার অভাবই উহার প্রকৃত কারণ।

আর একপ্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, অবরোধ প্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষোন্নতিসম্বন্ধে অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক। আমরা সকলেই জানি যে, অপরাপর বিদ্যার্থীর সহিত বিদ্যালয়ে একত্রে শিক্ষা করিলে, পরস্পরের উন্নতি দেখিয়া এমন একটি প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত হয় যে, তদ্দ্বারা শিক্ষাসম্বন্ধে উৎসাহ, আগ্রহ, ও অনুচিকীর্ষা শতগুণ প্রবলতর আকার ধারণ করে। এতদ্ভিন্ন জনসমাজের চতুর্দ্দিকের উন্নতির ব্যাপার সকল সন্দর্শন করিলে, চিত্ত সহজেই উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকে। অন্তঃপুরনিরুদ্ধ রমণীকুলের পক্ষে উন্নতির এই অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান নাই বলিয়া তাঁহাদের

শিক্ষাবিষয়ে আশানুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। অথবা তাঁহাদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রতিবন্ধকের মধ্যে উহা একটি প্রধান। বোম্বাই অঞ্চলে অবরোধ প্রথা বিদ্যমান না থাকাতে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় এই প্রতিবন্ধকটিও নাই। সেখানকার যে সকল ভদ্রমহিলা অন্যান্য বিদ্যার্থিনী রমণীগণের সহিত এক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, সহজেই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্দীপিত হইবার সম্ভাবনা ; এতদ্ভিন্ন জনসমাজে বহির্গত হইবার অধিকার থাকাতে চতুষ্পার্শ্ববাহী উন্নতিস্রোতের সঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁহাদের মন ভাসমান হইতে থাকে। এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি বাস্তবিকই বোম্বাই অঞ্চলে বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে প্রতিবন্ধক অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা হইলে এতদিনে বোম্বাই কেন বঙ্গদেশকে উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারিল না ? উত্তর—এ বিষয় মীমাংসা করিবার এখনও সময় হয় নাই। প্রতিবন্ধক যখন এক প্রদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প, তখন মানসিক শক্তিসম্বন্ধে স্বাভাবিক তারতম্য না থাকিলে নিশ্চয়ই এক প্রদেশের স্ত্রীশিক্ষা, সময়ে অপর প্রদেশ হইতে অধিকতর উন্নতিলাভ করিবে। বোম্বাই নগরে অবস্থিতি কালে জনৈক সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় আমাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, এখন আমরা আপনাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও অন্যান্যবিধ উন্নতিসম্বন্ধে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতে পারি, কিন্তু নিশ্চয়ই সময়ে আপনাদিগকে আমরা হারাইয়া দিব। আমাদের স্ত্রীস্বাধীনতা তাহার কারণ।" বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি হইলে পুরুষদিগের শিক্ষা ও তৎসহকারে অন্যান্যবিধ সামাজিক উন্নতি সকলও সহজেই সংসিদ্ধ হইতে পারে।

বোম্বাই প্রদেশে পুরুষজাতির শিক্ষা বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছে। তথাচ পাশ্চাত্য জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বঙ্গভূমি প্রথম স্থানীয়। বোম্বাই দ্বিতীয় স্থানীয় ; এবং বোধ হয় পঞ্জাব তৃতীয় স্থানীয়।

ইংরেজীশিক্ষা বঙ্গভূমিতে যেমন, বোম্বাই প্রদেশেও তেমনই বা তদনুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। কেবল বোম্বাই কেন, ভারতের যেখানে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়াছে সেখানেই কতকগুলি সমপ্রকৃতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতিগণের প্রবল পরাক্রম যাহা সম্পন্ন করিতে পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান তাহা অতি নিঃশব্দে ও অবলীলাক্রমে সংসাধন করিতেছে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তি সকল যেরূপ জনসমাজের অজ্ঞাতসারে বিনা আড়ম্বরে কার্য্য করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া থাকে সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অতি আশ্চর্য্যরূপে অথচ নিঃশব্দে সুমহৎ ক্রিয়া সকল সমুৎপাদন করিতেছে।

ইংরেজীশিক্ষার ফল ত্রিবিধ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিক।

আমাদের এখানে ইংরেজীশিক্ষার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ফল যেমন ব্রাহ্মসমাজ, বোম্বাই প্রদেশে ভিন্ন নামে অবিকল সেই প্রকার সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানকার নাম "প্রার্থনা সমাজ।" ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মসমাজ শব্দ সেখানে প্রচলিত নাই। বোম্বাই নগর, পুনা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রার্থনাসমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে এই সকল সমাজে গিয়া যোগ দিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় প্রার্থনাসমাজের কার্য্য দ্বিবিধ; একেশ্বরের উপাসনা ও সমাজসংস্কার।

এতদ্ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশে আর এক প্রকার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার নাম "আর্য্যসমাজ।" বোম্বাই নগরে ও পুনা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের আর্য্যসমাজে অনেক লোক জুটিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী এই নূতনবিধ সমাজের মূল। বোম্বাই প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে দেখিলাম, দয়ানন্দ তথায় মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক উৎসাহী ভদ্রলোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছেন। যেখানে সেখানে দয়ানন্দের কথা হইতেছে। দয়ানন্দের বক্তৃতাশক্তি, দয়ানন্দের সামাজিক মত, দয়ানন্দের নূতন প্রকার বেদের ব্যাখ্যা এই সকল লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা চলিতেছে।

দয়ানন্দ বোম্বাই প্রদেশেরই লোক। তিনি একজন গুজরাটি। তিনি বারানসী ও মথুরায় তাঁহার জীবনের কিছুকাল যাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে প্রায় আর কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। দয়ানন্দ সবল ও দীর্ঘকায় পুরুষ। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে ও তাঁহার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইলে তাঁহাকে যথার্থই একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার বাগ্মিতা অসাধারণ, তাঁহার তর্কশক্তি অসাধারণ, এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উৎসাহ ও চেষ্টাও অসাধারণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমরা বোম্বাই প্রদেশে দেখিলাম, তথায় দয়ানন্দ মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি যেখানে গমন করেন, সেইখানেই তাঁহাকে লইয়া যারপরনাই আন্দোলন উপস্থিত হয়। নব্য কি প্রাচীন সকলেই দয়ানন্দের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা করিতে থাকে।

এরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। একজন হিন্দু পণ্ডিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতেছেন; একজন হিন্দু সন্ন্যাসী পৌরাণিক উপাসনার অসারত্ব ঘোষণা করিতেছেন; একজন সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ব্যক্তি বেদকে সনাতন শাস্ত্র বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক তাহা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম মত সকল প্রতিপাদন করিতেছেন; ইহাতে যদি হিন্দু সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট না হইবে ত আর কিসে হইবে? দয়ানন্দ ইংরেজীর বিন্দু বিসর্গ জানেন না। উহা তাঁহার

পক্ষে এক প্রকার ভালই হইয়াছে। ইংরেজী জানিলে লোকে বলিত যে, ইনি যদিও বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী বটেন, তথাচ ইংরেজী পড়িয়া ইঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে; ইনি ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

একজন ইংরেজীশিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের লোক ইংরেজীপ্রণালীতে বক্তৃতাদি করিলে নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু সে আন্দোলন প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্তর স্পর্শ করে না;—দয়ানন্দ যাহা কিছু করিতেছেন সকলই দেশীয় ভাবের অনুযায়ী। তিনি নিজে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বেদজ্ঞ পণ্ডিত; তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন তাহাতে হিন্দুদিগের চিরপূজ্য বেদাদি শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা থাকে; কোন মত সমর্থন করিতে হইলে তিনি কখনই শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করেন না;—সকল সময়েই তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইবারই কথা।

জাতীয় আকারে কোন আন্দোলন উপস্থিত করিলে তাহা যেমন সহজে দেশের লোকের খবরে আইসে;—সহজে সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, বিজাতীয় আকারে করিলে কোন ক্রমেই সে প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই। শাক্যসিংহ, ঈশা, মহম্মদ, লুথর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সমাজসংস্কারকগণ যদিও নূতন ভাব ও মত সকল প্রচার করিয়াছিলেন, তথাচ যতদূর সম্ভব তাঁহারা স্বজাতীয় ভাব ও রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; এবং সে প্রকার না করিলে তাঁহাদের সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই দুরতিক্রমণীয় ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। সেণ্টপল প্রাচীন আথেন্স নগরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথাকার একটি দেবমন্দিরের উপর লিখিত রহিয়াছে "এই মন্দির অজ্ঞাত দেবতাকে উৎসর্গ করা হইল।" ("Dedicated to the unknown god") উহা হইতে সেণ্টপল একটি সুবিধা পাইলেন; তিনি নগরবাসীদিগের নিকট এই বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন যে, আপনাদের মন্দিরের উপর যে অজ্ঞাত দেবতার কথা লিখিত রহিয়াছে, আমি আপনাদিগকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত করিতে আসিয়াছি। একথা শুনিয়া অতি সহজেই আথেন্সবাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। আবার অপর দিকে আমাদের দেশের খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের বিষয় দেখুন। খ্রীষ্টধর্ম্মকে যে এদেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতেছে তাহার প্রধান কারণ কি ইহাই নহে যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম আমাদের দেশে অতি ভয়ানক বিজাতীয় ভাবে প্রচারিত হইয়াছে? কোন নূতন মত দেশীয় আকারে দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করিলে তাহা গৃহীত হইবার সম্ভাবনা; এ বিষয়ে যতই অধিক চিন্তা করা যায়, ততই এ কথার যাথার্থ্য অধিকতররূপে অনুভব করা যায়। রাজা রামমোহন রায় যখন সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ সম্বলিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন, হিন্দুসমাজে

হুলস্থূল পড়িয়া গেল ; কেন না তিনি জাতীয় আকারে উক্ত আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে বিধবাবিবাহের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, ইংরেজী সংবাদপত্রাদিতে, প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবিষয়ে অনেক কথা চলিতেছিল। কিন্তু উহা ইংরেজীশিক্ষিত নব্যদলের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যখনই বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উক্ত বিষয়ে বিচার উপস্থিত করিলেন, তখনই উক্ত কথা দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের চিত্তকে আন্দোলিত করিল ; নিতান্ত পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পর্য্যন্ত উক্ত সংবাদ পৌঁছিল। পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পর্য্যন্ত যে আন্দোলন পৌঁছে না তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। মনে করুন যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক হইতে কয়েকটি সদ্যুক্তি সংগ্রহ করিয়া বিধবার পুনঃপরিণয়সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কি যে প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার শতাংশের একাংশও সংঘটিত হইত ? ইহা একপ্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, উক্তরূপ পুস্তক প্রাচীন হিন্দুসমাজের খবরেও আসিত না। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রণালীতে বিধবাবিবাহের বিচার উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে লোকব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন কই ? কিয়ৎপরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ কথাটির উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে, এ কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। তিনি যে মহৎ ব্যাপারের সূত্রসঞ্চার করিয়াছেন তাহা একদিন কি দশদিন কি দশ বৎসর বা বিংশতি বৎসরের কার্য্য নহে। গুরুতর সমাজসংস্কারের কার্য্য সকল দীর্ঘকালসাপেক্ষ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বীজ বপন করিয়াছেন উহা অঙ্কুরিত ও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে ; এবং সময়ে সমগ্র ভারতভূমিকে উহার অমৃত ফল প্রদান করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, একখানি পুস্তক লিখিয়া বা একটি বক্তৃতা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব ; নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিব যে, ভারতবর্ষ সকল সামাজিক অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাঁহাদের কথায় কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না।

আর একটি কথা এই এতদিনে বাস্তবিক যতদূর কার্য্য হইতে পারিত, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুহীন ও সহায়হীন হইয়া একাকী সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবেন, ইহা কি সম্ভব ? যে সকল বুদ্ধিমান্ বাবুরা বড় বড় বক্তৃতা করিতে অথবা অপরের কার্য্যের সমালোচনা করিতে বড় ভালবাসেন, তাঁহারা কেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করুন না ? প্রকৃত কথা এই, আমাদের দেশের অনেকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তির এই এক রোগ হইয়াছে যে, তাঁহারা নিজে কিছু করিবেন

না কিন্তু অন্যে কোন মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার কঠিন সমালোচনা করিতে বিলক্ষণ অগ্রসর।

আমরা প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া কিছু অধিক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। দয়ানন্দ একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য এক্ষণে দ্বিবিধ। প্রথম স্থানে স্থানে আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত করা; দ্বিতীয় বেদের একটি নূতন ভাষ্য লেখা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই ও পুনা নগরে আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের আর্য্যসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। দেখিলাম অনেক লোক দয়ানন্দের শিষ্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে সুশিক্ষিত লোক হইতে, অশিক্ষিত সামান্য লোক পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইল। একদিবস দয়ানন্দের পুনা হইতে বোম্বাই নগরে আসিবার কথা ছিল। দেখিলাম বোম্বাইয়ের বাজারের একজন সামান্য দোকানদার দোকানপাট বন্ধ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিল। সে ব্যক্তি দয়ানন্দের শিষ্য। শুনিলাম রেলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় পঞ্চাশত জন লোক গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। ইহা ত সামান্য কথা। দয়ানন্দের অভ্যর্থনা লইয়া পুনরায় অতি অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছিল। দয়ানন্দের পুনার অনুচরগণ তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক লইয়া যাইবার জন্য একটা হাতীর উপর হাওদা বসাইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক আগমন করিলেন! প্রাচীন সম্প্রদায়ের যে সকল লোক দয়ানন্দের বিরোধী, তাঁহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও অপমান করিবার জন্য একটা গর্দ্দভকে সজ্জিত করিয়া দল বল লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ পুনায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখেন যে তাঁহার জন্য বহুসংখ্যক লোক প্রতীক্ষা করিতেছে; এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দুটি বাহন আনা হইয়াছে; একটি হস্তী ও একটি গর্দ্দভ। যাঁহারা হস্তী আনিয়াছিলেন তাঁহারা দয়ানন্দকে তাহাতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "দেখুন, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী। হস্তীতে আরোহণ করা আমার উচিত নহে। আমি পদব্রজেই গমন করিব। এত লোক যখন রাজপথ দিয়া পদব্রজে যাইতেছেন তখন আমি কি তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হইয়াছি যে, আমি হাতীতে চড়িয়া যাইব। বিশেষতঃ উচ্চস্থানে বসিলেই যদি মান্য হওয়া হইত, তাহা হইলে উর্দ্ধে বৃক্ষের উপর যে সকল কাক বসিয়া আছে উহারা ত আমাদের সকলের অপেক্ষা মান্য।" দয়ানন্দ হস্তীতে উঠিলেন না। তিনি সামান্য ভাবে পদব্রজে চলিলেন। এই উপলক্ষে দয়ানন্দের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছিল। বিরুদ্ধ দলের কয়েক ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

দয়ানন্দের মতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী, একেশ্বরবাদী। বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মনে করেন, সুতরাং জন্মান্তরের মত বিশ্বাস করেন। তাঁহার সামাজিক মত সকল অতি বিশুদ্ধ ও উন্নত। তিনি বালক ও বালিকা উভয় সম্বন্ধেই বাল্যবিবাহের পরম শত্রু। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শিক্ষার অধিকার সমান। উভয়েরই সমান পরিমাণ শিক্ষা হওয়া উচিত। জাতি-ভেদের প্রতি তিনি সর্ব্বদা খড়্গহস্ত। পাতঞ্জল দর্শনসম্মত প্রাণায়াম যোগ তাঁহার উপাসনা। পূর্ব্বে দয়ানন্দের, বেদের নূতন প্রকার ব্যাখ্যার কথা বলা হইয়াছে। তিনি সায়নাচার্য্য প্রভৃতি কোন ভাষ্যকারের কথাই মানেন না। তিনি নূতন ভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন। এ ভাষ্য যে সদ্বিদ্বান্ লোকে গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কোনক্রমেই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ব্যাকরণের সূত্র সকলের সাহায্য লইয়া বেদের ভৌতিক উপাসনাপ্রতিপাদক শ্লোক সকল নিরাকার ঈশ্বরপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বেদোক্ত শব্দ সকল পরব্রহ্মের এক একটি নাম মাত্র। বেদের একস্থানে ধান্যের স্তব আছে; হে ধান্য! তুমি আমার গৃহে আইস, ইত্যাদি। এস্থলে দয়ানন্দ ধা ধাতু হইতে যিনি ধারণ করেন এই অর্থ করিয়া ধান্যের স্তবকে পরমেশ্বরের স্তব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ প্রকার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না। একজন শাক্ত সমুদায় শ্রীমদ্ভাগবত কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ বেদব্যাখ্যা সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যে শাস্ত্রকে লোকে আপ্ত-বাক্য বলিয়া বহুকাল হইতে ভক্তি করিয়া আইসেন, উন্নত বিজ্ঞানের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা স্বভাবতঃই উক্ত উভয়ের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় উন্নত বিজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্র এ উভয়ের কাহাকেও তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, সেই সময়েই এই প্রকার সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখুন। খ্রীষ্টিয়ান্-ইউরোপে অতি আশ্চর্য্যরূপ বিজ্ঞানের উন্নতি হইল। কিন্তু দেখা গেল যে অনেক-স্থলেই বিজ্ঞানের কথা ও প্রাচীন বাইবেলের কথা পরস্পর বিরোধী। ভূতত্ত্ববিদ্যার মতের সহিত বাইবেলের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মিল নাই। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পুরোহিতগণ এতদুভয়ের সমন্বয় রক্ষা জন্য বাইবেল গ্রন্থের নূতন প্রকার অর্থ করিতে লাগিলেন। বাইবেল শাস্ত্রের সাতদিনের সৃষ্টির সহিত ভূতত্ত্ববিদ্যার যুগযুগান্তরব্যাপী সৃষ্টিক্রিয়ার সামঞ্জস্য করিবার জন্য তাঁহারা একদিনের অর্থ এক যুগ করিলেন। এইরূপে সাত দিনে সৃষ্টির অর্থ সাতযুগের সৃষ্টি হইল! ব্যবস্থাশাস্ত্রের অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া

থাকে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের কত প্রকারই টীকা হইয়াছে। নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইচ্ছা করিলেন, আর এক নূতন মত চালাইয়া গেলেন।

বঙ্গদেশে যে সকল সামাজিক বিষয় লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে, দুইটি বিষয় ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশেও অবিকল তাহাই হইতেছে। বিষ্ণুরাম শাস্ত্রী নামক জনৈক সুপণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যাসাগর। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রথমে তথায় বিধবাবিবাহ প্রচার আরম্ভ করেন। উহার জন্য তিনি বহুলপরিমাণে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং অটল অধ্যবসায় সহকারে বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থানে বিধবাবিবাহ প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিধবার বিবাহ দিতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। প্রায় একবৎসর হইল তিনি লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। এখানকার ন্যায় বোম্বাই প্রদেশে যাঁহারা বিধবাবিবাহ করিয়াছেন সকলকেই সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে।

একটি বিষয়ের জন্য পার্সিদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদের সমাজ হইতে বাল্যবিবাহ প্রথা একবারে রহিত করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পক্ষে এ প্রকার করিতে পারা সম্ভবপর নহে; কেন না তাঁহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম পরস্পর অখণ্ডনীয় বন্ধনে বদ্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এখান কার ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। যতদিন কন্যা যৌবনদশায় পদবিক্ষেপ না করে—স্বামিসহবাসের উপযুক্ত না হয় তত- দিন কখনই তাহাকে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। কেবল বোম্বাই বলিয়া কেন ? কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কি পাঞ্জাব ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত। কেবল আমাদের সুচতুর বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালি ভ্রাতারাই উক্ত শুভকর প্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারেন না। প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে উক্ত প্রথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বঙ্গভূমিতেও পূর্ব্বে উহা প্রচলিত ছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে তাহার লোপ হইয়াছে। বালিকা নব-বধূকে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইলে তাহার এই ফল হয় যে, বালিকার শরীরে অস্বাভাবিক ও অপরিপক্ক ভাবে যৌবনচিহ্ন সকল শীঘ্রই দৃষ্ট হয়, ও নিতান্ত অল্পবয়সে সন্তানবতী হইয়া চিরজীবনের জন্য স্বাস্থ্যসুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

বঙ্গদেশে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় অনেক দেশাচারবিগর্হিত কার্য্য চলিয়া যায়, তাহাতে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুসমাজের শাসন আমাদের এখান অপেক্ষা অনেক গুণে প্রবল রহিয়াছে। জাতিবন্ধন অদ্যাবধি এখানকার ন্যায় এত শিথিল হয়

নাই। সেইজন্য তথাকার ইংরেজীশিক্ষিত নব্যদলকে আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণে সমাজকে অধিক ভয় করিয়া চলিতে হয়। গুরুতর বিষয় সকলের কথা ছাড়িয়া দিন। একটা সামান্য বিষয় দেখুন। সকলকে মস্তক মুণ্ডন করিতে ও শিখা রাখিতে হইবেই হইবে। কাহার সাধ্য সমাজের এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করে?

বোম্বাইবাসী অনেক লোক বিলাত গিয়াছিলেন ও এখনও যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পার্সিই অধিকাংশ; হিন্দু অতি অল্প। পার্সিদের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নাই সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বিলাত যাইতে পারেন; কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষে উহা সহজ কার্য্য নহে। বিলাতগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল জাতিচ্যুতি। কোন কোন হিন্দুসন্তান ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ জাতিপ্রদায়িনী বটিকা গোময়পিণ্ড সেবন করাতে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু সকল লোকে ঐক্যমতে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতেছেন না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই ও বঙ্গদেশের সামাজিক আন্দোলনের বিষয় দুইটি ভিন্ন অন্য সকলগুলিই একপ্রকার। পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুইটির মধ্যে একটি অবরোধ-প্রথা। আর একটি বল্লালপ্রচারিত কৌলীন্যজনিত বহুবিবাহ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ-ব্যবসায় বঙ্গভূমি ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

আমাদের কলিকাতায় তিনটি রাজনৈতিক সভা। তিনটি মিলিয়া একটি করিবার উপায় নাই;—মিলিবে না, বিরোধ উপস্থিত হইবে। একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের রাজনীতি কেবল ক্রন্দন।" হায়! আমরা একত্র মিলিয়া কাঁদিব, ইহাতেও ব্যাঘাত! বোম্বাই প্রদেশে এপ্রকার রাজনৈতিক অসম্মিলন নাই। পুনা-সর্ব্বজনিক সভায় সকল শ্রেণীর লোক মিলিয়া অতি সুন্দররূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা দেশের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বজনিক সভাসম্বন্ধে একটি আহ্লাদের কথা এই যে, কয়েকজন সুশিক্ষিত যুবাপুরুষ সভার মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সভার উন্নতি সাধন ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের অন্য কার্য্য নাই, অন্য উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা সকলেই এক পরিবারের লোক, সকলেই ভ্রাতা। তাঁহাদিগকে জোসি পরিবার বলে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজে এপ্রকার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রাজনৈতিক সভা অদ্যাবধি সে প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক কোন মহৎ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করিলে কখনই তদ্বিষয়ে পূর্ণ সফলতা লাভের আশা

করা যায় না। স্বার্থ ও দেশের মঙ্গল দুই লইয়া কোন ক্রমেই প্রকৃত কাজ হয় না। হয় আল্লা বল, নয় রাম বল, দুই বলিলে নৌকা ডুবিবে।

পুনা রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থান। বোম্বাই নগরে রাজনৈতিক ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু বোম্বাই আর এক বিষয়ে মহদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছে। আমি বোম্বাইয়ের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কথা বলিতেছি। বাঙ্গালি যেমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে বোম্বাইবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বোম্বাইবাসী সেই প্রকার শিল্পবাণিজ্যে বাঙ্গালি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক পুরাতন গল্প মনে পড়িল। একটি ব্রাহ্মণপালিত হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসের সহিত এক গোপপালিত শীর্ণ, দুর্ব্বলকায় গোবৎসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপালিত গোবৎস গোপপালিত গোবৎসকে বলিল, "আয় না ভাই আমরা দৌড়াদৌড়ি করি।" গোপপালিত গোবৎস বলিল, "আয় না ভাই আমরা বসিয়া বসিয়া লেজ নাড়ি।" সেইরূপ মনে করুন যেন বোম্বাইবাসী বলিতেছেন, আয় না ভাই আমরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করি; বঙ্গবাসী উত্তর করিতেছেন, আয় না ভাই আমরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করি (বচনে পুড়িয়ে মারি)!

বোম্বাইয়ে অন্যূন ৩২টী দেশীয়দিগের সূতা ও বস্ত্রের কল। পাঠকবর্গ জানেন যে, এই সকল কলের জন্য মাঞ্চেষ্টরের ঈর্ষ্যানল ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাঞ্চেষ্টর বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই কলগুলির অনিষ্ট-সাধন করিতে পারেন। একবার বলিলেন যে, বোম্বাইয়ের কলে বালকগণকে সমস্তদিন পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় ইহা বড় অন্যায়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। অতএব তাহাদের পরিশ্রমের সময় হ্রাস করিয়া দেওয়া হউক। আবার ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাদের জন্য ভারতবর্ষের বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হউক। আমাদের বোম্বাই অবস্থিতি কালে মিস্ কার্পেণ্টর তথায় আসিয়া প্রথমোক্ত প্রস্তাব লইয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছিলেন। বোম্বাইবাসিগণ তাঁহাকে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, মাঞ্চেষ্টরের পরামর্শমতে কার্য্য করিলে কারখানার শ্রমজীবিগণের প্রতিই অন্যায় করা হইবে। তাহারা মাসিক বেতন লইয়া কার্য্য করে না, তাহারা দৈনিক বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং কারখানার অধিকারিগণ যদি তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের বেতনও কমাইয়া দিবেন; যেমন কাজ, তেমনি বেতন ইহাই সার্ব্বজনিক নিয়ম। কিন্তু শ্রমজীবিগণ নিজেই সে প্রকার বন্দোবস্তে সম্মত হইবে না। অধিক পরি-শ্রম করিয়া অধিক পয়সা লইবে ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। বিশেষতঃ আর একটি

কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যায়। কারখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শ্রমজীবীদিগের যে প্রকার অবস্থা ছিল, কারখানার কাজ পাইয়া অবধি কি শারীরিক কি সাংসারিক সকল বিষয়েই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে। আমরা একদিন বোম্বাইয়ের একটি কল দেখিতে গেলাম। উহার নাম গোকুল দাসের কল। একটি প্রকাণ্ড বাষ্পীয় যন্ত্র চলিতেছে, কোন স্থানে তুলা পিজা হইতেছে, কোন স্থানে তুলা পাকাইয়া লম্বা লম্বা করা হইতেছে, কোন স্থানে তুলা হইতে সূতা হইতেছে, কোন স্থানে বস্ত্রের টানাপড়েন হইতেছে, কোন স্থানে কাপড়ের পাড় হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্য সেই একটি মাত্র বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে চলিতেছে। কোন স্থানে কেবল দুই তিন শত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কার্য্য করিতেছে, কোন স্থানে কেবল দুই তিন শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক কার্য্য করিতেছে, এবং একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে প্রায় পাঁচ ছয় শত স্ত্রীলোক কাজ করিতেছে। কল হওয়াতে এই সকল দুঃখী লোকের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না। কলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান উপকার। গোকুল দাসের কারখানায় একটি বিষয় দেখিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম, উহাতে একজনও ইউরোপীয় নাই, সমস্ত কার্য্য দেশীয়দিগের দ্বারা চলিতেছে।

কোন ইংরেজী গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সমুদ্রকূলবর্ত্তী জাতিদিগের স্বভাবতঃই ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। বোম্বাইয়ে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির নিশ্চয়ই উহা একটি কারণ। কিন্তু আর একটি কারণ আছে; তথায় ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাব। বাঙ্গালার জমিদারগণ চিরস্থায়ী আয় থাকাতে কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যের দিকে মন দিতে তাদৃশ ইচ্ছা করেন না। মন দিলে যে তাঁহাদের এক গুণ সম্পত্তি দশ গুণ হয়, ইহা তাঁহারা বুঝেন না। বোম্বাইবাসিগণ সে প্রকার নিশ্চিন্তচিত্তে সময়ক্ষেপ করিতে পারেন না। এখানে যেমন কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ হইলে তিনি জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হন, বোম্বাইয়ে সেইরূপ লোকের অর্থ হইলে বাণিজ্যে খাটাইতে ইচ্ছা করে। আমাদের ধনীদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে যে, শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিজের উপকার, মধ্যবিত্ত লোকের উপকার, ও নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রদিগের মহোপকার সাধন করিতে পারেন। অর্থের সদ্ব্যবহার না করা নিশ্চয়ই মহা পাপ। আমাদের একজন বাঙ্গালি রাজা বানরের বিবাহ দিতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন! শুনিয়াছি উক্ত বিবাহের সময় তিনি তাঁহার এক সুরসিক সভাসদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন হে, এমন

বিবাহ পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছিলে?" সভাসদ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! দেখিব না কেন, আপনার বিবাহের সময়ই দেখা হইয়াছিল।"

সম্প্রতি কলিকাতার নিকট একটি সূতার কল হইয়াছে। বোম্বাইয়ের পার্সিরা আসিয়া এই কলটি সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা কলিকাতার ধনশালী মহাশয়গণ দেখুন।

শ্রীন না।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভাল আছ ত?" হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না।—যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এত সর্ব্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল গৃহযাত্রা করিলে, নাএব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্র মাতাকে। লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ী আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না। কোন চিকিৎসা-পত্র করেন না—পীড়ার কথা স্বীকারই করেন না। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া

বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালি লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না, তাহা হইলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।” এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে একলক্ষ গালি দিয়া পত্র স্বামীকে দেখাইলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পাল্কী লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, “ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।” দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এদিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময় ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ওদিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া চারিদিনের করারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারিদিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, “আমি কেবল ভ্রমরের জন্য এ তৃষায় দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু ভ্রমরের এই ব্যবহার?—এই অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমিও আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?”

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে; ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস, মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল, মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্র উঁকি ঝুঁকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্র সূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাতত ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতি মাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া, সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখন কখন জোরে আসিতেছে—কখন মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার। বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে একজন স্ত্রীলোক জলে নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত

হয়, ভাবিয়া, গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কক্ষস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণি?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া গেলেন যে গোবিন্দলালই রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পাপিষ্ঠ এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। একদিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজি কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে, বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একবারে, স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য

বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—মনে মনে স্থিরসংকল্প অদ্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্য সহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন্ নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন। বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া, একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদায় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিশের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা মুহুরি ও দশজন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখনই নাএব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পূরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়।"

মুহুরি উইল পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ

ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।”

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকগমন করিলেন।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসম্বাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলেমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুইজনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে

যাহার মনে যা থাকে তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারিব না। শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুন লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুন লাগিয়াছে তা সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি, আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া, ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ!" সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত গোবিন্দলালের চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবন সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া, ভাবিয়া, ইহসংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয়সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর," "ভোমরা," "ভোমর" "ভোম্" "ভ্রমরি," "ভ্রমি," "ভ্রম্,"—সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ, সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলে সোনা, কালো মাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা, অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে, প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা অর্দ্ধেক মাত্র বলিতে হইত, আর অর্দ্ধেক না বলিতেই বুঝা যাইত, এখন সে কথা

উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রে থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরম," নয়, "কে ডাকিতেছে," বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। এ সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্ন রবিকরপ্রফুল্ল হৃদয় মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য, ভাবিত রোহিণী—ভ্রমর সে ঘোর, মহা ঘোরান্ধকারে, আলো করিবার জন্য—ভাবিত যম! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষও বলিল যে হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্র পক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬৷/১২॥

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল, শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকির নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা, মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল, মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল,

কেন না কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না ; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না ; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইলের বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ ?"

ভ্র। কি ?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার না তোমার ?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। না। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে ?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি ?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে ?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই ?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না ভ্রমর।

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষিয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন যথেচ্ছ কাটাইব। মাটীর ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী প্রভাত শুক্র নক্ষত্ররূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদ ত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। দ্বারদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

আজি কালি বঙ্গ লইয়া অনেক আন্দোলন হইতেছে। আমরাও এই সময় দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু প্রাচীন কালে এ দেশের যে সীমা ছিল এক্ষণে তাহাই আছে কি না, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য, নতুবা ঐতিহাসিক সমালোচনা কিম্বা তুলনা করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কি না জানি না। তখন হয়ত ভগবতী ভাগীরথী এতদূর না আসিয়াই কল্লোলিনীবল্লভের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গ তখন সাগরগর্ভে কি জঙ্গলময় চরভূমি মাত্র ছিল?* ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় নাম গন্ধ পাওয়া যাইত না। আদিধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনুর সময়েও বঙ্গ অনার্য্যপ্রদেশ। তখন আদিম শূদ্র ও চণ্ডাল আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, বঙ্গ প্রথমে পশু পক্ষী উরগের আবাসভূমি, পরে বন্যজাতির; মধ্যে মধ্যে বর্ষাকালে জলপ্লাবনে ডুবিয়া যাইত এবং শীতের প্রারম্ভে দারুণ রোগের জ্বালায় তত্রত্য লোকে অস্থির হইত; সুতরাং বঙ্গ তৎকালে বিজেতা তেজস্বী প্রভুপদাভিষিক্ত আর্য্যজাতির অলোভনীয় ছিল। মগধরাজ্যের প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আর্য্য সমাগম। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আর্য্যধ্বজা উড়িতেছিল অর্থাৎ বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের এই দিকে প্রথম আর্য্যনিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে। এইখানে কোন কোন মতে মৎস্যদেশ,—এক্ষণে দিনাজপুর। ইহার পূর্ব্ব রঙ্গপুরের সান্নিধ্য মহাস্থানে বাণরাজার বাস। কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পদ্মার তটে

* পুরাণে আছে মন্দর ভূধরকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন। পরে চক্রপাণির চক্রে অসুরেরা অমৃত ভোজনে বঞ্চিত ও অদিতিসুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মন্দর গিরি রাজমহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিরিশঙ্কটের একটী শিখর। অতএব বোধ হয় ঐ শৈলরাজের পদতলে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গরঙ্গে খেলা করিত। উহার এক পার্শ্বে আর্য্য দেবগণ অপর পার্শ্বে অনার্য্য অসুরগণ অবস্থিতি করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে সাগরোদ্ভূত দেশ সমুদয় দেবতাদিগের অধীন হইয়াছিল।

পৌণ্ড্র। মৎস্যের দক্ষিণে ভাগীরথীকূলে গৌড়। তৎকালে বর্ত্তমান বঙ্গের এই ভাগ বঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয় নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তাম্রলিপ্তী, অঙ্গরাজ্য ও মগধের কিয়দংশ। কোন কোন মতে আধুনিক বর্দ্ধমান প্রাচীন পৌণ্ড্র বর্দ্ধন।§ মেদিনীপুরের নিকট গোপনামা একটী স্থান আছে—কিম্বদন্তীতে শুনা যায় ঐ স্থানে বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ ছিল। যাহা হউক ইহা একপ্রকার স্থির করা যায় যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় এই সকল স্থান বঙ্গের অন্তর্গত ছিল না।

ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থানের কিছু উত্তরে লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থান। প্রবাদ আছে যে ঐস্থানে ভগবান্ বলদেব হল পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন অর শব্দে হল বুঝায় সুতরাং আর্য্যজাতি হলধর, অতএব হলধরের বিরামস্থান আর্য্যরাজ্যের সীমা। ইহার পূর্ব্ব পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া গণিত। কিন্তু কেহ কেহ কহেন বর্ত্তমান পার্ব্বতীয় অনার্য্য গারো জাতি হিড়িম্বার বংশীয় ও মণিপুরবাসীরা ইরাবানের সন্তান, যদ্যপি তাহা হয় তবে ইহারা পাণ্ডবের বংশ—কি পাপে বর্জ্জিত বলিতে পারি না। ত্রিপুরপ্রদেশ পৌরাণিক মতে দৈত্যদেশ, অতএব আর্য্যভূমি নহে। এতাবতা স্থির হইতেছে যে, পৌরাণিক সময়ে বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে বহুল প্রদেশ বঙ্গান্তর্গত ছিল না কেবল মাত্র নদীমাতৃক গঙ্গা পদ্মাবেষ্টিত গাঙ্গ্য ভূমিই বঙ্গভূমি। আধুনিক বঙ্গভূমি যে ভাগীরথীপ্রসূত, নব্য নবদ্বীপ ও চক্রদ্বীপ তাহার সাক্ষী। অর্থাৎ আর্য্যভারতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, প্রকৃত বঙ্গদেশ আধুনিক। আর দেখিতেছি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বঙ্গজশ্রেণী নাই, কায়স্থদিগের আছে; অন্য জাতির শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহাতেই বোধ হয় ভাগীরথীর পূর্ব্ববঙ্গ প্রথমে ব্রাহ্মণের আবাসযোগ্য ছিল না। আদিশূরের সময় (খৃঃ ৯৫০-১০০০) যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন তাঁহারা রাজা কর্ত্তৃক পাঁচখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বংশ-জাত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন। অতএব বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস অল্পদিন, খ্রীষ্টীয় সহস্র বৎসরেরও পরে।* আরও দেখা যায় পুরাণাদিতে যে সকল তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে বঙ্গে একটিও নাই। কালীঘাট সন্দেহ স্থল। এজন্য বিবেচনা হয় বঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যের বাসস্থান হয় নাই।

এক্ষণে দেখা গেল যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ও প্রাচীন বঙ্গ এক নহে। প্রকৃত বঙ্গ বাঙ্গালার সামান্য অংশ মাত্র এবং ঐ অংশও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ভিন্নদেশাগত

---

§ Cunningham's Geography of Ancient India.

* সপ্তশতি ব্রাহ্মণেরা কোথায় ছিলেন স্থির নাই।

আর্য্যসন্তান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন মহাভারতে কেবল বঙ্গাধিপ হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে এই মাত্র, আর কোন কথা নাই। পুরাণেও বাঙ্গালির যুদ্ধবিগ্রহ লেখা নাই—কোন অমানুষিক কি গৌরবের কার্য্যের উল্লেখ নাই; তাহাতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে বাঙ্গালিরা কোন কালে যুদ্ধাদি করেন নাই ও ইতিহাসের সমালোচ্য কিছুই তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। এইটী সমূহ ভ্রম। আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গালিরা প্রাচীন বঙ্গবাসীর সন্তান নহেন। কান্যকুব্জের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌর্য্যাদি অপরিচিত ছিল না। পৌরাণিক সময় ছাড়িয়া দিই। কেন না তখনকার ইতিহাস আধুনিক জ্ঞানদৃষ্টিতে অপ্রামাণ্য। প্রকৃত ইতিহাসে বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় উল্লেখ আছে। তৎকালে বাঙ্গালার লোকের সাহস ও কার্য্যকারিতা ছিল। নৌচালন ও বাণিজ্য বহুল প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় কার্পাস বস্ত্র রোমনগরবাসিনী কুলীন কন্যারা ব্যবহার করিতেন। জগদ্বিজেতা বিভবপূর্ণ গর্ব্বিত সুখসম্ভোগী রোমানজাতি ঢাকাই সূক্ষ্ম উর্ণনাভবিনিন্দ্য বিচিত্র বসনকে সমাদর করাতেই বঙ্গীয় তন্তুবায়ের বিশিষ্ট গৌরব ছিল। বোধ হয় তৎকালে পৃথিবীমধ্যে তাহারা এসকলে অতুল্য ছিল। অদ্যাপিও চট্টগ্রাম প্রদেশের লোকেরা নৌচালনতৎপর। খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গীয় নাবিকেরা বঙ্গোপসাগরে অর্ণবযান দ্বারা পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের সমস্ত বাণিজ্য বহন করিত। বিখ্যাত ফা হিয়ান নামক চীন পরিব্রাজক অস্মদ্দেশীয় তাম্রলিপ্তী (তমলুক) বন্দরের বিশেষ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন এবং হুএন সাঙ্গ নামক বৌদ্ধ চীনও হিন্দু নাবিকচালিত জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। রোমান্ জাতিও সপ্তগ্রামের বণিক্‌দিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গালায় পূর্ব্বকালে বাণিজ্য, নৌচালন বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিদ্যার চর্চ্চা বহুকাল হইতে হইয়াছিল। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকাকার কুল্লুকভট্ট রাজসাহী নিবাসী ছিলেন। আদিশূরের সময় বেণীসংহার রচয়িতা ভট্টনারায়ণ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ জীবিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সময় জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কবিরা বঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। হলায়ুধ নামক বিখ্যাত পণ্ডিত এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। অতএব মুসলমানদিগের বাঙ্গালা জয়ের পূর্ব্বে এ প্রদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রে অনেকে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ অলঙ্কার মহাকাব্য নাটক ও গীতিকাব্যে ইঁহাদের সমকক্ষ সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তামধ্যে অল্পই আছে। পৃথিবীমধ্যে যে কোন ভাষায় ইঁহাদের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমানদিগের আগমনের পর বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কীর্ত্তনরচয়িতা, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যগুণকীর্ত্তনরচয়িতা, রামায়ণ অনুবাদক কীর্ত্তিবাস ও তৎপরে মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি কবিগণও বাঙ্গালা সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহারা ভিন্ন জাতির সাহায্য না লইয়া প্রকৃত বাঙ্গালি কর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধন করেন।

ইহাদের ভাব, চিন্তা, ভাষা, এই দেশসম্ভূত। ইহা তাঁহাদের নিজের না হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী, সুতরাং স্বজাতিভাবাপন্ন। এই কালমধ্যে অর্থাৎ (খ্রী ১০০০ হইতে ১৬০০) পর্য্যন্ত কবিকর্ণপূর, মথুরেশ প্রভৃতি কবি, রঘুনাথ ভট্ট দার্শনিক, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালার সাহিত্য-উদ্যানে আম্রপণস, নারিকেল থাকিত, লিচু. পিচ, গোলাপযাম ছিল না। সেফালিকা, মালতী, গন্ধরাজ ছিল, ডালিয়া গোলাপ, লিলাক ছিল না।* আধুনিক যুবার মনোহরণের উপযোগী না হইতে পারে, নূতন রসাস্বাদনী রুচির, নূতন গন্ধানুসারী ঘ্রাণের তৃপ্তিকর না হইতে পারে কিন্তু দ্রব্যগুলি স্বদেশজাত, সহজউপলব্ধ, সাধারণভোগ্য এবং সুলভ ছিল। এক্ষণকার ন্যায় কৃত্রিম স্বাদের ও বিজাতীয় রুচির অভাব থাকায় তৎকালে তাহাতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। তখন গিল্টী করা অলঙ্কার ছিল না। চুয়া, চন্দন, কর্পূর, কস্তূরী, একাঙ্গী ছিল, গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার ছিল না। কেবল সাহিত্যে ছিল না এমত নহে আচারে বেশভূষায় গৃহোপকরণে সাধারণ সভ্যতায় সর্ব্বাঙ্গীণ দেশী ভাব ছিল। বিলাতীজড়িত দেশী কি বিলাতী মাখা হয় নাই। বাঙ্গালা সম্পূর্ণ বাঙ্গালির ছিল।

এই সময় বেশভূষায় বাঙ্গালিরা কিরূপ ছিলেন নিশ্চয় বলা যায় না। মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালির ধুতি, উত্তরীয়, অঙ্গরাখা ছিল উষ্ণীষও থাকা সম্ভব।† বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্যেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা ধারণ করিতেন না। বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রথমে একবারে মস্তক মুণ্ডন করিতেন, তাহা হইতে ব্রাহ্মণেরা ক্রমে তদনুরূপ করিতে শিখেন। বোধ হয় পূর্ব্বে জটাজুট গুম্ফ সকলেরই থাকিত, ক্রমে বৌদ্ধদিগের দেখাদেখি সকলই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিনামা ব্যবহার হইত কি না বলা যায় না কিন্তু কাষ্ঠপাদুকা ছিল অথবা কাষ্ঠ ও চর্ম্মে নির্ম্মিত এক প্রকার পাদুকা ছিল। ছত্র, শিবিকা, গোযান ছিল। এক্ষণকার ন্যায় ঘোটকযানাদি ছিল না। মুসলমানদিগের সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় বেশ বাহনাদি প্রচলিত হইয়াছে।

ভোজনে এই কালমধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অন্ন ব্যঞ্জন

---

* মালীরা জোড়কলম বান্ধিতে শিখে নাই এবং পরের সামগ্রীগুলি লইয়া গৃহ সাজাইতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। এখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে পরের দ্রব্য কিছু রঙ্গ বদলাইয়া চালাইয়া দিই।

† কার্পাস ও পট্টবস্ত্র উভয়ই প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের অধিকারে শালের ব্যবহার হয়।

প্রায় একরূপ ছিল। খিচুড়ী ছিল না, পলান্ন ও পায়স* ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে রন্ধনের কথা আছে, তাহাতে বোধ হয় মুসলমানদিগের সময় আহারাদির পদ্ধতি এক্ষণকার ন্যায় ছিল। অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা মাংসভোজী ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধাধিকার হইতে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ হয়। এক্ষণে যে প্রকার ঘৃত ও তৈলপক্ক জলপানীয় দ্রব্য ব্যবহার আছে তাহা পূর্ব্বে ছিল না। মিষ্টান্নের মধ্যে মোদক সন্দেশ ও পিষ্টক ছিল। এতদ্ব্যতীত সকলই মুসলমানদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছি। কিন্তু জলপানীয়ের পদ্ধতি পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল না কেন না উক্ত জাতিরা প্রায় দ্বিভোজন করিতেন না। ব্যঞ্জনের দ্রব্যমধ্যে কপি, আলু, সালগাম, গাজর ছিল না, অন্যান্য ফল মূল মধ্যে পেঁপিয়া ও বাতাবি নেবু, বিলাতী ফল মাত্র ছিল না।

বাটী ঘর প্রায় এক্ষণকার ন্যায় ছিল। ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ বিরল ছিল। তুষারধবলকায় কবাটযুক্ত বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি কোথাও নয়নগোচর হইত না। গ্রাম, নগর, বিপণী, নদী ও সরোবরতটে, পুষ্পোদ্যানে অমরাবতী তুল্য কবি কল্পনাসম্ভূত-সমা অট্টালিকা কেহ দেখেন নাই। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তী, গৌড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি নগর ছিল তথায় প্রশস্ত স্থূল স্থূল ইষ্টক ও প্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল কিন্তু তাহাতে অন্য প্রকার কারুকার্য্য ও হস্তচাতুর্য্য ছিল। কাচের দ্বার কি চূর্ণের আবরণ, কি বিনিসীয় ঝিলমিল ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান উপকরণ বাষ্পীয় যন্ত্র ইংরেজরাজের সহিত এদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। মাদকদ্রব্য তুরিতানন্দ ও সিদ্ধি ছিল—মুসলমানেরা চরস তামাক প্রচলিত করেন। কেহ কেহ অনুভব করেন মোগলদিগের সময় তামাক এ দেশে আনীত হয়। কেহ বলেন "তাম্রকূট" অনেক দিন পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। সোমরস ও একপ্রকার ফুলের দ্বারা প্রস্তুত সুরার ব্যবহার ছিল; কিন্তু বৈষ্ণবচূড়ামণি ভক্তিমার্গপ্রদর্শক ভগবান্ চৈতন্যদেব হইতে সুরানিবারণী সভার সৃষ্টি হয়। চৈতন্যদেব (খৃ অঃ ১৪৯৭-১৫৪০) মোগল সাম্রাজ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার কিছু পূর্ব্বে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হয়; ঐ সময় পঞ্চ মকারের বৃদ্ধি, অতএব পাঠান রাজাদিগের সময়ে প্রথমে সুরার আধিপত্য, মধ্যে লোপ পাইয়া আবার প্রবল হইয়াছে। এখানে আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তন্ত্র শাস্ত্র বাঙ্গালায় অধিক ও অগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল।

বোধ হয় গীত বাদ্য বহুদিন হইতে এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। দুর্গোৎসব পদ্ধতি মধ্যে রাগাদির সহিত মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে। জয়দেবের গ্র-

---

* পায়স এক্ষণকার ন্যায় ছিল কি না বলা যায় না। ঋগ্বেদের সময় পায়সে দধি দেওয়া পদ্ধতি ছিল! (See Aitaryea Brahmana by Dr. M. Haug) কিন্তু বাঙ্গালিরা এরূপ পায়স খাইতেন কি না ঠিক নাই।

গোবিন্দে গীতসমূহে রাগের উল্লেখ আছে এবং তদ্দ্বারা জয়দেবগোস্বামী সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। গীতাভিনয় ও কৃষ্ণলীলাসঙ্কীর্ত্তন জয়দেবের সময়ে কি কিছু পরে আরম্ভ হয়। উভয়ই মুসলমানদিগের পূর্ব্বে। চণ্ডীর গান কবিকঙ্কণের পর ও তৎপরে কবির গান। এতদুভয় অপেক্ষাকৃত নূতন। নর্ত্তকীও ঐরূপ। বাঙ্গালার মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রথম গীতবাদ্যের আলোচনা। তথায় গীতবাদ্য অনেক উন্নতিপ্রাপ্ত ও বৈঠকীগানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বশেষে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত করিতেছিলেন। ইহারাই নীচ জাতি অথবা অন্ত্যজ যথা বাগ্‌দী ঢুলিয়া প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাদের সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্ম দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে না হইতে শাক্যমুনি মগধে ধর্ম্মধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইতে না হইতেই বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল। সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় ও মুসলমানদিগের প্রথমাধিকারে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হয়। অতএব পৌরাণিক মতও অনেক বৎসর প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তান্ত্রিক ও চৈতন্য সম্প্রদায়ে জাতিভেদ শিথিল ছিল। ফলতঃ ভগবান্ চৈতন্য বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পথে ধর্ম্ম-সংস্করণের চেষ্টা করেন। বিশেষ এই বৌদ্ধধর্ম্ম নীরস ও তর্কসম্ভূত, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ কিন্তু উভয়ই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মবিরোধী। এইরূপে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব ঘটিয়া ধর্ম্মভাব অনেকাংশে শিথিল হইয়াছে। এই জন্যই বাঙ্গালায় ইতর লোকেরা শীঘ্র শীঘ্র মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইয়াছে।

মুসলমানদিগের দ্বারা (১২০৩ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) বাঙ্গালায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সাহিত্যে পারস্যভাষার চর্চ্চা ও বাঙ্গালা ভাষায় পারস্য শব্দের বহুল ব্যবহার। ধর্ম্ম ও সমাজে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি। আচার ব্যবহার ও বেশভূষায় মুসলমানের অনুকরণ। আহারে মাংসের প্রাচুর্য্য ও খিচুড়ি প্রভৃতির নূতন ব্যবহার। নগরাদি নূতন নূতন নির্ম্মাণ মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, হুগলী, রাজমহল প্রভৃতি। বাণিজ্যে উন্নতি কিন্তু চাকরিরও বৃদ্ধি। হিন্দুদিগের স্বাধীনাবস্থায় লোকে প্রায় স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। মুসলমানদিগের সময় তাহা ক্রমশঃ কমিয়া এক্ষণে চাকরি প্রায় সাধারণবৃত্তি হইয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালি হিন্দুদিগকে উচ্চপদ দিতেন। নবাবের রায় রেঁয়ে, ঢাকা ও পাটনার ডিপুটী গবর্ণরী পদ ইহাদের প্রাপ্য ছিল। কমিসনরের পদাপেক্ষা এ সকল মর্য্যাদাবান্ পদ ছিল।

এই সকল পরিবর্ত্তন মধ্যে সাহিত্যের বিষয় বিশেষ অনুধাবনীয়। কবিওয়ালার গান, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী মুসলমানাধিকারের শেষে হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে মধ্যে পারস্যভাষার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু পারস্য কি কোনরূপ বিজাতীয় ভাবের বহুল অনুকরণ দৃষ্ট হয় না, ভাষার উন্নতিও দৃষ্ট হয়। একাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় গদ্য গ্রন্থ ছিল না বলিলেই হয়।

ইংরেজাধিকারে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। এক্ষণকার উন্নতি সকলেই দেখিতেছেন অতএব তাহা বর্ণন বাহুল্য। তবে বাঙ্গালিরা ইংরেজের সম্পূর্ণ অনুকরণে প্রবৃত্ত—আহার, ব্যবহার, বসন, গৃহ, আমোদ-প্রমোদ সকলই ইংরেজী। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজীতে চিন্তা করিয়া বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন। ষ্টুয়ার্ট নামক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিশারদ কহিয়াছেন যে, অন্য কোন লোককে মনের ভাব জ্ঞাপনার্থ ভাষার প্রয়োজন নহে, মনোমধ্যে ভাবিতে গেলেও ভাষার আবশ্যক; অতএব ইংরেজিতে ভাবিলে ইংরেজি বাঙ্গালার ভাব প্রকাশ হয় এই জন্যই ইংরেজি শিক্ষিতেরা উভয় জড়িত ভাষা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। যাঁহারা বড় বড় লেখক তাঁহারা কথায় কথায় মিল, স্পেন্সর, বেন্থাম প্রভৃতির দোহাই দেন। এই জন্যই বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজি ভাব পরিপূর্ণ। নাটক, কাব্য, নবন্যাস যে কিছু সাহিত্য দেখ ইংরেজি ভাব, ইংরেজি ভাষার অনুবাদ মাত্র। ফলতঃ বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য ধুতি চাদর পরা ইংরেজ।* ইংরেজি না জানিলে এক্ষণকার বাঙ্গালা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাঁহারা নূতন পদ্ধতির বাঙ্গালা শিখিতেছেন তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্ব কালের বাঙ্গালিরা তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও এক্ষণকার উন্নতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গদ্যলেখক পূর্ব্বে ছিল না। পদ্যও অনেকাংশে বিশুদ্ধভাবের অনুমোদিত ও উৎকৃষ্ট ভাবসম্পন্ন হইয়াছে। নূতন নূতন কৌশল ভাষার লালিত্য ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভরসা করি ক্রমে দোষগুলি বিলুপ্ত হইয়া গুণের আধিক্য হইবে।

---

* বাঙ্গালির অনুকরণপ্রিয়তা ডারউইন সাহেবের মতের আনুষঙ্গিক প্রমাণ। লাঙ্গুল থাকিলেও যা না থাকিলেও তা। ফলতঃ ডারউইন সাহেবের মতটী নূতন নহে; আমাদের প্রাচীন হিন্দুমতে অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে "নর বানর"—বা বাঙ্গালি। কবি গে সাহেবের (Gay's) সভ্য বানর!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমুদিনীর ভালবাসা

"আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম।" অতি ধীরে, অতি মৃদু, অতি মধুর এবং কাতরস্বরে একটি দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী নিকটস্থ একটি যুবাকে এই কথা বলিতেছিলেন। আগরা সহরে যমুনাতীরে একটি ক্ষুদ্র গৃহের বারেণ্ডায় বসিয়া কুমুদিনী আর শরৎকুমার, দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। শরৎকুমার কিঞ্চিৎ শীর্ণ—যেন সম্প্রতি কোন উৎকট রোগ হইতে শান্তিলাভ করিয়াছেন। দুইজনে দুইজনের বড় অনুগত—সর্ব্বদা একত্রিত, ক্ষণিক বিচ্ছেদ হইলে, উভয়ে বড় কাতর হইতেন; একের পীড়া হইলে, অপরে কাতর হইতেন, উভয়ে যেন কোন স্নেহরজ্জুতে আবদ্ধ। শরৎকুমারের মলিন মুখমণ্ডল দেখিয়া কুমুদিনী মধ্যে মধ্যে বড় কাতর হইতেন। কুমুদিনীর শুশ্রূষা এবং যত্নেই শরৎকুমার সে উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। একদিন কুমুদিনী অতি যত্নে শরতের হস্তধারণ করিয়া, তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, অতি কাতর স্বরে বলিল, "আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম।" শরৎকুমার কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি, আমি কাহার জন্য এ অতুল ঐশ্বর্য্য অন্যকে বিতরণ করিয়া দরিদ্র হইলাম, তোমার জন্য না? তুমিই না আমায় দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলে? মনে পড়ে কি না পড়ে দেখ, তুমি বলিয়াছিলে আমি যদি কখন কাহাকেও বিবাহ করি তবে সে দরিদ্রকে, এখন সে কথার অন্যথা কর কেন?" কুমুদিনী আবার মনে মনে ভাবিলেন, যে শরৎকুমার বড় ছেলে মানুষ—এখনই এইরূপ ছেলেমানুষের ন্যায় দাবি করিতেছে—যেন বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার কেনা গোলাম হইয়াছেন, না জানি বিবাহ হইলে কত অসঙ্গত দাবি করিবে! এই ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "কি অদৃষ্ট করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি!—শরৎকুমার! যে দরিদ্র হইবে তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে? যদি বিধাতা তাহাই আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে তোমা অপেক্ষা

শতসহস্র লোক দরিদ্র আছে, তাহারা সকলে আমার স্বামী হইবে—তুমি কেমন করে হবে—তুমি ত দরিদ্র নও—" এই বলিয়া কুমুদিনী অন্যমনস্ক হইয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। শরৎকুমার বালকের ন্যায় "সে কি, সে কি কুমুদিনি," বলিতে লাগিলেন। কুমুদিনী সে সকল কিছুই শুনিতেছিলেন না, অনন্যমনে যমুনার দিকে যাইয়া কি ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণের পর হঠাৎ শরৎকুমারের দুই হস্ত ধারণ করিয়া তাহার মুখপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, "শরৎকুমার, আমায় ভালবাস?" শরৎকুমার উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন "সে কি কথা কুমুদিনি? তোমায় ভালবাসিনে? তবে কাহাকে বাসি?"

কুমু। যদি ভালবাস তবে তাহার পরীক্ষা দাও।

শরৎ। কি পরীক্ষা কুমুদিনি! বল আমি প্রস্তুত আছি, প্রাণ দিতে হবে কি?

কু। না প্রাণ নহে, একে আমার আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি রাখিতে পারিতেছি না—তাতে আবার তোমার অত বড় প্রাণ লইয়া এ বোঝা কি ডুবাইব?

শরৎকুমার এই মর্ম্মভেদী উপহাসে বড় দুঃখিত হইলেন; তাঁহার যে আশাটুকুর উদ্দীপন হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিবিয়া গেল—বলিলেন, "তবে কি পরীক্ষা কুমুদিনী?"

কু। তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া একটি কথা স্বীকার কর।

আবার যেন শরৎকুমারের আশা জন্মিল।

শ। তোমার সম্মুখে স্বীকার করিলেই আমার শপথ হইল।

কু। না—তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া স্বীকার কর।

শ। তবে বল। শরৎকুমারের স্বর কম্পিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল—ওষ্ঠ শুষ্ক হইল।

কু। আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, আর কখন কাহাকেও তোমার বিষয় দান করিবে না।

শরৎকুমার প্রস্তরবৎ কুমুদিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কুমুদিনী বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিলেন, "আমার ত আর কিছু বিষয় নাই; সকল বিষয় দান করিয়া তোমার জন্য ভিখারী হইয়াছি।"

কু। যদিই আবার কোন বিষয় পাও?

"যদিই কোন বিষয় পাই, এ কি কথা—কুমুদিনী সে জন্য এত ব্যস্ত কেন, কুমুদিনীর সহিত আমার বিবাহ হইলে, পাছে ভবিষ্যতে আমি সমুদায় উড়াইয়া দিয়া তাহার সন্তানদিগকে দরিদ্র করি, সেই ভয়ে কি এই শপথ করাইতেছে। তাই কি?—বোধ হয় তাই,—নিশ্চয় তাই—তবে কুমুদিনী আমায় নিশ্চয় বিবাহ

করিবে”—এই ভাবিয়া শরৎকুমার ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “কুমুদিনী, আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, আর কখন আমার বিষয় কাহাকেও দান করিব না।”

কুমুদিনী শরৎকুমারের হস্তত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কেমন করে তোমায় বিবাহ করি শরৎকুমার—তুমি ত দরিদ্র নও—যদি দরিদ্র হইতে তবে বিবাহ করিতাম। তোমার বিষয় ত তুমি দান করিতে পার নাই।”

শ। বেশ, আমি দানপত্র লিখিয়া রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি—আমার বিষয় আমি জানিলাম না, তুমি জানিলে?

কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, “সে দানপত্র কোথায়?”

শ। কেন, রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

কু। বটে, কেমন করে পাঠাইলে বল দেখি?

শ। কলিকাতায় উকিলের বাড়ীতে দানপত্র লেখাইয়া মনে করিয়াছিলাম কলিকাতার ডাকে স্বহস্তে রওয়ানা করিব, কিন্তু সময় না পাওয়ায় রওয়ানা করিতে পারি নাই। তার পর গাড়ীতে মূর্চ্ছা হইল—জ্বর হইল, জ্বরগায়ে কাশী পৌঁছিলাম—কিছু মনে ছিল না—উহা পিরাণের পকেটে ছিল—তৎপরে আরোগ্য হইয়া স্বহস্তে ডাকে পাঠাইয়াছি।

কু। তাহাতে কি ছিল?

শ। কেন, দানপত্র।

কু। খুলে দেখিয়াছিলে কি?

শ। দেখিবার আবশ্যক কি, আমি স্বহস্তে কলিকাতায় খামের ভিতর পুরিয়াছিলাম।

কু। খাম কি কেহ খুলিয়া, দানপত্র বাহির করিয়া লইয়া অন্য কাগজ তাহার ভিতর পুরিয়া রাখিতে পারে না।

শরৎকুমার চমকিত হইয়া অতি কঠিন কটাক্ষে কুমুদিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে অতি পরুষভাবে বলিলেন, “কাহার আবশ্যক, কে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে?”

“শরৎকুমার তুমি যাহাকে ভালবাস, যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত ছিলে, সে কি তোমার রক্ষার জন্য চুরি করিতে পারে না?”

শরৎকুমার “কুমুদিনি, তবে তুমি চোর” এই বলিয়া অতি রুষ্টভাবে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া নদীপ্রতি চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কুমুদিনী এই রূঢ়বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, শরতের

ভালবাসার সহিত রজনীর ভালবাসার কত প্রভেদ। দুইজনেই তাঁহার কথায় বিষয় ত্যাগ করিয়াছে—একজন রূপে বশীভূত হইয়া, অপর তাঁহার গুণে। তাঁহার প্রতি রজনীর এতই বিশ্বাস যে, তাঁহার একটি কথায় বিষয় ত্যাগ করিল। রজনী দেবতার ন্যায় ভক্তি করে ও ভালবাসে, শরৎকুমার পুত্তলের ন্যায় ভালবাসে। যতদিন তাঁহার রূপ থাকিবে, ততদিন তাহার ভালবাসা। কিন্তু রজনীর ভালবাসা?—রজনী কি আর তাঁহাকে ভালবাসে?—এইবার বিষম সমস্যা—কুমুদিনী সকল ভুলিয়া গেলেন, চিন্তায় নিমগ্না হইলেন।

শরৎকুমার কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, নিকটের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ রতিকান্ত মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্র লিখিলেন; সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইলেন। আরও লিখিলেন যে, "সেই দানপত্র খানি তোমার ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীর নিকট আছে। যদি পারেন তবে তাহার নিকট হইতে কৌশলে বাহির করিয়া লইবেন। তা হলে বিষয় এখনও আপনার, তিনি চেষ্টা করিলে সফল হইবেন না—কুমুদিনী বড় কৌশলময়ী—"

তৎপরে রাগের শমতা হইলে শরৎকুমার বালকের ন্যায় পুনরায় কুমুদিনীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার ভালবাসা আবার কি ফিরে এলো—"

শরৎকুমার লজ্জিত হইয়া মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কুমুদিনী তাঁহার কষ্ট দেখিয়া অনেক প্রকার আদর করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, কুমুদিনি! রতিকান্ত তোমার দেবর, আর আমিত তোমার কেহ নহি বলিলে হয়—আমি রতিকান্তকে বিষয় দান করিলাম তোমার তাহাতে আহ্লাদ হইবার কথা, তা না হইয়া তুমি আমায় বিষয় ফিরিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ কেন?

"কেন? তবে শুন।" বলিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরৎকুমারের কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইলেন। তাঁহার অলকাগুচ্ছ শরতের গণ্ডদেশে পড়িল শরৎকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। অতি মৃদুস্বরে কাণে কাণে কুমুদিনী বলিলেন যে "তোমায় যেমন ভালবাসি, পৃথিবীতে তেমন আর কাহাকেও নহে; আমার সহোদর নাই—তুমিই আমার সহোদর। তোমার বিষয় তোমার থাকিলে আমি বড় সুখী হই।"

শরৎকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল, রোদনোন্মুখ হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক দিনের পর

আগরা সহরে যে বাড়ীটি হরিনাথ বাবু ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণের বাতায়নে বসিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। নিম্নে রাজপথ সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ, দিবারাত্র নানাপ্রকারের গাড়ী পাল্কী যাতায়াত করিতেছে। দূরে বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকাশ্রেণী অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণে হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছে এবং তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত যবনরাজদিগের ঐশ্বর্য্যের সুবর্ণ পতাকাস্বরূপ তাজমহলের সুবর্ণ কলস সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। সম্মুখে যমুনা নদী নীলাম্বু বিস্তৃত করিয়া দূরে অদৃশ্য হইতেছে—তদুপরি একপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অতি উচ্চ মাস্তুলের শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। অপর পার্শ্বে, মহাকালের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ ইংরেজের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

একদিবস অপরাহ্নে যখন সান্ধ্যতিমির ক্ষণে ক্ষণে মহানগরীতে গাঢ়তর হইতেছিল তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতায়নে বসিয়া কুমুদিনী ও বিনোদিনী রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধকর বায়ুস্পর্শলালসায় নাগরিকগণ নানাবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কেহ রাজপথে কেহ বা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন—কেহ বা পদব্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঘোড়ার টাপে ও অসংখ্য একার দূরনিঃসৃত ঝন্ ঝন্ শব্দে একত্রিত হইয়া মহানগরীর এক ভাগে অতি মধুর কোলাহল তুলিল। অন্যভাগে যে স্থানে হিন্দুদিগের বাস, সন্ধ্যাসমাগমে সে স্থানের দেবার্চ্চনাজনিত শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যোদ্যমের গভীর নিনাদে সহর পরিপূরিত হইল। ভগিনীদ্বয় কখন, সেই শব্দ শুনিতেছেন, কখন দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সহরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, কখন অশ্বারূঢ়া বিলাতী অবলাদিগের পরিচ্ছদ ও অশ্বচালনা দেখিয়া এবং সাহেবদিগের সহিত নিঃশঙ্কোচে তাহাদিগকে আলাপ করিতে দেখিয়া কত প্রকার ব্যঙ্গ করিতেছেন। বালিকাস্বভাবা বিনোদিনী তাহাদিগের গবাক্ষনিম্নে রাজপথে গাড়ির শ্রেণী দেখিয়া বলিল, "দিদি দেখ কত একা যাচ্চে, আমি গাড়ি গণি, এক খান, দু খান, তিন খান—দিদি দেখ দেখ কেমন সুন্দর বিবিটি, কেমন রং আহা চকের তারার রং ও চুলের রং যদি কাল হত তবে কি সুন্দর হত।" দেখিতে দেখিতে গড়গড় করিয়া গাড়ি অদৃশ্য হইল। তার পর—"এই পাঁচ খান, ছয় খান আহা, এখান কি সুন্দর গাড়ি! কেমন তেজাল ঘোড়া দুটো—এটি আমাদের বাঙ্গালি বাবু—কেমন গাড়িতে সুন্দর বসিয়া আছে—সাহেবদের অপেক্ষা ইহাকে ভাল দেখাচ্চে—" তৎপরে অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "দিদি এ কে? বোধ হয় যেন ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি"—বলিয়া হস্ত দ্বারা

কুমুদিনীকে টানিয়া দেখাইল। যেমন এক স্থানে প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতাসের বেগে সে স্থলের দ্রব্যাদি আলোড়িত হয় সেইরূপ গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুমুদিনীর মন আলোড়িত হইল, অথচ বাহ্যিক কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ হইল না। কুমুদিনী দৃষ্টি করিবামাত্র অস্ফুট চীৎকার ধ্বনিতে বলিলেন "রজনীকান্ত,—রজনী, আমাদের রজনী যে! বিনোদিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "কে, রজনী! তাই ত রজনীই বটে ত—দাড়ি রাখিয়াছে বলিয়া আমি প্রথমে চিনিতে পারি নাই।" এই বলিয়া অতি বেগে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া কুমুদিনী পিতা মাতাকে সংবাদ দিতে গেলেন।

কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া সেই গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন; দেখিতে দেখিতে গাড়ি অদৃশ্য হইল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ দ্রুত যাইয়া ছাদের উপর উঠিয়া দেখিলেন যে, গাড়ি রাস্তার একটি মোড় ফিরিয়া তাহাদিগের বাড়ীর সম্মুখের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দক্ষিণ ধারের একটি অনতিবৃহৎ সুচারু শ্বেত অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। সে অট্টালিকাটি কুমুদিনীর শয়নকক্ষ হইতে দৃষ্ট হয়। কত দিন তিনি সেই অট্টালিকাটির সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপরে নামিয়া আসিয়া বিনোদিনীকে ডাকিয়া গোপনে অতি মৃদুস্বরে (যেন কত লজ্জার কথা) বলিলেন, ঐ বাড়ীতে রজনীকান্তের বাসা—গাড়ি ঐ বাড়ীতে ঢুকিল। বিনোদিনী পুনরায় দৌড়িয়া যাইয়া হরিনাথ বাবুকে সংবাদ দিল, এবং ছাদে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি দ্বারায় বাড়ী দেখাইয়া দিল। হরিনাথ বাবু একখানি উত্তরীয় লইয়া সেই অট্টালিকার উদ্দেশে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাহুবল ও বাক্যবল কি

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তুলিজ বা সেদান জিত হইয়াছিল তাহা একই বল;—দুইই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটি মক্ষিকা ধরিয়া খাইল—সিস্‌স্ত্রিস হইতে আলেক্‌জণ্ডর রমানফ পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে—রোমান বা মাকিদনীয় খস্রু বা খলিফা, রুস বা প্রুস যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত্ত টিকটিকির বল একই বল—বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল—আর কালামুখী মার্জ্জারী ইন্দুর মুখে করিয়া পলাইল—উভয়েই বীর—বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি;—কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর একা মার্জ্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ—বীর্য্যে প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল—শিশিরবিন্দুও জল। মহম্মদের বীর্য্য, ও টিকটিকি বিড়ালের বীর্য্য একই বীর্য্য। দুইই বাহুবলের বীর্য্য। পৃথিবীর বীর পুরুষগণ ধন্য! এবং তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ—হের ডোটস হইতে কে ও কিঙলেক সাহেব পর্য্যন্ত—তাঁহারাও ধন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখন কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পাণিপাট বা সেডান জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন বা মাল'বর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল— অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্য-বীরের কার্য্যে নহে—কেহ কি মনে কর যে বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি

বিড়াল ইঁদুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফূর্ত্তি নাই—এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফূর্ত্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বক্ষম, এবং সর্ব্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে ছুরিতে কাটা যায় না—এমত প্রস্তর নাই যে আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এই খানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মানুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদর-পূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগসম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবল-প্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে এক বনের পশুগণ, কোন সিংহকর্ত্তৃক বন্যপশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহার জন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল—সিংহকর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে এই এক লক্ষ সৈনিকপুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা, বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হয়। এদিকে, এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত, বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজনিবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক

অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবন্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজনিবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবলপ্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে যদি আমরা এই সময়ে কর্ত্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্যপথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের একভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখন কখন রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্ত্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌স, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য-সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল, মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্টসাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য্য

সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমান অবস্থায় অকর্ত্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল এক মাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম, বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতদূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখন এক কালে কোন বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখন কখন জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদগত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশ-বাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখন সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইষা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইষা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্টসাধন হয় না এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধন কর্ত্তা, বাহুবলবীর ওয়াশিংটন। হলণ্ড বেলজিয়মের প্রধান উন্নতিসাধন কর্ত্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে, যে বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলেই বাক্যবল হয় না।—বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে

বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্ব সকল মনোমধ্যে হইতে উদ্ধৃত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল, একাধারে নিহিত—কখন কখন বলের আধার পৃথক্‌-ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্‌ভূত, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

পঞ্চম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন?

বঙ্গদেশে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার নাই, এজন্য বঙ্গদেশে শঙ্করাচার্য্যের মত লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গদেশে তাঁহার প্রভাবও বড় অধিক নহে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যকে লোকে দেবতা বলিয়া পূজা করে; তাঁহার গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে; তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে এবং অনেকে তাঁহার মত অনুসারে সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করে। মধ্যসময়ে ইয়ুরোপে আরিস্ততালের যেমন প্রভুত্ব হইয়াছিল আধুনিক ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্যেরও প্রায় তেমনি প্রভুত্ব। তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি ৩২ বৎসর বয়সে সমস্ত বেদ বেদান্তের টীকা লিখিয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ "অপরম্বা ভবিষ্যতি" বিষয়ক অদ্ভুত গল্পটী তাঁহার জীবনীতে প্রয়োগ করেন। কেহ আবার বলেন, শঙ্করাচার্য্য মহীশূরে স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণ পাইয়া টিপু সুলতান ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই হারিয়া যায়।

হিন্দুরা শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্করের অবতার মনে করেন এবং শৈবধর্ম্মের মিশনারী মনে করেন। ওদিকে আধুনিক ইংরেজীওয়ালারা বলেন শঙ্করাচার্য্য একজন সমাজসংস্কারক, তিনি বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে দূর করিয়া দেন। তাঁহা হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রচার হয়; তিনি লুথর লয়োলা প্রভৃতি সংস্কারকদিগের ন্যায় উচ্চদরের লোক। যাঁহার বিষয়ে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে, যাঁহার কথা এখনও বেদ বলিয়া কোটী কোটী লোক মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার কার্য্যকলাপ, তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ কিছু জানিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

(শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ)

আমরা শঙ্করাচার্য্যের বহুসংখ্যক জীবনচরিতের নাম শুনিয়াছি। এমন কি অনেক বৈদান্তিকের বিশ্বাস, তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া

গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক। আমরা এক্ষণে দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি শঙ্করার্য্যের একজন প্রধান ছাত্র আনন্দগিরির লিখিত, অপর খানি মাধবাচার্য্যের। প্রথম খানির নাম শঙ্করবিজয়, দ্বিতীয় খানির নাম শঙ্কর দিগ্বিজয়। প্রথম খানি গদ্য, দ্বিতীয় খানি মহাকাব্য—ষোড়শ স্বর্গে সম্পূর্ণ। বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রধানতঃ এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইবে। আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্যের এস্থলে বিশেষ পরিচয় আবশ্যক করে না, উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথিতনামা। একজন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্য্যের পরই প্রধানতম বলিয়া গণ্য এবং স্বীয় আচার্য্যের বহুসংখ্যক ভাষ্যের টীকাকার। অপরজন বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের ছাত্র, প্রসিদ্ধ বেদার্থপ্রকাশ নামক বেদব্যাখ্যার রচয়িতা।

(শঙ্করবিজয়ের প্রাধান্য)

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ অপেক্ষা শঙ্করবিজয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক অধিক। আনন্দগিরি আচার্য্যের সমসাময়িক লোক। মাধবাচার্য্য অন্তত তাঁহার ছয় শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আনন্দগিরি গদ্যে ইতিহাস লিখিব প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিয়াছেন। মাধব মহাকাব্য লিখিতে গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহাকে রাজা নব কালিদাস উপাধি দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথায় আমরা অধিক বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু কল্পনা যতই ক্ষমতা বিস্তার করুক না, ধর্ম্মভয়ে আচার্য্যের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড় ইতর বিশেষ নাই।

(শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ?)

শঙ্করাচার্য্য বিষয়ে কতকগুলি লোকায়ত কুসংস্কার আছে। তাঁহার জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে সেইগুলি দূর করা আবশ্যক। প্রথম কুসংস্কারক এই যে তিনি একজন সমাজসংস্কারক, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধের সহিত, কেহ চৈতন্যের সহিত, কেহ লুথরের সহিত, কেহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংস্কারকদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন না। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের সহিত তুলিত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ও উদারতাবিরহিত। তিনি বুদ্ধিমান্, বিচারপটু, অগাধবিদ্যাসমুদ্রপারযায়ী, যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক আয়ত্ত হয়, অনেকে দেবতা, গুরু, অবতার বলিয়া মান্য করে, সেই ক্ষমতা তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় বক্তৃতাশক্তি, তাঁহার ন্যায় রচনার গভীরতা, প্রাচীন ভারতবর্ষে দুর্লভ। কিন্তু তথাপি তিনি সমাজসংস্কারক নহেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতি এক করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিব, সকলকে সন্নীতি, সৎকার্য্য, সদ্ধর্ম্মে আনিয়া নূতন সভ্যতার

ভিত্তিপাত করিব, এ সকল তিনি পারিতেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ সকল উদারভাব তাঁহার অনুদার হৃদয়কন্দরে স্থান পায় নাই। সংস্কারবিষয়ে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এই,—তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শিব, শক্তি প্রভৃতি নানা উপাসনা হইতে বিরত করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া মঠাশ্রমী হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এইটুকু তাঁহার সংস্কারকার্য্য। ইহাতে ভারতবর্ষের দুই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রথম হিন্দুদিগের মধ্যে মঠাশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সহানুভূতি হ্রাস হইয়াছে। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই তিনি যখন উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেছেন, সেই সময়ে শূদ্রজাতীয় উন্মত্তভৈরব নামা কাপালিক তাঁহার সহিত বিচার করিতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "গচ্ছ কাপালিক, স্বচ্ছন্দে বেড়াও গিয়া; দুষ্টমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিবার জন্যই আমার আগমন। অগ্রজাতিপাদসেবনই অন্ত্যজাতির কর্ম্ম। অতএব শিষ্যগণ উহাকে দূর করিয়া দেও।" বলিবামাত্র শিষ্যেরা কশাঘাত পুরঃসর কাপালিককে দূর করিয়া দিল। * এই তাঁহার সমাজ-সংস্কার।

(বিরুদ্ধমত খণ্ডন)

অনেকে বলিবেন শঙ্করাচার্য্য যে সময়ের লোক সে সময়ে শঙ্করাচার্য্যের ব্রাহ্মণদমন কার্য্যদ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। সত্য, হইয়াছিল। তাঁহার পর ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট বিদ্যোন্নতি হয়। তিনি স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী নূতন সাহসের আবির্ভাব করেন, তাহার ফল আমরা আজিও অনুভব করিতে পারি। তাই বলিয়া তাঁহাকে আমরা রিফরমর বা সমাজ-সংস্কারক বলিতে পারি না। যদি বলিতে হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন বলিতে পারিব না। তাঁহার কৃত সংস্কার ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্য্যবসিত। বুদ্ধদেবের আগে হইলে তাঁহার ঐ সংস্কারেই বাহাদুরী হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওরূপ অল্পায়ত সংস্কার তাঁহার অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় মাত্র।

(তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই)

তাঁহার বিষয়ে দ্বিতীয় কুসংস্কার এই যে তিনি বৌদ্ধদিগকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পত্রে নয়ন নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পারা যাইবে এইটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। তিনি বৌদ্ধ জৈন মত নিরাকরণ করিয়া তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধেরা তাঁহার শিষ্যদিগের পদসেবা প্রভৃতি কার্য্য করিত ও তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট আহার করিত। জৈনেরা এই অবধি বণিক্ হইল, সৌগতেরা দাস হইল, বৌদ্ধেরা বন্দী অর্থাৎ স্তুতিপাঠক হইল। একথা সত্য, কিন্তু তিনি যেমন বৌদ্ধমত নিরাকরণ

* শঙ্করবিজয় ২৪ প্রকরণ।

করেন তেমনি বৈষ্ণবমত শৈবমত সৌরমত কাপালিকমত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডমত এবং ঔপনিষদিক সাংখ্যমতও নিরাকৃত করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইলেন কিরূপে? পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের যেমন প্রভুত্ব ছিল তাঁহার সময়ে তেমন ছিল না। তাঁহার সহিত বিচারে উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি উহাদের তাড়াইলেন কই? আর যদিই তাড়াইলেন তবে তাহার পরে লোক আবার বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যায় কেন?

(তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রচার হয় নাই)

তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই, বৌদ্ধেরা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ পৌত্তলিক উপাসনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ পৌত্তলিক উপাসনাপ্রবর্ত্তক পৌরাণিকগণই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পুনঃ সংস্থাপক। তাহাদের নিকট হইতেই আবার লোকে ব্রাহ্মণকে ভয় করিতে, ভক্তি করিতে, ভূদেব বলিয়া প্রণাম করিতে শিখে—তাহাদের দ্বারাই বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি বৈদিক অবৈদিক দেবতাদিগের উপাসনা প্রচারিত হয়। ইহার পর এই সকল পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিকধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আবার বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয়। সে প্রস্তাবও শঙ্করাচার্য্যের নহে। যখন বৈদিকধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আবার চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড হইতে উহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগ দিতে আজ্ঞা করেন। ইহারই নাম দুষ্ট ব্রাহ্মণদমন।

(তিনি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না)

যাঁহারা মনে করেন শঙ্করাচার্য্য শৈবমত প্রচারক তাঁহারা একবার শঙ্করবিজয় খুলিয়া দেখিবেন। উহার নির্ঘণ্টপত্রেই পাইবেন "শৈবমত নিরাকরণম্।" বাস্তবিকই শঙ্করাচার্য্যকে—শুদ্ধাদ্বৈত মতের পোষক অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পুরুষকে—শৈবমতপ্রচারক বলিলে তাঁহাকে গালি দেওয়া হয় মাত্র।

(সংক্ষিপ্তার্থ)

এতক্ষণ শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন না তাহাই দেখাইতেছিলাম। তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন না। বৌদ্ধদিগকে তিনি তাড়ান নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তিনি পুনঃপ্রচার করেন নাই। শৈবমতের তিনি সংস্থাপক নহেন। তবে তিনি কি ছিলেন? তাঁহার এত প্রভুত্ব কেন? এত লোকে তাঁহাকে মানে কেন? যে সকল মহৎকার্য্যের জন্য তাঁহার নাম ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত এক্ষণে সেই সকলের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সবিস্তারে লিখিতে গেলে বিস্তর হয় এই জন্য সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথা মাত্র বলিবার চেষ্টা করিব।

(তাঁহার যশের প্রধান কারণ বিদ্যা)

তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভুত্বের প্রধান কারণ তাঁহার বিদ্যা। অতি অল্প

বয়সেই তিনি তৎকালপ্রচলিত সমস্ত সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পাঠসমাপ্তির পূর্ব্বেই গুরুর আসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে দুরূহ দুর্ব্বোধ শাস্ত্রসমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। "চতুঃষষ্টি কলা, চতুর্দ্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সূত্র, ইতিহাস, তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত বিষয়ে তিনি কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পর্ব্বতে যেমন বালভানু, বিদ্যা অর্দ্রিমালায় তিনি তেমনি, ব্রহ্মাণ্ড গোলকীলকে তিনি ধ্রুবের ন্যায়, যজ্ঞবিদ্যায় যাজ্ঞবল্কের ন্যায়, (ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন।" ইহাতেও তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিলে জানা যাইবে তাঁহার বিদ্যার পার ছিল না। ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ, কাপালিকগ্রন্থ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণ মধ্যে ছিল। যিনি এত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি ?

(২য়। রচনা)

শঙ্করাচার্য্যের রচনা তাঁহার প্রতিপত্তির দ্বিতীয় কারণ। সরল মিষ্ট সুললিত পদবিন্যাস করত তিনি দুরূহ, দুর্ব্বোধ, অতি জটিল, শাস্ত্রসমূহের অতি কঠিন অতি সূক্ষ্ম অতি নীরস অংশ সকলের অতি বিশদ মূঢ়জনেরও সুবোধ্য অর্থ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন লেখনী ধারণ করিতেন বোধ হয় তাঁহার হৃদয় লেখনীর অনুসরণ করিত। ভাষা তাঁহার ভাব প্রকাশে কাঁপিত। যখন লেখনী ধরিতেন কোথাও যে বিশ্রাম করিতে হইত, ভাবিয়া ভাব সংগ্রহ করিতে হইত, মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে হইত, একেবারে বোধ হয় না। বোধ হয় অন্তঃস্থ বিদ্যাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া তীব্রস্রোতে অজস্র লেখনী মুখে নির্গত হইত। কখন স্তুতি, কখন নিন্দা, কখন হৃন্মর্ম্মভেদী শ্লেষ বাক্য, কখন ভক্তি, কখন জটিল শাস্ত্রার্থ, সমান বেগে, সমান তেজে, সমান ওজস্বিতার সহিত বহির্গত। শঙ্করাচার্য্যের মত কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীন বলিয়া দূরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার রচনা, তাঁহার ওজস্বিনী লেখনী মুখনিঃসৃত বাক্য পরম্পরা, তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ শাঙ্করভাষ্য, কখনই বিস্মৃতিসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না।

আচার্য্য শুদ্ধ নিজেই লিখিতে পারিতেন এমন নহে, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অনুকরণ করিয়া ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেবল স্বয়ং অদ্বিতীয় লেখক নহেন, তিনি এক অদ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আনন্দগিরি শ্রীধরস্বামী তাঁহার শিষ্য পরম্পরামধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ কেন যে কেহ তাঁহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সকলেই তাঁহাকে অনুকরণ করিতে গিয়াছেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা অনুকরণের অতীত।

(৩য়। বিচারপটুতা)

বিচারপটুতায় তাঁহার অপেক্ষা বড় অতি অল্প লোক ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া তত্তৎস্থানস্থ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া স্বমত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মবিরোধী চার্ব্বাক ও কাপালিক, হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধ, সৌগত, জৈন, হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর বেদধর্ম্ম বিরোধী পৌত্তলিকা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির উপাসক, বৈদিকদিগের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ী মীমাংসক, জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ীদিগের মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত মত বিরোধী সাংখ্যাদি। এই সমস্ত পণ্ডিতদিগকে স্বীয় মনীষা প্রভাবে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি কি অদ্বিতীয় নহেন? তিনি হিন্দুমনে এমনি একটী শীল মোহর মারিয়া গিয়াছেন যে এখন আর শুদ্ধ সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌত্তলিকমত, দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই সকলে অদ্বৈতধর্ম্ম বজায় রাখিয়া আপন আপন মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নূতন স্মৃতি, সর্ব্বত্র অদ্বৈতমতই চলিতেছে। যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত সেও শেষ বলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে মিলিয়া অদ্বৈত ঈশ্বর। কেবল বঙ্গীয় নৈয়ায়িকেরা শঙ্করাচার্য্য হইতে আপনাদিগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের বিলক্ষণ বাহাদুরী আছে।

(গ্রন্থ ও টীকার সংখ্যা)

শঙ্করাচার্য্য যে কত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছেন বলা যায় না। সকল এখনও ছাপা হয় নাই। বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত সূত্রের তিনি ভাষ্য করেন। যদিও টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টীকা নহে। এখানি শঙ্করাচার্য্যের নিজমত প্রচারের উপায়। সূত্রগুলি এমনি প্রহেলিকার ন্যায় যে, উহা হইতে যেরূপ ইচ্ছা অর্থ করিতে পারে। ঐ এক সূত্রমালা হইতে নানা দর্শনের নানা প্রস্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সূত্র হইতেই একখানি বৈষ্ণবদর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে আর একখানি দর্শন হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়া তাঁহার গভীর অন্তর মধ্যে শিষ্যগণকে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভগবদ্গীতার ভাষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার সময়ে যে সকল উপনিষৎ চলিত ছিল, শঙ্করাচার্য্য সে সমস্তেরই টীকা করিয়াছিলেন। অনেক উপনিষৎ তাঁহার পরে লিখিত, ইহাতে তাঁহার টীকা নাই। অনেক উপনিষদের টীকা তাঁহার লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি জাল। শঙ্করাচার্য্য সমস্ত বেদের টীকা করেন, সেটী মিথ্যা কথা। তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই টীকা লিখিয়াছেন। সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা তাঁহার অনেক পরে লিখিত হয়।

(স্বমত প্রচার)

শুদ্ধাদ্বৈতমত প্রচারই শঙ্করাচার্য্যের প্রভুত্বের প্রধান কারণ—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নান্যাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্যের তিনি অদ্বৈতমতে অর্থ করেন। তাঁহার মতে জগতে যা কিছু দেখি সমস্তই ভ্রম, তুমি, আমি, বাড়ী, ঘর, নদ, নদী, পর্ব্বতাদি সমস্তই ভ্রম, কেবল এক ঈশ্বরই সত্য। তিনিই সব তিনি ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে। তবে আমাদের যে তুমি আমি জ্ঞান হইতেছে সে অধ্যাস (যেটা যে জিনিস নয় সেইটাতে সেই জিনিস বলিয়া জ্ঞান।) শঙ্কর এই মত কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। লোকে বৈষ্ণবাদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করে। তিনি কোন্ কোন্ মত খণ্ডন করেন পরে লিখিত হইবে।

(মঠ স্থাপন)

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী—তিনি বহুসংখ্যক লোককে সন্ন্যাসী করেন। পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসী ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। মনুতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া এক দল লোক আছে। তাহারা বাল্যকাল হইতে গুরুর আলয়ে বাস করিয়া লেখা পড়া ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত—তাহারা বিবাহ করিত না কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসী ছিল না। চতুর্থ আশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়া লোকে সন্ন্যাসী হইত যোগাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। শঙ্করাচার্য্যের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে একটি মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" যে দিন সংসারে বিরক্তি হইবে সেই দিন হইতেই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য্য এই মত অনুসারে ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই সন্ন্যাসী মোহান্তের কিছু বাড়াবাড়ি। এখানকার সকল সন্ন্যাসীই শঙ্করকে আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করে। শঙ্করাচার্য্য আপন শিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য ভারতী নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। অনেকে বলেন তিনি গিরি পুরী ভারতী—তিন সম্প্রদায়ের মোহান্তদিগেরই সংস্থাপক, শঙ্করবিজয়ে কিন্তু আমরা ভারতী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই না।

এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোহান্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি, কিন্তু তাঁহার দশনামার মধ্যে দুই তিন জন ভারতী আছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বশিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে মঠস্থাপন করেন। ঐ মঠ এখন সিংহারি নামে খ্যাত। কাঞ্চী নগরে তাঁহার দুই পুরী বা মঠ ছিল। এখন আছে কি না বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন কিসের জন্য তাঁহার এত মান্য এক প্রকার উক্ত হইল। তাঁহার জীবন-চরিত বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিশোধ

রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে—এখনও কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া নীরবে সেই প্রান্তরপার্শ্বস্থিত অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন। সেই অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন, যে কক্ষে পাখা দুলিতেছিল, তন্মনঃ হইয়া সেই কক্ষ প্রতি চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া এক একবার দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। আবার চক্ষু মুদিয়া হস্তদ্বারা তাহা বিমর্দ্দিত করিবাতে, দৃষ্টির পুনঃ সঞ্চার হইতে লাগিল। খড়খড়ির অল্পায়তন ছিদ্রপথে অধিকক্ষণ দৃষ্টি চলিল না—মধ্যে মধ্যে লোপ হইতে লাগিল, উঠিয়া কুমুদিনী প্রাসাদোপরি যাইলেন। উপরে নীল নভোমণ্ডলে একখানি বৃহৎ রূপার থালের ন্যায় চন্দ্র উঠিয়াছে, পশ্চাতে নৌকাভরণা যমুনার নীলবক্ষে চাঁদের আলো ঝিকমিক করিতেছে, আর অতি দূরে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের মাস্তুল সকল নীলাকাশে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে মহানগরীর বিচিত্র প্রস্তর রেইল পরিবেষ্টিত অসংখ্য সৌধমালা নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া চাঁদের আলোয় হাসিতেছে। রাজপথ ক্ষণে ক্ষণে বিরলমানব হইতেছে, ভ্রমণকারীগণ ক্লান্ত হইয়া অলসাবেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে—প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে চন্দ্রালোকে বসিয়া এক এক দল যুবক স্থানে স্থানে গল্প করিতেছে। কুমুদিনী প্রাসাদোপরি উঠিয়া এসকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অবিচলিতচিত্তে স্থিরনেত্রে সেই অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একটি কক্ষে পাখা দুলিতেছিল, হঠাৎ পাখা থামিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কক্ষে মনুষ্যের অবস্থিতির চিহ্ন পাওয়া গেল না—তথাচ কুমুদিনী প্রাসাদোপরি বসিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে বিনোদিনী দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "দিদি শিগ্‌গির আয়—রজনীকান্ত আসিয়াছে—জ্যেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছে"—কুমুদিনী ইহা

শুনিবামাত্র অতি দ্রুত উঠিবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন "তুমি চল আমি যাচ্চি।" ইহা শুনিয়া বিনোদিনী বলিল, "ও কি দিদি—ও কি রকম—সে আমাদের ভগিনীপতি—অনেক দিন পরে আসিয়াছে, তার সহিত দেখা করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন "হয় বই কি—তুমি চল না আমি যাচ্চি—" পুনরায় বলিলেন, "রজনী কি তোমার আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?" বিনোদিনী উত্তর করিল "না, তোমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই—তবে আমার সহিত দেখা হওয়াতে অনেক কথা কহিলেন, তারপর জ্যেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, আমি সেই অবসরে তোমায় ডাকিতে আসিলাম। দিদি শিগ্‌গির এস—" এই বলিয়া বিনোদিনী অন্তর্হিত হইল। কুমুদিনী যখন একাকিনী হইলেন তখন অতি দ্রুতপদে উঠিয়া প্রাসাদ হইতে নিম্নে যে কক্ষে রজনী আছেন—সেই কক্ষের নিকট আসিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া যে মূর্ত্তি দিবারাত্র ভাবিয়া থাকেন সেই মূর্ত্তি অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন, যেমন বর্ষার মেঘাকাশে পূর্ণচন্দ্র, কিঞ্চিৎ ম্লান, অথচ নয়নরঞ্জন, স্নিগ্ধকর বটে। কোন গভীর চিন্তামেঘে তাহার মুখ চন্দ্রমার উজ্জ্বলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হৃদয় উছলিয়া উঠিল, নয়ন বারিতে পরিপূরিত হইল, আর দেখিতে পান না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিতে লাগিলেন। এবার রজনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না—কুমুদিনীর কি যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কোন দিকে দাঁড়াইলে ভালরূপে দেখিতে পাইবেন স্থির পান না। রজনীকান্তকে ত অনেকবার দেখিয়াছেন. এবার এত দেখিতে সাধ কেন? দেখে সাধ মিটে না কেন? অন্ধকারে কক্ষমধ্যে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। একস্থানে কতিপয় দ্রব্যাদি একত্রিত থাকাতে কুমুদিনী তাহাতে পা বাঁধিয়া পড়িয়া গেলেন, তৎসঙ্গে ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির ঝনঝন শব্দ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আলো লইয়া কুমুদিনীর মাতা, বিনোদিনী ও রজনীকান্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কুমুদিনী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়া মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে পলাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া রজনী সে কক্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনী লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া ছাদের উপর গিয়া বসিলেন। কাঁদিতে লাগিলেন, কেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না। অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীচে আসিয়া দেখিলেন বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বিনোদিনী ও রজনীকান্ত চন্দ্রালোকে যমুনার শোভা দেখিতে দেখিতে কথোপকথন করিতেছিল, বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাকরি কর?"

র। ওকালতি করি।

বি। কত টাকা পাও ?

র। কিছু না।

বি। তবে কি রকম চাকরি ?

র। এ নূতন রকম চাকরি।

বি। ও গাড়িখানা কার ?

র। আমার।

বি। টাকা দিয়া কিনিয়াছিলে ?

র। নয় ত কি।

বি। টাকা কোথায় পেলে ?

র। কুড়িয়ে পেয়েছি।

বি। ছি তুমি চোর।

র। কিসে ?

বি। যে টাকা তুমি কুড়াইয়া পাইয়াছ সে টাকা কি তোমার ?

র। এইবার হারি মানিলাম।

দুইজনে ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ রহিল, কেহ চাঁদের পানে চাহিয়া কেহ যমুনার প্রতি চাহিয়া। কিয়ংক্ষণের পর বিনোদিনী আবার বলিল, "তুমি কি আর বিবাহ করিয়াছ ?" রজনীর হঠাং মুখকান্তি পরিবর্ত্তিত হইল, পরে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "না, কর্‌বো।"

বি। কাহাকে ?

র। তা পরে জানিবে।

বি। মেয়েটির বয়স কত ?

র। তোমার বয়স।

বি। দেখিতে কেমন ?

র। বড় সুন্দরী।

বি। এমন কেউ কখন দেখিনি কি ?

র। কেউ কখন দেখিনি।

বি। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি ?

র। দেখিয়াছি, দেখিবামাত্র ভালবাসিয়াছি।

বি। আর সে তোমাকে ভালবাসিয়াছে ?

র। তা কেমন করে জান্‌ব।

বি। ভাল, এমন অদ্ভুত সুন্দরী খুঁজে খুঁজে কোথায় পাইলে ?

র। তোমাদের গ্রাম হইতে, সুবর্ণপুর হইতে।

বি। আমাদের গ্রাম হইতে? কার মেয়ে, নাম কি?

র। শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নাম বিনোদিনী।

ইহা শুনিবামাত্র বিনোদিনী লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বেগে সেখান হইতে পলায়ন করিল। তাহার মলের ঝনঝনাৎ শব্দ প্রতি কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রজনীকান্ত হাসিতে হাসিতে একবার বলিলেন, "দৌড়িও না, পড়ে যাবে।" তৎপরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আর কুমুদিনী? কুমুদিনী কোথায়? বারেণ্ডার সন্নিকটে একটি কক্ষদ্বারের অন্তরালে প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন, হৃদয়াঘাতে ব্যথিত হইয়া, হস্তদ্বারায় হৃদয় চাপিয়া, স্থিরনেত্রে রজনীকান্তের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। রজনীকে কত সুন্দর দেখিতেছিলেন। তাঁহার কথা কত মধুর বোধ হইতেছিল। আর বেহায়া বিনোদিনীকে কি কুৎসিত দেখিয়াছিলেন? কি নির্লজ্জার ন্যায় রজনীর সহিত কথা কহিতেছিল।

কুমুদিনীর মনে পড়ে কি না পড়ে জানি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ মনে আছে, এইরূপ আড়ি পাতিয়া রজনীকান্ত এক দিবস রাত্রে কুমুদিনীর ও শরৎকুমারের প্রেমালাপ শুনিয়াছিলেন। সেই জ্যোৎস্নাময়ী উদ্যানের স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রালোকপ্রতিবিম্বিত সরোবরের সোপানে বসিয়া যখন দুইজনে প্রেমালাপ করিতে-ছিলেন, তখন নিকটের একটি কামিনী বৃক্ষের ডাল অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। কুমুদিনী তাহাতে কত রাগ করিয়াছিলেন, কত বিরক্ত হইয়াছিলেন, রজনীকে রূঢ়বাক্য দ্বারা কত ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এমন কি রজনীকে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। আর আজ তিনি স্বয়ং কি করিলেন? সংসারের এইরূপ গতি!

রজনীকান্ত বারাণ্ডা হইতে যাইয়া কুমুদিনীর মাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "বাবা রোজ সকালে বিকালে এক এক বার দেখা দিও—আর প্রত্যহ এখানে আহার করিও।" রজনীকান্ত দেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ আহার করিতে সম্মত হইলেন না—বলিলেন, "আমায় প্রত্যহ কাছারি যাইতে হয়, কোন দিন দশটার সময়, কোন দিন দুই প্রহরের সময়। প্রত্যহ এখানে আহার করা হইয়া উঠিবে না, এক এক দিন আহার করিব।" এই বলিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন। কুমুদিনীও আপনার শয়নকক্ষের গবাক্ষে আসিয়া বসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি রাজপথ ত্যাগ করিয়া প্রান্তর দিয়া উহার দক্ষিণপার্শ্বের একটি অট্টালিকার দিকে যাইতেছেন। অতি মৃদু গমনে যাইতেছেন, প্রান্তর পার হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর তাঁহাকে দেখা গেল না—কিয়ৎকাল বিলম্বে

অট্টালিকার বাতায়নপথ দিয়া যে দীপমালা দেখা যাইতেছিল একে একে তাহা সকলই নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে গবাক্ষগুলি কে আসিয়া বন্ধ করিল, জনমানবের আর চিহ্ন পাওয়া গেল না—কেবল মাত্র সুন্দর শ্বেত অট্টালিকাটি চন্দ্রালোকে আরো শ্বেত দেখাইতেছিল, কিন্তু কুমুদিনীর হৃদয়ও অন্ধকারময় হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দানপত্র

রজনীকান্ত কুমুদিনীকে কত ভালবাসিতেন, কুমুদিনী ভিন্ন আর কেহ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কুমুদিনী তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল, কুমুদিনী প্রতিমার স্বরূপ তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিত—কিন্তু যে দিবস জানিতে পারিলেন যে তাঁহা হইতে শরৎকুমার কুমুদিনীর অধিক প্রিয়তম সেই দিবস তাঁহার হৃদয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লবের ফল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে কুমুদিনী প্রতিমা তাহার হৃদয়মন্দির হইতে বিসর্জ্জন করিবেন। কতদূর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহা আমরা জানি না কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে যে সে প্রতিজ্ঞায় সফল হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ এই যে যাহাকে দেখিবার জন্য, যাহার সহিত কথা কহিবার জন্য, রজনী সতত নানাপ্রকার কৌশল কল্পনা করিতেন, আজ বহু-দিবসের পর তাহার সহিত দেখা হইল। দেখা হইলে রজনীকান্তের কি কোন বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল? কিছু না। তিনি কি "কুমুদিনী" বলিয়া একবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। মুক্ত বাতায়নে একাকিনী বসিয়া কুমুদিনী তাহাই ভাবিতেছিলেন। ভাল, রজনী কি একবার মুখের কথা খুলিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না? একবার কুমুদিনী বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্তি হইল না? রজনী যে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন তাহা মিথ্যা কথা। রজনী তাঁহাকে কখন ভাল বাসিতেন না, তিনিই কেবল রজনীকে ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান হইল না, এখন তাঁহার জীবন অন্ধকার বিজন মরুভূমির ন্যায়। এ আঁধার জীবনাকাশে একমাত্র তারা রজনীকান্ত, এ আঁধার বিজন অরণ্যে এক মাত্র আলো রজনীকান্ত। কিন্তু সে আলো অতি দূরে, কখন তাঁহার জীবন আলোকময় করিবার আর সম্ভাবনা নাই। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মরীচিকার ন্যায় অতিদূরে একবার জ্বলিতেছে একবার নিবিতেছে। কুমুদিনীর নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "হা বিধাতা, কি করিলে, কেন আমার এ দশা করিলে, আমি কি পাপ করিয়াছি যে আমার দর্প চূর্ণ করিলে, আমাকে রজনীকান্তের

ক্রীতদাসীর ন্যায় হইতে হইল ! রজনী হাসিলে আমি হাসিব, রজনী কাঁদিলে আমি কাঁদিব। রজনীকান্তের প্রতি কেন আমার এ প্রকার ভাবান্তর জন্মিল, মনের এ দুর্দ্দমনীয় বেগ কি কখন সম্বরণ করিতে পারিব না—বিধাতা তুমিই জান।” বলিতে বলিতে কুমুদিনীর হঠাৎ ভাবান্তর হইল, রজনীকান্তের মুখ মনে পড়িয়া ভাবান্তর হইল, মেঘাবৃত শরতের শশীর ন্যায় তাহার হাসি মনে পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ঈশ্বরকে ডাকিয়া কি রজনীকান্তের অকল্যাণ করিলেন, মনে মনে বড় যন্ত্রণা হইল, হৃদয় উছলিয়া উঠিল, আবার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। রজনীকান্তের ললাটে একটি শুষ্ক ক্ষত চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। ভাবিলেন, কিসের ক্ষত ? আহা, কত কষ্ট পাইয়াছে, কে তাহাকে সে সময়ে যত্ন করিয়াছে ? কে তাহাকে আমার বলিয়া যন্ত্রণা নিবারণ জন্য আদর করিয়াছে ? এ জগতে যে রজনীকে আমার বলে এমন কেহ নাই। কেবল এই হতভাগিনী চিরদুঃখিনী মনে মনে আমার বলিয়া থাকে। এই সুখময় চিন্তায় নিমগ্না হইয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। কুমুদিনী সংজ্ঞাহীনা হইয়া সেই মুক্ত বাতায়নে বসিয়া আছেন, নিদ্রার আকর্ষণ নাই ; শয্যা একবারও স্পর্শ করেন না। ক্রমে নিশানাথ মধ্যগমন অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে আসিলেন। হঠাৎ কুমুদিনীর চিন্তা ভঙ্গ হইল ; বাতায়নের নিম্নে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিলেন। দেখিলেন জ্যোৎস্নাবিধৌত রাজপথের পার্শ্বে তাঁহার গবাক্ষের নিম্নে একটি বকুলবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছে। কুমুদিনী সরিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য বাতায়নের অন্তরালে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একজন বাঙ্গালি, অপর সেই দেশীয়—যে ব্যক্তি বাঙ্গালি সেই ব্যক্তি কুমুদিনীর গবাক্ষ প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুস্থানীকে চুপি চুপি কি বলিতেছে। কুমুদিনীর বড় সন্দেহ হইল, ভাবিলেন এই দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি অবশ্য কোন দুরভিসন্ধিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছে। তজ্জন্য গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া চলিলেন। নিকটে এক কক্ষে বিনোদিনী শয়ন করিতেন, অতি দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া বিনোদিনীর কক্ষ আলোকিত করিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে কক্ষের সমুদায় দ্রব্যাদি দৃষ্ট হইতেছে। এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে বিনোদিনীর শয্যা রহিয়াছে কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে নাই। আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কুমুদিনী কক্ষের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেই কক্ষের একটি বাতায়নে কুমুদিনীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া প্রান্তরপার্শ্বে রজনীকান্তের অমল শ্বেত অট্টালিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিনোদিনী বসিয়া আছে। অতি মৃদুস্বরে কুমুদিনী ডাকিলেন, “বিনোদ!” বিনোদিনী চমকিয়া উঠিলেন, লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, যেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছেন। কুমুদিনী তাহা লক্ষ্য না করিয়া, তাহার হস্ত ধরিয়া আপনার ঘরের বাতায়নের নিকট আনিয়া চুপি চুপি বলিলেন দেখ, বকুলতলায় কারা দাঁড়াইয়া। বিনোদিনী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু কুমুদিনী দেখিলেন অনতিদূরে রাজপথে সেই দুই ব্যক্তি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বিনোদিনী আপনার কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনী একাকিনী বাতায়নে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন, তন্দ্রা আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। কক্ষমধ্যে কোন প্রকার শব্দেতে নিদ্রা ভাঙ্গিল দুই এক বার খুট খুট শব্দ শুনিলেন, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, বারেণ্ডার দিকের একটি দ্বার কে খুলিয়াছে, এবং তজ্জনিত অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন এক ব্যক্তি মুখ আবৃত করিয়া তাঁহার একটি বাক্স খুলিতেছে। কুমুদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ চীৎকার করাতে হরিনাথ বাবু এবং অন্যান্য পৌরজন দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু চোরকে কেহ দেখিতে পাইল না, কেবলমাত্র দেখিল বারেণ্ডায় একখানি মই লাগান রহিয়াছে। আলো আনিয়া হরিনাথ বাবু কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, দেখিলেন, কুমুদিনীর বাক্স খোলা রহিয়াছে কিন্তু অলঙ্কার অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই। কোন পথ দিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল আলো লইয়া তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, বারেণ্ডার নিম্নে মইয়ের নিকট একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। আলো দ্বারা তাহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কুমুদিনীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাগজখানি কি তুমি জান? ইহা কি তোমার বাক্সের ভিতর ছিল?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন "এ খানি শরৎকুমারের দানপত্র, ইহা আমার বাক্সের ভিতর ছিল।" এবং কি প্রকারে উহা পাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার পিতাকে অবগত করাইলেন। হরিনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "তবে শরৎকুমারের বিষয় শরৎকুমারের আছে, রতিকান্তের নহে।" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, দানপত্র যখন রেজিষ্টরি হয় নাই, এবং রতিকান্তের হস্তগত হয় নাই তখন শরতের আছে বই কি।"

হরিনাথ বাবু কুমুদিনীর কৌশলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কুমু, তুমি আজ বালস্বভাব শরৎকে রক্ষা করিয়াছ, যদি শরৎ তোমার পরামর্শে সকল কার্য্য করে তবে তাহার বিপদসম্ভাবনা নাই।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া অগ্নিসংস্পৃষ্ট করিলেন। এই বৃত্তান্ত পৌরজন সকলে জানিতে পারিল।

হরিনাথ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে।

কুমুদিনীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর শরৎকুমার। তজ্জন্য মনে মনে বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যমুনার জলে

পরদিবস অপরাহ্নে হরিনাথ বাবু কুমুদিনী ও তাহার প্রসূতিকে ডাকিয়া নির্জ্জনে বলিলেন "কুমুদিনী, তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়, যে আমি পুনরায় সংসার আশ্রমী হইয়াছি কেবল তোমার জন্য। তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় সন্তান নাই; তোমার সুখসাধন আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; তুমি বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলে, আমি সেই দুঃখে উদাসীন হইয়াছিলাম, পরে তুমি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হওয়াতে আমি পুনরায় সংসারী হইয়াছি, কিন্তু আজ প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, তথাচ তোমার বিবাহ দিতে পারিলাম না। আমি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি—আর অল্পদিন বাঁচিব, তোমায় এ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হইলে বড় কষ্টে মরিব; অতএব—"

কুমুদিনী অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, তুমি যে আমাকে কখন ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও মনে আসে না। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে তার পর আর আমার কি সুখ থাকিবে, তাহলে কি আমি আর বাঁচিব।" হরিনাথ বাবু উত্তর করিলেন, "যাক আমার মৃত্যুর কথা উত্থাপন করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না—এক্ষণে আমি তোমার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। তোমার ন্যায় সুবোধ মেয়ে যে পিতৃ আজ্ঞা অবহেলন করিবে তাহা আমার বোধ হয় না—আগামী কল্য সুবর্ণপুর যাত্রা করিব, সেই স্থানে বিবাহ হইবে—আমি পাত্র স্থির করিয়াছি, তোমরা প্রস্তুত হও। কুমুদিনি, আমায় সুখী কর।"

কুমুদিনী বঙ্গীয় কুলকামিনী; বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে লজ্জা পাইতে হয়, সুতরাং লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। পরে হরিনাথ বাবু তাঁহাকে বিদায় দিলেন! কুমুদিনী আপনার কক্ষে যাইয়া সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; যাহাকে মনে মনে পতিত্ব বরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে জন্মের মত হারাইলেন, আর কখন তাহাকে মনে স্থান দিতে পারিবেন না, তাহার চিন্তা এক্ষণ হইতে পাপ সংস্পৃষ্ট! তাঁহাদের জীবনের একমাত্র সুখ সেই রজনীকান্তের চিন্তা, আজ হইতে তাহা বর্জ্জন করিতে হইল; কাহার জন্য? শরৎকুমারের জন্য—পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার পিতার কথার আভাষে কুমুদিনীর নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে,

শরৎকুমারকে তিনি আপন জামাতা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শরৎকুমার তাঁহার স্বামী হইলে তিনি বড় অসুখী হইবেন। পিতার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে, এ কথা পিতাকে কেমন করিয়া জানাইবেন। বঙ্গীয় কুলকামিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধে মতামত দিবার ত কোন অধিকার নাই, কেবল মাত্র কাঁদিবার অধিকার আছে। কুমুদিনী কাঁদিতেই লাগিলেন। রজনীকান্তের মুখ মনে করিয়া কাঁদিতেই লাগিলেন, আর বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইল, পাছে কেহ তাঁহার মনোবেদনা জানিতে পারে, এই জন্য কুমুদিনী চক্ষু মুছিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। বিনোদিনী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি তোমার মুখ ভার, চক্ষু ফুলেছে কেন? কি হইয়াছে?—" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, "অসুখ হইয়াছে।" কিন্তু তৎপরেই গামছা লইয়া তাঁহার বাটীর পার্শ্বে যমুনাতীরে যে একটি গোপনীয় ঘাট আছে, সেই ঘাটে গাত্রপ্রক্ষালন করিতে গেলেন, আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া যমুনার জলে আঁধার আকাশে একমাত্র তারার ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হওয়াতে যমুনার অপর তীর অন্ধকারময় হইল। কুমুদিনী চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইলে তাঁহার বোধ হইল, যেন অন্ধকারময় অনন্ত-সমুদ্রে ভাসিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কেবল বারি নিঃশব্দে অন্ধকারে ছুটিতেছে। তিনি একাকিনী যেন সেই অকূলসমুদ্রে অন্ধকারে ভাসিতেছেন, চারিদিকে বারিরাশি উছলিতেছে। ভাবিলেন, আমার জীবন এইরূপ আঁধার অনন্তসমুদ্র, কতদিনে যে ইহা শেষ হইবে তাহা জানি না। দূরে অন্ধকারে যমুনার বক্ষে একটি আলো জ্বলিতেছিল। কোন জলযানে উহা জ্বলিতেছিল। কুমুদিনী ভাবিলেন, ও আলোটি কেন জ্বলিতেছে, আমার জীবন-সমুদ্রে যে একটি মাত্র আলো জ্বলিতেছিল, তাহা আজ নির্ব্বাণ হইয়াছে, ওটি জ্বলিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে সে আলোটি নিবিয়া গেল। কুমুদিনী চমকিত হইলেন, হৃদয় অন্ধকারময় হইল, এই সামান্য ঘটনাটি রজনীকান্তের অমঙ্গল স্বরূপ ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু সেই আলো আর জ্বলিল না। ভগ্নহৃদয়ে যমুনার বারিরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনতিদূরে জলের ভিতরে একটি মৃদু আলো দেখিয়া উৎসাহান্বিতা হইলেন। কৃষ্ণা যামিনীর নীল নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল সান্ধ্য তারার প্রতিবিম্ব যমুনার কালো জলে ঝিকমিক করিতেছে দেখিয়া হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল, অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন "বালাই, কেন আমি অকারণে রজনীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলাম!" বলিতে বলিতে আর সে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না। উপরে চাহিয়া দেখিলেন একখানি কাল মেঘ আসিয়া সেই সন্ধ্যা তারাকে আবৃত করিয়াছে। দেখিয়া কুমুদিনীর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল—ভাবিলেন প্রকৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার রজনীকান্তের ভবিষ্যৎ

অমঙ্গল তাঁহাকে দেখাইতেছে। নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিয়া যমুনার জলে পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। ঘাটের সোপানাবলীতে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া হস্তদ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি একখানি গামছা কাঁধে করিয়া জলে নামিবার উপক্রম করিতেছে। সে জলে নামিল। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন "কুমুদিনি", অপর মনে মনে বলিল "রজনী।" আগন্তুক ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে জল হইতে কূলে উঠিয়া গেলেন। পরে সোপানাবলী আরোহণ করিতে লাগিলেন। কুমুদিনীর হৃদয় উছলিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল একবার তাঁহাকে স্পর্শ করেন। একবার তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনোবেদনা সকল প্রকাশ করেন। নিষ্ঠুর রজনীকান্ত আস্তে আস্তে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানে উঠিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধকারে রজনীকান্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "যাও, প্রাণনাথ, যাও! এ অভাগিনীর সংস্পর্শে আসিও না। যাও প্রাণেশ্বর! তোমার পদে যেন কখন কুশাঙ্কুর না বিঁধে! কখন নাইতে যেন মাথার কেশ না ছিঁড়ে—তুমি চিরজীবী হও—আবার কোন মনের মত সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হইয়া যেন সুখী হও! কিন্তু আমায় চিরদুঃখিনী করিলে! আমার এ কি হইল!—" অবিশ্রান্ত নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল, সেই আঁধার জলরাশির মধ্যে আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কূলে কুক্কুরের কলরব শুনিতে পাইয়া দেখিলেন, জলের নিকটে একটি বিড়ালের ন্যায় ছোট বিলাতী কুক্কুরকে একটা বৃহৎ দেশী কুক্কুর তাড়া করিয়াছে। দেখিয়া চিনিলেন যে ছোট কুক্কুরটি রজনীকান্তের। অতি দ্রুত তীরে উঠিয়া সেই কুক্কুরটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু দেশী কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে—কুমুদিনী দৌড়িতে দৌড়িতে আর্দ্রবসন জন্য সোপান হইতে পড়িয়া গেলেন, বড় আঘাত হওয়াতে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। তৎপরে কে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। তাহার হস্তের উপর নির্ভর করিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন রজনীকান্ত ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া রহিয়াছেন। কুমুদিনীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, দুইজনে দুই জনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই জনহীন শব্দহীন যমুনার উপকূলে, অন্ধকারে দুইজনে দুইজনের হস্ত ধারণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বামহস্ত দ্বারা সেই কুক্কুরটি বক্ষে ধারণ করিয়া, কুমুদিনী দক্ষিণ হস্ত রজনীর হস্তে রাখিয়া নীরবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। আর সে লজ্জা নাই—সে ব্রীড়াবিকম্পিত দৃষ্টি নাই—হঠাৎ কুমুদিনীর

আচরণ পরিবর্ত্তন হইল, অনেকক্ষণের পর রজনীকান্ত কথা কহিলেন, বলিলেন, "কুমুদিনি!" কুমুদিনী অমনি চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জায় মস্তকে কাপড় টানিলেন, মুখ নত করিলেন, রজনীর হস্ত হইতে আপনার হাত টানিয়া লইলেন, বক্ষ হইতে কুক্কুরটি লইয়া রজনীর হস্তে দিলেন। রজনী দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া কুক্কুরটি লইলেন। আবার বলিলেন, "কুমুদিনি, কুমুদিনি—বড় আঘাত হইয়াছে কি?"

কুমুদিনী মস্তক নত করিয়া অতি মৃদু স্বরে উত্তর করিলেন "না।" রজনী যেন আবার কি বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কুমুদিনী আর দাঁড়াইলেন না। অতি মৃদু মৃদু পদসঞ্চালনে উপরে উঠিতে লাগিলেন। ঘাটের উপরে তাঁহাদের খিড়কির দ্বারের নিকটে বিনোদিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিদি, ঘাটে কে?"

কু। রজনীকান্ত।

বি। কি হয়েছে, খোঁড়াচ্চ কেন?"

কু। পড়ে গিয়াছি।

বি। আহা! বড় লেগেছে কি, কোথায় লেগেছে?

বলিয়া বিনোদিনী অতি যত্নে হস্তদ্বারা কুমুদিনীর পদদ্বয় দেখিতে লাগিল, তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন করে উঠিলে?"

কু। রজনী আসিয়া তুলিল।

বি। ছি ছি, রজনীর সাক্ষাতে পড়িতে লজ্জা করিল না।

কু। তা কি করিব।

নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ

নববার্ষিকী* গ্রন্থখানি বহু শ্রমসহকারে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষেপে বা বিস্তারে ইহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের উৎপত্তি, পঞ্জিকাপ্রকরণ, ভারতবর্ষের রাজ্যবিভাগ ও শাসনতন্ত্র, বাঙ্গালায় লোক-সংখ্যা, কৃষিতত্ত্ব, বাণিজ্য, রেলওয়ে, ডাকঘর, সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, মুদ্রাযন্ত্র, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সাময়িক খ্যাতিমান্' ব্যক্তিদিগের উল্লেখও আছে। আমরা প্রথমতঃ "খ্যাতিমান্" ব্যক্তিদিগের দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমাদের খ্যাতিমান্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প; কিন্তু নববার্ষিকী গ্রন্থে জানিলাম যে বাঙ্গালায় ২৬ জন "খ্যাতিমান্" আছেন। আবার দেখিলাম সংগ্রহকার আত্মনিবেদনে লিখিয়াছেন যে তদ্ভিন্ন আর ১৬ জন আছেন। আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক খ্যাতিমান্‌দিগের নাম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথমেই দেখিলাম বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মাহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের নাম নাই! আমরা মনে করিয়াছিলাম মাহাতাপ চাঁদ বাহাদুর বাঙ্গালার একজন খ্যাতিমান্ ব্যক্তি। নববার্ষিকী পাঠ করিয়া জানিলাম যে তাহা নহে। আমরা একাল পর্য্যন্ত জানিতাম যে ধনে কি মানে বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু এক্ষণে নববার্ষিকী পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলাম যে ধনে কি মানে লোক খ্যাতিমান্ হয় না। সংগ্রহকার হয় ত বলিবেন 'সনামা পুরুষো ধন্যঃ,' মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর নিজের গুণে খ্যাত নহেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই সম্পদ নতুবা কেহ তাঁহার নাম শুনিতে পাইতেন না। অথবা সংগ্রহকার হয় ত বলিবেন যে বাঙ্গালির সহিত মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের সংশ্রব নাই; তিনি বাঙ্গালির মধ্যে গণ্য নহেন বলিয়া তাঁহার নাম লিখিত হয় নাই। সংগ্রহকার যে কারণই নির্দ্দেশ করুন তাঁহার মতে নববার্ষিকীলিখিত ব্যক্তিগণ বর্দ্ধমানাধিপতি অপেক্ষা বড়লোক।

* নববার্ষিকী। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া যন্ত্র। শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যাঁহারা বর্দ্ধমানের মহারাজা অপেক্ষা "খ্যাতিমান্" তাঁহাদের মধ্যে কেহ গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় হউন, বা "জজমেনে" ব্রাহ্মণ হউন তাঁহারা নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তি। আবার তাঁহারা কেবল এক মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর অপেক্ষা যে বড়লোক এমত নহেন, বাঙ্গালার ছয় কোটি লোক অপেক্ষা তাঁহারা প্রধান।

যাঁহারা ছয়কোটি লোকের মধ্যে প্রধান তাঁহারা কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবেন! বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ হইতে গেলে বোধ হয় দুই একটী এমন বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক যাহা ঐ ছয় কোটী লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। পাঠক-মহাশয়ের এক্ষণে দেখা উচিত নববার্ষিকীলিখিত খ্যাতিমান্দিগের মধ্যে কাহারও ঐরূপ কোন অসাধারণ গুণ আছে কি না।

প্রত্যেক "খ্যাতিমানের" অসাধারণত্ব তত্ত্ব করিবার প্রয়োজন নাই; কয়েকজনের সম্বন্ধে হয় ত লোকের বড় সন্দেহ না থাকিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট কয়েকটীর নাম এই স্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, কখন কি এই অদ্ভুত "খ্যাতিমান্দিগের" কেহ খ্যাতি শুনিয়াছেন? কখন কেহ কি তাঁহাদিগের নাম শুনিয়াছেন? কিন্তু পাছে এই "খ্যাতিমান্দিগের" আত্মীয়েরা কষ্ট পান এই ভয়ে আমরা তাঁহাদের নাম এস্থলে লিখিতে পারিলাম না।

এই সকল গুপ্ত "খ্যাতিমান্দিগের" জীবনী নববার্ষিকীগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে দেখিয়া মনে করিলাম বাঙ্গালার লোক হয় ত অবিবেচক, আপনাদিগের রত্নগুলিকে চিনিতে পারে নাই, জীবনী পড়িয়া চিনিতে পারিবে বলিয়া সংগ্রহকার তাঁহাদের জীবনী লিখিয়াছেন; খ্যাতিমান্দিগের খ্যাতিতে যত দাবি দাওয়া তাহা সমুদয় ঐ জীবনীতে লিখিত হইয়াছে। ইহাই জীবনীর একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমরা জীবনীগুলি একে একে পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথমেই যাঁহার জীবনী পাঠ করিলাম তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে;— খ্যাতিমান্টি দরিদ্রসন্তান, পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, তাহার পর কালেজে পড়িয়াছিলেন, ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, কালেজের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে ভাল-বাসিতেন। সংসার অচল বলিয়া কালেজ ত্যাগ করেন। শিক্ষা শেষ হইল না বলিয়া তাঁহার ক্ষতি হয় নাই। তিনি এক্ষণে দুই শত টাকা বেতন পাইতেছেন, গ্রাম্য লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানির নাম আমরা লিখিতে পারিলাম না, লিখিতে পারিলে পাঠকেরা দেখিতেন যে তল্লেখক স্বয়ং যেরূপ অপরিচিত তাঁহার গ্রন্থখানিও সেইরূপ অপরিচিত। নববার্ষিকীলেখক আপনিই বলুন দেখি যে প্রতিবেশী

ভিন্ন এই ব্যক্তিকে কেহ জানে? কেহ জানিবার সম্ভাবনা? কোন্ গুণে এই ব্যক্তি ছয়কোটী লোকের মধ্যে "খ্যাতিমান্" হইবার যোগ্য? তাঁহার কোন্ গুণটী অসাধারণ? তিনি কি দরিদ্রসন্তান বলিয়া অসাধারণ? কালেজে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া কি অসাধারণ? পাঠশালার পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া কি অসাধারণ? গ্রামে ডাকঘর স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া কি অসাধারণ? না, বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অসাধারণ? কোন্ গুণটির নিমিত্ত এই অদ্ভুত খ্যাতিমান্‌টি ছয়কোটী লোকের উপর স্থান পাইয়াছেন? এরূপ লোক যদি "খ্যাতিমান্" হয়েন তবে সংগ্রহকার দেখুন দেখি নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে নববার্ষিকী গ্রন্থে স্থান দিতে পারিবেন কি না?

রামভদ্র খণ্ডপাদ সন ১২৪০ সালের ১২ই বৈশাখে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ই বৈশাখের একদিন পূর্ব্বেও নহে একদিন পরেও নহে। ইহার একমাত্র গর্ভধারিণী ছিলেন, তাঁহাকে রামভদ্র চিরকাল মা বলিয়া ডাকিতেন, কখন অন্যথা হয় নাই। বয়স হইলেও মাকে মা বলিতেন। তাঁহার জন্মমাত্রেই জ্ঞানোদয়ের আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; ঐ সময় মাতৃস্তন তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি দুগ্ধপান করিয়াছিলেন। স্তনে দুগ্ধ আছে এ কথা তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় নাই। তাহা শোষণ করিলে দুগ্ধ বহির্গত হইবে এবং সেই দুগ্ধ পান করিতে হইবে এ সকল কিছুই শিখাইতে হয় নাই, অথচ রামভদ্র জন্মমাত্রেই তাহা সকল জানিয়াছিলেন। লোকে তখনই বুঝিয়াছিল যে এ ছেলে বাঙ্গালার "খ্যাতিমান্" হইবে। তাহার পর রামভদ্র দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে বাড়ায় না, অথচ তিনি আপনি বাড়িতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল জানিতেন! প্রথমে তিনি পাঠশালায় পাঠারম্ভ করেন। বর্ণগুলি বহুযত্নে অতি সাবধানে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এতই চমৎকার যে কতদিন হইল বর্ণগুলি শিখিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা ভুলেন নাই, কখন ভ্রমেও ক অক্ষরকে চ বলেন না। তাঁহার বুদ্ধির কৌশল আরও আশ্চর্য্য এই, পাঠশালে যে সেই কয়েকটি বর্ণ শিখিয়াছিলেন তাহা দ্বারা কি না করিতেছেন। পত্র লিখিতে বল, টপ্পা লিখিতে বল, সকল কার্য্য ঐ বর্ণ কয়েকটির দ্বারা উদ্ধার করিয়া থাকেন; কখন অন্য উপায় অবলম্বন করেন না। ইদানীং বর্ণমাহাত্ম্য নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্ভুত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। গ্রন্থ দ্বারা তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বেদ বল বেদাঙ্গ বল, বর্ণ ছাড়া কিছুই নাই। পাঠশালায় যে বর্ণগুলি শিখা যায় তাহা লইয়া বেদ। তাহার একটী বর্ণ মুছিয়া ফেল, বেদ অশুদ্ধ হইবে। সকল বর্ণগুলি মুছিয়া ফেল, বেদ লোপ পাইবে। গ্রন্থখানি অধিক বিক্রীত হয় নাই কিন্তু শুনিয়াছি বাঙ্গালায় আপামর সাধারণে সকলেই তাহা পড়িয়াছেন। রামভদ্রের

বিশেষ বন্ধুরা বলেন যে বর্ণমাহাত্ম্য পড়িয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ধন্য ধন্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ঐ গ্রন্থ দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্র পরিবর্দ্ধিত হইবে, বর্ণমাহাত্ম্য দ্বারা নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে। আবার সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে বর্ণমাহাত্ম্য দ্বারা সমাজের নানা মঙ্গল সংসাধিত হইবে। ফলতঃ যিনিই যাহা বলুন আমরাও নববার্ষিকী সংগ্রহকারের ন্যায় গ্রন্থের গুণাগুণ দেখি না। রামভদ্র পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন আপনার ব্যয়ে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। অতএব তিনি নববার্ষিকীলিখিত খ্যাতিমান্‌দিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার নিতান্ত যোগ্য। বাস্তবিক যোগ্য কি না যাঁহারা নববার্ষিকীলিখিত দুই চারিটি জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বিচার করুন।

নববার্ষিকীর একটি জীবনী পড়িয়া রামভদ্র খঞ্জপাদকে আমাদের মনে পড়িয়াছিল। আর দুই একটি জীবনী পাঠ করিয়া যাহা মনে হইল তাহা বলা বাহুল্য। কেবল এই মাত্র পাঠকদিগকে স্মরণ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, নববার্ষিকীর দুই চারিটি খ্যাতিমান্ অপেক্ষা অনেক যাত্রাকর এবং নাকছাঁদি প্রভৃতি দোকানদার সুপরিচিত ; সংগ্রহকার তাঁহাদের জীবনী সন্নিবেশিত করিলে নিতান্ত অসংলগ্ন হইত না।

সংগ্রহকার যে সকল সামান্য ব্যক্তির কপালে টিকিট মারিয়া 'খ্যাতিমান্' করিয়াছেন আমরা যথার্থই তাঁহাদের নিমিত্ত দুঃখিত। তাঁহারা পথে বাহির হইলে লোকে তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া চিনিতে চেষ্টা করিবে। হয় ত ইতর লোকেরা 'নববার্ষিকীর খ্যাতিমান্' যাইতেছে বলিয়া অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইয়া দিবে। ভদ্রলোকদিগকে এরূপে অপ্রতিভ করিবার উপায় করিয়া সংগ্রহকার ভাল করেন নাই। ঐ সকল ভদ্রলোকেরা তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইয়াছেন বলিয়া কখনই মনে করিবেন না। বাস্তবিক সংগ্রহকার তাঁহাদের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যে ব্যক্তিরা কখনই তাঁহাদের জানিত না এক্ষণে জানিবার নিমিত্ত তাহাদের কৌতূহল জন্মিবে। আশানুযায়ী গুণ না দেখিলে উপহাস করিবে। সংগ্রহকার সে উপহাসের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। খ্যাতির কারণ আর অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে না, জীবনী পাঠ করিলেই খ্যাতিমান্‌দিগের দাবি দাওয়া একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহাই বলিতেছিলাম সংগ্রহকার শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। 'খ্যাতিমান্‌দিগকে' সংগ্রহকার উচ্চস্থানে দাঁড় করাইয়া ভাঙ্গাঢোল পিটিয়া বাজারের লোক জমা করিয়াছেন ; কিন্তু কয়েকজনের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উপহাস করিবার নিমিত্ত প্রকারান্তরে ইঙ্গিতও করিয়াছেন।

আবার বিশেষ আক্ষেপের বিষয় যে এই সকল বিবেচনা না করিয়া দুই একজন 'খ্যাতিমান্' আপনাদের পরিচয় আপনারাই লিখিয়া দিয়াছেন। সংগ্রহকারের কখন

এই সামান্য ব্যক্তিদিগের জন্ম বা বংশবৃত্তান্ত জানিবার সম্ভব নহে। অবশ্য খ্যাতি-মানেরা স্বয়ং তাহা সংগ্রহ করিয়া না দিলে নববার্ষিকীলেখক তাহা কোথায় পাইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও রহস্যের বিষয় এই যে তাঁহাদের জন্মদিন সাধারণে নিশ্চয় করিয়া না জানিলে পাছে ভবিষ্যতে দেশের কোন ক্ষতি হয় এই বিবেচনায় তাঁহারা মায় তিথি নক্ষত্র জানাইয়া সাধারণকে চিরবাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদের দয়ার পার নাই! কেহ কেহ আবার অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহার বিবাহ দুইটি, কেহ বা বলিয়াছেন তাঁহার ভগিনী চারিটি। এ সকল পরিচয়ে দেশের মহৎ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্ত লেখক-দিগের নিমিত্ত রাখিলে ভাল হইত।

সংগ্রহকার যে কেবল দুই চারিটি নিরীহ ব্যক্তিকে উপহাসের পথে দাঁড় করাইয়া-ছেন এমত নহে, তিনি নিজেও কতক সেই পথে দাঁড়াইয়াছেন। যিনি এই সকল সামান্য ও অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন তিনি অবশ্য উপহাসের যোগ্য। সংগ্রহকার নিজের নাম গোপন রাখিয়া ভাল করিয়াছেন।

আমরা যে এত কথা বলিলাম তাহার প্রধান কারণ এই যে 'খ্যাতিমান্' অংশ ব্যতীত নববার্ষিকী গ্রন্থখানি সুন্দররূপে সংগৃহীত হইয়াছে। অন্য অংশ উৎকৃষ্ট না হইলে কেবল 'খ্যাতিমানের' পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া আমরা এত সময় নষ্ট করিতাম না; মনে করিতাম কোন পাঠশালার গুরুমহাশয় বা কোন উকিলের টর্নি কর্ত্তৃক ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার নিকট আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আর এক কথা এই যে, যে দেশে রামভদ্র খঞ্জপাদের ন্যায় ব্যক্তিরা খ্যাতিমান্, সে দেশের গৌরব গোপন করিলেই ভাল হয়।

সংগ্রহকারের বোধ হয় দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভালই হউক মন্দই হউক গ্রন্থ লিখিলেই লোক খ্যাত্যাপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না, কখন কখন অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াও লেখক অপরিচিত থাকেন হয় ত শত বৎসর পরে তাঁহার গ্রন্থের গুণ প্রকাশ পায়। তৎকালে তিনি জীবিত থাকিতে পারিলে খ্যাত্যাপন্ন হইতে পারিতেন। অনেকে বহুতর ধনসঞ্চয় করিয়াও খ্যাত্যাপন্ন হইতে পারেন না সমাজের সর্ব্বত্র তাঁহার ধনাঢ্যতার পরিচয় বিস্তার হয় না। অধিক দিনের কথা নহে বাঙ্গালার কোন ব্যক্তি মরণকালে চারি ক্রোর টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি ধনবান্ বলিয়া বাঙ্গালায় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন না। দান করিয়া অনেকে দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন অথচ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই। অনেকে

রাজসম্মান পাইয়াছেন কেহ বা রাজা কেহ বা নবাব হইয়াছেন অথচ বাঙ্গালায় খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই।

কি গুণে লোক খ্যাত্যাপন্ন হয় তাহা বলা যায় না। যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন হয় ত তিনি খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বা মহৎব্যক্তি হইলেই যে খ্যাত্যাপন্ন হইবে এমত নহে। অনেকে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন অথচ তাঁহারা মহৎ নহেন। প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মুখাপেক্ষী নহে। বরং প্রকৃত মাহাত্ম্য খ্যাত্যাপন্ন না হওয়াই সম্ভব। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেও অনেকটা ঐরূপ। প্রতিভাশালী হইলেই যে খ্যাতিমান্ হইবে এমত নিশ্চয় নাই।

সংগ্রহকার যে ৪১ জনের নাম নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে তিন চারি জনকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ বলিলেও বলা যাইতে পারে; কেন না বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহাদের খ্যাতি বিস্তার হইয়াছে। অপর কয়জনের মধ্যে কাহাকে কলিকাতার খ্যাতিমান্, কাহাকে পটলডাঙ্গার খ্যাতিমান্, কাহাকে রামপুর বা শ্যামপুরের খ্যাতিমান্ বলিয়া পরিচয় দিলে সঙ্গত হইত, কেহ তাহাতে আপত্তি করিত না। তাঁহারা সহস্র গুণালঙ্কৃত হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাপিয়া তাঁহারা পরিচিত হয়েন নাই, কাজেই তাঁহারা বাঙ্গালার 'খ্যাতিমান্' নহেন। বাঙ্গালার অবস্থা মন্দ, অদ্যাপি পূর্ব্বকালের ন্যায় যেন শত রাজ্যে বিভক্ত রহিয়াছে কাজেই প্রতিষ্ঠা প্রচার বাঙ্গালায় এখনও অতি কঠিন।

নববার্ষিকীর অপকৃষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। ইচ্ছা ছিল উৎকৃষ্ট অংশ লইয়া আলোচনা করি কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। নববার্ষিকী গ্রন্থে উৎকৃষ্ট ভাগ অনেক আছে। পঞ্জিকা প্রকরণটি আদ্যোপান্ত সকলের পাঠ করা আবশ্যক। সংগ্রহকার যে একটি বিশেষ ভ্রম দর্শাইয়াছেন তাহা সকলের জানা উচিত। আমরা তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাকারেরা এক্ষণে যে সময় হইতে নূতন বৎসরের গণনা আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যে নিয়মে মাসিক দিনসংখ্যার ভাগ করিতেছেন, তাহাতে গুরুতর ভ্রম লক্ষিত হয়। এই ভ্রম আশু সংশোধন না করিলে আমাদিগের পঞ্জিকা ক্রমেই অধিকতর অশুদ্ধ হইতে থাকিবে, এবং তিন চারি সহস্র বৎসর পরে এক ঋতুতে অন্য ঋতুর গণনা আরম্ভ হইবে। সর্ব্বসাধারণের সম্মতি ভিন্ন যদিও এই ভ্রম সংশোধন করা আমাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তথাপিও এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।"

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে সংগ্রহকার এই নিম্ন-উদ্ধৃত আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছেন।

"বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

গিয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারানসী জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি ব্যবহার করিতেন, আমরা যবনাধিকারে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

সংগ্রহকার এই সংবাদ কোথায় পাইয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিলে ভাল হইত। না লেখায় এই পরিচয় অনেকের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীনকালে চীনদেশে ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে যে কখন ছিল এমত কাহারও বিশ্বাস নাই। এক্ষণে তাহা বিশ্বাস করাইতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। শুনা যায় Gentleman's Magazine নামক একখানি সামান্য সাময়িক পত্রে এই কথা লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রথমে তদন্ত করা উচিত ছিল।

সংগ্রহকার বহু পরিশ্রম করিয়া নববার্ষিকী গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় স্থানাভাবে সকল বিষয় সমালোচন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

প্রথম প্রস্তাব

পঞ্জাব ভারতবর্ষের মধ্যে, বর্ত্তমান কি প্রাচীন উভয়কালেই অতি প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য। কিন্তু প্রাচীন কালের পঞ্জাবের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। পূজ্যপাদ আর্য্যপিতৃপুরুষেরা মধ্য আসিয়া হইতে প্রথমে পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়াই পদার্পণ করেন, এবং তথায় বহুকাল পর্য্যন্ত অধিবাস করিয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখীন হন। তাঁহারা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে উহাকে অভিহিত করেন। সরস্বতী এক্ষণে অদৃশ্য, দৃষদ্বতী কাগার নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্জাবেই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাদ বিগ্রহ আরম্ভ হয়। ঋগ্বেদের অধিকাংশ পঞ্জাব প্রদেশেই লিখিত। দেবাসুরের যুদ্ধও, বোধ হয় পঞ্জাব প্রদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীনকালীন আর্য্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবিভেদ লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়; পরে তাঁহারা হিন্দু ও পার্সি এই উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এই যুদ্ধ পঞ্জাব প্রদেশেই ঘটিয়াছিল, এবং উহা উত্তরকালে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রীস্‌দেশীয় পুরাবৃত্ত পঞ্জাবের প্রাচীন গৌরব প্রকাশ করিতেছে। মহাবীর সেকন্দর সাহ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী গ্রীকেরা পঞ্জাব প্রদেশবাসিগণের বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু পঞ্জাবের প্রাচীন গৌরব বর্ণনা করা আমার লক্ষ্য নহে। বর্ত্তমানকালীন পঞ্জাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিবরণ ও উক্ত প্রদেশের আধুনিক ইতিবৃত্তের দুই একটি কথা আনুষঙ্গিকরূপে ব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পঞ্জাবীরা সাহসী, বলবান্, ও দীর্ঘকায়। বাঙ্গালিদের ত কথাই নাই, তাঁহারা (পঞ্জাবীরা) সাহস শারীরিক গঠন ও বল সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতি সকলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। পঞ্জাবে কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রী কি পুরুষ বিরল, কাশ্মীর ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে গৌরবর্ণ লোকের সংখ্যা অনেক অধিক। কাশ্মীর ভিন্ন এত সুন্দরী নারীও ভারতের আর কুত্রাপি দেখিতে

পাওয়া যায় না। অনেক পঞ্জাবীর সংস্কার এই যে, বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ সুন্দর পুরুষ কি গৌরাঙ্গী সুন্দরী নারীর সম্পূর্ণ অসম্ভাব। আমি এরূপ কোন কোন লোকের কথার প্রতিবাদ করিলাম, তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন কি না জানি না। বঙ্গদেশে গৌরবর্ণ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গালিরা কুৎসিত নহে। কুৎসিত হওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালির শারীরিক গঠন, মুখাকৃতি দেখিতে সুশ্রী। পঞ্জাবীর সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গালি যেমন বর্ণ সম্বন্ধে নিকৃষ্ট, সেইরূপ আর একটি বিষয়ে নিকৃষ্ট। বাঙ্গালির আকৃতিতে সাধারণতঃ গাম্ভীর্য্য নাই। গুণাগুণের পরিচয় কিছু মাত্র না পাইয়াও, কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই সম্মান করিতে ইচ্ছা করে। তাঁহারাই প্রকৃত গম্ভীরমূর্ত্তি। বর্ণের উজ্জ্বলতা, শরীরের দৈর্ঘ্য, ও অঙ্গ সকলের প্রশস্ততা থাকিলে শারীরিক গাম্ভীর্য্য উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালির আকৃতিতে সে প্রকার গাম্ভীর্য্য সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। কেননা বাঙ্গালির আকৃতি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, অঙ্গ সকল ক্ষুদ্র, ও বর্ণ মলিন। কিন্তু পুনর্ব্বার বলি বঙ্গবাসী পুরুষ কি স্ত্রীলোকের আকৃতি সুগঠিত ও সুশ্রী। পঞ্জাবের ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে এমন সকল রূপবতী নারী দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি দেবী-প্রতিমা বলিয়া মনে হয়। কেবল তাহাই কেন? সিমলা পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে কাল্‌কা নামক ক্ষুদ্র নগরে এক সামান্য ঘোড়ার সহিসের স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সে নিতান্ত দরিদ্র, আমার নিকট কয়েকটি পয়সা ভিক্ষা গ্রহণ করিল। কিন্তু এমনি চমৎকার রূপ যে, আমাদের এখানকার অনেক বড় বড় ঘরের রূপবতীরাও তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারেন না। ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ইতর জাতীয় পুরুষ সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। লাহোর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে যে মুটিয়া আমার দ্রব্যাদি বহন করিয়া সহর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, সে ব্যক্তির আকৃতি দেখিলে আমাদের এখানকার অনেক ভদ্রবংশজাত ব্যক্তিকেও লজ্জা পাইতে হয়। তাহাকে আপ্‌না বলিয়া তোম্ বলিতে প্রথমে যেন একটু বাধ বাধ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্জাবীরা সাহসী। যদিও বর্ত্তমান কঠোর রাজশাসন-বশতঃ তাহাদের শারীরিক বীর্য্য ও সাহসের ক্রমশঃ অবনতি লক্ষিত হইতেছে, তথাচ অদ্যাপি যাহা আছে তাহা দেখিয়াও আনন্দিত হইতে হয়। শিখদিগের যুদ্ধকুশলতা ও সাহসের কথা বংশপরম্পরায় চিরদিন বিঘোষিত হইবে; পুরাবৃত্ত চিরদিনের জন্য অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। পঞ্জাববাসিগণ সাধারণতঃ ও শিখেরা বিশেষতঃ জগতে চিরকাল বীর্য্য ও সাহসের জন্য খ্যাতিমান্।

জলন্ধর হইতে আসিতেছি, একজন পঞ্জাবী বাহক আমার দ্রব্যাদি বহন করিয়া

আনিতেছে। বাহক অতিশয় বলবান্ পুরুষ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে ব্যক্তির স্ত্রী ও কতকগুলি সন্তানাদি আছে। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, প্রতিদিন সে ৮৷১০ পয়সা উপার্জ্জন করে। এরূপ অল্প আয়ে কেমন করিয়া এতগুলি পরিবার প্রতিপালন হয়, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে, তাহার অতিকষ্টে দিনপাত হইয়া থাকে। আমি তখন বলিলাম যে, তুমি এমন বলবান্ পুরুষ, তুমি কেন মুটিয়ার কাজ ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ কর না, তাহা হইলে তোমার আয় বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সে ব্যক্তি অস্পষ্টরূপে কি বলিল, ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম যে, তুমি কি যুদ্ধ করিতে ভয় কর, তাই সিপাহি হইতে ইচ্ছা কর না ? বাহক এই কথা শুনিয়া আমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। বলিল আমি কি ভীরু ? আমি কি মরিতে ভয় করি ? এমন আপনি কখন ভাবিবেন না। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এমন দিন কি কখন আসিবে যে, বাঙ্গালিকে ভীরু বলিলে বাঙ্গালি বিরক্ত ও অপমানিত মনে করিবে।

খ্রীষ্টিয়ান্ পাদ্রি সাহেবদিগের স্বভাব এই যে, পরের ধর্ম্মের নিন্দা না করিলে, তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম প্রচার করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ লম্পট ছিলেন, মহাদেব গাঁজাখোর, ইত্যাদি কথা হিন্দুদিগের নিকট না বলিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। সেই প্রকার পঞ্জাবে শিখদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে তাঁহারা শিখ গুরুদিগের নিন্দাবাদ আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতি সকলের নিকট উক্তপ্রকার ধর্ম্মনিন্দা করা যেরূপ সহজ, সাহসী ও তেজস্বী শিখদিগের নিকট তত সহজ নহে। একদা জনৈক খ্রীষ্টিয়ান্ পাদ্রি অমৃতসরের রাজপথে শিখ গুরুদিগের প্রতি গালিবর্ষণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। একজন শিখের তাহা সহ্য হইল না। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড লগুড় লইয়া সাহেবের মস্তকে সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাত করিল। সাহেব ভগ্নশির হইয়া অবিলম্বে শমনভবনে যাত্রা করিলেন। অবশ্য হন্তা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি স্বীকার করিল যে, সে পাদ্রি সাহেবের মাথা ভাঙ্গিয় দিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে এরূপ ভয়ানক কার্য্য করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "গুরুজীকা ইয়ে হুকুম হ্যায় যো, যো কোই ধরম কি নিন্দা করে গা, ওস্কো তিন ডাণ্ডা লাগাও, হুজুর হাম তো এক লাগায়া, বেচারা মর্ গেয়া, অওর দোডাণ্ডা তো আবি বাকি হ্যায়।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া অবাক্। হয় ত তিনি ভাবিলেন যে, বাকি দুই ডাণ্ডা বুঝি তাঁহার মস্তকের উপরেই পড়ে।

সাহস ও ন্যায়পরতার আর একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দিব। অমৃতসর নগরে ইউরোপীয়দিগের ভোজনার্থ বহুসংখ্যক গোবধ হইত। ইহাতে শিখ ও অপরাপর

হিন্দুগণ যারপরনাই বিরক্ত হইলেন। বিরক্ত হইয়া নগরের ভিতর গোবধ নিবারণ জন্য কমিসনর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন। কমিসনর সাহেব আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন না। যেদিন আবেদন অগ্রাহ্য হইল, সেদিন গেল, সে রাত্রি গেল, প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ শুনিলেন যে রাত্রির মধ্যে নগরের সমস্ত গোহন্তা কসাই মারা পড়িয়াছে। কে আসিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন নাই,—সন্ধান নাই। পুলিস হত্যাকারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক অনুসন্ধান হইল বটে, কিন্তু কিছুই নির্ণয় হইল না। পরিশেষে কোন দূর প্রদেশ হইতে জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারীকে আনিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর ছয়জন লোককে হত্যাকারী বলিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া হইল; এবং বিচারে তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল। প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইল। কোথা হইতে ৪।৫ জন লোক আসিয়া বলিল যে, যে কয়েকজনের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছে তাহারা বাস্তবিক দোষী নহে। তাহারা কসাই হত্যা করে নাই। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আমরাই গোহন্তা কসাইদিগকে হত্যা করিয়াছি। হত্যা করিয়া লুকাইয়াছিলাম। পুলিস আমাদিগের কোন সন্ধান পায় নাই। কিন্তু কয়েকজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি আমাদিগের জন্য প্রাণ হারাইতেছে দেখিয়া আর আমরা লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিলাম। যে কোন দণ্ড হউক তাহাই আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তাহারা যে বাস্তবিক কসাই হন্তা, তাহার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা করাতে, হস্তস্থিত তলবার, কোষ হইতে উন্মুক্ত করিয়া বলিল, "এই দেখুন! ইহা এখনও কসাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত রহিয়াছে।" পরে বিধিপূর্ব্বক বিচার হইয়া, পূর্ব্বে যে কয়জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, এবং এই নবাগত সত্যনিষ্ঠ, সাহসবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণকে নরাধম পাষণ্ডের ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাই ইহসংসারে বিচার!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কঠোর রাজশাসনবশতঃ পঞ্জাববাসিগণের শারীরিক কার্য্য ও সাহসের অবনতি লক্ষিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৫।৩০ বৎসর মাত্র পঞ্জাবের স্বাধীনতাবিলোপ হইয়াছে, অথচ এই অল্পকাল মধ্যেই জাতীয় বীর্য্যের অধোগতি সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত পঞ্জাবীর সঙ্গে পঞ্জাব প্রদেশের শুভাশুভ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল, তন্মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বিষয়টির উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিলেন। পঞ্জাববাসিগণের কিয়ৎপরিমাণে অবনতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজও তাঁহারা অন্যের

পর্ব্বত ;—ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসীর সহিত তুলনা করিলে আজও পঞ্জাবীরা সাহস ও বীর্য্য সম্বন্ধে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান রাজশাসনের কঠোরতাবশতঃ পঞ্জাবে বীর্য্যগ্লানি লক্ষিত হইতেছে। কেবল পঞ্জাব কেন? ভারতবর্ষের প্রাচীন সকল প্রদেশেই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজশাসন ভারতের প্রভূত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যে যদি কখন সম্মিলন ও ঐক্য বন্ধন থাকে, তাহা ইংরেজ শাসনাধীনেই ঘটিবে, সেই জন্য আমরা ইংরেজ শাসনের একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া এমন কথা বলি না যে, উহা কলঙ্কশূন্য। বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। মুসলমান শাসনের সহিত ইংরেজ শাসনের তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজ অধিকার কালে ভারতবর্ষে এমন কয়েকটি অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে যাহা মুসলমানদিগের সময়েও ছিল না। আমরা ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিব না যে, গবর্ণমেণ্টের আবকারী বিভাগ অশেষ অমঙ্গলের কারণ? যে বিভাগের জন্য ভারতসন্তানগণ কালকূটগরলপান করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে, ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে উহা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক? ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া আমাদের দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিলোপ বা অবনতি দর্শনে কি ব্যথিত হৃদয় হইব না? ইংরেজ-শাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে, মুসলমান রাজ্যকালে আমরা দেশের উচ্চতর পদ সকল—রাজমন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতাম, এখন আর আমাদের সে সৌভাগ্য নাই, এখন অধিক বেতন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পদ সকলের দ্বার আমাদের নিকট একপ্রকার নিরুদ্ধ? সেই প্রকার ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে, উক্ত শাসনের প্রণালী নিবন্ধন ভারতসন্তান দিন দিন সাহস ও পৌরুষ বল বীর্য্য বিহীন হইয়া কাপুরুষ হইয়া যাইতেছে?

ইংরেজশাসনকালে বাঙ্গালি সাহস ও বীর্য্যবিহীন হইয়া যাইতেছে এ কথায় চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই হাস্য করিবেন। বাস্তবিক ইংরেজদিগের সময়ে বাঙ্গালির যে অনেক বিষয়ে সাহসাদি গুণের উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল সম্বন্ধে যে, বঙ্গবাসী দিন দিন হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় প্রতি পল্লীতেই ব্যায়াম চর্চ্চা দৃষ্ট হইত। এক সময় ছিল যখন লাঠি, সড়কি, তীর প্রভৃতি আত্মরক্ষা ও আক্রমণোপযোগী অস্ত্রাদির সঞ্চালন ও শিক্ষা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। এখন আর সে দিন নাই। ক্যাম্বেল সাহেবের যত্নে আজকাল কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের বিদ্যালয়ে

ব্যায়াম চর্চা প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমরা বাঙ্গালিজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বীর্য্যহানির কথা বলিতেছি না। পঞ্জাবী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতি সকলকে মনে করিয়াই বলা হইতেছে।

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বৃটিশ শাসন কেমন করিয়া ভারতবাসিগণের বীর্য্যহানির কারণ হইল? বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, এবং সৈনিক বিভাগের সামান্য সিপাহির কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য উচ্চ পদ সকলে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের জাতীয় বীর্য্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের আশা এককালীন বিদূরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার করিবার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের এক সহজ উত্তর এই যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না, আমাদিগকে সম্পূর্ণ রাজভক্ত প্রজা বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু এই উত্তরের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিজের কথার সঙ্গতি হইতেছে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহুকাল হইতে সুসভ্য জগতের সম্মুখে বলিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের সুশাসনগুণে তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অনেক দিন হইতে এ কথা আমাদের রাজপুরুষগণ পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। এই সে দিন দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ও তাঁহার প্রতিনিধি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ভারতবর্ষবাসিগণ মহারাণীর একান্ত অনুগত ও রাজভক্ত প্রজা। তাহাই যদি হইল তবে আবার তাহাদিগকে এত অবিশ্বাস কেন? তাহাই যদি হইল তবে আবার তাহাদিগকে উচ্চতর সৈনিক পদে নিযুক্ত করিতে আপত্তি কেন? তাহাই যদি হইল তবে যুদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতে আশঙ্কা কেন? মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হৃদয়, অত্যাচারী ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রতি যে প্রসাদ বিতরণে কৃপণতা করেন নাই, সুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান, জ্ঞানালোকসম্পন্ন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি তাহাই করিবেন? যশোবন্ত সিং—এক জন হিন্দু, আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

এক্ষণে পঞ্জাববাসিগণের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করে। বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় পঞ্জাবে অবরোধ প্রথা নাই। ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকগণকেও প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যথা তথা গমন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ও পঞ্জাব প্রদেশের স্ত্রীস্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথম প্রভেদ এই যে, পঞ্জাবে অবগুণ্ঠন প্রচলিত আছে কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে তাহা আদবে নাই। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণরূপে মুখ অনাবৃত করিয়া পথ দিয়া চলিয়া যান, কিন্তু যখনই কোন ভক্তিভাজন আত্মীয় বা সম্মানযোগ্য পরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়েন, তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দেন। অনেক সময়

এমনও দৃষ্ট হয় যে, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করিতে থাকেন, অথচ মুখটি বাহির করিতেই যত আপত্তি। কেবল পঞ্জাবে কেন? ভারতের অনেক স্থানেই উক্তরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপালের বেগম বাক্পটুতা প্রকাশ করিয়া দিল্লির সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া গেলেন, অথচ মহা অনুরোধেও লর্ড লিটনকে আপনার মুখ দেখাইতে সম্মত হইলেন না। বোম্বাই ও বাঙ্গালাশীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা ছিল না। তৎকালীন রমণীকুলের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার অপেক্ষাকৃত অধিকতর মিল দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠনের কথা উক্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় নারীদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রচলিত নাই; পঞ্জাবী নারীদিগের মধ্যে আছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতের রমণীদিগের সহিত পঞ্জাববাসিনীদিগের অবস্থার অধিকতর সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, বোম্বাই অপেক্ষা পঞ্জাবের স্ত্রীস্বাধীনতা পরিমাণে অল্প বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্জাবে একটি অতি কদর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যরূপে নদীতে বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিয়া থাকেন। শত শত যুবতী নারী চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, ইরাবতী প্রভৃতি নদীতে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতেছে, লেশমাত্র লজ্জা নাই। তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী পুরুষগণও এই কদর্য্যব্যবহার দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছে না। বাস্তবিক কোন একটি প্রথা যত কেন জঘন্য হউক না বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিলে লোকে উহার জঘন্যতা অনুভব করিতে পারে না। লাহোর নগরের ভিতর নগরবাসিগণের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল সকল প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ সকল খালে স্থানে স্থানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্নানাগার সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখন স্ত্রীলোকদিগকে উহারই মধ্যে গিয়া স্নান করিতে হয়। কিন্তু যাহারা রাবী (ইরাবতী) নদীতে স্নান করিয়া থাকে তাহাদিগের জন্য কোন উপায়ই করা হয় নাই।

এস্থলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই সৃষ্টিছাড়া প্রথা কোথা হইতে আসিল? আমাদের উত্তর এই যে উহা একটি সনাতন আর্য্য প্রথা। আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে উক্ত প্রথা আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কালসহকারে ইহা অনেক স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে-সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। আর্য্যবংশসম্ভূত কোন কোন ইউরোপীয় জাতির মধ্যেও অদ্যাবধি উক্ত প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

উক্ত প্রথার প্রাচীনত্ব বিষয়ে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপী-

দিগের বস্ত্রহরণের পুরাতন আখ্যায়িকা একটি সুন্দর প্রমাণ। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে অন্য প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতে আছে যে, একদা মহর্ষি শুকদেব ও তৎপশ্চাৎ মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাস চন্দ্রভাগা নদীতীর দিয়া গমন করিতেছিলেন। দেবীরা তৎকালে নদীতে বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করিতেছিলেন। তাঁহারা নগ্ন যুবা শুকদেবকে দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জা করিলেন না। কিন্তু অনগ্ন বৃদ্ধ ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জাপূর্ব্বক বস্ত্রগ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্যাসদেব দেবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনারা শুকদেবকে দেখিয়াই বা কেন লজ্জা করিলেন না এবং আমাকে দেখিয়াই বা কেন লজ্জা করিলেন? ইহাতে দেবীরা বলিলেন যে, তোমার স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান আছে সেই জন্য তোমাকে দেখিয়া লজ্জা করিলাম। কিন্তু শুকদেবের দৃষ্টি বিবেকযুক্ত সেই জন্য তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিলাম না। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধু র্ন সুতস্য চিত্রং।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রী পুং ভিদা ন সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ॥

শ্রী ভাঃ ১ স্কঃ ৪ অধ্যায় ৫।

শ্রী ন না।
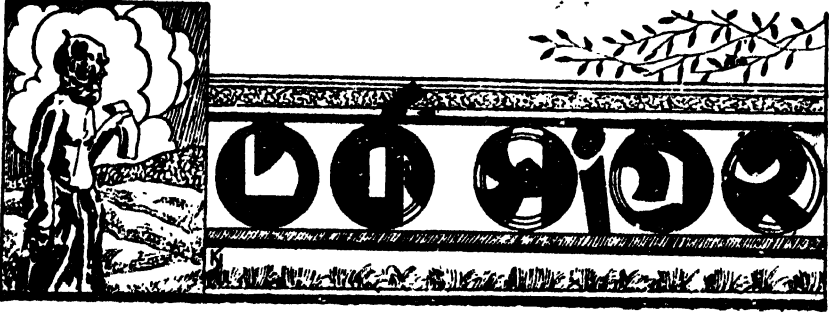
অর্থাৎ

(সংস্কৃত ন্যায় দর্শনসম্মত কতগুলি তর্ক)

প্রথম তর্ক—মঙ্গলাচরণ

পূর্ব্বে আমাদের দেশে গ্রন্থারম্ভের প্রথমে মঙ্গলাচরণ একটী অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। দর্শনশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়াই হউক, শৃঙ্গার রসের অত্যপকৃষ্ট অনুভাব সকল প্রকাশ করিয়াই হউক, আর হাস্যরস ব্যঙ্গ করিয়াই হউক, যেরূপে হউক মঙ্গলাচরণ করিলে আর কোন দোষ থাকিত না, মঙ্গলাচরণ না করাই মহাপাপ, যিনি এই মঙ্গলাচরণ না করিতেন তিনিই নাস্তিক ও সমাজের ঘৃণাস্পদ হইতেন। অদ্যাপি এদেশে মঙ্গলাচরণের প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও অনেক স্থলে গ্রন্থকারের কথা দূরে থাকুক, প্রাচীন গ্রন্থের সংস্কারকদিগকেও স্বকৃত সংস্করণের পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ করিতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের তর্ক সংগ্রহ করা যাইতেছে।

প্রশ্ন এই যে মঙ্গলাচরণের ফল কি? যদি বল নির্ব্বিঘ্নে অভীপ্সিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তিই ইহার ফল, তাহা হইতে পারে না। কারণ আমরা দেখিতেছি 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের নামমাত্র না থাকিলেও তাহারা নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কাদম্বরীর প্রথমে বিস্তার পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ থাকিলেও বাণভট্ট তাহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই—তবে এই মঙ্গলাচরণের ফল কি? এই আশঙ্কা করিয়া প্রাচীন আর নবীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সমাধান করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রাচীনেরা বলেন "মঙ্গলাচরণ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ উহা শিষ্টপরম্পরা-সমাচরিত। শিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজের মস্তক স্বরূপ, তাঁহাদিগের কার্য্য কখনই বালকের জলক্রীড়ার ন্যায় নিষ্ফল হইতে পারে না। তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্যের ফল আছে, সুতরাং মঙ্গলাচরণের একটী ফল অবশ্য স্বীকার্য্য, এক্ষণে যদি কোনরূপে

সেই ফলকে দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক কার্য্যকরী করা যায়, তবে স্বর্গভোগাদির ন্যায় অদৃষ্টরূপ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? বিঘ্ন ধ্বংস পূর্ব্বক গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়াই মঙ্গলাচরণের ফল। মঙ্গলাচরণ অসত্ত্বেও যাঁহাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়, তাঁহাদের পুর্ব্বজন্মকৃত মঙ্গলপ্রাবণ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর মঙ্গলাচরণ সত্ত্বেও যাঁহাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই তাঁহাদের মঙ্গল অপেক্ষা বিঘ্নের প্রাচুর্য্য মানিতে হইবে, অর্থাৎ যে পরিমাণে মঙ্গলাচরণ হইয়াছিল তাহা সমুদায় বিঘ্ন ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই।"

প্রাচীনদিগের সহিত নবীনদিগের মত প্রায় তুল্যরূপ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, নবীনদিগের মতে বিঘ্ন-ধ্বংসই মঙ্গলাচরণের একমাত্র ফল, তবে সমাপ্তি হওয়া না হওয়ার প্রতি গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাদি কারণ। গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাদিগুণ থাকিলে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে অন্যথা মঙ্গলাচরণ করিলেও গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না। ইঁহাদের মতেও যেখানে মঙ্গলাচরণের অভাব অথচ নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি দেখা যায়, সেখানে জন্মান্তরীণ মঙ্গলদ্বারা বিঘ্নের নাশ স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বিঘ্ন ধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল তবে যেখানে কোন বিঘ্ন নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণেরও আবশ্যকতা নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণ নিস্ফল, আর কোথায় বিঘ্ন আছে না আছে ইহা জানিবারও কোন সহজ উপায় নাই সুতরাং সকল স্থানেই মঙ্গলাচরণ করিতে হইবে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নাভাব স্থলে মঙ্গলাচরণ নিস্ফল হওয়ায় শিষ্টাচারানুমিত মঙ্গলাচরণবিষয়ক বেদবচনেরও অপ্রামাণ্য হইল। ইহার উত্তরে নবীনেরা বলিয়াছেন যে, যেমন পাপ না থাকিলেও পাপ ভ্রমে প্রায়শ্চিত্ত করিলে প্রায়শ্চিত্তপ্রবর্ত্তক বেদবচনের অপ্রামাণ্য নাই—কারণ প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকারিণী শক্তি পাপ থাকিলে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা অবশ্যই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিঘ্ন থাকিলে মঙ্গলাচরণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। মঙ্গলাচরণের বিঘ্ননাশকারিণীশক্তি এবং বিঘ্ননাশ করিবার নিমিত্তই ইহার প্রবৃত্তি হয়।

আমরা যখন কেবল প্রাচীন ন্যায়মত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন তাহাই প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিরস্ত থাকা উচিত, তথাপি এখানে আর দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পণ্ডিতেরা যে মঙ্গলাচরণের প্রতি শিষ্টাচারকে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যে শিষ্টের আচারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও ভিন্নদেশীয় কি একদেশীয় ভিন্নশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণেরাও পরস্পর বৈবাহিকাদিব্যবহার করিতে সক্ষম নহেন, যে শিষ্টের আচারে হিন্দুগণ মুসলমানের পক্ক গুড়াদি অনায়াসে দৈব পিতৃকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগের স্পৃষ্ট জলাদির অন্য ব্যবহার দূরে থাকুক কোনরূপে পরস্পরা স্পর্শ করিলে স্নান করিতে বাধ্য হন,

যে শিষ্টের আচারে পলাণ্ডু আর খর্জ্জুররস শাস্ত্রদ্বারা সমানরূপে নিষিদ্ধ হইলেও মহারাষ্ট্রদেশে পলাণ্ডু এবং বঙ্গদেশে খর্জ্জুররসের নির্ব্বিবাদে ব্যবহার হইয়া থাকে, আর যে শিষ্টের আচারে শূদ্রকন্যাসংসর্গী ব্রাহ্মণের কোন সামাজিক ক্ষতি হয় না কিন্তু শূদ্রকন্যা বিবাহকারী বৈশ্যেরও সমাজচ্যুত হইতে হয় সেই শিষ্টাচারানুরোধে স্বকীয় গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ কিছু অধিক কথা নয়। তবে ফলের বিষয় প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। নবীনদিগের সূক্ষ্ম মতে আমাদের বুদ্ধির প্রবেশ হইল না, কারণ আমরা জানি গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি যতগুলি প্রতিবন্ধক, তাহারা সকলেই বিঘ্ন, গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাদির অভাব গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, অতএব উহাও বিঘ্ন, মঙ্গলাচরণদ্বারা যদি সকল বিঘ্নের ধ্বংস হইল তবে যে গ্রন্থ কেন সম্পূর্ণ হইবে না ইহা সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি নব্য নৈয়ায়িকেরা বুঝিয়াছেন।

দ্বিতীয় তর্ক—ঈশ্বরাস্তিত্ব

পূর্ব্বে যে মঙ্গলাচরণের বিষয় উল্লেখ করা গেল, উহা আর কিছুই নয়, কেবল গ্রন্থের আদিতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর জগন্মণ্ডলের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী জগদীশ্বরের স্তবপাঠ বা নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি। এস্থলে একথাও বলা আবশ্যক যে, যদ্যপি অনেক গ্রন্থের আদিতে গণেশ, শিব ও দুর্গা প্রভৃতি দেবতাবিশেষের স্তব-পাঠাদি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সেই সেই স্থলে সেই সেই দেবতাবিশেষকে প্রায় ঐশ্বরিক গুণসমষ্টিতে অলঙ্কৃত করিয়া স্তব করা হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের সারমর্ম্মই এই যে "নদীসকল যেমন নানা পথে প্রধাবিত হইয়াও পরিশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে দেবতারই উপাসনা করুক না কেন সেই একমাত্র জগদীশ্বরই ঐ উপাসনার লক্ষ্যস্থল।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, হাঁ ঈশ্বরনামক তাদৃশ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তু থাকিলে তাঁহার স্তবপাঠাদিতে মঙ্গল হয় হৌক, কিন্তু ঈশ্বরের স্থিতি-বিষয়ে প্রমাণ কি? তাঁহার রূপাদি না থাকায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে না। যদি বল "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তাহাও হইতে পারে না, কারণ শ্রুতিসকল ঈশ্বরকর্ত্তৃক উচ্চারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক্ষণে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হইল তবে তদুচ্চারিত বেদের উপরই বা কিরূপে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে।

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা* অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন।

---

* নৈয়ায়িকেরা চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অতএব অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখাইতে পারিলে উহা সপ্রমাণ করা হয়।

সে অনুমানের আকার এই যে, "আমরা এই জগতে ঘট পট প্রভৃতি যে সমুদায় কার্য্য দেখিতেছি তাহাদিগের সকলেরই এক একটী কর্ত্তা আছে, এই বিচিত্র বিশ্বমণ্ডলের রচনা, এবং যথানিয়মে পরিপালনাদিও কার্য্য সুতরাং তাহাদিগেরও যে একটী কর্ত্তা আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। একজন কর্ত্তা না থাকিলে কে এই তেজোরাশি সূর্য্যমণ্ডলকে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানে স্থাপিত করিয়া শত শত গ্রহগণকে উহার চতুর্দ্দিকে যথানিয়মে ঘুরাইতেছে? কাহার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই বা ঋতুগণ সময়োচিত ফল পুষ্পাদিদ্বারা যথাসময়ে প্রকৃতিকে অলঙ্কৃত করিতেছে? এবং কাহার কথা শুনিয়াই বা নগর বন এবং বন নগর হওয়া প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনাবলী প্রতিক্ষণে সঙ্ঘটিত হইতেছে?† সে কর্তৃত্ব আমাদের সম্ভবে না, কারণ সৃষ্টির আরম্ভক্ষণে আমরা বর্ত্তমান ছিলাম না, তৎকালীন কার্য্যের উপর কিরূপে আমাদের কর্তৃত্ব হইবে? এবং আমরা সম্যক্ চেষ্টা করিয়াও কোন বৃক্ষের অঙ্কুর বা পর্ব্বতাদির সৃষ্টি করিতে পারি না। তাহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত আর একটি স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর।"

ন্যায় শাস্ত্রের আদিমাচার্য্য মহর্ষি গৌতমও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

(ঈশ্বরঃ কারনং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শনাত্) ৪ অ, ১ আ, ১৯ সূ। সমুদয় বিশ্ব কার্য্যের প্রতি ঈশ্বরই কারণ, উহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন অস্মদাদির কর্তৃত্ব সম্ভবে না, যেহেতু আমরা সামান্য ঘটাদিকার্য্যের নির্ম্মাণাদি বিষয়ে সমীচীন চেষ্টা করিয়াও অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হই না; তখন কিরূপে এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের কার্য্যকলাপকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইব? কেহ কেহ এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা দেখিতেছি মনুষ্যেরা যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন সচরাচর তদনুগত ফললাভ হয় না, এমন কি কখন কখন তাহার বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের কর্ম্মফললাভকে কোন অপর কারণেই সম্পূর্ণ অধীন বলিতে হইতেছে; সেই অপর কারণই ঈশ্বর!

গৌতম ঈশ্বরকে কারণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরুষকারকে একেবারে পরিহার করেন নাই। তিনি বলেন সত্য বটে যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমুদয় ফললাভ হইত তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা ব্যতীতও ফললাভ হইতে পারিত একথা সত্য, তথাপি—

(তৎ কারিতত্বাদ্ হেতুঃ) ৪ অ, ১ আ, ২১ সূ। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পুরুষকার ফলবান্ হয়, অন্যথা নহে। অর্থাৎ, সুবিজ্ঞ পিতা যেমন পুত্রগণের কার্য্যানুসারে

† ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ (যৎ যৎ কার্য্যং তৎ কর্তৃজন্যং ঘটবৎ)

তাহাদিগকে অভিনন্দিত করেন সেইরূপ সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে স্বকীয় কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা এখন প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে যতটুকু আসিয়াছি বোধ হয় তাহাতে উপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই।

যাহা হউক নৈয়ায়িকদিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উপর কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তোমরা যেমন ঘটাদিরূপ কার্য্যকে কর্ত্তৃজন্য দেখিয়া ক্ষিত্যাদিকার্য্যকেও কর্ত্তৃজন্য রূপে অনুমান করিতেছ এবং সেই কর্ত্তাকে ঈশ্বর বলিতেছ, আমরাও আবার ইহার প্রতিকূলে অপরবিধ অনুমান করিয়া ঐ অনুমানকে অসিদ্ধ করিতে পারি।*

যথা—

যাহারা শরীর হইতে উৎপন্ন নয় তাহারা কর্ত্তৃজন্য নয়, (যেমন আকাশাদি) পৃথিবী প্রভৃতিও শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই অতএব উহারাও কর্ত্তৃজন্য।†

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন এ আশঙ্কা ঠিক নহে। যেহেতু তোমাদের অনুমানে অনুকূল তর্ক নাই—অর্থাৎ তোমরা একথা বলিতে পার না যে, যাহারা কর্ত্তৃজন্য তাহারাই শরীরজন্য এবং যাহারা কর্ত্তৃজন্য নয় তাহারা শরীরজন্য নয়। কারণ আমরা স্বেদজ দংশ মশকাদির উৎপত্তির প্রতি কোন কর্ত্তা দেখিতে পাই না কিন্তু তাহারা শরীরজন্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মতে এ দোষ নাই; আমাদের অনুকূল তর্ক আছে; আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যাহারা কর্ত্তৃজন্য তাহারাই কার্য্য এবং যাহারা কর্ত্তৃজন্য নয় তাহারা কার্য্য নয়।

নৈয়ায়িকগণ অনুমান দ্বারা যেরূপে ঈশ্বরের অভীষ্টসিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ন্যায়সম্মত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন—

ন হীশ্বর এব কঃ ইত্যত্র ভাষ্যং—

গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। গুণৈর্নিত্য জ্ঞানেচ্ছপ্রযত্নৈঃ সামান্য গুণৈর্যোগাদিভি র্বিশিষ্টমাত্মান্তরং জীবেভ্যো ভিন্ন আত্মা জগদারাধ্যঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বেদদ্বারা হিতাহিতোপদেশকো জগতঃ পিতা। ইত্যাদি। ঈশ্বরের স্বরূপ ভাষ্যে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্যইচ্ছা, নিত্যপ্রযত্ন ও যোগাদি গুণদ্বারা ইতর জীব হইতে বিশিষ্ট এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী। তিনি বেদদ্বারা হিতাহিত উপদেশ করেন এবং জগতের পিতা স্বরূপ।

---

* কোন অনুমানের প্রতিকূলে আর একটি অনুমান্ করিলে সৎপ্রতিপক্ষ নামক দোষের আরোপ হয়। পরে দেখান হইবে।

† ক্ষিত্যাদিকং কর্ত্তৃজন্যং শরীরাজন্যত্বাৎ আকাশাদিবৎ।

তর্ক দীপিকা নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে "নিত্যজ্ঞানাধিকরণত্বমীশ্বরত্বম্।" ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের আধার। জীবের যে সকল জ্ঞান হয় তাহা অনিত্য তাহা কিছুক্ষণ পরে নষ্ট হয় ঈশ্বরের জ্ঞান নষ্ট হয় না।

এক্ষণে একথাও বক্তব্য যে নৈয়ায়িকদিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা নয় কিন্তু এক লোকাতীত নিয়ন্তা। কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা জল প্রভৃতিকে উপাদান করিয়া দণ্ড চক্রাদির সহায়তায় ঘট নির্ম্মাণ করে, তন্তুবায় যেমন তন্তুকে উপাদান করিয়া তূরী প্রভৃতির সহায়তায় বস্ত্রবয়ন করে ঈশ্বরও সেইরূপ অবিনশ্বর পরমাণু সকলকে উপাদান করিয়া জীবদিগের অদৃষ্টের সহায়তায় এই পরিতঃ পরিদৃশ্যমান এই চরাচর জগন্মণ্ডলের সৃষ্টি প্রভৃতির সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে যতদিন অবধি জীবগণের কর্ম্মফলরূপ অদৃষ্ট থাকিবে ততদিনই জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইবে, অদৃষ্টের একবারে অভাব হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে তাহার পর আর সৃষ্টি হইবে না।

ঈশ্বরকে লইয়া অধিক আন্দোলন করিলে পরিশেষে হয় ত শিষ্টজনবিগর্হিত নাস্তিকতাদোষে দূষিত হইয়া পড়িব এই আশঙ্কায় আমরা ন্যায়মতের স্থূল মর্ম্ম মাত্র সংগ্রহ করিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের মতে সেই জগৎ-পিতা করুণাময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে যত যুক্তি পাওয়া যায় ভালই না হয় বিশ্বাসকে সর্ব্বদা দৃঢ় করা সংসারধর্ম্মীর পক্ষে অনন্তমঙ্গলকর। কারণ সংসার-ধর্ম্ম করিতে করিতে এমন সকল ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হয় যাহাতে সেই করুণাময়ের চরণ ভিন্ন আমাদিগের হৃদয়ের আর কিছুই শান্তিপ্রদ বিশ্রাম স্থান লক্ষিত হয় না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে?

একথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে, ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক-প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের এইটি প্রথম অপরাধ—এই অবিশ্বাস।"

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য—তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ—ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দোষ?"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল—তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার, যে চুরি করে তার কিছু নয়?

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারব না। দেখনা ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আস্‌ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল?

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে? সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?

কুমতি। এমন বিশ্বাস করিল কেন?

সুমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ আর ভ্রমর, নিতান্ত বালিকা না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল, বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এতকাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এতকাল রোহিণী জোটে নাই। একদিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয় তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। অরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী সঙ্গে যাবে কি ?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষাঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুংকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোকে ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে, সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে, এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্না হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ-সম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব এ সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামীবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহ বশতঃ এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল। তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর ; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন।

এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, "ভয় কি? বিষ খাইব।"

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছুদূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেণ পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্ধুক, তোরঙ্গ, বাক্স, ব্যাগ, গাঁটরি, বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া, দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এদিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?"

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাঁহার অধরে স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, "দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী, ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গোবিন্দলাল। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্টাম্পে, আপনার সমুদায় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল, বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারিতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে, থাক। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর যোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "তবে যাও—পার আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম, আন্তরিক স্নেহ কোথায়? একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই—যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা—ভ্রমর অসতী। তুমি যাও আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাতদিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী—আমার কাঙ্গালের সোনা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা—তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?—"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে, ঊর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুটবাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই

সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল ; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমায় স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স। আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ, এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন ?”

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে ? ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট বিদায় হইয়া, ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার, অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাত্র ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন যাহা করিয়াছি তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাই হউক, যাত্রা করিয়াছি এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি, তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেকবার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও, একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন এত তাড়াতাড়ি কি ? যখন মনে করিব তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া—বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, কষাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সম্বাদ আসিল, গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতির সঙ্গে, নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিলেন না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল। এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল।

শেষে এক দিন সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন, এমন ভরসা হইল না। এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সম্বাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সম্বাদ নাই। ক্রমে এক দিন সম্বাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তারপর একদিন সম্বাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সম্বাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন মাস চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। মনে করিত, কেবল এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সম্বাদ পাইলেই বাঁচি। এ সম্বাদও পাই না কেন? শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সম্বাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন তিনি গোবিন্দলালের সম্বাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ মথুরা জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এদিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন রোহিণী কোথায় গেল? আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সম্বাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সম্বাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, গোবিন্দলাল আর কোন সম্বাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোন সম্বাদ পাই না। ভ্রমর আবার পিত্রালয় গেলেন। এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা

প্রথম ভাগ

মনুষ্যত্ব কি ?

মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বাক্যে না হউক, কার্য্যে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই, এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালি এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে, মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ, এবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে কর, রবিবারে কার্য্যত্যাগ, গিরজায় বসিয়া নয়ন নিমিলন, এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্য কর্ম্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি, পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ১২৮৪।

জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত, আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্ত্তি, এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্ত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর, কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপূর্ত্তির পর, ধনে হউক, বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্যলাভ করাকে মনুষ্যগণ, আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ, ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্য্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ব্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্ল্লভ, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন, থাকিলেই সম্পদ বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্ক্ষাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ অগ্রবর্ত্তী, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে বাহ্যসম্পদ্ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।† কেবল সাধারণ মনুষ্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে।

কদাচিৎ কখন এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদ্‌কে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্য সম্পদকে অপর লোকে, জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যসিংহ তাহা বিঘ্নকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে, বা ইউরোপে এমন অনেকেই মুনিবৃত্তি মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য সম্পদকে ঐরূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে—ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল যে বিষময় হইয়াছে, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থানেই তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইরূপ,

† স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অমঙ্গলজনক এ কথা বলি না, ধন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।

আর অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে ঐহিক সম্পদে অনমুরক্ত হইয়াও সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় বৈরাগী সম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

স্থূল কথা এই যে ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমি মাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে, কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব।

তৃতীয়তঃ পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষা ভূমিমাত্র হইলেও, ঐহিক এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্ম্মিকের শুভ, এবং ধার্ম্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাঁহাদিগের বিচার এই মূলভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্য কর্ম্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্য কর্ম্ম শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্য কর্ম্ম কি পরলোকে কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্য কর্ম্ম তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায়, অপ্রসন্নচিত্তে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লক্ষমুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব।

অতএব মনোবৃত্তি সকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্য কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক

ফলস্বরূপ স্বতঃনিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন, যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এমত নহে। তাঁহাদিগেব সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গূঢ় তত্ত্ব সকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন ষ্টুয়ার্ট মিল

(ক্রমশঃ)

প্রথম প্রস্তাব

মেঘদূত

কালিদাস যে সকল কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার এক একখানি ধরিয়া ভৌগোলিক তত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আমরা সর্ব্বপ্রথমে মেঘদূতনিহিত ভৌগোলিক তত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

কুবেরের জনৈক অনুচর অতিস্ত্রৈণতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করাতে কুবের তাহাকে একাকী এক বৎসর কাল রামগিরিতে থাকিতে আদেশ করেন। যক্ষ কুবের কর্ত্তৃক এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া কতিপয় মাস রামগিরির আশ্রমে অতিবাহিত করে। পরিশেষে আষাঢ়ের প্রথমদিবসে আকাশে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া বিরহবিধুর যক্ষ সজীব পদার্থ জ্ঞানে উহাকেই দৌতকার্য্যে নিযুক্ত করে। এবং রামগিরি হইতে স্বীয় আবাসবাটীর পথনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হয়। মেঘদূতে এই রামগিরি হইতে যক্ষের আলয় অলকার পথবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগর পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থান সন্নিবেশ একে একে বিবৃত হইবে। শৃঙ্খলার অনুরোধে প্রথমে "রামগিরি" হইতে প্রবন্ধের আরম্ভ করা যাইতেছে।

"রামগিরি" কালিদাসের বর্ণনানুসারে এই গিরির আশ্রমসলিল জনকতনয়া সীতার স্নানহেতু পবিত্র এবং ইহার তটভূমি পুরুষদিগের বন্দনীয় রামপদন্যাসে অঙ্কিত। [১] সুতরাং রামচন্দ্র যে অরণ্যবাস সময়ে এই পর্ব্বতে সীতার সহিত কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাস আছে। রামচন্দ্র সীতা

---

[১] "যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।" ৮।

* * *

"বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।" ১২।

ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে সর্ব্বপ্রথমে চিত্রকূটে সমুপস্থিত হয়েন। রামায়ণের নির্দ্দেশানুসারে ভরদ্বাজের আশ্রম প্রয়াগে ছিল। [২] চিত্রকূটের পথ-নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া ভরদ্বাজ রাম ও লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলেন "এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদন তুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। + + তোমরা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গিয়া পশ্চিমযমুনার তীর অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর গেলে একটি তীর্থ (ঘাট) দেখিতে পাইবে, সেই তীর্থে নামিয়া ভেলাদ্বারা নদী পার হইবে। অনন্তর হরিদ্বর্ণ পত্রবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহার ছায়ায় বিশ্রাম কর আর নাই কর তথা হইতে এক ক্রোশ গেলে শল্লকী বদরীযুক্ত ও যমুনাতীরজ বিবিধ বন্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন নয়নগোচর হইবে। ঐপথ দিয়াই চিত্রকূটে যাওয়া যায়, আমি অনেকবার উক্ত পর্ব্বতে গিয়াছি।" [৩] রামায়ণের এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতীতি হয়, চিত্রকূট পর্ব্বত গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদের দক্ষিণপশ্চিমবর্ত্তী বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। অধ্যাপক উইল্‌সনের মতে বুন্দেলখণ্ডস্থ বর্ত্তমান কম্‌তা পর্ব্বতই পূর্ব্বে চিত্রকূট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [৪] অদ্যাপি এই পর্ব্বত পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

---

[২] রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

[৩] "দশক্রোশ ইতস্তাত! গিরির্যস্মিন্নিবৎস্যসি।

* * *

চিত্রকূট ইতিখ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥

* * *

গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভৌ।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্॥
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃসমাগতাম্।
তস্যাস্তীর্থং প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব॥
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্।
ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তম্ হরিতচ্ছদম্॥

* * . *

সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্বাতিক্রমেত বা।
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্॥
শল্লকীবদরীমিশ্রং রাম! বংশৈশ্চ যামুনৈঃ।
স পন্থা চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া॥

রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৪ ও ৫৫ অধ্যায়।

[৪] Wilson's Megha Duta, verse I, note. চিত্রকূট বুন্দেলখণ্ডস্থ বান্দা বিভাগের অন্তঃপাতী, এবং এলাহাবাদ হইতে ৭১ মাইল দূরে অবস্থিত। পাদদেশে এই পর্ব্বতের পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

কাম্‌তা নাথ চিত্রকূটের অপর নাম। ইহা কামদনাথের অপভ্রংশ। এই পর্ব্বতে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, লোকে বলে এই জন্যই ইহার "চিত্রকূট" নাম হইয়াছে। এই পর্ব্বত হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। Vide Atkinson's Statistical.

যাহা হউক, প্রামাণিক টীকার মল্লিনাথ এই চিত্রকূটকেই রামগিরি নামে নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। [৫] কিন্তু এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সরল পথে রামগিরি হইতে কৈলাসে যাইতে হইলে যে যে স্থান প্রাপ্ত হইতে হয়, মেঘদূতে তাহাই বর্ণিত আছে। কৈলাস রামগিরির উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং কৈলাস যাত্রীকে রামগিরি হইতে বাহির হইয়া উত্তরবর্ত্তী পথেরই অনুসরণ করিতে হইবে। এক্ষণে মেঘদূতে দেখা যাইতেছে, কুবেরের অনুচর মেঘের নিকট কৈলাসের পথনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া রামগিরির পর আম্রকূট পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছে। নর্ম্মদা বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণবর্ত্তী স্থান দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। রামগিরি বুন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকূট পর্ব্বতের নামান্তর হইলে নর্ম্মদা কৈলাসযাত্রী মেঘের গন্তব্য পথের ঠিক বিপরীত দিকে পড়ে। সুতরাং মল্লিনাথের সিদ্ধান্তানুসারে নর্ম্মদা নদী প্রভৃতি মেঘদূতে বর্ণনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কিন্তু কালিদাস যখন রামগিরির পর আম্রকূট পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন রামগিরির অবস্থান সন্নিবেশ এমন কোন স্থানে হইবে যে, যে স্থান হইতে কৈলাসের পথ অতিবাহন করিতে হইলে আম্রকূট পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিতে হয়। এই কারণে আমরা মল্লিনাথের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। মল্লিনাথের অনুসরণ পূর্ব্বক কালিদাসকে উদ্দিষ্ট স্থানানভিজ্ঞ ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা বিষয়ান্তরের অনুসরণ পূর্ব্বক রামগিরির অবস্থান সন্নিবেশ নির্দ্ধারণই অধিকতর সঙ্গত।

কিম্বদন্তী অনুসারে কৈমোর পর্ব্বত শ্রেণীর* পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী একটি পর্ব্বত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের আশ্রয়স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকে বলে রামচন্দ্র প্রভৃতি অরণ্যবাস সময়ে এই পর্ব্বতে একরাত্রি বাস ও ইহার জলে

Descriptive and Historical Account of the North Western Provinces of India. Vol. I, p. 405. Comp. As. Res. Vol. XIV, p. 384.

[৫] রামগিরেঃ চিত্রকূটস্থ ইত্যাদি। প্রথম শ্লোকের টীকা দেখ।

* এই পর্ব্বতশ্রেণীর অক্ষাংশ প্রায় ২৪ ডিগ্রি ৪০ মিনিট ও দ্রাঘিমা প্রায় ৮২ ডিগ্রির সন্ধিস্থল হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় ৭০।৮০ মাইল বিস্তৃত। ইহার একটি অংশের আকার মোচাগ্রভাগের ন্যায় (Bengal and Agra Guide, 1842, Vol. II. Part I. 321.) সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সম্ভবতঃ ২০০০ ফীটের অধিক হইবে। এই পাহাড়শ্রেণী বিন্ধ্যপর্ব্বতের একটি অংশ Thorton, Gazetteer of India, Vol. III. p. 5. Comp. Journ. As Soc. Beng. 1833, V. 477.

দেশাবলী গ্রন্থেও কৈমোর পাহাড় বিন্ধ্যপর্ব্বতের অংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :—

"বিন্ধ্যগিরি দক্ষিণাংশো (বিন্ধ্যগিরির্দক্ষিণাংশঃ ?)
কৈমোর পর্ব্বতারতন্তরে (পর্ব্বতন্তরে ?")

দেশাবলী। (হস্তলিখিত)

আপনাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন। [৬] রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে লিখিত আছে, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি পর্ব্বতের অদূরবর্ত্তী সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। [৭] কৈমোর পর্ব্বতের পশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বত রামায়ণের লিখিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রম সন্নিহিত পর্ব্বত হইতে পারে। যাহাহউক, সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে এই পর্ব্বতের সহিতই রামগিরির অভিন্নতা কল্পিত হইয়া থাকে। ইহারই অন্যতম নাম রামটিক অথবা রামটেক্ষ। মহারাষ্ট্র ভাষানুসারে রামটোক্ ও রামগিরি একার্থ বোধক। [৮] কেহ কেহ বলেন মেঘদূতোক্ত রামগিরি নাগপুরের নিকটবর্ত্তী।[৯] আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট রামটিক অথবা রামটোক্‌ও নাগপুরের নিকটে অবস্থিত। সুতরাং রামগিরির সহিত রামটিকের অভিন্নতা স্পষ্টত লক্ষিত হইতেছে।

রামটিক—অন্যতর নাম রামটোক্—ইহা নাগপুর রাজ্যে ও সাগর হইতে নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে রামটিক নামে একটী নগর আছে। এই নগর নাগপুরের উত্তরপূর্ব্ব দিকে ২৪ মাইল অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের চারিদিকে সমতল ক্ষেত্র। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে পাঁচ শত ফীট ঊর্দ্ধে কতকগুলি দেবমন্দির আছে। সুগঠিত সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপানদ্বারা উহার উপরে উঠা যায়। এই সোপানমার্গের স্থানে স্থানে বিশ্রামযোগ্য উপবেশন স্থান আছে। [১০] পর্ব্বতের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বহুবিধ পল্লী, জলাশয় ও আম্রকাননসমাকীর্ণ নাগপুরপ্রান্তর নয়নগোচর হয়। উত্তরদিকে দুই মাইল প্রশস্ত একটি উপত্যকার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে জঙ্গলময় পর্ব্বতশ্রেণী পরিদৃষ্ট

---

[৬] As. Res. Vol. VII. p. 60-61.

[৭] "রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়াচ পরন্তপঃ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ॥
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্॥
ততস্তদিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈ দ্রুমৈঃ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ॥
* * *
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবৎ তপোধনমভাষত॥
অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।

রামায়ণ। আরণ্যকাণ্ড ৭ম সর্গ।

[৮] Wilson's Megha Dûta. verse 1, note.

[৯] Asiatic Annual Register for 1806.

[১০] As. Res. Vol. xviii, p. 206.

হইয়া থাকে, এই পর্ব্বতমালার অনতিদূরে বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামটিক পর্ব্বতের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি রামের নামে উৎসর্গীকৃত, প্রতিবৎসর এই স্থানে বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয় [১১]। যাত্রীদিগের এই উৎসব চান্দ্র কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া দশদিন থাকে। যাত্রিগণ প্রধানতঃ নাগপুর ও নিজামের রাজ্য হইতে আসিয়া থাকে; ইহাদের সংখ্যা প্রায়ই এক লক্ষের ন্যূন হয় না। মন্দিরের উত্তরদিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বত-গহ্বরে একটি প্রশস্ত ও সুন্দর জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের চারিদিকে কতকগুলি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র দেবালয় দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতশিখরস্থ মন্দির হইতে এই গুহাস্থিত দেবালয় পর্য্যন্ত একটি সুগঠিত, সুন্দর ও সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপান আছে। রামটিকের অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি, ২৪ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৯ ডিগ্রি, ২২ মিনিট [১২]।

যক্ষদূত মেঘ রামগিরি হইতে ক্রমাগত উত্তরমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। অধ্যাপক উইল্‌সন্ লিখিয়াছেন, মেঘ আদৌ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পরে উত্তরমুখে কৈলাসগন্তব্য পথে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। [১৩] কিন্তু মেঘদূতের সহিত ইহার একতা লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয় উইল্‌সন্ মেঘদূতের পঞ্চদশ কবিতালিখিত 'পুরস্তাৎ' শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিকে [১৪] করিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মল্লিনাথের মতে পুরস্তাৎ শব্দের অর্থ অগ্রে। সুতরাং মেঘ যে রামগিরি হইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইবে, মল্লিনাথের ব্যাখ্যাদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ মেঘদূতে পূর্ব্বদিকের উল্লেখ নাই; যক্ষ রামগিরি হইতে কৈলাসগন্তব্য পথের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া মেঘকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্পষ্টই বলিয়াছে, 'সরস বেতসময় এই রামগিরি হইতে উত্তরাভিমুখ হইয়া আকাশপথে প্রস্থান কর' (স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্‌মুখঃ খং।) যক্ষের এই উক্তিতে মেঘের প্রতি পূর্ব্বাভি-গমনাদেশ সমর্থিত হইতেছে না। রামগিরির অবস্থানসন্নিবেশ পূর্ব্বে যেরূপ মুখে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, মেঘের গতি নাগপুরনগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী ছত্রিশ গড় [১৫] বিভাগের মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

[১১] Jenkins', Report on Nagpur, p. 53.

[১২] Thornton, Gazetteer of India, Vol. iv. p. 295-296. Comp. Hamilton East India Gazetteer, Vol, ii. p. 458.

[১৩] Wilson's Megha Duta, verse 95, note.

[১৪] রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ ইত্যাদি।

মেঘদূত। ১৫।

উইল্‌সনের অনুবাদ:—

Eastward, where various gems, with blending ray, &c. &c.

[১৫] নাগপুর রাজ্যের গোন্দয়ানা প্রদেশ এই বিভাগে অবস্থিত। মুসলমানেরা এই স্থানকে প্রায়ই জেহার খণ্ড বলিয়া থাকে। এই বৃহৎ বিভাগের কোন কোন অংশে

মানচিত্রে নাগপুর ও ছত্রিশ গড়ের অবস্থানসন্নিবেশ দেখিলেই ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মেঘ রামগিরি হইতে প্রস্থান করিয়া 'মাল' নামক ক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হয়। মাল শব্দের অর্থ শৈলপ্রায় উন্নত স্থল। কর্ণেল উইলফোর্ডকৃত পৌরাণিক স্থানাদির তালিকার মধ্যে "মাল" শব্দের উল্লেখ আছে। [১৬] উইলফোর্ডের মতে এই "মাল" মেদিনীপুর বিভাগের "মালভূমি।" [১৭] কিন্তু অধ্যাপক উইল্‌সন্ ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই। তিনি মেঘদূতোক্ত ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসরণ পূর্ব্বক উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকে ছত্রিশ গড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন।[১৮] কালিদাস যখন রামগিরির পরেই "মাল" নামক ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহা ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে বক্তব্য নাই। কিন্তু পুরাণান্তর্গত মালই যে কালিদাসের ছত্রিশ গড়ান্তর্গত মালনামক ক্ষেত্র তদ্বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। উইলফোর্ড মাল ও মালী একপর্য্যায়ে নিবেশিত করিয়া উভয়কেই মেদিনীপুরান্তর্গত মালভূমি বলিয়াছেন। মাল যদি মহাভারত ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত মালবের ন্যায় কেবল জাতিবাচক হয়, [১৯] তাহা হইলে মালীর সহিত উহার

শৈলপ্রায় ভূমি ও অকৃষ্ট জঙ্গল আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সমুদায় স্থানই উর্ব্বরতা গুণসম্পন্ন। ছত্রিশ গড়ের রাজধানী রতনপুর। Vide Hamilton's Hindustan, Vol. II., p. 22. Comp. Spry. Modern India, Vol, II. p. 140.

রতনপুর হাজারিবাগ হইতে নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। ইহা হাজারিবাগের ৩১০ মাইল। Garden Tables of route, 200) দক্ষিণ পশ্চিম ও নাগপুরের ২৪৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রাজপুর (Blunt, As. Res. vii. 105) ছিল; পরে এই স্থানের জনৈক রাজা রতনসিংহের নামে ইহার "রতনপুর" নাম হইয়াছে। Blunt, As. Res. vii 101. Comp. Hamilton, ut. supra. p. 22-23. Thornton Gazetteer of India Vol, iv. p 349-350.

[১৬] As. Res. Vol. viii. p. 336.

[১৭] Ibid, p. 336,

[১৮] Wilson's Megha Duta, verse, 99, note. Comp. Wilson's Essays, Analytical &c. Vol. vii. Ed. by Fitzedward Hall p. 157, note. 5.

[১৯] মহাভারতে নকুলের পশ্চিম দিগ্বিজয় বর্ণনায় মালবের উল্লেখ আছে। যথা ;—

শিবং স্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চ কর্প টান্।
তথা মধ্যমকেয়াংশ্চ বাটধানান্ দ্বিজানথ॥ ইত্যাদি

মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়। ৩৮।

স্থলান্তরে—

অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।
বশাতয়শ্চ মৌলেয়াঃ সহক্ষুদ্রকমালবৈঃ॥

মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়। ৫১।

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবা। ভাগবত পুরাণ।
Comp. Wilson's Essays Ed. by Fitzedward Hall Vol. vii. p. 133. note.

অভিন্নতা সমর্থিত হইতে পারে। সেকেন্দর সাহ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মালী ও অক্সিদ্রক নামে দুটী রণপ্রিয় জাতিকে পরাজিত করেন। প্লিনি এরিয়ান ও স্ত্রাবো প্রভৃতির গ্রন্থে এই জাতিদ্বয়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। সেকেন্দর মালীদিগের হস্ত হইতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, এতন্নিবন্ধন তাঁহার সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া ইহাদের অনেককে মৃত্যুমুখে পাতিত করে, [২০] পাণিনি ৫।৩।১১৪ সংখ্যক সূত্রে এই বিধান করিয়াছেন যে পঞ্জাবদেশীয় যোদ্ধজাতি বুঝাইতে তাহাদের নামের উত্তর "য" আদেশ ও পূর্ব্বস্বরের বৃদ্ধি হয়। টীকাকারগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল "মালব্য" ও "ক্ষৌদ্রক্য" এই দুটি পদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [২১] অতএব "মালব" ও "ক্ষুদ্রক" নামে যে পঞ্জাব দেশে দুটি রণপ্রিয় জাতি বাস করিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। [২২] এই "মালব" ও "ক্ষুদ্রকের" সহিত অনায়াসে সেকন্দরের পরাজিত "মালী" ও "অক্সিদ্রক" জাতি তুলনীয় হইতে পারে। [২৩] কানিংহাম মুলতানবাসীদিগকেই "মালী" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [২৪] যাহা হউক মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও পাণিনির "মালব" এবং গ্রীকদিগের "মালী" একজাতিবাচক শব্দ। এই জাতিবাচক "মালীর" সহিত স্থানবাচক শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উইলফোর্ড যে "মাল" ও "মালী" এক পর্য্যায়ে নিবেশিত করিয়া মেদিনীপুরান্তর্গত মালভূমের সহিত উহার অভিন্নতা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উইলসন্ সাহেব উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকেই কালিদাসের লিখিত "মাল" নামক ক্ষেত্র বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্থলান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বায়ু ও মৎস্যপুরাণে জাতিবাচক শব্দের মধ্যে "মাল" ও

বিষ্ণুপুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনায় মালবজাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

তথা পরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরা ভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারূষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

[২০] Cunningham, Ancient Geography of India, p. 238-239.

[২১] ৫।৩।১১৪ : আয়ুধজীবি সঙ্ঘাঞ্ঞ্যড্ বাহীকেষ্বব্রাহ্মণরাজন্যাৎ।
বাহীকেষু য আয়ুধজীবিসঙ্ঘস্তদ্বাচিনঃ স্বার্থে ঞ্যট্। ক্ষৌদ্রক্যাঃ। মালব্যাঃ।

সিদ্ধান্তকৌমুদী।

"ক্ষত্রিয়াদেকরাজা দিতিবক্তব্যং। কিং প্রয়োজনং। সংঘপ্রতিষেধার্থং। সংঘান্মাভূৎ। পঞ্চালানামপত্যং বিদেহানামপত্যমিতি। + + ইদং তর্হি ক্ষৌদ্রকানামপত্যং (ক্ষুদ্রকানাম-পত্যং ?) মালবানামপত্যমিতি। অত্রাপি ক্ষৌদ্রক্যো মালব্য ইতি।" পাণিনীয় ৪।১।১৬৮ সূত্রের পতঞ্জলির ভাষ্য। Vide Professor Goldstucker's Patanjali's Mahabhashya. Photo-Lithography Edition Vol. II. p. 1224.

[২২] See "Indian Antiquary." Vol. I. p. 21.-23.

[২৩] প্রস্তাবলেখক বিরচিত পাণিনি বিচারের ১১১-১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

[২৪] Ancient Geography of India. p. 237.

মালবর্ত্তীর প্রয়োগ আছে। [২৫] সুতরাং উইল্‌সনের মতানুসারে এক পৌরাণিক মালই একসময়ে স্থানবাচক অন্য সময়ে জাতিবাচক হইতেছে। এরূপ বিভিন্ন মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যে শব্দ একটি বিশেষ জাতিকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা কি প্রকারে একটি বিশেষ ক্ষেত্রের দ্যোতক হইবে? আমাদের বিবেচনায় পৌরাণিক "মাল" ও "মালব" এবং গ্রীকদিগের "মালী" সকলই একটি বিশেষ জাতির নির্দ্দেশক, ইহার সহিত মেঘদূতোক্ত মালক্ষেত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই। ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে একটি ক্ষেত্র শৈল-প্রায় ও সাধারণ ভূমি অপেক্ষা উন্নত বলিয়া কালিদাস উহা "মাল" এই আভিধানিক নামে বিশেষিত করিয়াছেন। মেঘদূতে এই কৃষিক্ষেত্রের এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জ্জনপদ বধূলোচনৈঃপীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণ সুরভি ক্ষেত্রমারুহ্যমালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ॥"

"কৃষিফল তোমারই অধীন, এইজন্য ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ পল্লীবধূগণ তোমায় প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে দেখিতে থাকিবে। তুমি মালক্ষেত্রে বর্ষণ করিলেই হলকর্ষণে উহা হইতে সৌরভ বহির্গত হইবে। কিয়ৎক্ষণের পর তুমি এই ক্ষেত্র হইতে পুনর্ব্বার উত্তর দিকে গমন করিও।"

এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, মেঘের গন্তব্য পথে একটি কৃষিভূমি পড়িয়াছিল, পর্ব্বত সান্নিধ্য হেতু এই ভূমি শৈলপ্রায় ও উন্নত বলিয়া উহা মালসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ বলেন, রতনপুরের কিছু উত্তরে "মালদ" নামে একটি নগর আছে; এক্ষণে কেবল এই মালদে মালের চিহ্ন পাওয়া যায়। পরন্তু টলেমীর মানচিত্রে মালেত নামে একটি স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের "মাল" ও টলেমীর "মালেত" উভয়ই বিন্ধ্যপর্ব্বতের একদিকে অবস্থিত। এই "মালদ" ও "মালেত" মেঘদূতোক্ত "মাল" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। [২৬] আমরা উইল্‌সনের এ মতেও আস্থাবান্ হইতে পারি না। উইল্‌সন্ মেঘদূতের "মালকে" একটি জনপদ ভাবিয়াই মালদ ও মালতের সহিত উহার অভিন্নতা প্রতিপন্ন

[২৫] Professor Wilson's Essays, Analytical, &c., Vol. vii. Ed. by Fitzedward Hall. p. 157. note, 5.

অধ্যাপক উইল্‌সন্ বলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে গণবর্ত্তী বলিয়া একটী জাতির নাম আছে। তিনি এই গণবর্ত্তীর সহিত মালবর্ত্তীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। হল সাহেব বলেন হস্তলিখিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে মালব নামে একটী প্রাচ্য জাতির নির্দ্দেশ আছে (Wilson's Essays, vii. 157. Fitzedward Hall's note.) মহাভারতের সভাপর্ব্বেও এই জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বিষয় স্থলান্তরে লিখিত হইল।

[২৬] Wilson's Megha Duta, verse 99. note.

করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস সফল হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাচ্য জাতির মধ্যে মালদ নামক এক এক জাতির উল্লেখ আছে। [২৭] মহাভারতে ভীমসেনের পূর্ব্বদিক্ বিজয় বর্ণনাতেও এই জাতির নির্দ্দেশ লক্ষিত হয়। ভীম দশার্ণ প্রভৃতি জয় করিয়া মালদ প্রভৃতিকে সমরে পরাজিত করেন। [২৮] আমাদের বিবেচনায় টলেমীর "মালেত" এই "মালদ" জাতির অধিষ্ঠিত জনপদ। ইহার সহিত কালিদাসের মালক্ষেত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সিন্ধুদেশে "মাল" নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহা সিন্ধুনদের উপশাখা। পূর্ব্বে এই নদী বড় ছিল; কিন্তু এক্ষণে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই নদীর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কেবল ২৫ টন বোঝাই নৌকা যাইতে পারে। [২৯]

মালক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মেঘ আম্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হয়। কালিদাসের বর্ণনানুসারে এই পর্ব্বতের পার্শ্বভাগ আম্রকাননে পরিব্যাপ্ত। [৩০] এই জন্যই ইহা "আম্রকূট" নামে আখ্যাত হইয়াছে। মেঘ এই আম্রকূট পর্ব্বত দিয়া নর্ম্মদাতীরে উপনীত হয়। পূর্ব্বে মেঘের গমনপথ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান

[২৭] Wilson's Essays, Analytical &c., Vol. vii. Edited by Fitzedward Hall, p. 157, Hall's note 3.

[২৮] এতস্মিন্নেব কালে তু ভীমসেনোঽপি বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মরাজমনুজ্ঞাপ্য যযৌ প্রাচীং দিশং প্রতি॥

* *

বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ।
তত্র দশার্ণকো রাজা সুধর্ম্মা লোমহর্ষণং।
কৃতবান্ ভীমসেনেন মহদ্যুদ্ধং নিরায়ুধং।

* *

যুধ্যমান বলাৎ সংখ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
ততো বৎসান্ মহাতেজা মলদাশ্চ মহাবলান্॥

মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়। ২৮ ও ২৯।

Comp. Journ. As. Soc. of Bengal, Vol. xiv. part I. No II. 1876. p. 373.

[২৯] Edward Thornton, a gazetteer of the countries adjacent to India on the N. West, Vol. ii. p. 75.

[৩০] ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুন প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

পূর্ব্বমেঘ। ১৮।

অমরকণ্টক পর্ব্বতই কালিদাসের আম্রকূট বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। [৩১] সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের অন্তঃপাতী ব্রিটিশাধিকৃত রামগড় বিভাগে রত্নপুরের ২৮ মাইল উত্তরে অমরকণ্টক পর্ব্বত অবস্থিত। গোন্দয়ানার জঙ্গলময় উন্নত ভূমির মধ্যভাগে এই পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের ৪০ ফীট উর্দ্ধে একটি অট্টালিকা আছে। এই অট্টালিকায় অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। বিগ্রহের অধিকাংশই ভবানীর প্রতিমূর্ত্তি। এই দেবমন্দির হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্দিরের নিকটে প্রস্তরময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি জলাধার আছে। ইহা হইতে যে জল নির্গত হইয়াছে, স্থানীয় লোকে তাহা নর্ম্মদা নদীর মূল বলিয়া থাকে। অনেকের মতে এই জলাধার শোণ নদীরও উদ্ভবস্থান। কিন্তু টিফেন মালারের মতে ইহার অর্দ্ধ মাইল অন্তরে শোণ নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। অমরকণ্টকের চতুর্দ্দিক নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত, গমনাগমনের প্রায় পথ নাই। এরূপ দুর্গম হইলেও এই পর্ব্বতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানের তত্ত্ব লইয়া পূর্ব্বে অনেক গোলযোগ ছিল; পরে ১৮২৬ অব্দে নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলার সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইহা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। [৩২] যদিও জব্বলপুর হইতে এই পর্ব্বত ১২০ মাইল অন্তরে অবস্থিত, তথাপি এপর্য্যন্ত সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। এই উচ্চতা এক গণনানুসারে [৩৩] ৫০০ ফীট, অন্য গণনানুসারে [৩৪] ৩৫০ ফীট নিরূপিত হইয়াছে। থর্টনের মতে শেষোক্ত গণনাই অধিকতর সঙ্গত। বৎসরের যে সময় গ্রীষ্মের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময় অমরকণ্টকে তাপমানের পারদ কদাচিৎ ৯৫ ডিগ্রি অতিক্রম করিয়া থাকে। [৩৫]

---

[৩১] Wilson's Megha Duta, verse 104 note.

[৩২] Aitcheson, a Collection of treaties. Vol. iii. p. 112. Camp's Empire in India.

[৩৩] Bengal and Agra Guide, 142 Vol. II part I. p. 323.

[৩৪] Spry : Modern India, Vol. ii. p. 145 note 2.

[৩৫] Thornton, Gazetteer of India Vol. i. p. 104-106. Comp As. Res Vol. viii pp. 89, 96, 99 Hamilton's Hindustan, Vol. ii. p. 16-17 Malcoln's Central India Vol. ii y 507.

(প্রতিবাদ)

বিগত আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে সতীদাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহার সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। দুটি বিষয়ের জন্য লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রথম, তাঁহার লিপিচাতুর্য্য; দ্বিতীয়, অভাগিনী বিধবাদিগের দুঃখে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি। জ্বলন্ত চিতায় জীবিত মনুষ্যের পুড়িয়া মরার পক্ষ যিনি সমর্থন করেন, লোকে তাঁহাকে আপাততঃ কঠিন-হৃদয় বলিয়া মনে করিলেও করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিনিবিষ্টচিত্তে প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, লেখক একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি। বিধবার দুঃখে যথার্থই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত। এমন কি, বোধ হয়, তাঁহার হৃদয়ই প্রধানতঃ তাঁহাকে এই ভয়ানক মতে আনিয়াছে যে, যাবজ্জীবন পুড়িয়া মরা অপেক্ষা একদিনে পুড়িয়া মরা ভাল।

প্রশংসার দিকে যাহা বলিবার ছিল বলিলাম। এক্ষণে প্রবন্ধটির মধ্যে যে সকল ভ্রম আছে, ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের বিষয় বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটি কথার সমালোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

লেখক পত্যনুগমনের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই স্থির করিয়াছেন যে, বিধবার দুর্গতি উহার প্রকৃত কারণ নহে। দুটি যুক্তিদ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি এই "বৈধব্য দুঃখই যদি সহমরণের কারণ হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবা পতিবর্ত্মগা হইত। তাহা হয় নাই।" এই যুক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। লেখকের বাক্যের মর্ম্ম এই যে, যদি বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে কোন সাধারণ দুঃখ থাকে এবং সেই দুঃখের জন্য যদি তাহারা মরে, তবে অধিকাংশ কিম্বা অনেক লোক মরিবে। নিতান্ত অল্পাংশ লোক কখন মরিবে না। সুতরাং বৈধব্য যন্ত্রণার

ভয়ে যদি বিধবারা সহমৃতা হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবাই সহমৃতা হইত ; "ঊর্দ্ধ সংখ্যা হাজারে পাঁচ জন" কেন হইবে।

এই যুক্তির বল কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। স্পষ্ট করিয়া বলি, যুক্তিটি নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ইহা সকলেই জানেন যে, দারিদ্র্যদুঃখের ভয়ে কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যত লোক দারিদ্র্যনিবন্ধন কষ্টভোগ করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ বা বহুসংখ্যক লোক কি আত্মঘাতী হইয়া থাকে ? কখনই না। নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকেই উক্ত ভয়ানক কার্য্য করিয়া থাকে। যত লোক কষ্টভোগ করে, তাহাদের দুর্দ্দশার সমতা থাকিলেও তন্মধ্যে যাহারা নিতান্ত অসহিষ্ণু তাহারাই আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ততদূর দুর্ব্বলমতি লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই যারপরনাই অল্প। দারিদ্র্যবিষয়ে যে প্রকার, বৈধব্য সম্বন্ধেও কেন তাহা না হইবে ? দরিদ্রদিগের মধ্যে সাধারণ দারিদ্র্যদুঃখের ভয়ে যেমন নিতান্ত অল্পসংখ্যক দরিদ্র আত্মবিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিধবাদিগের মধ্যে সাধারণ বৈধব্যদুঃখের জন্য নিতান্ত অল্পসংখ্যক বিধবা—"ঊর্দ্ধসংখ্যা হাজারে পাঁচজন" সহমৃতা হইত, এরূপ বলিলে কি অযুক্ত বাক্য বলা হয় ?

স্বর্গলাভের জন্য বিধবারা সহমৃতা হইত কি না এই বিষয় বিবেচনা করিয়া, লেখক তৎপরে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহারা ভালবাসার জন্য মরিত না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি কথার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নারীধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। হিন্দুললনার ধর্ম্ম, পতিভক্তি—পতিপ্রেম নহে।" লেখক আরও বলিয়াছেন, "যদি কিঞ্চিৎ প্রেমশিক্ষা আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। দাম্পত্য-প্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে।" আমরা স্বীকার করি যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ অতি বাহুল্যরূপে পতিভক্তির উপদেশ চিরকাল দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম কোনকালে দাম্পত্যপ্রণয়ের শিক্ষা দান করেন নাই। সত্য ঠিক গোলাকার পদার্থের ন্যায়। একেবারে সকল দিক্ দেখা যায় না। যিনি যে দিক্ দেখেন, তিনি সেইদিকেরই বিষয় জানিতে পারেন ; অপরদিকের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না। যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখেন, তাঁহারই সকল দিকের জ্ঞানলাভ হয়। যদি সকল দিক্ দেখিতে পার, ভালই। কিন্তু যদি কেবল একদিক দেখিয়া থাক, তবে সেই এক দিকের কথা বল। আপনাকে সকল দিকেরই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করিও না। সতীদাহ-লেখক কেবল

একদিক দেখিয়াছেন। দেখুন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিক দেখিয়া যে আপনাকে সকল দিকের বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করিয়াছেন;—সকল দিক্ সেই একদিকের ন্যায় ভাবিয়াছেন,—ইহাই অন্যায় হইয়াছে। তিনি একদিক্ দেখিয়াছেন;—তিনি দেখিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ বাহুল্যরূপে পতিভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অপর দিক্ দেখেন নাই;—তিনি দেখেন নাই যে, হিন্দুসমাজ পতিপ্রেমেরও উপদেশ দেন।

লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ কখন হিন্দুরমণীগণকে শিক্ষা দেন না যে, স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে। তিনি এ কথার কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি বলিতে পারেন যে, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রমাণের ভার তাঁহার উপর নাই। ভাল; আমরা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিব যে তাঁহার কথা সত্য নহে।

যাঁহারা বিবাহের মন্ত্রগুলি কখন মন দিয়া শুনিয়াছেন তাঁহারাই বলিবেন যে, লেখকের কথা সত্য নহে। আমরা নিম্নে উক্ত মন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবা সমাপোহৃদয়ানিনৌ।
(ঋগ্বেদী বিবাহের মন্ত্র।)

সমস্ত দেবতারা তোমাদের হৃদয়কে সমান করুন।

উক্ত মন্ত্রসকল হইতে নিম্নে আর একটি অংশ উদ্ধৃত হইল।

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
(সামবেদী বিবাহের মন্ত্র।)

অর্থাৎ এই যে তোমার হৃদয়, তাহা আমার হউক; এই যে আমার হৃদয় তাহা তোমার হউক।

জিজ্ঞাসা করি এ গুলি কি প্রেমের কথা নহে? জিজ্ঞাসা করি এই কয়েকটি শব্দে প্রেমশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব যেমন সহজে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে, পাঠকবর্গ এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন? এই কয়েকটী শব্দে যিনি উচ্চতম দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব অনুভব করিতে না পারেন, তিনি প্রেমতত্ত্ববিষয়ে নিতান্তই মূর্খ। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি দেখিতে পান যে, এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সুন্দর প্রেমময় জগৎ অবস্থিতি করিতেছে।

নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে।
(শান্তিপর্ব্ব। ১৪৪।৫৫০৮।)

ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই, ইহলোকে ধর্ম্মসাধনে ভার্য্যার সমান আর সহায় নাই।

আমাদের স্ত্রীলোকেরা নিরক্ষর। সুতরাং এমন বলিতেছি না যে, এই সকল

সংস্কৃত বচনে তাহাদের পতিপ্রেম শিক্ষা হয়। এই সকল বচনে কেবল লেখকের একটি কথার খণ্ডন হইতেছে; তিনি বলিয়াছেন যে, "স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজকর্ত্তৃক নারীধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই" এই কথা খণ্ডনের নিমিত্ত বচনগুলি দেওয়া গেল।

অধিক বিচার করিতে হয় না, সামান্য বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, লেখকের কথা সত্য নহে। হিন্দুসমাজ চিরদিন আমাদের রমণীকুলের সম্মুখে দুইটি মনোহর আদর্শ ধারণ করিয়া আছেন। একটি সীতা; আর একটি সাবিত্রী। এই দুইটি আদর্শের প্রতি হিন্দুরমণীকুলের মনশ্চক্ষু বংশপরম্পরায় স্থির হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ নিরক্ষর। সংস্কৃত বচন তাহারা বুঝে না। কিন্তু কথকথা, প্রচলিত যাত্রা গান প্রভৃতির দ্বারা সীতা ও সাবিত্রীর কথা তাহাদের অস্থি মাংস মজ্জার মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট রহিয়াছে। "সাবিত্রী সমানা হও" ইহাই প্রচলিত আশীর্ব্বাদ। জিজ্ঞাসা করি, এই সীতা ও সাবিত্রী চরিত্রে কি প্রেম নাই? কে না বলিবে যে, এই দুটি নারীচরিত্রে পতিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রেম অতি সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। যে সমাজ নারীকুলের সম্মুখে সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় পবিত্র আদর্শদ্বয় চিরকাল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন্ মুখে বলিব যে সে সমাজ তাহাদিগকে পতিপ্রেম শিক্ষা দেয় না?

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রেম ও ভক্তির পরস্পর এমনি সম্বন্ধ যে একটি সহজেই আর একটিতে পরিণত হয়। বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর যে প্রকার নিগূঢ় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে ভক্তি প্রেমরূপে পরিণত হওয়া এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, সমাজের সাহিত্যে সমাজের লোকের মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করি হিন্দুসাহিত্যে দাম্পত্য-প্রণয়ের বর্ণনার কি কিছু অসদ্ভাব আছে? কে সাহস করিয়া বলিবে যে সংস্কৃত সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের কোন বর্ণনা নাই? ভাল; সংস্কৃতসাহিত্য ত দূরের কথা। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে কি প্রকাশ পায়? ইংরেজিওয়ালাদের লিখিত বাঙ্গালাসাহিত্য ছাড়িয়া দিন; যে বাঙ্গালাসাহিত্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গন্ধ মাত্র নাই সেই সাহিত্য দেখুন। কে বলিবে যে, বেহুলা ও ফুল্লরার চরিত্রে প্রেম নাই।

"দাম্পত্যপ্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে।" ইহা অতি অসার কথা। স্বীকার করিতে পারি যে নব্যদলে দাম্পত্যপ্রণয়ের ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু "কেবল নব্যদলে" এ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য।' লেখকের নিজের কথারই পরস্পর সঙ্গতি নাই। "কেবল নব্য দলে" বলিয়া আবার বলিতেছেন—"আমরা এমন বলিতেছি না যে,

পূর্ব্বতন হিন্দুললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল না।" তাঁহার মতে নব্যদলে যে দাম্পত্যপ্রণয়ের ভাব আছে, তাহাও "কিঞ্চিৎ।" সুতরাং তাঁহার কথানুসারে ইহাই হইতেছে যে, পূর্ব্বতন রমণীকুলের হৃদয়ে যে প্রেম ছিল তাহা কিঞ্চিৎ হইতেও কিঞ্চিৎ; অর্থাৎ প্রায় কিছুই নহে।

সহমরণের প্রকৃত কারণ কি, নিরূপণ করিয়া, লেখক তৎপরে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মহত্যা মহা পাপ বলিয়া যাঁহারা সহমরণের বিরোধী, লেখক তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "আত্মহত্যা পাপ কিসে তাহা ঠিক বুঝা যায় না।" একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এ প্রকার কথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। পূর্ব্বেও আমরা দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এরূপ শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, আত্মহত্যা পাপ কেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে অধিক কথা বলিবার স্থান নাই। সংক্ষেপে একটি কথা বলিতেছি।

অপর মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য আছে। অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য নাই সংসারে এমন মনুষ্য নাই। পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র, প্রভৃতি সমুদায় পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য; প্রতিবেশীগণের প্রতি কর্ত্তব্য; বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি কর্ত্তব্য; সমগ্র জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য। এই প্রকার লোকব্যাপী কর্ত্তব্যজালে প্রত্যেক মনুষ্য পরিবেষ্টিত। নর কি নারী, যুবা কি বৃদ্ধ, পণ্ডিত কি বর্ব্বর, ধনী কি দরিদ্র, সধবা কি বিধবা কাহারও বলিবার যো নাই যে, তাঁহার অন্যের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই। এই কর্ত্তব্য পবিত্র পদার্থ। উহা কাহারও অবহেলা করিবার, লঙ্ঘন করিবার অধিকার নাই। কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন মহা পাপ। আত্মহত্যা দ্বারা সকল প্রকার কর্ত্তব্য-সাধন হইতে আপনাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হয়; সুতরাং আত্মহত্যা করিবার কাহারও অধিকার নাই, আত্মহত্যা মহা পাপ।

যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করেন তিনি মহা ভ্রান্ত। নর কি নারী প্রত্যেক মনুষ্য জনসমাজরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রের এক একটি অংশ মাত্র। প্রত্যেককে সেই অংশের কার্য্য করিতেই হইবে; না করিলে নিশ্চয় অপরাধ। জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুবিধবার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? যখন সে ব্যক্তি, জনসমাজের এক অংশ, তখন নিশ্চয়ই অন্য ব্যক্তির সহিত সেও কর্ত্তব্যের পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ। সুতরাং তাহার আত্ম-বিনাশের অধিকার নাই।

সকলেই বলিবেন যে, হত্যাকারীর দৃষ্টান্ত বড় মন্দ। তাহার দেখা দেখি অন্য লোকেও যদি হত্যা করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সমাজে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়। সেইরূপ বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-

বিনাশ করে, সে অপরাপর দুঃখীকে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আর ইহসংসারে দুঃখ কাহার নাই? বাস্তবিক অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন আত্মহত্যা হইতে আরম্ভ হয় তখন চারিদিক হইতে আত্মহত্যার সংবাদ আসিতে থাকে। সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যার সংবাদ পাঠ করিতে হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে দৃষ্টান্ত যে এ বিষয়ের একটি প্রধান কারণ তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই। যে বিধবা নারী সহমৃতা হইতেন, তাঁহারও তদবস্থাপন্ন অপর স্ত্রীলোকদিগকে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইত।

লেখক তৎপরে বলিয়াছেন যে, নিউটন, কেপ্লর, গালিলিও প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যখন "সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই তখন দুঃখিনী হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি?" নিউটন প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যে সংসারের বিশেষ ক্ষতি নাই,ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই ;—নিউটন না জন্মিলেও মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইত, গালিলিও না জন্মিলেও পৃথিবীর বার্ষিক গতি আবিষ্কৃত হইত, হর্বি ন জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত ইত্যাদি। তবে কিনা দশদিন অগ্র পশ্চাৎ। "সকলই সময়ে করে।" নিউটনের পূর্ব্বেও ইউরোপে বুদ্ধিমান্ তত্ত্বানুসন্ধায়ী লোক ছিল, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্ক্রিয়ার পক্ষে যে সকল সত্যের আবিষ্ক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যক, সে সকল তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, মাধ্যাকর্ষণও তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সময়ে ও সমাজের যে অবস্থায় নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ও সেই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইতই হইত। নিউটন যখন উক্ত নিয়ম আবিষ্কার করেন, ফ্রান্সে তখন আর এক ব্যক্তি উক্ত নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই জন্য লেখক বলেন যে নিউটনের ন্যায় লোকের মৃত্যুতেও সমাজের তাদৃশ ক্ষতি নাই।

এই কয়েকটি কথার উপর আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, বলিতেছি। মনে করুন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত করিবার পূর্ব্বেই নিউটনের মৃত্যু হইল। দেখুন, ইহাতে সমাজের কি ক্ষতি হইল। যদি নিউটনের সমতুল্য ব্যক্তি—আর একজন নিউটন,—তখন জগতে থাকেন তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু যদি তেমন লোক কেহ না থাকেন, (থাকিবেনই থাকিবেন এমন কোন নিয়ম নাই) অথবা আর যিনি আছেন তাঁহারও মৃত্যু ঘটিল ; তাহা হইলে কি হইবে? নিশ্চয়ই উক্ত নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব হইবে। কতদিন বিলম্ব হইবে? যতদিন না আর একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আর একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করিতে কত বিলম্ব হইবে? তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। বলিবার কোন উপায় নাই। দশ কি পঁচিশ, পঞ্চাশ কি একশত বৎসর তাহা কোন প্রকার

গণনায় স্থির হইতে পারে না। এই অনিশ্চিতকাল,* হয় ত অনিশ্চিত অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্ক্রিয়া - বন্ধ থাকিবে। কেবল তাহাই নহে। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্ক্রিয়ার উপর যে সকল সত্যের আবিষ্ক্রিয়া নির্ভর করে, সে সকলেরও আবিষ্ক্রিয়া এই অনিশ্চিত কালের জন্য বন্ধ রহিল;—বিজ্ঞানের উন্নতি, সুতরাং জনসমাজের উন্নতি বন্ধ রহিল। নাদের সা কর্ত্তৃক দিল্লীর হত্যাকাণ্ড, অন্ধকূপ হত্যা, কিম্বা বাখরগঞ্জের জলপ্লাবন কি ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুর্ঘটনা? নিউটনের মৃত্যুতে এই ভয়ানক ক্ষতি হইল। ইহাতেও কি বলিব যে, "সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই?"

এখনও আর একটি কথা বলিবার আছে। "যে সময়ে এবং সমাজের যে অবস্থায় তিনি (নিউটন) পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত"। "হইতই হইত" ইহা আমরা মানি না। আমরা বলি, হইত যদি নিউটনতুল্য কোন ব্যক্তি তখন জীবিত থাকিতেন, নতুবা নহে। নিউটন ভিন্ন নিউটনের কার্য্য কোন সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। এমন কি বহুসংখ্যক সামান্যবুদ্ধিব্যক্তি সমবেত হইলেও কেবল সময়ের গুণে প্রতিভাশালীর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। একথা মিল সুস্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন।*

"তাদৃশ ক্ষতি নাই" এ কথার অর্থই বুঝিতে পারি না। সংসারে এমন দুর্ঘটনা কিছুই নাই যাহার সম্বন্ধে একভাবে ঐ কথাটি বলা না যাইতে পারে। মনে করুন কলিকাতা নগর মহামারীতে বিনষ্ট হইয়া গেল। যাক্। "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" নিউটনের মৃত্যুর ক্ষতির ন্যায় এ ক্ষতি অপূরণীয় নহে। সময়ে আবার উহার তুল্য কত নগর সৃষ্টি হইবে। মনে করুন, সমগ্র বঙ্গভূমি সাগরগর্ভে মিশাইয়া গেল। যাক্। "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বঙ্গভূমি কতটুকু স্থান।

* সতীদাহ লেখক—বেকলের মত গ্রহণ করিয়াছেন। জন্ উক্ত মত গ্রহণ করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"I believe that if Newton had not lived, the world must have waited for the Newtonian philosophy until there had been another Newton, or his equivalent. No ordinary man, and no succession of ordinary men, could have achieved it. * * * * Philosophy and religion are abundantly amenable to general causes; yet few will doubt, that had there been no Socrates, no Plato, and no Aristotle, there would have been no philosophy for the next two thousand years nor, in all probability, then; and that if there had been no Christ, and no St. Paul, there would have been no Christianity.

Mill's Logic Vol. II

মনে করুন, ভারতবর্ষ একেবারে বিলুপ্ত হইল। "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" সমস্ত ভূমণ্ডলের তুলনায় ভারতবর্ষ কিছুই নয়। মনে করুন, সমগ্র পৃথিবী প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। মনে করুন, কোন অচিন্তনীয় কারণে সৌরজগৎ বিনষ্ট হইল। তাহাতেই বা কি? "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" প্রকাণ্ড বালুভূমির মধ্যে একটি বালুকণা যেমন, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই প্রকাণ্ড সৌরজগৎও সেইরূপ।

প্রদর্শিত হইল যে লেখকের যুক্তির মূল নাই আর যদি বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে, বিধবার মৃত্যুতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও এমন প্রমাণ হয় না যে তাহার মরিবার অধিকার আছে।

লেখক তৎপরে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে যুক্তিটি এই;—সংসারে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই জীবিত চেষ্টার বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং জীবিত চেষ্টার বৃদ্ধি হইলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে উন্নতিও তত অধিক হইতে থাকে। যে কোন প্রথা জনসংখ্যা হ্রাস করে, তাহাতেই অবশ্য উন্নতির ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সহমরণপ্রথা জনসমাজের পক্ষে অহিতকর।

লেখক উপরিউক্ত যুক্তিটির এই বলিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপের পক্ষে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের জীবিত চেষ্টা নাই। তাহারা অন্ন বস্ত্রের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে জীবিত চেষ্টা অসম্ভব। তবে সধবা স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া জীবিত চেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া দেয়; কিন্তু বিধবাদিগের সে কার্য্যকারিতাও নাই। সুতরাং বিধবার মৃত্যুতে সমাজের কোন অনিষ্ট নাই।

এই উত্তরটিতে ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবিত চেষ্টা নাই বটে, কিন্তু ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জীবিত চেষ্টা বিলক্ষণ রহিয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, তাহারা নানাপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করে। ভদ্রমহিলার অপেক্ষা ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক। আবার সতীদাহ-লেখক নিজেই বলিয়াছেন যে, "সর তামস্ ষ্ট্রেঞ্জ বলেন, আর্য্যাবর্ত্তে না হউক, অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা নীচজাতির মধ্যেই অধিক।" সুতরাং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে জীবিত চেষ্টার যে ক্ষতি হইত তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। ভদ্রজাতীয়া বিধবাদিগের দ্বারা যে জীবিত চেষ্টার কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, ইহাও আমরা মনে করি না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক গৌণরূপে বিলক্ষণ সাহায্য হয়। তাঁহারা অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও

না কাহারও অবশ্য গলগ্রহ হইয়া থাকেন; এবং যে ব্যক্তির গলগ্রহ হন, তাহার জীবিত চেষ্টা অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। লেখক বলেন, জীবিত চেষ্টার যুক্তি ভারতবর্ষে খাটিল না। আমরা বলি বিলক্ষণ খাটিল।

এখন একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইতেছে। সতীদাহের বিষয় বিচার করিতে হইলে, বোধ হয়, এই কথাটির মীমাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কথাটি এই;—সতীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বামীর চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিত, অথবা তাহাদের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইত। সতীদাহ লেখক বলেন, প্রায় সকল স্থলেই সতীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহমৃতা হইত। আমাদের বিশ্বাস সে প্রকার নহে। আমরা মনে করি যে, অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত;—এমন কি একপ্রকার সজ্ঞানে স্ত্রীহত্যা করা হইত।

যে সময় সতীদাহ প্রচলিত ছিল, সতীদাহ-লেখক সে সময়ের লোক নহেন। আমরাও সে সময়ের লোক নহি। সুতরাং আমরা কেহই সতীদাহ স্বচক্ষে দেখি নাই। প্রাচীনদিগের সহিত উক্ত বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে তাহারা সহমৃতা হইবে। কিন্তু সঙ্কল্পের পর আর ফিরিবার যো ছিল না। ফিরিলে পরিবারের দুরপণেয় কলঙ্ক। সুতরাং সঙ্কল্পের পর মতপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে, অথবা মতপরিবর্ত্তন হইলে বিলক্ষণরূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত। সতীদাহলেখক সহমরণের অনুষ্ঠানটি কবিত্বের চক্ষে দেখিয়াছেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত যেমন বর্ণনা করিয়াছেন যে, মেঘনাদপত্নী প্রমীলাসুন্দরী প্রাণপতির চিতারোহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বাধীনভাবে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সতীদাহ-লেখক হয় ত, কল্পনার চক্ষে দেখেন যে, যত হিন্দুরমণী সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রমীলার ন্যায় হাসিতে হাসিতে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি দান করিতেছেন।

যখন আমরা কেহ সতীদাহ স্বচক্ষে দেখি নাই, তখন সেই সময়ের লোকের সাক্ষ্যগ্রহণ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। লেখক, হেনরি জেফ্রিস্ বুস্বি নামক এক ইউরোপীয়ের কথায় বিশেষ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বিলাত আপিলে যেমন মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, সেইরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একজন ইউরোপীয়ের কথা পাইলে তাহাতে বিলাত আপিলের কাজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, ইহা লইয়া যখন ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল, তখন আদি-ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বিলাত হইতে মোক্ষমূলরের ব্যবস্থা আনাইয়া ভাবিলেন যে, লড়াই ফতে হইল।

দেখা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত হেন্‌রি জেফ্রিস্‌ বুস্বির গ্রন্থ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বুস্বি সাহেব কি স্বচক্ষে সতীদাহ দেখিয়াছিলেন, না, কেবল শোনা কথা লিখিয়াছেন? যদি কেবল শোনা কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা যত কেন সুন্দর হউক না, তাঁহার সাক্ষ্যের কিছুই মূল্য নাই।

বুস্বি সাহেব স্বচক্ষে দেখুন আর নাই দেখুন, এ বিষয়টি নিঃসংশয়ে মীমাংসা করিতে হইলে অন্য মাতব্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক। আমরা ক্রমে ক্রমে সে প্রকার তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিব।

প্রথম ব্যক্তির নাম জে পেগস্‌ সাহেব। আমরাও বিলাত আপিল করিতে বাধ্য হইলাম। ইনি সতীদাহ নিবারণের পূর্ব্বে, ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ দিবসে "The Suttee's cry to Britain" নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে বলপূর্ব্বক সতীদাহের অনেক অনেক হৃদয়ভেদী বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ যদি কোন প্রকারে উক্ত পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন, সকলই জানিতে পারিবেন। আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত উহা হইতে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যাহা হউক একটী স্থান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"In the burning of widows as practised at present in some parts of Hindostan however voluntary the widow may have been in her determination, force is employed in the act of immolation. After she has circumambuated and ascended the pile, several natives leap on it, and pressing her down on the wood, bind her with two or three ropes to the corpse of her husband, and instantly throw over the two bodies, thus bound to each other, several large bamboos, which being firmly fixed to the ground on both sides of the pile, prevent the possibility of her extricating herself when the flames reach her. Logs of wood are also thrown on the pile, which is then in flames in an instant."

পেগস্‌ সাহেব এস্থলে সতীদাহ সম্বন্ধে একটী বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন সতী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নদীর জলে আসিয়া পড়ে। তাহার আত্মীয়েরা পরিবারের ভয়ানক কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য পুনরায় বলপূর্ব্বক চিতার উপর ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করে। সতী আত্মরক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পুলিস আসিয়া তাহাকে সেই হত্যাকারী আত্মীয়গণের হস্ত হইতে উদ্ধার করে। পেগস্‌ সাহেব ইহার পর বলিতেছেন ;—

"The use of force by means of bamboos, is we believe, universal through Bengal; it is intended to prevent the possibility of the widow's escape from the flames, as such an act would be thought to reflect indelible disgrace on the family."

আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষী একজন ইউরোপীয় মহিলা। ইঁহার নাম ফ্যানি পার্কস্ (Fanny Parks) ইঁহার পুস্তকের নাম Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque, during four and twenty years in the east with Revelations of life in the Zenana. এই পুস্তকখানি ১৮৫৩ সালের কলিকাতা রিভিউয়ে সমালোচিত ও বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে সতী-দাহের অত্যাচার সম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনার কথা আছে। একটী ঘটনা এই যে, ১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর কানপুরনিবাসী এক ধনশালী বণিকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সতীদাহ দেখিবার জন্য কানপুরের গঙ্গাতীরে অতিশয় জনতা হইল। সতী উপযুক্তরূপ সজ্জিত হইয়া স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত করিল। সাহস ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া চিতার উপর বসিল। বসিয়া "রামনাম সত্য হ্যায়" "রামনাম সত্য হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে যখন হুতাশন আপনার সহস্রদশন বিস্তার করিয়া দংশন করিতে লাগিলেন, তখন আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদ্যত হইল। যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং খোলা তলবার হস্তে একজন সিপাহিকে চিতার নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। সতী যখন চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, নিকটস্থ সিপাহি তখন আপনার প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া, চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ব্বার চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সিপাহির প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে সেস্থান হইতে তফাৎ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সতী আবার অল্পক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। মৃত-ব্যক্তির ভ্রাতারা, আত্মীয় স্বজন, ও অপরাপর সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বলপূর্ব্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা হউক। সেইরূপই অবশ্য করা হইত। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার চিতায় আসিতে সম্মত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাল্কি করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ফ্যানি পার্কস্ কলিকাতার সন্নিহিত স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের তৃতীয় সাক্ষীর পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। পৃথিবীর সকল

খণ্ডেই ইনি পরিচিত; এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম সংসারে পরিচিত থাকিবে। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতেছি। রাজা রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। উহা নিবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তক এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"নিবর্ত্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য। ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান, সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বচনেতে এবং বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প-বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীতমতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়।"

"অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্তু বালককাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে, এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে, এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"

উপরি উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রথা প্রচলিত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কুসংস্কারের ভীষণ মন্দিরে কেবল বলিদান দেওয়া হইত। আবশ্যক বোধ হইলে আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারিতাম। কিন্তু ইউরোপীয় ও দেশীয়ের প্রকাশিত পুস্তক হইতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, উহাই যথেষ্ট। পুনর্ব্বার বলি সতীদাহ প্রচলিত থাকাতে যে, একপ্রকার সজ্ঞানে নারীহত্যা হইত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মনে কর তুমি আমাকে বলিলে যে, "আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মার।" আমি তোমার কথানুসারে তোমাকে চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলাম। তোমার শরীর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। তখন কষ্ট অসহ্য হওয়াতে তুমি আমাকে বলিলে "না, আমি মরিব না, আমাকে ছাড়িয়া দেও।" আমি যদি তখনও তোমাকে ছাড়িয়া না দি, তোমার উপর কাষ্ঠ চাপাই, ও বাঁশ দিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরি, তাহা হইলে কি তোমাকে হত্যা করা হইবে না? সহমরণে অধিকাংশ

স্থলে এই প্রকার হত্যা হইত। সতীর আর্ত্তনাদ যাহাতে শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য অনেক স্থলে ঢাকিদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হইত "কসিয়া ঢাক বাজাও।"

আমাদের সতীদাহ-লেখক মহাত্মা বেণ্টিঙ্ককে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত করিতে চাহেন। করুন; তাহাতে তাঁহার কুরুচি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই ক্ষতি হইবে না।

সতীদাহ-লেখক হর্বর্ট স্পেন্সরের সমস্বাতন্ত্র্যবাদের দোহাই দিয়া সতীদিগের সহমৃতা হইবার অধিকার সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরাও ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতী। কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল আছে। চোর, দস্যু প্রভৃতি যাহারা জনসমাজের নিকট অপরাধী, তাহাদের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে জনসমাজের অধিকার আছে। যাহারা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া বিচারশক্তি হারাইয়াছে, আত্মীয়স্বজন ও জনসমাজের এ অধিকার আছে যে, তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখেন। সেই প্রকার যে ব্যক্তি শোক দুঃখে মুহ্যমান হইয়া স্বাভাবিক বিবেচনাশক্তিবিরহিত হইয়াছে, তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার নিশ্চয়ই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সমাজের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। হিন্দুরমণীর ইহসংসারের সর্ব্বস্বধন স্বামী। যে মুহূর্ত্তে সেই স্বামীরত্ন সে জন্মের মত হারাইল তখন কি তাহার বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে? যখন গৃহ তাহার নিকট শ্মশান; সংসার, মরুভূমি; দিবালোক, অন্ধকার; জীবন বিড়ম্বনা মাত্র তখন কি তাহার বিবেচনাশক্তি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? কখনই না; এবং সেই অবস্থায় কি তাহার কোন গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, না, তাহাকে কোন গুরুতর কার্য্য করিতে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? এ প্রকার চিত্তবিকলতার সময় গুরুতর কার্য্যানুষ্ঠানের স্বাধীনতা থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকাও বিধেয় নহে।

হিন্দু বিধবার নিজের দুঃখ, তাহার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনের দুঃখ বর্ণনা করিয়া, লেখক বলিয়াছেন যে, "বিধবার মরাই ভাল।" বর্ণনা যথার্থই হৃদয়ভেদী হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না; পাষাণ বিগলিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং আবার বলিতেছি যে যতই কেন দুঃখ হউক না, দুঃখের জন্য কাহারও আত্মবিনাশের অধিকার নাই। এস্থলে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, দুঃখের জন্য আত্মহত্যার অধিকার থাকিলে তাহার সীমা কোথায় থাকিবে? দুঃখের জন্য মরিবার অধিকার থাকিলে যাহার দুঃখ অসহ্য বোধ হইবে, সেই মরিতে পারিবে। আমি পারিব, তুমি পারিবে, রাম পারিবে, শ্যাম পারিবে, হরি পারিবে, যদু পারিবে, কে পারিবে না? সকলেই পারিবে। এ সংসার ত দুঃখের সংসার। দারিদ্র্য, রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি বিবিধ দুঃখে সংসার পরিপূর্ণ।

যদি বিধবাকে মরিতে অধিকার দেও, অন্য সকলকেও দিতে হইবে। ভাল; যেন তাহা দিলে, কিন্তু ঐ নিয়মটি কি বেন্থামের হিতবাদ দর্শনসঙ্গত হইল। যে কার্য্য ও নিয়মের গতি (tendency) সংসারের বিনাশের দিকে তাহা কি কখন হিতবাদদর্শন-সঙ্গত হইতে পারে? সহস্র দুঃখযন্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়া জগতের হিতের জন্য জীবনধারণ করাই নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত। কষ্টের জন্য আত্মবিনাশ ত স্বার্থপরের কাজ।

সতীদাহ-লেখক বলেন যে, সহমরণ সতীত্বের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত; এবং সে দৃষ্টান্তে জনসমাজের প্রভূত উপকার। আমরা বলি যে, শোকাবেগসম্বরণে অক্ষম হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শরীর ভস্মসাৎ করা অপেক্ষা, কি দীর্ঘজীবনের পরোপকার, ইন্দ্রিয় দমন, সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠতর নহে? একদিনের আত্ম-বিসর্জ্জন অপেক্ষা দৈনিক আত্মবিসর্জ্জন ("Martyrdom of daily life") কি অনন্ত গুণে অধিকতর প্রশংসনীয় নহে? যে কার্য্য হৃদয়ে ক্ষণিক আবেগের ফল, তাহার সহিত কি জীবনের স্থায়ী মহত্ত্বের তুলনা হইতে পারে? আমাদিগের বিবেচনায় সহমরণ অপেক্ষা চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া জীবনধারণ করা অনেক গুণে উচ্চতর দৃষ্টান্ত।

আর একটি কথা। অনেক ধর্ম্মপ্রচারকের চরিত্রগত দোষ দেখিয়া যেমন অনেকে ধর্ম্মের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়া যান, সেইরূপ যে সময় সহমরণ প্রচালিত ছিল, তখন মধ্যে মধ্যে অসতীকে "সতী" হইতে দেখিয়া অনেকের সতীদাহের প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পাইত। প্রাচীনদিগের মুখে শুনা যায় যে, স্বামীর জীবদ্দশায় যে হয় ত ব্যভিচার করিত,—স্বামীর প্রতি যারপরনাই অসদ্ব্যবহার করিত,—স্বামী মরিলে সেই আবার সহমরণে গেল। এই প্রকার ঘটনা মধ্যে মধ্যে দেখিয়া, লোকে আর সহমৃতা হইলেই বাস্তবিক সতী;—যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—এরূপ বড় মনে করিত না।

হিন্দু বিধবার যন্ত্রণা অতি ভয়ানক। ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমাদের স্মার্ত্তবাগীশ ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের হৃদয়ে কি হয় জানি না। কিন্তু এখন উপায় কি? পুনঃপরিণীতা হইয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনপাত করা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। যাহাতে বিধবার পুনরুদ্বাহ প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলে প্রাণপণে যত্নশীল হউন। এখন "সতীদাহ" "সতীদাহ" করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক আকাশ ফাটাইলে কোন ফল নাই। আর কেন? পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ প্রথা চিরকালের মত রহিত হইয়াছে।

এই অসভ্যোচিত প্রথা রহিত করার জন্য কি গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া উচিত? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সতীদাহ

ব্যাপারে অধিকাংশ স্থলে এক প্রকার সজ্ঞানে নারীহত্যা হইত। সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট তাহা দেখিয়া শুনিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? লেখক যাহাই কেন বলুন না, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে ইহা কোন কাজেরই কথা নহে। সহমৃতা হইতেই হইবে শাস্ত্রের এ প্রকার আদেশ নহে। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য, কি বিবাহ, বিধবা এই তিনটির কোনটী অবলম্বন করিতে পারেন। গুরুতর কারণ বশতঃ রাজবিধি দ্বারা এই তিনটির মধ্যে দুইটির বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আর ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার কি?

"তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত,—এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না।" কেন "ধ্বংসপুরের শত সহস্র দ্বার" ত রহিয়াছে? তাহা সত্ত্বেও প্রাণধারণ করে কেন? লেখক বলেন সতীরা ভালবাসার জন্য মরিত না। কেন না "ধ্বংসপুরের শত সহস্র দ্বার রহিয়াছে", তবু তাহারা বাঁচিয়া থাকে কেন? উক্ত যুক্তিতে যদি কোন বল থাকে, তবে আমরাও বলিতে পারি, বিধবার মরিতে ইচ্ছা করে না, নতুবা "ধ্বংসপুরের শত সহস্র দ্বার" রহিয়াছে, তথাচ জীবন ধারণ করিতেছে কেন?

আমাদের সমালোচনা শেষ হইল। আমরা দেখিলাম যে, সতীদাহ-লেখক সহমরণের বিরুদ্ধে একটি যুক্তির খণ্ডন করিতে পারেন নাই, এবং উহার পক্ষে একটি অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমরা বিশুদ্ধবিচারমার্গ-অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছি যে, সতীদাহ যথার্থই ভয়ানক কুপ্রথা। ইহাও প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, সতীদাহ প্রচলিত থাকাতে অধিকাংশ স্থলে একপ্রকার সজ্ঞানে স্ত্রীহত্যা হইত। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু নিতান্ত পুঁথি বাড়িয়া যায় বলিয়া এইস্থলেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

শ্রীন, না

আমরা বেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে পুরাকালে আর্য্যগণের আচার ব্যবহার কিঞ্চিত বর্ণন করিয়া তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনীধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেজন্য অদ্য তাহা বিশেষরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। একটি প্রবন্ধেই এই গুরুতর বিষয় শেষ না করিয়া এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা আছে।

আর্য্য শব্দ যে জাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে "আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।" এই অমরসিংহোক্ত বাক্যে যে 'আর্য্যাবর্ত্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'আর্য্যদিগের আবাসভূমি' কিন্তু এতদ্দ্বারা আর্য্যজাতি বুঝায় না। সাধারণতঃ আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর কৃষ্ণ সাংখ্য সপ্ততির শেষে লিখিয়াছেন "আর্য্যমতিভিঃ।" আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ব্যক্তি কর্ত্তৃক—

আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি "আরাৎ জাতঃ" "আরাদাগতঃ" এই বাক্যে 'আরাৎ' শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় এবং পৃষোদরাংসিদ্ধ। ইহার অর্থ নিকট হইতে বা দূর হইতে যে জন্মিয়াছে বা আসিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে আর্য্যগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তথা হইতে তাহাদিগের আগমন বার্ত্তা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে এই মাত্র লিখিত আছে যে বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা কুরুদেশে ছিল। সেই কুরু বা উত্তর কুরু যে কোথায় ছিল, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতীয় বন পর্ব্বে লিখিত আছে, যখন পাণ্ডু রাজা পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন যে "আমাদিগের পূর্ব্বভূমি উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে।" ইহাতে ভারতবর্ষের অন্তবর্ত্তী বোধ হইতেছে না। বোধ হয় মধ্য এসিয়ার কোন স্থান কুরুদেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে।

মহাভারতে ইহাও লিখিত আছে এবং কোষকারেরাও কহেন যে বালুকাময় একটি প্রদেশের নাম ইরিণ, যথা—"ইরিণে নির্জ্জলে দেশে" 'বন পর্ব্ব' তদ্ভিন্ন 'ঈরামা' নামক এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত 'ইরিণ' দেশই ঈরাণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালুকাময় জলশূন্য 'ইরিণ' বা ঈরাণ হইতেই আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন।

রাজতরঙ্গিনীলেখক কহ্লণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের পর সর্ব্বাগ্রে কাশ্মীর দেশ প্রকাশ পাইয়াছিল "নির্ম্মমে তৎ সরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলং।" ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে কাশ্মীর দেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল তবে কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই হিন্দুদিগের আদি ভূমি, তথা হইতে দিগ্‌দিগন্তে বাস হইয়াছে। কিন্তু এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না কহ্লণ মিশ্র পৌরাণিক জল-প্লাবনের বিষয় বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের ছায়ামাত্র নাই।

আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কৃষির উন্নতিমানসে মধ্য এসিয়ার সৈকত ভূমি পরিত্যাগ করেন। পুত্র কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে ভারত-বর্ষের উর্ব্বরা ভূমিতে পদার্পণ করেন তাঁহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ দর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া গম্ভীর স্বরে সোম, আদিত্য, উষা, পূষা, অগ্নি প্রভৃতির স্তুতিগান করিয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছিলেন। সে সময় আর্য্যগণ দেবতাপ্রিয় ও দস্যুগণের শাস্তিদাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সোমরস-পায়ী আম-মাংসভোজী আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের বেদধ্বনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া উঠিল এবং ক্রমে সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভারতবর্ষ রজতনিন্দিত শুভ্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রথিত হয়।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই অগ্নি-উপাসক ছিলেন এবং এখানে আসিয়াও তাঁহাদিগের ভ্রাতা "আতস্ পরস্ত" (পার্সী) গণের ন্যায় অগ্নি উপাসনা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, এজন্যই বেদে তাঁহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা করিয়াছেন —"অগ্নি পূর্ব্বেভির্ঋষিভি রো ঝো নূতনৈরুত" "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং" "নাভিরগ্নিপৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি।

আর্য্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শাস্ত্র নির্ম্মাণের ভাষা সংস্কৃত, তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা ব্যবহার ও গৃহ কর্ম্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল ইহা অনুমান হয়। "নাপভ্রংশিত বৈ ন ম্লেচ্ছিত বৈ"—"যজ্ঞযজ্ঞীয়ং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে; ইহার অর্থ যজ্ঞকার্য্যে অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার

করিবে না। যদি অবজ্ঞায় অর্থাৎ অপভাষা (চলিত ভাষা) দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অযজ্ঞীয় বাক্যব্যয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বৈদিককালে আর্য্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে সুরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্য পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠকবর্গ শুনিয়া এককালে হতবুদ্ধি হইবেন যে, কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস পর্য্যন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল শুক্লযজুর্বেদে মাধ্যনিন্দিনী শাখায় বর্ণিত আছে। এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো, অজা ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুণ্ড গৃহীত হইত। পুরুষ শির সম্বন্ধে যথা—

"আদিত্যঙ্গর্ভম্পয় মসমঙধি সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্ পরিবৃঙধি হরসামাভিম৺স্থাঃ শতায়ুষঙ্কুণুহিচীয়মানঃ।"

("পূর্ব্ব মন্ত্রে* গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উখার মধ্যে উপধান করিবে।")

চয়ন কার্য্যে ব্যবহ্রীয়মান হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী, সহস্রপোষী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর; তোমার শিরগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর।†

পুনশ্চ "এই যজ্ঞে চীয়মান, সহস্রাক্ষ হে অগ্নে! তুমি দ্বিপদ পশুর এই মুণ্ড নষ্ট করিও না।"—

এতাদৃশ ভয়াবহ যজ্ঞ বৈদিককালেই লোপ হইয়াছিল। মধ্যকালে টীকাকারগণ কৃত্রিম নির্ম্মিত পুরুষ মুণ্ড যজ্ঞে স্থাপন করিতে বিধি দিয়াছেন।

পূর্ব্বে আর্য্যগণের পশু ও শস্য প্রধান ধনমধ্যে পরিগণিত হইত। "পশুকামঃ পুত্রকামো ভার্য্যাকামঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যগত বিধিদৃষ্টে বোধ হয়, পশু, পুত্র, ভার্য্যা আর্য্যদিগের প্রধান ধন ছিল। এই জন্য তাঁহারা এ সকল লাভের নিমিত্ত কামনা পূর্ব্বক "পশ্বেষ্টি" "পুত্রেষ্টি" প্রভৃতি যাগ করিতেন। "বৃষ্টিকামঃ কারারীর্য্যা যজেৎ" এই বিধিদৃষ্টে বোধ হয় কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারা কারারী নামক যাগ করিতেন। তৎকালে প্রধান শস্য যব, ব্রীহি, গোধূম, তিল, মাষকলায়। এ সকল কৃষ্ণপচ্য শস্য, ইহা ভিন্ন অকৃষ্ণপচ্য শস্যও ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নবনীত, এ সকল বেদ বাক্যে উল্লেখ আছে, যথা—

"সাবৈশ্ব দেব্যামীক্ষাঃ" "দধিক্রাব্নোহকার্ষং" "ঘৃতবতী ভুবনানি চিত্বা।" ইহা ভিন্ন বৈদিক সময়ের আর্য্যগণ নানাবিধ গ্রাম্য ফল ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ফল

---

* ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

† যজুর্ব্বেদ সংহিতা। মাধ্যন্দিনীশাখা ৪১ কণ্ডিকা। ১৩ অধ্যায়। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

মূল ভিন্ন গো, অশ্ব, অজা, মেষ, মৃগ প্রভৃতি পশুর মাংস খাইতেন। বিশেষতঃ গোমাংস অতি পবিত্র মাংস বলিয়া গৃহীত হইত। গোভিল "তৈষ্টা উর্দ্ধং অষ্টম্যাং গৌঃ" এই সূত্রে গোমাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে বৈদিককালে গোমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করা হইত এবং ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধান্তে তাহাই আহার করিতেন। মহাভারতেও গোমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করা ও তদ্ভক্ষণের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভট্ট ভবভূতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে এই রূপ লিখিয়াছেন। যথা—

"সৌধাতকি। হুং বসিট্টো।

ভাণ্ডায়ন। অথ কিম্।

সৌধা। ম এ উণ জাণিদং, বগ্‌ঘো বা বিও বা এসো ত্তি।

ভাণ্ডা। আঃ কিমুক্তং ভবতি ?

সৌধা। তেণ পরাবড়িদেণ জ্জেব সা বরাইআ কল্লাণিআ মড়মড়াইদা।

ভাণ্ডা। সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়া আভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষম্বা মহাজম্বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি।"

(অর্থ)

"সৌধা। আঁ বশিষ্ঠ ?

ভাণ্ডা। হাঁ।

সৌধা। তাই হোক বাবা! আমি মনে করেছিলুম বুঝি একটা বাঘ বা বৃক এসেছে।

ভাণ্ডা। আঃ! কি পাগলের মত বকিস্।

সৌধা। কেন ভাই! ঐ দেখলে না ঐ ব্যাটা আস্‌বামাত্রই ঐ ব্যাচারই গাভিটার ঘাড় মটকান হলো।

ভাণ্ডা। 'সমাংসমধুপর্ক করিবে' গৃহস্থেরা এই বেদবাক্যটি বহুজ্ঞান করিয়া শ্রোত্রিয় অতিথিকে মহাবৃষ কিম্বা মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।" *

বৈদ্যশাস্ত্রেও গোমাংস ভক্ষণের বিধি আছে। যথা—

"তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাদ্‌ঘৃতব্যাপত্তিনাশিনী
তৈলব্যাপদিশস্তভূতক্রপিণ্যাক সাধিতা।
গব্যমাংস রসে সাম্লা বিষমজ্বরনাশিনী॥

(চরকসংহিতা।)

---

* উত্তররামচরিত নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনায় পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৎস্য, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, বহু শৃঙ্গমৃগ, বরাহ, শশক, মাংস দ্বারা যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন, যথা—

"মাৎস্য হারিণ রৌরভ্র শাকুনি চ্ছাগ পার্ষতৈঃ।
ঐণ রৌরব বারাহ শশৈ র্মাংসৈর্যথাক্রমম্॥

রামায়ণে লিখিত আছে "পঞ্চপাঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ" (কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড) এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও হিন্দুদিগের খাদ্য ছিল। মহাভারতের মতে সকল প্রকার আরণ্যপশু ভক্ষ্য, যথা—

আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতা সর্ব্বশোমৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরারাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে।

আর্য্যগণ, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করিতেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পিতৃলোককে যিনি মাংস দিয়া তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন যথা—

"নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেক বিংশতিম্॥"

(মনুসংহিতা।)

পূর্ব্বে কেহ স্ত্রী পশু যজ্ঞে বধ করিত না বা খাইত না, যথা—

"অবধ্যাঞ্চস্ত্রিয়ংপ্রাহুঃ তির্য্যগ্‌যোনি গতেষপি" (হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ)

মনু বলেন "দেবান্ পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং নদূষ্যতি।" দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনার অবসানে তৎপ্রসাদ স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। এতাবতা ইহা বুঝিতে হইবে যে, মনুর সময়ে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন বৃথামাংস ভক্ষণ দোষাবহ হইয়া উঠিয়াছিল। মনুসংহিতায় বেদবিহিত পশুহিংসা, অহিংসা বলিয়া উক্ত হইয়াছে যথা—

"যা বেদ বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহিনির্ব্বভৌ॥"

মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই "মাহিংসেৎসর্ব্বভূতানি" শ্রুতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্মৃতি, সর্ব্বত্র মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণিত হইল, কেবল যাগ যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় মাংস প্রদানের নিয়ম থাকিল।

বৈদিককালে আর্য্যগণ একখণ্ড বস্ত্র পরিধান ও একখণ্ড উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন যথা "বস্ত্রান্যায়ুরূর্জ পতে" (ঋগ্বেদ) সে সময় স্ত্রীলোকেরা সূত্রবদ্ধ অর্থাৎ 'ঘাগরা' পরিত।

"গোর্বাধিত্বচি" এই ঋগ্বেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে জল বা রসাদি তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কাষ্ঠ বা বৃষচর্ম্মে নির্ম্মিত হইত। সে সময় সকলে

চন্দন দ্রব, মৃগনাভি, কুঙ্কুম সেবা এবং তদ্দ্বারা শরীরে অলকা তিলকা রচনা করিত। ব্রাহ্মণেরা উষ্ণীষের কার্য্যকারী শিখা (বেড়ী) রাখিতেন। সর্ব্বদা উষ্ণীষ বাঁধিতেন না। ক্ষত্রিয়েরা 'জুল্পি' (কাকপক্ষ) রাখিত এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাখিতেন। স্মৃতিধৃত বচনে তাহার প্রশংসা দৃষ্ট হয় যথা—"কেশ শ্মশ্রু ধারয়তাং অগ্র্যা ভবতিসন্ততিঃ" অনুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা (চর্ম্মনির্ম্মিত) পূর্ব্বে ব্যবহার হইত যথা—"সোপানৎকঃ সদাব্রজেৎ" (মনুঃ) ঋগ্বেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া হয় যথা—"রথঃ স্বশ্বো অজরো যে অস্তি" "যো বামশ্বিন। মনসো জবীয়াগ্রথঃ স্বশ্বো বিশ আজি গতি।" "নকিঃ স্বশ্ব" "মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তঃ" স্বশ্বো যো অভীমন্যমানঃ" "রশ্মিং দেব যজসে স্বশ্বঃ" "স্বশ্বাসঃ" "স্বশ্বো অগ্নে" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বৈদিক-কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা—"দেবা যো বীণাং পদমন্তরীক্ষেণ পততাং বেদনাবঃ সমুদ্রিয়ঃ" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ যে বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র প্রচরমান নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি। পূর্ব্বে রাজাগণ সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদমধ্যে আছে। নিষ্ক নামক একপ্রকার সুবর্ণ মুদ্রার বিষয় ঋগ্বেদ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। বীরবেশধারী রুদ্র তীর, ধনুঃ ও সমুজ্জ্বল নিষ্কের মালা পরিধান করতঃ সুসজ্জিত হইয়া আছেন কল্পনা করিয়া ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন। যথা—

"অর্হন্বিভর্ষি সায়কানি ধন্বর্হিন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপং।
"অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বভভ্যং ন বা ওজীয়োরুদ্রত্বদস্তি"

(ঋগ্বেদ।)

এই সূক্ত পাঠে অনুমান হয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়গণ, যেরূপ স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড মোহরের মালা গাঁথিয়া গলদেশে পরিধান করে সেইমত বৈদিককালের আর্য্যগণ নিষ্কের মালিয়া গ্রন্থন করিয়া পরিধান করিতেন। পাণিনিসূত্রে নিষ্ক ও দীনার নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। মনু শতমান নামক রজতমুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান সুবর্ণনির্ম্মিতও হইত যথা—"হিরণ্যম, সুবর্ণম্ শতমানং" (শতপথ ব্রাহ্মণ।) সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা ভিন্ন পূর্ব্বে তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। তাহার নাম কার্ষাপণ। অতি পূর্ব্বকালে কাচের গ্লাস জল রাখিবার জন্য ব্যবহার হইত। এক্ষণে কাচের গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীন-সম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। সুশ্রুত মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা—

"সৌবর্ণে রাজতে কাচে কাংস্যে মনিময়ে তথা।
পুষ্পায়তংসং ভৌমে বা সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ॥"

মহাভারতে "অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়া আসন্" ইত্যাদি পাঠে বোধ হয়, পূর্ব্বে বিবাহের নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে অবস্থান করিত। বিবাহের নিয়ম শ্বেতকেতু নামা ঋষিপুত্র হইতে সৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় "জায়েব পত্যু রুষতী সুবাসা" জায়া অর্থাৎ পত্নীরা স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ বেশভূষান্বিতা হইত, এবং পতির অনুগত হইয়া কার্য্যাচরণ করিত। এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়া আছে, বৈদিককালে সেরূপ থাকিত না কিন্তু এক্ষণে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় "রিফারমার" মহোদয়গণ কুমারী রাজলক্ষ্মী দে বা বসন্ত কুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবিগণের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেমত স্বাধীনতা পূর্ব্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই। সে সময় তাহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্তু একাকিনী বা অন্য কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত না। রাজার স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকার্য্য, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত যজ্ঞকার্য্য, এবং বৈশ্যের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিত। মনুও স্ত্রীগণকে পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে "স্ত্রিয়ঃ কিম পরাধ্যন্তে গৃহপিঞ্জরকোকিলাঃ।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আসিতে পারিতেন না।

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন ধারণ করা পূর্ব্বকালের রীতি, আধুনিক নহে. যথা—

শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাচ্ছিরঃ প্রচ্ছাদনক্রিয়া" (গার্গ্য সংহিতা।)

"পুরুষসূক্তে" চারিবর্ণের উল্লেখ আছে।' ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ, এই চতুর্ব্বর্ণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয় বিষয় নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, দশ দিনের দিন নামকরণ হইত। শর্ম্মা, বর্ম্মা ঐশ্বর্য্য ঘটিত আর সেবা ঘটিত উপাধি যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞান মঙ্গলাদি, বল বিক্রমাদি ধনাদি ও নিন্দনীয় কার্য্যকারণ বোধক নাম রাখা হইত। সে নাম শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় তাহা জানা যাইত। যথা—শুভ শর্ম্মা, বল শর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস, ইত্যাদি। চারিবর্ণের আচার, বেশভূষা, খাদ্যনিয়ম, পৃথক পৃথক ব্যবস্থার অধীন ছিল।

ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিল। তৎপরে দুইবার মাত্র আহার করিবার বিধি হয়—

"মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাম্।" (কাত্যায়ন।)

এক্ষণে আর্য্যগণের প্রাত্যহিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। প্রত্যূষ-কালে শৌচ প্রস্রাবাদি সমাধা করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবেক। যথা—

"উষা কালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্হতঃ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। (দক্ষ।)

প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, যথা—"প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং" স্নানের পর পবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক। যথা—"স্নানাদনন্তরং তাবদুপস্পর্শন মুচ্যতে" (দক্ষ) তৎপরে সন্ধ্যা উপাসনা তাহার পর হোম করিবে যথা—"সন্ধ্যা কর্ম্মাবসানেতু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে" (দক্ষ) ইহার পর দেবপূজা করিয়া পুনশ্চ মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবেক, যথা—"দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা গুরুং মঙ্গলবীক্ষণম্" প্রাতঃকালে কার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়নাদি করিবেক, যথা—"দ্বিতীয়ে চৈব ভাগেতু বেদা-ভ্যাসো বিধীয়তে।" শিক্ষা করা ও দেওয়া যা কিছু লেখা পড়ার কার্য্য তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে করা হইত। তৎপরে তৃতীয় ভাগে পোষ্ট্র্বর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত কার্য্য করিবেক যথা—

"তৃতীয়ে চৈব ভাগেতু পোষ্ট্র্বর্গার্থ সাধনম্" পুনর্ব্বার চতুর্থভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে স্নানাদি করিবেক। যথা "চতুর্থেতু তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ" পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ ২॥ প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে অন্নাদি খাদ্য দেওয়া হইত, যথা—

"পঞ্চমেচ তথা ভাগে সম্বিভাগো যথার্হতঃ।"

সকলকে আহার দিয়া গৃহস্থ শেষে ভোজন করিবেক। যথা—

"গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ" (দক্ষ।)

ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। যথা "ইতিহাস পুরাণাদৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং চরেৎ।" তাহার পর সূর্য্যাস্তকালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে যাইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপাসনা করার বিধি আছে। তৎপরে ১॥ প্রহর রাত্রের মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে হইত যথা—

"নিত্যমর্হনিচ তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহর যামান্তর।" (কাত্যায়ন।)

শ্রাদ্ধ করা মনুর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে পূর্ব্বে ছিল না যথা "অথৈতন্মনুঃ শ্রাদ্ধশব্দং কর্ম্ম প্রোবাচ" (আপস্তম্বঋষি) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ এবং এই কার্য্য মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেন—

"সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাত্যঞ্চ পয়োদধি ঘৃতান্বিতং।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্যঞ্জনাদিযুক্ত সংস্কৃত অন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় বলিয়া এই কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না। যথা "বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত" (শ্রুতি) অর্থাৎ মৌন হইয়া ভোজন করিবেক।

তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল যথা—

"সর্ব্বদেশেষনাচারঃ পথি তাম্বুল ভক্ষণম্।" (মনুঃ।)

এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট কিন্তু পূর্ব্বে ভোজনাবশিষ্টকেই উচ্ছিষ্ট বলিত। অনাস্বাদিত অন্ন, স্পর্শ হইলেই যে হস্ত ধৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে আর্য্যমাত্রেরই এই সকল সদাচার অনুষ্ঠান করিবার বিধি ছিল—

"দয়া ক্ষমানসূয়াচ শৌচ মায়াসবর্জ্জনং।
অকার্পণ্যমস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানিচ॥" (বৃহস্পতি।)

"ক্ষমা সত্যং দয়াশৌচঃ দানমিন্দ্রিয় সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং তথা॥" (বিষ্ণু।)

ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়বিধ শৌচ, দান, জিতেন্দ্রিয়তা, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্ষ্যা না করা, সারল্য, আয়াসবর্জ্জন, অকার্পণ্য, বীতস্পৃহতা, এই সকল ধর্ম্মের দ্বারা স্বরূপ, এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা আচরণ করিতে পারে।

অদ্য আর্য্যগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র সমালোচিত হইল। ইহার পর এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীরামদাস সেন

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণ শরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সম্বরণ করিলে পর, ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলেমানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্ম্মভেদী দুঃখে মাধবীনাথের হৃদয় ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—যে, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?" ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ, তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এখনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে!

মা। সারিবে মা—কি হইয়াছে? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শ্বাশুড়ী নাই—কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব—তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে? দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাহার কোন সম্বাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সম্বাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সম্বাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সম্বাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সম্বাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সম্বাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা, একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ

বলিলেন যে, যদি আমি তাঁহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটী পোষ্ট আপিস ছিল—মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপর কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটী নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনের টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে আমি পোষ্টমাষ্টার বাবুর অর্দ্ধেক দরের লোক—আট আনার যোল আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে আমি একটা ডিপুটি—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ—উহাতে আমাতে জমীন আশমান ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরিবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন—সেও আট আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আধীআনার ওজনে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্য-বদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয় এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল, কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয় তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ?"

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন "হাঁ—তু—তুমি—আপনি—"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম !"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন "বসুন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন;—পোষ্ট বাবু ত বলিলেন "বসুন" কিন্তু তিনি বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে

বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্টার বাবুর আট আনা, হরিদাস পিয়াদা—একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া, মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন।

"কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামাক সাজো দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখন তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাইলে কোন না চারি গণ্ডা বক্‌শিষ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকার উল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে?"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন হনুমান হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটী কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন—"কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে আপনি চিনেন?

পোষ্ট। চিনি না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন বাঙ্গাল নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছেই আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন; "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব—এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোষ্ট বাবু, হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিলেন, "কি কন্?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পোষ্ট। আসে।

মা। কত দিন অন্তর ?

পোষ্ট। যে কথাটী বলিয়া দিলাম তাহার টাকা এখনও পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন ; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—"বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখছি—আমায় চেন কি ?"

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোষ্ট আপিষের খবর যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?"

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ?

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। বলিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, কি মিছা বল, তবে, তোমার ঘরে আগুন দিব ; তোমার ডাকঘর লুঠ করিব ; আদালতে প্রমাণ করাইব যে তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন এখন বলিবে ?"

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিল—বলিল—"আপনি রাগ করেন কেন ? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না—বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।"

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে ?

পোষ্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিষ্টরি করা।

মা। কোন্ আপিষ হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে ?

পোষ্ট। মনে নাই।

মাধবী। তোমার আপিষে একখানা করিয়া রসীদ থাকে না ?

পোষ্ট মাষ্টার রসীদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, "প্রসাদপুর।"

"প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিষ্টি দেখ।"

পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, "যশোর।"

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রশীদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজীর হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী, গোবিন্দলাল একস্থানেই, গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন, সব ইনস্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কনষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সব ইনস্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন—পত্র প্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কনষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন। মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দি মিন্দি কইও না—যা বলি তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয়, আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ আপদ পড়িলে আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল—"বিপদ কি মহাশয় ?"

মাধবীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত বটে।"

ব্র। কি বিপদ্‌ মহাশয় ?

মা। বিপদ সমূহ। পুলিষে কি প্রকারে জানিয়াছে যে আপনার কাছে এক খানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি ! আমার কাছে চোরা নোট !"

মাধবী। তোমার জ্ঞানতঃ চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে—তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয় ! আমাকে নোট কে দিবে ?

মাধবীনাথ তখন, আওয়াজ ছোট করিয়া, বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিষেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিষের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ একজন পুলিষের কনষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত, জলধরসন্নিভ কনষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল "আপনি রক্ষা করুন্‌ !"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্‌ কোন্‌ নম্বরের নোট পাইয়াছ বল দেখি। পুলিষের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয় তবে ভয় কি ? নম্বর বদলাইতে কত ক্ষণ ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্র খানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে ? ভয় করে—কনষ্টেবল যে গাছ তলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত একজন দ্বারবান্‌ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতে ছিলেন সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কনষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল—মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীত বাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায়?

মা। জিলা—জশ্—শ্—শর—

নি। জশ্—শরে কেন?

মা। নীলকুঠি কিন্‌ব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই একদিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় একক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য, ধ্বংসপুরে প্রয়ান করিয়াছে—তাঁহার আমীন তাগাদগীর নাএব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছিলেন। একজন বাঙ্গালি সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলিন রমণীয় চিত্র—কিন্তু, সকলগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন

শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটী তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন, এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে, যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান খ্যান ওস্তাদজির বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সেই তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল। এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনীসন্তাড়িত হইয়া, সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমলকণ্ঠ মিশাইয়া, গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সেনালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানেই যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি, সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথি জাতি মল্লিকা মধু মালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীল কাচ প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজত স্ফটিকাদিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহ শোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণ, আর সেই বৃদ্ধের বিশুদ্ধস্বর-সপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্ট করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল। গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহ দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাঁহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

ডাহির সেনাপতি নাটক

নাটকে* যে গল্পটি বিবৃত হইয়াছে তাহার চুম্বক এই :—আলোর দেশে ডাহির নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সে বড় বিপদাপন্ন হন। বসোরার অধিপতি খলিফা ওয়ালেদের সৈন্যেরা আসিয়া আলোর আক্রমণ করে, এই বিপদের সময় বৃদ্ধ ডাহির উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রকাশ করেন যে, যে তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে সে ব্যক্তিকে এক রাজকন্যা বিবাহ দিবেন। রাজার দুই কন্যা ছিল, সর্ব্বকনিষ্ঠা জয়া বালিকা, সরলা ও অতি ভীরুস্বভাবা। জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলসুতা, সুন্দরী, যুবতী, নিলর্জ্জা, দাম্ভিকস্বভাবা। যে ব্যক্তি যবনহস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবে, তাহার সহিত শৈলসুতার বিবাহ হইবে, এই কথা রাষ্ট্র হইলে রাজার প্রধান সেনাপতি শৈলসুতার পাণিগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু প্রথমেই আহত হইয়া মরণাপন্ন অবস্থায় জনৈক যবনসেনাপতির শিবিরে পড়িয়া রহিলেন। বৃদ্ধ রাজা আর উপায় না দেখিয়া, শেষ আপনিই যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধ বড় করিতে হইল না, শীঘ্রই আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার মহিষী যুদ্ধে গেলেন, তিনিও হত হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, যবনেরা রাজপুরী অধিকার করিল। রাজকন্যারা উভয়েই পলাইয়া, এক বনে আশ্রয় লইলেন। তথায় এক ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় শৈলসুতার অন্তরে প্রতিহিংসা অঙ্কুরিত হইল। শেষ ডাকিনীর পরামর্শ অনুসারে রাজকন্যারা পুনরায় পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে ধৃত হইয়া খলিফার প্রতিনিধি মহম্মদ বেন্‌কাসিমের সম্মুখে আনীত হইলেন। বেন্‌কাসিম তাঁহাদের রূপ লাবণ্য দেখিয়া, খলিফার বেগম হইবার যোগ্য বিবেচনায় তাঁহাদিগকে বসোরায় প্রেরণ করিলেন। শৈলসুতাকে পাইয়া খলিফা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া যত্নে অন্তঃপুরে রাখিলেন। প্রথম যে রাত্রে খলিফা শৈলসুতার শয়নগৃহে আসিলেন, সেই রাত্রেই শৈলসুতার কৌশলে খলিফার মানসিক বেগ প্রেমের পথ ত্যাগ করিয়া প্রতিহিংসার দিকে ধাবিত হইল। শৈলসুতার সহচরী খলিফাকে প্রকারান্তরে জানাইলেন যে তাঁহার প্রতিনিধি বেন্‌কাসিম

* শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ প্রণীত। ২১ কলেজ ষ্ট্রীট, মজুমদার এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

আপন উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে নজর পাঠাইয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র খলিফা রাগান্ধ হইয়া শৈলসুতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেন্‌কাসিমের শিরশ্ছেদ করিতে হুকুম দিলেন। বেন্‌কাসিমের মাথা শীঘ্রই কাটা গেল, শৈলসুতার প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত হইল। তিনি ভগিনী সমভিব্যাহারে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

গল্পটী, সম্যক্‌রূপে না হউক, কতকাংশে নাটকোপযোগী বটে। আমাদের দেশে যাঁহারা উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া নাটক নাম দিয়া পাঠকদিগকে ঠকান এবং নাটক লিখিয়াছি বলিয়া আপনারাও ঠকেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই জানেন না যে সকল গল্পই নাটকোপযোগী নহে। যিনি মনে করেন যে, যে কোন গল্প লইয়া নাটক লেখা যায়, তিনি নাটকের কিছুই বুঝেন না। উপন্যাস আকারে কোন গল্প অতি মনোহর হইয়াছে বলিয়া যে তাহা অবশ্যই নাটকোপযোগী হইবে এমত বিবেচনা করা ভ্রম। আমাদের অধিকাংশ নাটকলেখকদিগের মধ্যে এই সকল ভ্রম অতি বলবৎ থাকায় দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রায়ই নাটক লিখিতে গিয়া "জোবানবন্দি" লিখিয়া ফেলেন। তাঁহাদের লিখিত কথোপকথনকে তাঁহারা নাটক বলুন, কে বারণ করিবে? কিন্তু তাঁহাদের সমকক্ষ "সমজদার" ভিন্ন আর কেহ উহাকে নাটক বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যদি অন্য কেহ করেন, করুন; তথাপি সে গ্রন্থ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।

ডাহির সেনাপতি নাটক সম্বন্ধে আমরা বলিতেছিলাম যে গল্পটী কতকাংশে নাটকোপযোগী কিন্তু নাটকোপযোগী বলিয়া গ্রন্থকার যে এই গল্পটি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন, এমত বোধ হয় না; গল্পটি কেন নাটকোপযোগী, ইহার কোন্ অংশ নাটকোপযোগী আর কোন্ অংশ নহে, গ্রন্থকার তাহা বুঝিলে প্রথম তিন অঙ্কের অধিকাংশ তিনি লিখিতেন না। শৈলসুতার সহিত ডাকিনীর সাক্ষাৎ হইতে নাটকের আরম্ভ, তৎপূর্ব্বে যে পঞ্চাশ পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা দশ কি দ্বাদশ পত্রে লিখিত হইলে, নাটকের কোন ক্ষতি হইত না। যে ভাগ নাটকের কোন অংশই নহে বলিলে হয়, গ্রন্থকার সেই ভাগ লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যে ভাগ এই নাটকের মজ্জাস্বরূপ, গ্রন্থকার সে ভাগের প্রতি কোন যত্নই করেন নাই। বোধ হয় সে ভাগ তিনি বড় চিনিতেও পারেন নাই।

গল্পটী নাটকোপযোগী বটে, কিন্তু এরূপ গল্প লইয়া নাটক লেখা উচিত কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রতিহিংসা গল্পটির বীজ। এ বীজে বড় সুফল ফলে না; এখানেও ফলে নাই, প্রতিহিংসার ফল এ গল্পে নিরপরাধের দণ্ড। একদিকে প্রতিহিংসা অপর দিকে নিরপরাধের দণ্ড ভিন্ন আর কিছুই এ গল্পে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি আর কিছু থাকে তবে বোধ হয় প্রতিহিংসার পার্শ্বে তাহা লুকাইয়া আছে তাহাতে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। কেহ কেহ বলিতে

পারেন, শৈলসুতার প্রণয় এই নাটকের এক অংশ। তাহা হইলে, হইতে পারে। শৈলসুতা ও সেনাপতি উভয়েই দুই একস্থানে "উঃ" "আঃ" করিয়াছেন, তাহা প্রেমের পীড়নে হইতে পারে, কিন্তু সে প্রেমে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না, আমরাও তাহাতে কিছুই বিশেষ অসাধারণত্ব দেখিতে পাই নাই।

নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পর তল্লিখিত বিষয় মনে বড় স্থায়ী হয় না। শৈলসুতার অভাগ্য কি সৌভাগ্য অথবা বেন্‌কাসিমের দণ্ড এতৎ উভয়ের মধ্যে কিছুই এরূপ অন্তরস্পর্শ করে না যে থাকিয়া থাকিয়া তাহা মনে পড়িবে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় নিরপরাধের দণ্ড হইলে সকলেই কাতর হয়। সেই পরিচয় আবার কবির নিকট শুনিলে একেবারে ব্যাকুল হইতে হয় কিন্তু বেন্‌কাসিমের দণ্ড শুনিয়া ব্যাকুল হওয়া দূরে থাকুক সাধারণ লোকের মুখে শুনিলে যেরূপ 'আহা' বলা যায়, তাহাও বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, আমাদের কবির সে চেষ্টা করা উদ্দেশ্য নহে; বেন্‌কাসিমের প্রতি সহৃদয়তা না জন্মে, এই তাঁহার চেষ্টা ছিল। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, নিরপরাধের প্রতি সহৃদয়তা জন্মিতে বারণ, আর প্রতিহিংসার দলে যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু সে অনুরোধ শুনিলেও যে শৈলসুতার সহিত কাহারও সহৃদয়তা জন্মিবে এমত বলা যায় না। শৈলসুতাকে সেনাপতি ভালবাসিয়াছিলেন কিন্তু আমরা ভালবাসিতে পারিলাম না। এই নাটকে বিশেষ কবিত্ব আছে বলিয়াও বোধ হয় না। ইহাতে এমত কোন কথাই নাই যে মনে রাখিতে ইচ্ছা করে। বোধ হয় এরূপ কোন কথা বলিবার বয়সও গ্রন্থকারের হয় নাই। গ্রন্থকারের যে বহুদর্শন নাই তাহার অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদর্শন ব্যতীত নাটক লিখিবার অধিকার জন্মে না।

গ্রন্থকার হিন্দু মুসলমান এক করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে মহম্মদ বেন্‌কাসিম বলিতেছেন, "জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া মাত্র।" এই কথাগুলি হিন্দু ভিন্ন পূর্ব্বকালের মুসলমান দ্বারা কথিত হইবার কখন সম্ভাবনা নহে। হিন্দুরা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সর্ব্বদাই হোম যাগ করিতেন, ঘৃতাহুতিতে অগ্নি কিরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা নিত্যই দেখিতে পাইতেন, কোন বিষয়ের হঠাৎ বৃদ্ধি দেখিলে, তাঁহাদের নিত্য পরিচিত ঘৃতাহুতি মনে পড়িত। মুসলমানদিগের তাহা মনে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্য আমাদের মধ্যে ঘৃতাহুতির উপমা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, মুসলমানদিগের মধ্যে কখন তাহা হয় নাই।

শৈলসুতার সহিত যখন ডাকিনীর সাক্ষাৎ হইল, ডাকিনী শৈলসুতাকে সয়তানী বলিয়া সম্বোধন করিল। আমরা মনে করিলাম ডাকিনী বুঝি মুসলমান, পরে দেখিলাম, আমাদের ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুডাকিনী কেন মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ

হইতে নাম বাছিয়া শৈলসুতার প্রতি প্রয়োগ করিল, আমরা তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

আটশত বৎসর পূর্ব্বে মহম্মদীয় সৈনিকেরা কিরূপ বীর্য্যবান্ ছিলেন, গ্রন্থকার তাহা কিছুই অবগত নহেন। বেন্‌কাসিম ও রস্তমের কথাবার্ত্তা শুনিলে বোধ হয়, তাঁহারা অতি সামান্য বাঙ্গালি ছিলেন, অথবা বাঙ্গালির আদর্শ হইতে গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। বেন্‌কাসিমের বা রস্তমের মৌখিক দম্ভ ও আস্ফালন দেখিয়া আমাদের বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকেও মনে পড়ে না।

নাটকের মধ্যে বিশেষ অপকৃষ্ট অংশ চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। জয়ার চরিত্র উত্তম হইতেছিল, এই চতুর্থ অঙ্কে তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রস্তম ও বেন্‌কাসিম উভয়েই এ স্থলে বাঙ্গালি হইয়া গিয়াছেন। তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রস্তম তাৎকালিক মহাযোদ্ধাদিগের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কথাবার্ত্তার প্রতি মনোযোগ করা হউক। আর বেন্‌কাসিমের তেজঃপুঞ্জ কিরূপ রক্ষিত হইয়াছে এই উদ্ধৃত অংশে তাহাও দেখা হউক।

বেনকাসিম। কথা কও,—নহিলে অপমান হবে।

শৈল। আর অপমানের বাকি কি? যে যবন, পদতলে থাকিবার যোগ্য, সেই রাজা ডাহিরের সিংহাসনে,—আমরা তাঁহার কন্যা হয়ে সিংহাসন সমীপে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছি—আর অপমানের বাকি কি!

বে, কা। এত স্বাধীনভাবে কথা কহিও না। জান, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ?

শৈল। অত্যাচারীর সম্মুখে।

বে, কা। কিসে অত্যাচারী দেখিলে!

শৈ। অন্যায় যুদ্ধে আমার পিতামাতাকে হত্যা করিয়াছে।

বে, কা। অন্যায় যুদ্ধে! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা—অন্যায় যুদ্ধে!!

শৈ। কি ভয় দেখাইতেছ! ডাহিরের কন্যা ভীত হইবার মেয়ে নয়,—আবার বলিতেছি,—অন্যায় যুদ্ধে!

বে, কা। তোমার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

শৈ। মরিব,—পিতৃমাতৃ হন্তার রক্তে স্নান করিয়া মরিব।

রস্ত। লক্ষণ ভাল নয়। *

বে, কা। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার সুকণ্ঠনিঃসৃত বিষপূর্ণ বাক্যাবলি এতক্ষণ সহ্য করিয়াছি,—আর পারি না।

* চাচা, আপনা বাঁচা।

শৈল। আবার ভয় দেখাইতেছ! রাজা ডাহিরের সিংহাসনে দুর্ব্বৃত্ত, পার্শ্বে তাঁহার মন্ত্রী,—দুর্ব্বৃত্তকে দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসা, আমরা তাঁহারই কন্যা বন্দিনী হোয়ে দুর্ব্বৃত্তের সম্মুখে!—ভৈরবি এ বিষদৃষ্টি আর সহ্য হয় না চক্ষু তুলিয়া ফেল, চক্ষে আগুন জ্বালিয়া দাও।

প্র, সে। খোদাবন্ এ ভাল লক্ষণ নয়। ক্ষত্রিয় শোণিত সামান্য জ্ঞান করিবেন না।

রস্ত। সত্য। কিন্তু মন্মথের শর ও কোমল অঙ্গে একবার বিদ্ধ হলে, এত তেজ সমুদয় জল হইয়া যাইবে।

জয়া। আমার দিদিকে রাগাচ্চ কেন? বাবাকে মেরেছ—মাকে মেরেছ, এর প্রতিফল পাবে না বুঝি?

রস্ত। এটিকে দেখ্‌তে ত বালিকা বলে বোধ হয় না, কিন্তু কথা, হাব, ভাব সমুদয় বালিকার ন্যায়।

জয়া। আমি বুঝি বালিকা,—অরিন্দম বলেছেন আমায় বিয়ে করিবেন।

বে, কা। তোমার বিবাহ বসেরায় কালিফের সহিত হইবে।

শৈল। কি দুর্ব্বৃত্ত! জিহ্বা উপাড়িয়া ফেল,—যেন একথা মুখ হইতে আর বাহির না হয়।†

বে, কা। শয়তানি, তোর শমন নিকটবর্ত্তী।

শৈল। শমন নিকটবর্ত্তী না হলে তোমার নিকট আসিব কেন?

বে, কা। আমার নিকট দয়ার আশা কর না?

শৈল। করি না।

বে, কা। মরিতে চাও?

শৈল। মারিয়া মরিতে চাই।

বে, কা। তোমার ভগ্নীকে কে রক্ষা করিবে?

শৈল। আগে ওকে মারিব, প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থ করিব,—তবে আপনি মরিব।

বে, কা। আর এখন যদি তোমার প্রাণ সংহার করি।

শৈল। তাহার উপায় আছে।

বে, কা। কি?

শৈল। (বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) এই।

বে, কা। উহা দ্বারা কি করিবে?

---

† বটেত, লাগে বাকারি!

শৈল। ইহা দ্বারাই অভীষ্ট সাধন করিব।*

রস্তম। খোদাবন্—ক্ষান্ত দেন। দেখিতেছেন না রমণীর সমুদায় অঙ্গ প্রতিভা বিশিষ্ট। চক্ষু দিয়া যেন ঝলকে ঝলকে অগ্নি নির্গত হইতেছে। আর কিছু বলার আবশ্যক নাই, বসোরায় পাঠাইবার উদ্যোগ করুন।

বে, কা। কেমন বসোরায় যাইতে স্বীকার আছ?

শৈল। না যাই ত কি করিবে?

বে, কা। কি করিব – শয়তানি! তোর সতীত্ব অপহরণ করিব।

শৈল। কি পামর! এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা!! কি আমি কি এখনও দাঁড়াইয়া আছি?† এখনও পৃথিবী দ্বিধা হলে না? এখনও আমার শিরে বজ্রাঘাত হলো না!! সর্ব্বনাশি। এই সর্ব্বনাশের কথা শুনাইতে এখানে আনিয়াছিলি,—রাক্ষসি, তোর আরাধনা করে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো! আমার পিতা মাতাকে গ্রাস করেছিস্,—বাকী ছিলাম আমরা,—আমাদের দস্যুহস্তে সমর্পণ করে এই লাঞ্ছনা দিলি,—আর না। আর আমি তোর কথা শুনি না। আয় জয়া —(জয়ার গলদেশে হস্ত দান, দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা উত্থান) আয়,—আয় আগে তোকে বিনাশ করি—

জয়া। ওমা দিদি এমন হলো কেন!

সহ। (হস্ত ধরিয়া) ও কি কর—কি কর।

শৈল। না—আমায় প্রতিবন্ধক দিস্ না। আমি এখনই ওর প্রাণসংহার করিব। দুর্ব্বৃত্তকে মারিব, না হয় এই ছোরা আপনার বক্ষে বসাইব।

বে, কা। ধর,—শয়তানীকে ধর,—রস্তম ঐ ছোরাখানা আগে কাড়িয়া লও।

রস্তম। (অগ্রসর হইয়া) না, এ অগ্নিমূর্ত্তির নিকট যাইতে কে সাহস করিবে।"‡

---

* সময়টা কাঁদবের সময় নয় ত?

† তাই ত। বিছানা করে দিব না কি?

‡ যাত্রার মটক কোথায় লাগে!

প্রথম পরিচ্ছেদ

জনকের ন্যায় পুত্র হয়, জননীর ন্যায় কন্যা হয় একথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। অনেক সময় সন্তানেরা কিয়দংশে পিতার ন্যায় কিয়দংশে মাতার ন্যায় হইয়া থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা এই সর্ব্বসাধারণ পরিচিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিব না, বৈজিকতত্ত্বসম্বন্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করি এই আমাদের অভিপ্রায়।

বৈজিকতত্ত্ব প্রথমতঃ যত সামান্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক তত নহে। ইদানীং বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতেরা ইহার নিয়মানুসন্ধানে বহু যত্ন করিতেছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বাঙ্গালায় গোমেষাদি যত চতুষ্পদ আমরা যত্নে পালন করি তাহাদের এক্ষণে নিতান্ত অবনতি না হউক কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় না। বৈজিকতত্ত্ব অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ কিয়দংশে পরিবর্ত্তন করান যাইতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে বৈজিকতত্ত্বের অনুশীলন হওয়া অবধি গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সংসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের প্রয়োজনানুরূপ তাহাদের গঠন হইতেছে। মেষসম্বন্ধে লর্ড সমরবিল লিখিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদিগের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা নির্দ্দোষ আকৃতি প্রথমে প্রাচীরে অঙ্কিত করিয়া পরে তাহার প্রাণদান করে।* বাস্তবিক বিলাতের মেষব্যবসায়ীরা যেরূপ আকার ইচ্ছা করে সেইরূপ মেষ উৎপাদন করিয়া লইতেছে। কপোত সম্বন্ধে সর জন সিব্রাইট সাহেব বলিতেন যে যেরূপ পক্ষযুক্ত পায়রা চাও তিনি তাহা তিন বৎসরের মধ্যে দিতে পারেন কিন্তু

* "It would seem as if they had chalked out upon a wall a form perfect in itself and then had given it existence." *Quoted by Darwin in his Origin of Species page 23.*

চঞ্চু বা মাথার গঠন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাঁহার ছয় বৎসর লাগে।† এই সকল কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বৈজিক কৌশল দ্বারা জীবের গঠন যে কতকটা মনুষ্যের আয়ত্তমধ্যে আসিয়াছে এমত স্বীকার করিতে হয়। বেশবিলাসীরা তন্তুবায়কে যেরূপ বস্ত্র "ফরমাইস" দিয়া থাকেন জীবসম্বন্ধে এক্ষণে প্রায় সেইরূপ "ফরমাইস" চলিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হয় না। কিরূপে হইতে পারে তাহা পরে বলা যাইবে। কিন্তু প্রথমতঃ কতকগুলি বৈজিক নিয়ম না জানিলে তাহার উল্লেখ করা বৃথা হইবে বিবেচনা করিয়া আমরা তাহার নিয়মপরম্পরা বিবৃত করিতেছি।

বৈজিকতত্ত্বের প্রথম কথা এই যে সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশানুরূপ হয়; অর্থাৎ জাতি, অন্তর্জাতি এবং গোষ্ঠী, অনুরূপ হয়। সাধারণতঃ জানা আছে যে কখন গোজাতিতে ঘোটক জন্মে না, অথবা ঘোটকজাতিতে গো জন্মে না। বিজাতীয় জন্ম যে অসম্ভব তাহা বালকেরাও অবগত আছে। তাহার পর অন্তর্জাতির মধ্যেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ বলবৎ, এক প্রকার মেষের বংশে অন্য প্রকার মেষ জন্মে না। চিতা ব্যাঘ্রের বংশে নাগেশ্বরী ব্যাঘ্র জন্মে না। গোষ্ঠীসম্বন্ধেও ঐ রূপ নিয়ম; আমাদের দেশী ক্ষুদ্রকায় বেটুয়া ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন ওয়েলার বা আরব্য ঘোটক জন্মে না অথবা আরব্য ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন আমাদের পক্ষিরাজেরা জন্মগ্রহণ করেন না। আবার, অতি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিগোষ্ঠীতে কখন ইংরেজদিগের মত শ্বেতকায় সন্তান জন্মে না অথবা শ্বেতকায় ইংরেজদিগের গোষ্ঠীতে কখন কাফ্রিদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সন্তান জন্মে না। যদি কেহ কোন বংশে ইহার অন্যথা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে সে বংশ অমিশ্রিত নহে, তাহাতে শঙ্কর দোষ এক সময়ে না এক সময়ে ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সন্তানের গঠন জনক বা জননীর অনুরূপ হয়। কিন্তু অনেক সময় তাহা একেবারে হয় না এমন কি জনকজননীর অনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক বংশেরও অনুরূপ হয় না। আমরা সে বিষয় স্বতন্ত্র স্থানে বিবৃত করিব। সন্তান যে জনকজননীর অনুরূপ হইতে পারে আপাততঃ সেই বিষয়ের কতকগুলি পরিচয় দুই একখানি ইংরেজি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পিতা পুত্রের সাদৃশ্য যে কতদূর পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম হয় এবং তাহা যে কেবল বাহ্যিক আকারে নহে, ইহা ঐ সকল পরিচয় দ্বারা অনুভূত হইবে। পরিচয়গুলি ছয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

---

† "That most skilful breeder Sir John Seabright used to say, with respect to pigeons, that "he would produce any given feather in three years, but it would take him six years to obtain head and beak." *Herbert Spencer, Biology Vol. ii. page 242.*

প্রথমতঃ। অস্থিসম্বন্ধে সৌসাদৃশ্যের পরিচয়। জনক বা জননীর যে অংশে অস্থি দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র, লঘু বা গুরু, রিক্ত বা অতিরিক্ত থাকে সন্তানদেহের সেই অংশে অস্থির অবস্থা প্রায় তদ্রূপ হয় (১) অনেকের দেখা যায় অঙ্গুলির পার্শ্ব হইতে অস্থি বৃদ্ধি হইয়া আর একটি অতিরিক্ত অঙ্গুলি জন্মে; তাহাদের সন্তানদিগেরও সেইরূপ অতিরিক্ত অঙ্গুলি দেখা যায়।* (২) অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া পর্ব্ব থাকে; একজনের তাহা না হইয়া দুইটী করিয়া হইয়াছিল; পরে তাহার সন্তান হইলে দেখা গেল তাহাদিগেরও ঐরূপ দুইটি করিয়া পর্ব্ব হইয়াছে। পৌত্রদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।† (৩) যাহারা শ্রমজীবী তাহাদের হস্ত সর্ব্বদা চালনায় পুষ্টিলাভ করে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে শ্রমজীবি-বংশোদ্ভব সন্তানদিগের হস্ত প্রায় অপর বালকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়।§ পদসম্বন্ধে ঐরূপ। (৪) এক সময় একটী কুক্কুরী ত্রিপদ জন্মিয়াছিল। তাহার শাবকগুলিও তাহার ন্যায় ত্রিপদ হইয়াছিল।‡ এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে যদি জনকজননীর অনুরূপ সন্তান জন্মে তবে কুক্কুরী আপনার জনকজননীর ন্যায় চতুষ্পদ না হইয়া ত্রিপদ কেন হইল? বর্ত্তমান অবস্থায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। জনকজননীর ন্যায় সন্তান জন্মে এইটি সাধারণ নিয়ম সত্য, কিন্তু ইহার অনেক অনিয়ম ঘটে। মধ্যে মধ্যে অসাধারণ ও অদ্ভুত জন্ম হয় তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। লাম্বার্ট নামে এক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে সজারুর ন্যায় এক প্রকার চর্ম্মকীল জন্মিয়াছিল অথচ তাহার পিতৃপুরুষের কাহারও ঐরূপ ছিল না। যাহার অঙ্গুলিতে দুইটী করিয়া পর্ব্ব থাকার কথা বলা গিয়াছে তাহার পিতৃপুরুষের অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া পর্ব্ব ছিল, কেন এই ব্যক্তির তদ্বিপরীত দুইটী করিয়া পর্ব্ব হইল তাহা বলা যায় না। কিন্তু যে কারণেই এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকুক ইহা একবার উপস্থিত হইলে

* Dr. Struther quoted by Herbert Spencer.

† Mr. Sedgwick quoted by Herbert Spencer, *Biology* ii. 243.

§ Some special modifications of organs, caused by special changes in their functions may also be noted. That large hands are inherited by men and women whose ancestors led laborious lives; and that men and women, whose descent for many generations has been from those unused to manual labour, commonly have small hands, are established opinions. It seems very unlikely that in the absence of any such connection the size of the hand should thus have come to be generally regarded as some index of extraction. That there exists a like relation between habitual use of the feet and largeness of the feet, we have strong evidence in the customs of the Chinese. The torturing practice of artificially arresting the growth of the feet, could never have become established among the ladies of China, had they not found abundant proof that a small foot was significant of superior rank—that is, of a luxurious life—that is, of a life without bodily labour.

Herbert Sencer Biology.

‡ Anderson quoted by Darwin.

পূর্ব্বকথিত নিয়মাধীন হইয়া কিয়দ্দিনের নিমিত্ত বা চিরকালের নিমিত্ত বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আইসে। লাম্বার্ট সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে যেরূপ চর্ম্মকীল * জন্মিয়াছিল তাহার পুত্র পৌত্রেরও সেইরূপ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ। কেশসম্বন্ধে সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্য। ইহুদিদিগের ভ্রূযুগ চিরবিখ্যাত; আকর্ণ পর্য্যন্ত না হউক ভ্রূ সুদীর্ঘ এবং পরিষ্কৃত যেন চিত্রকর দ্বারা সাবধানে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের বংশপরম্পরা এইরূপ ভ্রূ চলিয়া আসিতেছে; (১) কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় কোন একজন প্রধান ইংরেজের ঐরূপ ভ্রূ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ইংরেজটি ইহুদিকুলোদ্ভব, কয়েক পুরুষ হইল ইংরেজদিগের দেশে বাস করিয়া ইংরেজ হইয়াছেন। ইংরেজ-দিগের সহিত তাঁহার পুরুষানুক্রমে আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে কিন্তু তথাপি ইহুদির ভ্রূ তাঁহার বংশ হইতে এপর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। (২) কোন কোন ব্যক্তির ভ্রূমধ্যে দুই তিন গাছি করিয়া চুল কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের সন্তানদিগের মধ্যেও এই সামান্য ন্যূনাধিক্যটি দেখা যায়। † (৩) কোন কোন ব্যক্তির মস্তকে একটি করিয়া শ্বেত বা তাম্রবর্ণ কেশগুচ্ছ থাকে; তাহাদের সন্তান-দিগের মস্তকে কোন ভাগে না কোন ভাগে ঐরূপ স্বতন্ত্র বর্ণের কেশগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়। ‡

তৃতীয়তঃ। জনক বা জননীর ন্যায় সন্তানের বলমাংস শিরা ইত্যাদি হইয়া থাকে। (১) অনেক সময় দেখা যায় পিতা পুত্রের একই প্রকার হস্তাক্ষর, এমন কি শুনা যায় যে সন্তান জনকের হস্তাক্ষর কখন দেখে নাই তথাপি পিতার ন্যায় তাহার হস্তাক্ষর হইয়াছে; যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে ইহার একমাত্র কারণ অনুভব হইতে পারে; জনকের যেরূপ সূক্ষ্ম শিরা ও বলমাংস দ্বারা অঙ্গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল পুত্রেরও অবিকল সেইরূপ শিরা ও বলমাংসে অঙ্গুলি গঠিত হইয়াছে। জনকের ন্যায় সন্তানের যে হস্তাক্ষর হইয়া থাকে ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় কিন্তু জনকের হস্তাক্ষর না দেখিলেও সন্তান যে জনকের মত লিখিতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ আছে। মহাপণ্ডিত ডারউইন সাহেব হস্তলিপি সম্বন্ধে বলিয়াছেন $ যে, এবিষয়ে আরও বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। (২) অনেকের চলন ও ভঙ্গী জনকের ন্যায় অবিকল হইয়া থাকে।

* Darwin on the *Variation of Animals &c.*

† Darwin on the *Variation of Animals &c* vol. i chap. xii page 452.

‡ Darwin on the *Variation of Animals &c* vol. i chap. xii page 449, and also Herbert Spencer on the *Principles of Biology.*

$ On what a curious combination of corporeal structure mental character and training, hand-writing depends! yet every one must have noted the occasional close similarity of the hand-writing in father and son, although the father had not taught his son. A great collector of auto-

যে স্থলে এ প্রকার দেখা যায় সে স্থলে বুঝিতে হইবে শরীরপরিচালক বলমাংস পিতাপুত্রের একইরূপ। (৩) কণ্ঠস্বর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। কণ্ঠরন্ধ্র যেরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় তদনুরূপ স্বর বিনির্গত হইয়া থাকে। পিতাপুত্রের একরূপ স্বর শুনিলে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কণ্ঠের গঠন একই প্রকার। হস্তলিপি চলনভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিবিশেষের উদাহরণ দেওয়া গেল না। এ সকল বিষয়ে সাদৃশ্য এত সচরাচর দেখা যায় যে উদাহরণের প্রয়োজন বোধ হয় না। সে যাহা হউক, সন্তানের বাহ্যিক আকৃতি জনকের ন্যায় হয় এই কথাই লোকের অনুভব আছে কিন্তু যাহা বলা গেল তদ্দারা প্রতিপন্ন হইবে যে সন্তানের আভ্যন্তরিক গঠনও জনকের ন্যায় হইয়া থাকে।

চতুর্থ। এক্ষণে অভ্যাস, শিক্ষা, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। (১) একব্যক্তি অভ্যাসবশতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ বিন্যাস করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিত; তাহার কন্যাটি অতি শৈশব অবস্থায় পিতৃ অভ্যাসটি পাইয়াছিল। যখন জ্ঞান মাত্রই জন্মে নাই তখন কন্যাটি পিতার ন্যায় বাম উরুর উপর দক্ষিণ উরু স্থাপন করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিত।* (২) কুক্কুরকে নানা কৌশল শিখান হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একবার একটি কুক্কুরীকে ভিক্ষা করিতে শিখান হইয়াছিল। যখনই তাহার কিছু লইবার ইচ্ছা হইত, শিক্ষিত মত ভিক্ষা না করিলে তাহা পাইত না। কুক্কুরীর কয়েকটি শাবক জন্মে, তন্মধ্যে একটিকে দেড়মাস বয়সের সময় তাহার গর্ভধারিণীর নিকট হইতে লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হয়। পরে শাবকটি সাতমাস কি আটমাস বয়সের সময় তাহার গর্ভধারিণীর ন্যায় ভিক্ষা আরম্ভ করিল;† কেহ তাহাকে ভিক্ষা করিতে শিখায় নাই, কাহাকেও সে

---

graphs assured me that in his collection there were several signatures of father and son hardly distinguishable except by their dates. Hofacker,* in Germany remarks on the inheritance of hand-writing · and it has even been asserted that English boys when taught to write in France naturally cling to their English manner of writing; but for so extraordinary a statement more evidence is requisite. Darwin on the *Variation of Animals &c.* vol. i 449.

* Several instances could be given of the inheritance of peculiar manners; as in the case, often quoted, of the father who generally slept on his back with his right leg crossed over the left, and whose daughter, whilst an infant in the cradle followed exactly the same habit though an attempt was made to cure her. Darwin's *Variation of Animals* vol. i 450.

† Mr. Lewes "had a puppy taken from its mother at six weeks old, who, although never taught 'to beg' (an accomplishment his mother had been taught), spontaneously took to begging everything he wanted when about seven or eight months old: he would beg for food, beg to be let out of the room, and one day was found at a rabbit hatch begging for rabbits." Herbert Spencer on the *Principles of Biology.*

ভিক্ষা করিতে দেখে নাই অথচ শাবকটি ভিক্ষা শিখিয়াছিল। শাবকের এই জ্ঞানটি মাতৃশিক্ষাজনিত এবং মাতৃবীজ হইতে প্রাপ্ত। এই যে দুইটি পরিচয় দেওয়া গেল, ইহা দ্বারা আমাদের একটি প্রাচীন প্রথার হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদিগের এই প্রথা ছিল যে, কোন উপজীবিকা অবলম্বন করিতে হইলে যুবারা পৈতৃক উপজীবিকা অবলম্বন করিত, পৈতৃক ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় গ্রহণ করিত না, সমাজও তাহা গ্রহণ করিতে দিত না। কেন না পিতৃব্যবসায় অতি সহজে শিক্ষা হয়। সমাজ দুই কারণে এই নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিল; প্রথম বৈজিক কারণ দ্বিতীয় সংসর্গ কারণ। বালকের জ্ঞানোদয় হইলে প্রথমেই পিতার ব্যবসায় দেখিতে পায়, দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিতে থাকে, পিতৃব্যবসায় লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, সে ক্রীড়া এক প্রকার শিক্ষা। বালক পিতৃব্যবসায় অনুকরণ করিবে, তাহা অভ্যাস করিবে এই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। পাল্কীবাহকদিগের সন্তানেরা একত্র হইয়া লগুড় স্কন্ধে করিয়া পিতৃব্যবসায় অনুকরণ করিয়া থাকে। বণিকের সন্তানেরা যে বয়সে তুল ধরিয়া ধূলা ওজন করিতে করিতে বলে "এই পাঁচ সের, এই সাত সের তিন ছটাক," তন্তুবায় কি অন্য ব্যবসায়ীদিগের সন্তানেরা সে বয়সে ওজন কাহারে বলে তাহা জানেও না। তন্তুবায়ের সন্তানেরা হয়ত সে বয়সে নাটাই ঘুরায় অথবা হেলিয়া দুলিয়া মাকু চালানর অনুকরণ করে। চিকিৎসকের সন্তানেরা দেখা যায় পাঠারম্ভের পূর্ব্বে বিনা চেষ্টায় যাহা শিখে অন্য ব্যবসায়ীর সন্তানেরা বহুশ্রম ও সময় ব্যয় না করিলে তাহা শিখিতে পারে না। অনেক দিন হইল একবার আমরা কোন চিকিৎসকের গৃহে উপস্থিত ছিলাম, তথায় একটি অপরিচিত দ্রব্য দেখিয়া উহার নাম চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে একটি বালক উত্তর করিল 'জটামাংসী' আমরা আর একটী দ্রব্য দেখাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করায় আবার বালকটী উত্তর করিল "কর্কল, এ তুমি জান না।" বালকটির বয়স তৎকালে চারিবৎসরের অধিক ছিল না এই অল্পবয়সে দ্রব্যনাম শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছিলাম, তাহাতে চিকিৎসক বলিলেন 'আমাদের সন্তানেরা অল্প বয়সেই এ সকল শিখিয়া থাকে, সর্ব্বদাই দেখে শুনে কাজেই না শিখাইলেও শিখে।' একথা সত্য, কিন্তু এক চিকিৎসকের পক্ষে নহে, সকল ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সমভাবে খাটে। পিতৃব্যবসায় অনায়াসে শিখিতে পাওয়া যায় এবং অনায়াসে শিখিতে পারা যায়। বলা হইয়াছে জ্ঞানারম্ভ হইতেই পিতৃব্যবসায়ে দৃষ্টি পড়ে, তাহা না শিখাইলেও শিখা যায়, আবার বৈজিক কারণ তাহাতে সহায়তা করে; এই দুই কারণে পিতৃব্যবসায় অতি সহজে শিক্ষা হয়। সন্তান বুদ্ধিমান্ না হইলেও পিতৃব্যবসায় শিখিতে তাহার বড় কঠিন বোধ হয় না। সন্তান বুদ্ধিমান্ হইলে ত কথাই নাই! সে সন্তান পিতৃব্যবসায়ের উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বকালে আমাদের শিল্পীরা যে বিশেষ

খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এই নিয়মাবলম্বন তাহার প্রধান কারণ। তাৎকালিক সমাজের ধারণা ছিল যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেশের ব্যবসায় ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিবে, কেহ অপর ব্যবসায়ে অপটু হইলেও আপন পিতৃব্যবসায়ে নিশ্চয় পটুতা লাভ করিবে, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে কি পটু কি অপটু সকলেই প্রয়োজনমত ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। বোধ হয় এই পদ্ধতির অনুরোধে জাতিবন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালে মুচির সন্তান কখন বস্ত্রবয়ন শিখিতে পাইত না। এই নিয়মের মন্দ ফল অবশ্য অনেক ছিল; মুচির সন্তান প্রতিভাশালী হইলেও তাহাকে জুতা-গঠনে নিযুক্ত থাকিতে হইত; সে ব্যক্তি বিদ্যানুশীলনে বা অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে পাইলে যে উপকার করিতে পারিত, সমাজ তাহাতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু এ কথার বিপক্ষে উত্তর করা যাইতে পারে যে, সন্তানের বুদ্ধি ও প্রকৃতি বৈজিক নিয়মানুসারে জনক জননীর ন্যায় হইয়া থাকে, অতএব মুচির সন্তান প্রতিভাশালী হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। বিদেশী চর্ম্মকারের সন্তানকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে শুনা গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় যেরূপ সমাজ ছিল, এবং অদ্যাপি যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে মুচির বংশে প্রতিভাশালী সন্তান বড় দেখা যায় না। যেস্থানে দেখা যাইতেছে সন্তানের শারীরিক গঠন অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশে জনকের ন্যায় হয়, সেস্থলে পৈতৃক প্রকৃতি বা পৈতৃক পটুতা সম্বন্ধে যে কোন সাদৃশ্য জন্মিবে না এমত সম্ভব নহে। বরং তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হারবার্ট স্পেন্‌সর সাহেব * বিলাতের কতকগুলি বিখ্যাতনামা সংগীতবিৎদিগের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকের জনক সংগীতব্যবসায়ী ছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বৈজিক নিয়মানুসারে তাঁহারা পিতৃবিদ্যায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; সংগীত বিদ্যায় এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে তানরাজ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য একজন

---

* Some of the best illustrations of functional heredity, are furinshed by the mental characteristics of human races. Certain powers which mankind have gained in the course of civilization, cannot, I think, be accounted for, without admitting the inheritance of acquired modifications. The musical faculty is one of these, * * Grant that among a people endowed with musical faculty to a certain degree, spontaneous variation will occasionally produce men possessing it in a higher degree; it cannot be granted that spontaneous variation accounts for the frequent production, by such highly endowed men, of men still more highly endowed. On the average, the offspring of marriage with others not similarly endowed, will be less distinguished rather than more distinguished. The most that can be expected is, that this unusual amount of faculty shall

প্রধান বলিয়া গণ্য, তাঁহার পিতা সেতারবাদ্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ গোস্বামী দেশীয় সংগীতবিদ্যার অধ্যাপক, তাঁহার পিতা ঐ বিদ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল 'খেয়ালি ও ধ্রুপদী" আমাদের দেশে আইসেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তানসেন বা অন্য কোন না কোন "ওস্তাদ ঘরনা" বলিয়া পরিচয় দেন। বাস্তবিক তাহা সত্য হউক বা না হউক, তাঁহাদের পরিচয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'ওস্তাদের' বংশে "ভাল ওস্তাদ" জন্মে এ কথা কি বাঙ্গালা, কি হিন্দুস্থান সর্ব্বত্র চলিত আছে। কেবল সংগীতব্যবসায়ী কেন? যে ব্যবসায়ী হউক আপন ব্যবসায়ে পারদর্শী হইলে, সে পারদর্শিতার অংশ তাহার সন্তানেও লক্ষিত হয়। অল্প আয়াসে পিতৃবিদ্যা অধিক শিখিতে পারে, লোকে বলে বালকের তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ছিল, এক্ষণে বুঝা যাইতেছে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নহে, পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত। সকল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এই নিয়ম সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান মহারাজার সভাসং কবিরাজ ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ বাতব্যাধি চিকিৎসায় এদেশের মধ্যে প্রায় অদ্বিতীয়। তাঁহার পিতা আশ্চর্য্য চিকিৎসক ছিলেন, শুনা যায়, তাঁহার পিতামহ বাতব্যাধি চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসক, তাঁহার পিতা ঢাকা অঞ্চলে চিকিৎসাব্যবসায়ে বিশেষ যশস্বী ছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সন্তান। ইহার বৈজিক কারণ মানিতে হইবে। যাঁহারা সে নিয়মানভিজ্ঞ তাঁহারা হয় ত বলিতে পারেন, সুচিকিৎসকের পুত্র যে সুচিকিৎসক হয়, তাহা কেবল শিক্ষাগুণে, বীজগুণে নহে। এই কথার উত্তরে আমরা উল্লিখিত পরিচয় স্মরণ করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করি, কুক্কুরীশাবক যে ভিক্ষা করিত, তাহা কি শিক্ষা কৌশলে? তাহাকে ত কেহ ভিক্ষা শিখায় নাই। দুগ্ধপোষ্য শিশু উরুর উপর উরু রাখিয়া পিতার ন্যায় যে শয়ন করিয়া থাকিত, তাহা কি শিক্ষাজনিত? শিশুটির ত তখন শিক্ষার উপযোগী কোন জ্ঞান জন্মে নাই। "বুনিয়াদী" চিকিৎসক বা সংগীতবিৎদিগের নৈপুণ্য কতটা শিক্ষাজনিত আর কতটা বা পিতৃবীজগুণে তাহা পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায় না বলিয়াই

---

reappear in the next generation undiminished. How then shall we explain cases like those of Bach, Mozart and Beethoven who were all sons of men having unusual musical powers, but who greatly excelled their fathers in their musical powers? What shall we say to the facts, that Hayan was the son of the organist, that Hummel was born to be a music master, and that Weber's father was a distinguished violinist? The occurrence of so many cases in one nation, within a short period of time, cannot rationally be ascribed to the coincidence of spontaneous variations—*Herbert Spencer on Biology.*

যে বৈজিক গুণ অস্বীকার করিতে হইবে এমত নহে। যাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া লোকে কতপ্রকার বাণিজ্য করিয়া ধনবান্ হইতেছে। এই সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সার বলেন, যে, "Excluding those inductions that have been so fully verified as to rank with exact science, there are no inductions so trustworthy as those which have undergone the mercantile test. When we have thousands of men whose profit or loss depends on the truth of the inferences they draw from simple and perpetually repeated observations; and when we find that the inferences arrived at, and handed down from generation to generation of those deeply interested observers, has become an unshakable conviction; we may accept it without hesitation. In breeders of animals we have such a class, led by such experiences, and entertaining such a conviction, the conviction that minor peculiarities of organization are inherited as well as major peculiarities. Hence the immense prices given for successful racers, bulls of superior forms, sheep that have certain desired peculiarities. Hence the careful record of pedigrees of high-bred horses and sporting dogs. Hence the care taken to avoid intermixture with inferior stocks"

যাহারা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া লইয়া বাণিজ্য করে, তাহারা কেবল এই নিয়মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সহস্র সহস্র টাকা নিত্য ব্যয় করিতেছে। ব্যবসায়ীরা সকলেই ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করে না, অনেকে ঘোটককে অতি শৈশব অবস্থায় ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করে। কেবল ক্রয়ের সময় বিশেষ করিয়া এইমাত্র অনুসন্ধান করে যে, শাবকের জনক জননীর মধ্যে সে কয়বার জয়ী হইয়াছিল, যদি সে পরিচয় বাঞ্ছানুরূপ হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা আর কোন সন্দেহ করে না, ঘোড়া নিশ্চয়ই ভাল হইবে বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চমূল্য দিয়া ক্রয় করে। যাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে তাহারাও ঐ নিয়ম অবলম্বন করিয়া জয়ী ঘোটকের দ্বারা শাবক উৎপাদন করাইয়া বিক্রয় করে। নিত্য এইরূপ ক্রয় বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ আবশ্যক। মৃগয়াকৌশলী কুক্কুরের শাবক বিলাতে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ জানা আছে, অপর শাবক অপেক্ষা মৃগয়াকৌশলীর শাবক অতি সহজে শিখে, ও না শিখাইলেও কখন কখন কৌশলে নিপুণ দেখা যায়। যদি এই সকল বিশ্বাসের কারণ না থাকিত, তাহাহইলে এরূপ বাণিজ্য চলিত না, ব্যবসায়ীরা সতর্ক হইত। পিতৃপ্রকৃতি, পিতৃবুদ্ধি প্রভৃতি বৈজিক নিয়মানুসারে যে সন্তানে যায় ইহার প্রমাণ

নিত্য পাওয়া যায়, তবে যে মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহার অন্যান্য অনেক কারণ থাকে। জনক জননীর মধ্যে পরস্পরের বৈপরীত্য অনেক স্থলে সেই ব্যতিক্রমের কারণ, অসাধারণ বুদ্ধিমানের সন্তান অতি নির্ব্বোধ দেখা যায়, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে হয় ত প্রকাশ পায় যে, সন্তানের জননী অতি নির্ব্বোধ। এস্থলে জননীর বৈজিক দোষে জনকের বৈজিক গুণ খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

পঞ্চম। বলা হইয়াছে সন্তানের আকৃতি প্রকৃতি জনকের ন্যায় হয়, আবার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বিঘ্ন না থাকিলে, সন্তানের আয়ু ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনক জননীর ন্যায় হইয়া থাকে। বিলাতে এই কথা সপ্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এই কথায় বড় অবিশ্বাস নাই। উপস্থিত প্রস্তাব-লেখকের বংশে এই নিয়মটির যথেষ্ট প্রমাণ আছে, লেখকের পিতা পঁচাশী বৎসর বয়স্ অতিক্রম করিয়াছেন, পিতামহের বয়স্ তিরাশী বৎসর হইয়াছিল, প্রপিতামহের বয়স্ কত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয় হওয়া এক্ষণে অতি কঠিন কিন্তু বৃদ্ধলোকেরা বলিয়া থাকেন, যে, তিনি পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পঞ্চ সঙ্গীর বংশপরিচয় ঘটকেরা পুরুষানুক্রমে লিখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রতি কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে বলা যায় না। যদি তাহা গ্রাহ্য করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সেই পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে কাহার বংশ ২৮ পুরুষ, কাহার বংশ ৩৭ পুরুষ হইয়াছে। সমকালীন ব্যক্তিদিগের বংশসম্বন্ধে এরূপ ন্যূনাতিরেক দেখিলে প্রতীতি হয় যে কোন কোন বংশের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। দক্ষের বংশ ২৮ পুরুষ হইয়াছে। শ্রীহর্ষের বংশ ৩৭ পুরুষ হইয়াছে। দক্ষের সন্তানেরা দীর্ঘজীবী। উপস্থিত প্রস্তাব-লেখক দক্ষের বংশোদ্ভব। অতএব পূর্ব্বে যে নিজ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন নহে।

ষষ্ঠ। জনক জননীর পীড়া সন্তানে যায়। শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, মৃগীরোগ, উন্মাদ-রোগ সম্বন্ধে এই নিয়ম যে অলঙ্ঘনীয় তাহা অনেকেই জানেন, তাহার বাহুল্য পরিচয় অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, জানিয়া শুনিয়াও অনেকে বিবাহের সময় এই নিয়মটি একবারে ভুলিয়া যান। যাঁহার বংশে এই সকল রোগ কস্মিনকালে হয় নাই, তিনি অনেক সময় অপর রোগী বংশের বীজ আনিয়া আপনার নিরোগী বংশে রোপণ করেন। যিনি পৈতৃক সম্পত্তি অখণ্ড রাখিতে পারাকে পুরুষার্থ বলেন, তিনি হয় ত পিতৃদত্ত পবিত্র রক্তকে কলুষিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। এক্ষণে সে সকল কথা থাকুক। পীড়া সম্বন্ধের নিয়ম বলা যাইতেছিল। প্রায় চিরস্থায়ী রোগমাত্রই বীজানু-

গামী। জনক জননীর হইলে সন্তান সন্ততির হইয়া থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের রোগ, চক্ষের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, বায়ুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সন্তানের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চক্ষের রোগ বিশেষরূপে বীজানুবর্ত্তী। চক্ষের যে প্রকার পীড়া হউক সন্তানের প্রায়ই তাহা জন্মে। দূরদৃষ্টি, নিকটদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এ সকল পুত্রে যায়। রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ, বর্ণান্ধ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ইহার মধ্যে বর্ণান্ধতা পুত্রে যায় না প্রায় দৌহিত্রে যায়। যে প্রকার পীড়াগ্রস্তকে লোকে সচরাচর 'সূর্য্যকানা' বলে তাহাও সন্তানে যায়। নিকটদৃষ্টি অনেক প্রকার আছে; আমরা একজনের তাহার অতি প্রবল অবস্থা দেখিয়াছি, তিনি সম্মুখস্থ কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে তাহা চক্ষের নিকট লইয়া চক্ষু অতি সঙ্কুচিত না করিলে দেখিতে পান না। একদিন বালিকা কালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত একটী দ্রব্য আপন চক্ষের নিকট ধরিয়া নানা ভঙ্গী করিতেছিল। অন্ধের মাতা এই উপহাস দেখিতে পাইয়া রাগতভাবে পুত্রবধূকে অভিসম্পাত করিলেন যে 'তুই যেমন আমার সন্তানকে উপহাস করিতেছিস, আমি বলিতেছি তোর সন্তানেরাও ঐরূপ অন্ধ হইবে।' পুত্রবধূর ক্রমে দুই তিন সন্তান হইল, আমরা সন্তানগুলি দেখিয়াছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় অন্ধ হইয়াছে। প্রতিবেশীরা বলেন যে ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য্য ফলিয়াছে। কিন্তু যিনি বৈজিক নিয়ম জানেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাতের বড় আবশ্যকতা ছিল না। যাহারা জন্মান্ধ নহে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ যাহাদের পূর্ব্বাবস্থায় চক্ষুর কোন দোষ ছিল না পরে কোন-রূপ আঘাত লাগিয়া বা বিষাক্ত দ্রব্যাদি সংস্পর্শে বা অন্য কোন কারণে চক্ষু গিয়াছে তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় না। কেবল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন, শারীরিক যে কোন পীড়া বা পরিবর্ত্তন আপন হইতে হয় নাই, বাহ্যিক কোন কারণ বশতঃ হইয়াছে, সে পীড়া বা পরিবর্ত্তন সন্তানে প্রায় যায় না। খঞ্জের সন্তান খঞ্জ হয় না। যাহার অস্থি আঘাতে বা পতনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার সন্তানেরা ভগ্নাস্থি হয় না। তথাপি কেহ কেহ বলেন যে সময়ে সময়ে এরূপও জন্মে। একজনের একটি অঙ্গুলি অস্ত্রাঘাতে সম্পূর্ণরূপে না কাটিয়া কতকাংশে কাটে, অঙ্গুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন হয় নাই কিন্তু বাঁকিয়া যায়। তাহার পর ঐ ব্যক্তির কয়েকটী সন্তান জন্মে। সন্তান গুলির সকলেরই সেই অঙ্গুলি বক্র হইয়াছিল। প্রোফেসর রোলেষ্টান বলেন যে একজনের জানু কাটিয়া গিয়াছিল তাহার সন্তানের জানুতে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। তিনি আর একজনের কথা বলেন যে তাহার চিবুকে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল সন্তানের চিবুকেও ঐরূপ ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। বসন্তরোগের ক্ষতচিহ্ন কখন সন্তানে যায় না। আমাদের দেশে পুরুষানুক্রমে স্ত্রীলোকদিগের

নাসিকা ও কর্ণ বিদ্ধ করা রীতি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কখন তাহার চিহ্ন সন্তানে দেখা যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, যে শারীরিক পরিবর্ত্তন আপনা হইতে না জন্মে অথবা যে পরিবর্ত্তন শরীরের আভ্যন্তরিক নিয়ম সংস্পর্শ না করে সে পরিবর্ত্তন সন্তানে যায় না। তদ্ভিন্ন সকল পরিবর্ত্তন, সকল পীড়া, সকল দোষ, সকল গুণ বীজবলম্বন করিয়া সন্তানে যাইতে পারে। এমন কি দেখা যায় প্রসবিত্রীর প্রসবকষ্টটী পর্য্যন্ত কন্যাতে যায়, সেই কন্যা গর্ভবতী হইলে প্রসবের সময় কষ্ট পায়। অনেক প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ জন্মে না, শুনা যায় তাহার কন্যারও স্তনে দুগ্ধ হয় না। অনেক গর্ভধারিণী মৃতবৎসা, যদি তাঁহাদের দুই একটি কন্যা রক্ষা পায় সে কন্যাও মৃতবৎস প্রসব করে। আবার অনেক স্ত্রীলোক অনাপত্যা বা বাঁজা আছে যদি কখন তাঁহাদের গর্ভে কন্যা জন্মে সে কন্যাও মাতৃবৎ বাঁজা হয়। আমরা দেখিয়াছি একজন ধনবান ব্যক্তি পুত্রকামনায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের সময় জানিতেন না যে তিনি স্বল্পপুত্রীর কন্যা বিবাহ করিলেন। সন্তান হইল না, অনেক দেবার্চ্চনা করিলেন, দেবতারা এ সকল বিষয়ে "নিমখহারাম"! তাঁহারা মনোযোগ করিলেন না দেখিয়া হতাশ হইয়া অদৃষ্টকে দোষের ভাগী করিলেন। দোষ অদৃষ্টের নহে দোষ ঘটকের। আমাদের ঘটকেরা অনর্থের মূল; তাঁহারা বৃথা কুলমর্য্যাদা অনুসন্ধান না করিয়া যদি অন্য কার্য্য করেন তাহা হইলে ভাল হয়। আমরাও যদি তাঁহাদের প্রতি নির্ভর না করিয়া আপনাদের সন্তানের নিমিত্ত বল্লালি কুল না খুঁজিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন পবিত্রবংশ অনুসন্ধান করি তাহা হইলে আপনাদেরই মঙ্গলসাধন হয়।

(ক্রমশঃ)

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণপুর

হরিনাথ বাবু অনেক দিনের পর সপরিবারে সুবর্ণপুর আসিলেন। আসিয়া বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য যত্নবান্ হইলেন। সমাজের ভদ্রলোকদিগের কাহাকে মিষ্ট বাক্যদ্বারা, কাহাকে বা ধনদ্বারা, এবং কোন কোন ব্যক্তিকে বা কোন উপকারের দ্বারা হস্তগত করিলেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। সুবর্ণপুর সেইরূপ আছে,—সেইরূপ চাঁদের আলো, সেইরূপ শ্যামলবর্ণ নিবিড় পল্লবাচ্ছাদিত ঘন বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, পাপিয়ার আকাশভেদী চীৎকার, ক্রীড়াশীল বালকদিগের আনন্দসূচক ধ্বনি, যুবতীদিগের মৃদু মধুর হাস্য, সকলই সেইরূপ আছে, কেবল কুমুদিনীর আর সে মন নাই—সুবর্ণপুর তাঁহার অগ্নিকুণ্ডবৎ বোধ হইতে লাগিল। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা আসিল; বর্ষা গেল, শরৎ আসিল; ক্রমে হেমন্ত আসিল; কুমুদিনী পদ্মপুষ্পের সহিত শুকাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটী অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম শুকাইতে ছিল; কি কারণে জানি না, সরলা বিনোদিনী দিন দিন ম্লান হইতেছিল। শরৎকুমারও সুবর্ণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রতিকান্তকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তি দখল করিলেন। জনরব যে হরিনাথ বাবু দরিদ্রহস্তে কুমুদিনীকে সমর্পিত করিতে অসম্মত হওয়াতে শরৎকুমার তাঁহার পূর্ব্বকৃত দানপত্র অবর্ত্তমানে, তাঁহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। শরৎকুমার তাঁহার গৃহ সকল প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু কি কারণে কেহ জানিল না তাঁহার গঙ্গাতীরের রমণীয় বৃক্ষবাটিকাটি বিক্রয় করিলেন। কাহাকে বিক্রয় করিলেন তাহাও কেহ জানিতে পারিল না, কেহ কেহ বলিল যে সেই বাটীতে ভূতযোনি বিরাজ করে সেইজন্য বিক্রয় করিয়াছেন, এবং কোন কোন কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট করিল, যে এক এক দিন গভীর রাত্রে ঐ বৃক্ষবাটিকার পার্শ্বস্থ বড় বড় দেবদারু বৃক্ষের

তলায় অতি দীর্ঘাকার এক মনুষ্যমূর্ত্তি বেড়াইতে দেখিয়াছে। কুমুদিনীর প্রিয় পরিচারিকা শ্যামা জানিত যে সেই বাটীতে একজন বিখ্যাত ভূতের ওঝা আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহার কারণ, সে এক দিবস বৃক্ষবাটিকার একজন পরিচারককে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হাঁগা তোমরা কারা ? তোমাদের কি সাহস ? ভূতের বাড়ীতে আসিয়া বাসা লইয়াছ ? পরিচারক উত্তর করিয়াছিল, আমাদের মুনিব একজন পশ্চিম দেশীয় বিখ্যাত ভূতের ওঝা। সেই অবধি শ্যামা জানিত যে ভূতের ওঝা সেই বাটীতে বাস করিয়াছে। যাহা হউক সন্ধ্যার পর সেই বাটীর নিকটের পথ দিয়া আর কেহ যাতায়াত করিত না। দিবসে যাহারা যাইত তাহারা সেই বাটীতে নূতন প্রকার চাকর নফরের আবির্ভাব দেখিয়া অন্যপ্রকার সন্দিহান হইল।

এই সময়ে নিষ্কর্ম্মা নিন্দাপ্রিয় এবং মিথ্যাগল্পপ্রিয় সুবর্ণপুর গ্রামবাসীরা নানাপ্রকার কথা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইল। কোথাও দোকানে বসিয়া, কোথাও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, কোথাও দেবমন্দিরে বসিয়া, এবং কখন কখন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বসিয়া, দলে দলে গ্রামবাসীরা ঐ সকল নূতন কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল,—প্রথমতঃ বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয়তঃ দান করিয়া ফিরে লওয়া, তৃতীয়তঃ গঙ্গাতীরের বাটীতে কে বাস করিল! স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই। ফলাহারে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গঙ্গাতীরে সারি দিয়া বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে, কুমুদিনীর, শরৎকুমারের, এবং গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকা-অধিষ্ঠাতা ভূতের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। এ ত বৃদ্ধা এবং অর্দ্ধবয়সীদিগের সভা। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ম্লানকিরণ না হইতে হইতেই প্রৌঢ়া এবং যুবতীগণ কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ত্যাগ করিয়া, কেহ পীড়িত স্বামী ত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধ পিতা ত্যাগ করিয়া, দলে দলে হরিনাথ বাবুর বাটীর সন্নিকট নিভৃত এবং বৃহৎ একটি পুষ্করিণীতে গাত্রপ্রক্ষালন উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কোন যুবতী যদি অসামান্যা সুন্দরী হয় তবে তাঁহার প্রতিবেশী যুবতীগণ তাহাকে বিষনয়নে দেখিয়া থাকে, তাহার অতি সামান্য ছল পাইলে তাহাকে অতিশয় ঘৃণিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। কুমুদিনী অসামান্যা সুন্দরী,—সুবর্ণপুর গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, বিধবা হইলেও পুনরায় বিবাহ হইবে, তাহাতে আবার অতি বাঞ্ছনীয় পাত্রের সহিত, রূপ, গুণ, ধন, যৌবন, সকলি আছে এমন পাত্র শরৎকুমারের সহিত বিবাহ হইবে, প্রতিবেশিনীদিগের কি হিংসার শেষ আছে! সুতরাং সকলে ঘাটে একত্র মিলিত হইয়া কুমুদিনীর নিন্দার একশেষ করিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধ্যা হইয়াছে, পুষ্করিণী অধিষ্ঠাত্রী যুবতীদিগের রূপে লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেব একখানি বৃহৎ রূপার থালের ন্যায় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে উঁকি

মারিতেছেন। দুই চারিটি মাত্র যুবতী ঘাটে কুমুদিনীর নানাপ্রকার নিন্দা করিতেছে। এমত সময়ে তাঁহার ভগিনী বিনোদিনী একাকিনী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাঁহাকে দেখিবা মাত্র নিন্দাপ্রিয় স্ত্রীগণ, লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া একে একে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। এখন চন্দ্রদেব নিঃসঙ্কোচে বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে পূর্ণজ্যোতিতে নীলাকাশে প্রকাশ পাইলেন, দেখিয়া গাছ পালা, লতাপাতা, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত গিরিগুহাসম্বলিত সমুদায় জগৎ হাসিয়া উঠিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নে

নিভৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ, এবং চন্দ্রালোকবিধৃত পদ্মপুষ্করিণীর ঘাটে বিনোদিনী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন,—কখন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নয়নরঞ্জন চন্দ্রের প্রতি, কখন বা উজ্জ্বল সান্ধ্য তারার প্রতি চাহিয়া অনন্যমনে ভাবিতেছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন কে বলিবে? হেমন্তের অতি শীতল নীহারে শরীর আর্দ্র হইয়া কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়াতে বিনোদিনীর সংজ্ঞা হইল, আস্তে আস্তে জলে নামিলেন। স্থির সরসীবক্ষে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম দুলিতেছিল, একটি রাজহংস স্বচ্ছ বারিবক্ষে বিচরণ করাতে তাহার জলহিল্লোলে পদ্মটি হেলিতেছিল দুলিতেছিল। জলে নামিয়া বিনোদিনী তাহাই দেখিতেছিলেন। কখন কখন এমত ঘটে যে, চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করা যায় না, কোন কার্য্যের ফলবিশেষ সুখপ্রদ নহে বরং অমঙ্গলজনক হইতে পারে অথচ সেই কার্য্যসাধনে চিত্ত দুর্দ্দমনীয় বেগে ধাবমান হয়। পদ্মফুলটি তুলিতে বিনোদিনীর বিশেষ স্পৃহা ছিল না বরং শীতপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ জলে নিমগ্ন থাকিতে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তথাচ সেই পুষ্পটি তুলিবার জন্য চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যেরূপ অলসচিত্তে অলসশরীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, সেইরূপ চিত্তে সেইরূপ শরীরে জলে নিমজ্জন করিয়া সেই পুষ্প উদ্দেশে চলিলেন। বাল্যকাল হইতে বিনোদিনী সন্তরণে পটু ছিলেন, নিঃশব্দে স্থির অঙ্গে রাজহংসীর ন্যায় যাইয়া পুষ্পটি চয়ন করিলেন, প্রত্যাগমন কালে হঠাৎ অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, ভাবিলেন শীতবশতঃ শরীর অবশ হইতেছে। অতি কষ্টে কূলে পৌঁছিলেন, কিন্তু পৌঁছিবা মাত্র অচেতনপ্রায় ভূপতিত হইলেন।

তীরোপরি একটী আম্রবৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি উঁকি মারিয়া তাঁহাকে

পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিতেছিল ; এক্ষণে তাঁহার মূর্চ্ছাবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইল। বিনোদিনী অজ্ঞান হন নাই কেবলমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য ভূপতিত হইয়াছিলেন। যখন নৃশংস তাঁহাকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন ; তাঁহার চীৎকার শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে কে এক ব্যক্তি সেইরূপ স্বরে অভয় দিল, নৃশংস সেই স্বর শুনিবামাত্র বিনোদিনীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। বিনোদিনী আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি যুবাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল। বিনোদিনী হঠাৎ ভয় পাইয়া চমকিতা হইলেন, তৎপরে যুবার মুখপ্রতি চাহিবামাত্র সেই ভয় অন্তর্হিত হইল, লজ্জায় শিরোবসন টানিয়া মুখ আবৃত করিলেন, এবং কোন কারণে শরীর চঞ্চল হইল, তদুপরে যুবক, যে ফুলটি তুলিতে গিয়া বিনোদিনী প্রাণ হারাইতেছিলেন, সেই ফুলটি তাঁহার হস্তে দিলেন। দিবার সময় কি কথা বলিতে লাগিলেন, সে একটি কি দুইটি কথা নহে, অনেকগুলি কথা বলিতে লাগিলেন। বিনোদিনী মুখ আবৃত করিয়া নত মস্তকে দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষত করিতে করিতে তাহা শুনিতেছিলেন, কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিমধ্যে পরিচারিকা শ্যামার সহিত বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে দেখিয়া শ্যামা বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ গা গৃহস্থের মেয়ে এত রাত পর্য্যন্ত কি জলে পড়ে থাকৃতে হয়।" বিনোদিনী কোন উত্তর না করাতে শ্যামা নিকটে আসিয়া তাঁহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। দেখিল গতি অন্য-মনার ন্যায়, মস্তক কুলবধূদিগের ন্যায় আবরিত। শ্যামা তৎপরে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "হ্যাঁ এই যে হয়েছে দেখ্‌ছি, না হবে কেন, ভরসন্ধ্যে বেলা, একলা গাছ তলায় পুকুর পাড়ে বেড়াবেন, এঁকে পাবে না ত কাকে পাবে ? ভাগি্‌গস একজন ভাল ভূতের রোজা এ গাঁয়ে এয়েচে, নহিলে কি হত!" তৎপরে অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিতে গিয়া, হঠাৎ পশ্চাৎদিগে দৃষ্টি পড়িল। দেখিল দীর্ঘাকার মল্লবেশী এক ব্যক্তি তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। শ্যামা কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া চীৎকার করিল "কে রা ?" দীর্ঘাকার ব্যক্তি তাহা শুনিবামাত্র নিকটস্থ এক জঙ্গল-মধ্যে অন্তর্হিত হইল এবং অতি দ্রুতপদে উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিশীথে

গভীর যামিনীতে একটি বিজনকক্ষে কুমুদিনী তাঁহার ভগিনী বিনোদিনীর মস্তক উরূপরে রাখিয়া একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন। বিনোদিনী বিষম জ্বরে অচেতনপ্রায়, মধ্যে মধ্যে এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিতেছেন। কুমুদিনীর চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ নাই, ঘন ঘন ভগিনীর গাত্রে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন, সন্ধ্যারাত্রে কে এবং কি অভিপ্রায়ে বিনোদিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হইল, আস্তে আস্তে বিনোদিনীর মস্তক আপনার উরু হইতে উপাধানে রাখিয়া, পশ্চিমদিকের একটী গবাক্ষ খুলিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইলেন। গবাক্ষের নিকট একটী নিম বৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে স্থিরভাবে বসিয়া দুই একটী পক্ষী নিদ্রিত ছিল, গবাক্ষোদঘাটন শব্দে বৃক্ষ হইতে তাহারা এক একবার পক্ষ সাপট দিল, বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্লবের অন্তরালে স্তিমিতপ্রায় চন্দ্রদেবকে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। কুমুদিনী অনেকক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, শীতল নৈশ বায়ু সেবন করিয়া পুনরায় ভগিনীর নিকট আসিয়া, আবার গাত্রোত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। দুই একবার "বিনোদ বিনোদ" বলিয়া ডাকিলেন ; উত্তর নাই। বিনোদিনী জ্বরে অঘোর হইয়া রহিয়াছেন। চিন্তিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। গবাক্ষ প্রতি দৃষ্টি পড়িল, অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, গবাক্ষদ্বারদেশে এক বৃহদাকার মনুষ্য দাঁড়াইয়া কক্ষমধ্যে উঁকি মারিতেছে। কুমুদিনী সামান্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা সাহসবিশিষ্টা হইলেও অতিশয় ভীতা হইলেন। "শ্যামা শ্যামা" বলিয়া চীৎকার করিলেন। শ্যামা কক্ষবাহিরে বারেণ্ডায় নিদ্রিত ছিল, তাহার উত্তর পাইলেন না। ইতিমধ্যে সেই দীর্ঘাকার ব্যক্তি গবাক্ষ হইতে অবরোহণ করিল। তাহার লম্ফনশব্দ কুমুদিনী শুনিতে পাইয়া অতি দ্রুত গিয়া গবাক্ষ বন্ধ করিলেন। পুনরায় শয্যোপরি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরিচারিকা-দিগকে অনেকবার ডাকিলেন, কাহারও উত্তর পাইলেন না, স্বয়ং ভগিনীকে একাকিনী রাখিয়া তাহাদিগের অন্বেষণে যাইতে পারেন না—অতিশয় ভীতা হইয়া বসিয়া রহিলেন, মনে মনে নানাপ্রকার ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল। নিস্তেজ ক্ষীণ দীপশিখা কক্ষমধ্যে কাঁপিতেছিল। কক্ষপ্রাচীরে একটি করালমূর্ত্তি দেবী কালী অঙ্কিত ছিল। আলুলায়িতকেশী, লোলজিহ্বা, বিবসনা, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি মহাকাল হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছিল। ক্ষীণ দীপালোক নানা রঙ্গে সেই ভয়ঙ্করী প্রতিমা উপরে খেলিতেছিল,

কুমুদিনী এক দৃষ্টে সেই মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে নিস্তেজ দীপালোক নির্ব্বাণ হইল, কক্ষ মসীময় হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদিনী সেই অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দ, বাহিরে কদাচিৎ কখন অতি মৃদু কখন অতি ভীষণ রব শুনিতেছিলেন, ইতিমধ্যে কক্ষবাহিরে বারেণ্ডায় হঠাৎ খস্ খস্ শব্দ শুনিলেন। শরীর রোমাঞ্চ হইল, শব্দ মনুষ্য পদধ্বনি বলিয়া বোধ হইল। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "কেও ?" শব্দ থামিল, কিন্তু কোন উত্তর নাই। কুমুদিনী স্থির-কর্ণে শুনিতে লাগিলেন ; আবার সেইরূপ খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে ?" শব্দ থামিল, তৎপরেই পুনরায় শব্দ হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে কক্ষদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল না, পাছে সে ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সেই ভয়ে কুমুদিনীর শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনিলেন যেন কে দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতরে অতি সাবধানে প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণেই সেই পূর্ব্ববৎ পদশব্দ কক্ষমধ্যে শুনিতে পাইলেন। কুমুদিনী মুমূর্ষুবৎ বসিয়া অন্ধকারে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই খস্ খস্ শব্দ ক্রমে ক্রমে অতি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অন্ধকারে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া অস্পষ্ট মৃদু চন্দ্রজ্যোতি প্রবেশ করাতে কক্ষমধ্যে কুমুদিনী দেখিতে পাইলেন যেন কে দ্বারের নিকট নড়িতেছে। ক্রমে অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন। কুমুদিনী পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মনুষ্যাবয়বকে ক্রমে একটি স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রীলোকও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার দিকে আসিতেছে। কুমুদিনী তাহাকে দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি, কথা কও না কেন ?" স্ত্রীলোকটী উত্তর না দিয়া কুমুদিনীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পালঙ্কের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কুমুদিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পরে নিশাচরী যেমন কুমুদিনীর গাত্র স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে যখন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিল তখন কুমুদিনী অচেতনপ্রায় হইয়া ভগিনীর পার্শ্বে পতিত হইলেন।
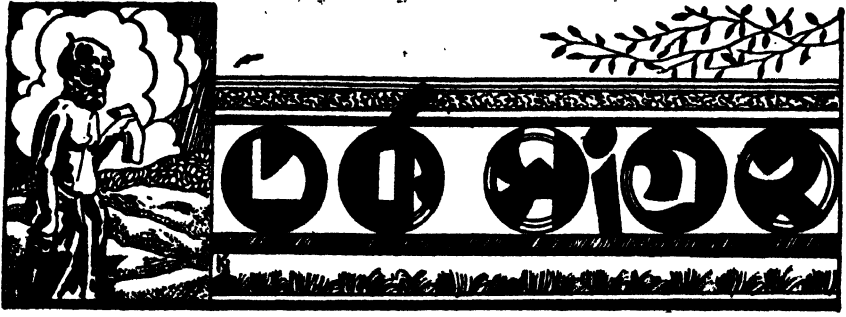
তৃতীয় তর্ক—জগদুপাদান* নিরূপণ ।

আমরা পূর্ব্বে ইহা উপপন্ন করিয়াছি যে, এই বিচিত্র কৌশলপূর্ণ জগন্মণ্ডলের একটি সৃষ্ট পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কর্ত্তা আছেন। তিনি নিত্য, তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন ও শক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলও নিত্য ও অনন্ত। তিনি সনাতন পরমাণু সকলকে উপাদান করিয়া এই বিতত বিশ্বমণ্ডলের নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এক্ষণে জগতের উপাদানরূপ সেই পরমাণুসমূহের অস্তিত্বাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে অভিহিত হইতেছে।

কিন্তু প্রস্তুত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আমরা, পূর্ব্ব তর্কগত একটি কথার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা উচিত বোধ করিতেছি, বোধ হয় সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।

আমরা "ঈশ্বরাস্তিত্ব" বিষয়ক তর্কের এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছি যে, "ঈশ্বরের বিষয় অধিক আলোচনা করিলে হয়ত শিষ্টজনবিগর্হিত নাস্তিকতা আসিয়া পড়িবে।" ইহাতে পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহার তাৎপর্য্য কি? ঈশ্বরের বিষয় অধিক আলোচনা করিলে কেন নাস্তিকতা আসিয়া পড়িবে? সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এতৎসম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায়টি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত অনুচিত নহে বরং তাহাতে কিছু উপকার হইতে পারে।

মনে কর আমি নৈয়ায়িক, আমি ঈশ্বরত্ব দান করিতে সঙ্কল্প করিয়া যিনি ঈশ্বর বলিয়া চিরপরিচিত তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। তিনি আসিতে না আসিতে পরমাণু সকল উচ্চৈঃস্বরে বলিবে "ছি! ছি! এমন পক্ষপাতের কর্ম্ম করোনা। আমরাও নিত্য, আমরাও জগন্নির্ম্মাণের কারণ, আমরা না থাকিলে তোমার ঈশ্বর কখনই জগন্নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, তবে তুমি কি বলিয়া উঁহাকে সর্ব্বেশ্বর করিতেছ?" কাল বলিবেন, "আমাকে তুমি নিত্য বলিয়াছ, জগতের আধার

* যাহা হইতে কোন বস্তুর অবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, গঠিত হয় তাহার নাম উপাদান। যেমন ঘটের মৃত্তিকা প্রভৃতি।

বলিয়াছ, এবং জন্য বস্তুর জনক বলিয়াছ, আমি থাকিতে কেহই সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন না।" অদৃষ্টও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া বলিবেন "যতদিন আমি ততদিনই এই সৃষ্টি, আমা ভিন্ন একটি কীটাণুরও সৃষ্টি করিতে কাহার সামর্থ্য নাই, অতএব আমি বর্ত্তমানে সর্ব্বেশ্বর হন এমন কাহাকে ত দেখি না। যদি বল, আমরা জড়, তিনি সচেতন, এই তারতম্য হেতু তাঁহাকে ঈশ্বরত্ব পদে অভিষিক্ত করা হইতেছে। একথা তাদৃশ সঙ্গত নহে, কেন না তিনি যখন আমাদের উপর প্রভুতা করিতে অক্ষম তখন তিনি কখনই সর্ব্বেশ্বর নহেন।"

একথা শুনিয়া আমি কি করিব? গুণানুসারে অবশ্যই ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিয়া দিতে বাধ্য হইব। পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করুন, মিল যে ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিয়া দিয়াই খৃষ্টান সমাজের মধ্যে অনেকের নিকট নাস্তিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, সেই ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিলে হিন্দুসমাজে আমাদের কি কেহ আস্তিক বলিয়া সম্মান করিবে?

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক। কেহ বলিয়াছিল একজন নিত্যজ্ঞানাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর, নিত্য পরমাণু সমূহকে উপাদান করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, এত আড়ম্বর অপেক্ষা জগতের উৎপত্তিকে অনিমিত্ত অর্থাৎ আকস্মিক বলিলে হয়। যেমন—

"অনিমিত্ততোভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ম্যাদি দর্শনাৎ।" ৪অ, ১আ, ২২সূ।

আমরা দেখিতেছি কণ্টকাদিরও তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি কোন নিমিত্ত বা উপাদান কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি হইয়া থাকে, এইরূপ এই জগৎও কোন উপাদান বা নিমিত্ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

ইহার উত্তরে কেহ বলিয়াছিল, অনিমিত্ত হইতে যদি জগতের উৎপত্তি হয় তবে অনিমিত্তই নিমিত্ত হইল। গৌতম বলেন—

"নিমিত্তানিমিত্তয়োরর্থান্তর ভাবাদপ্রতিষেধঃ।" ৪অ, ১আ, ২৪সূ।

এই সূত্রের নবীনেরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। নিমিত্ত আর অনিমিত্ত এই দুইটি কথা ভিন্নার্থক সুতরাং ভিন্ন প্রতীতির কারণ। প্রথমে কোন বস্তুর নিমিত্তের জ্ঞান না হইলে তাহার অনিমিত্তের জ্ঞান হয় না। যদি সকল বস্তুই অকস্মাৎ উৎপন্ন হইত তবে চিরপ্রসিদ্ধ নিমিত্ত আর অনিমিত্তের প্রতীতিই থাকিত না। তাঁহারা আরও বলেন কণ্টকতৈক্ষ্ম্যাদিও অনিমিত্ত নহে ইহারা অদৃষ্টবিশেষসহকৃত পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়।

অপরে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এই জগতের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রত্যেক কার্য্যকে স্বপূর্ব্ববর্ত্তি-কার্য্যবিশেষকে বিনাশ করিয়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন পুষ্পের অনন্তর ফল, ফলের অনন্তর বীজ, বীজের অনন্তর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার কত অবস্থান্তর হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়। এবং একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে হইলে তূলরাশির কত প্রকার অবস্থান্তর করিতে হয়।

এইরূপ জগতের সমুদয় কার্য্যকেই কোন না কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অভাবান্তর উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে। অতএব অভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি বলিলে হয়।

"অভাবাদ্‌ভাবোৎপত্তি র্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ।" ৭৮সূ, ১আ ১৪সূ।

ভাবানাং কার্য্যাগমভাবাদেবোৎপত্তি র্যতোবীজাদিকমনুপমৃদ্য অঙ্কুরাদেঃ প্রাদুর্ভাবাভাবাৎ। তথাচ বীজাদি বিনাশোঽঙ্কুরাদ্যুপাদান মিতি। সূত্রবৃত্তিঃ।

গৌতম ইহার এইরূপ উত্তর করিয়াছেন যে তুমি বলিতেছ সমস্ত কার্য্যই স্বপূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যবিশেষকে বিনাশ করিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে এ কথা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয়। আচ্ছা বল দেখি উৎপন্ন পদার্থ পূর্ব্ব পদার্থের বিনাশের পূর্ব্বে অবর্ত্তমান বা বর্ত্তমান থাকে? যদি অবর্ত্তমান থাকে তবে পূর্ব্বকার্য্যের বিনাশের কারণ হইতে পারে না, আর যদি বর্ত্তমান থাকে তবে পূর্ব্ববস্তুর অভাব ইহার উৎপত্তির প্রতি কিরূপে কারণ হইবে? আরও দেখ একটি পুষ্পকে হস্তাদি দ্বারা একবারে বিদলিত করিলে তাহা হইতে কি আর ফলোৎপত্তি হয়? কোন ব্যক্তি কখন কি সম্পূর্ণ বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি দেখিয়াছেন? কখনই না। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এই চরাচর জগন্মণ্ডলের উপাদান-অভাব কখনই হইতে পারে না।

প্রতিবাদীরা এখানে অভাব শব্দদ্বারা ধ্বংসরূপ অভাবের গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তদনুরূপ দোষারোপ করিয়া মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্তরূপ অভাব জগতের উপাদানীয় বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পদার্থের যে সকল অবয়ব ও ধর্ম্ম উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব উত্তর কার্য্যের একটি নিমিত্ত কারণ আর পূর্ব্ব পদার্থের অবয়ববিশেষ উত্তর পদার্থের উপাদান। অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত পদার্থের যে সকল অবয়ব উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব হইলে অবশিষ্ট অবয়ব হইতে উত্তর পদার্থের উৎপত্তি হয়। ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে প্রথমে অঙ্কুরোৎপত্তি প্রতিবন্ধক বীজাবয়ব বিশেষের নাশ হয়, পরে বীজের অবশিষ্ট অবয়ব জলাভিষিক্ত ভূমির অবয়বের সহযোগে অঙ্কুরকে উৎপন্ন করে। তথাচ—

"ব্যাহতব্যূহানামবয়বানাং পূর্ব্বব্যূহ নিবৃত্তৌ
ব্যূহান্তরাদদ্রব্য নিষ্পত্তি র্নাভাবাৎ।" ভাষ্যম্।

বীজে বিনষ্টেহি তদবয়বে জলাভিষিক্ত ভূম্যবয়বসহিতৈরঙ্কুর আরভ্যতে। অভাবমাত্রস্য কারণত্বে চূর্ণীকৃতাদপি বীজাদঙ্কুরোৎপত্তিঃ স্যাৎ অভাবস্য নির্বিশেষত্বাদিতি ভাবঃ। ইতি সূত্রবৃত্তিঃ।

এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকেরা কেন পরমাণুকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন। তথাচ আমরা এ বিষয় কিছু উল্লেখ করিতেছি।

পরম (অতিশয়) ও অণু (সূক্ষ্ম পদার্থ) এই দুইটি শব্দের সংযোগে, পরমাণু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ, ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে পরমাণুর স্বরূপ এইরূপে কথিত হইয়াছে—

"লোষ্ট্রস্য খলু বিভজ্যমানস্যাল্পতর মল্প তম মুত্তর মুত্তরং ভবতি + + + যতশ্চ নাল্পীয়োঽস্তি তং পরমাণুং প্রচক্ষ্মহে।"

একখানি ইট ক্রমশঃ ভঙ্গ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অর্থাৎ যাহা হইতে আর সূক্ষ্ম হইতে পারে না এমন অংশকে পরমাণু বলা যায়। এই পরমাণুর অবয়ব নাই। ইহা নিত্য। এই জন্যই গৌতম মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই তিনি বলেন—

"ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ।" ৭৮অ, আ, ১৬

একটি বস্তুর অবয়বের ক্রমশঃ বিভাগ হইতে হইতে পরমাণুতে উপস্থিত হয়। পরমাণুর অবয়ব নাই, তাহার বিভাগও নাই কাযে কাযেই একবারে সর্ব্বপ্রলয় হয় না।

পরমাণু হইতে যে কিরূপে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তর্কসংগ্রহের টীকা নীলকণ্ঠিতে অতি সরলরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

"ঈশ্বরস্য চিকীর্ষাবশাৎ পরমাণুষু ক্রিয়া জায়তে। ততঃ পরমাণুদ্বয় সংযোগে সতি দ্ব্যণুক মুৎপদ্যতে, ত্রিভির্দ্ব্যণুকৈ স্ত্র্যণুক মুৎপদ্যতে। এবং চতুরণুকাদি ক্রমেণ মহাপৃথিবী, মহত্যাপঃ মহত্তেজো মহান্ বায়ুরুৎপদ্যতে।"

ঈশ্বরের সিসৃক্ষা হইলে পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়াদ্বারা পরমাণুদ্বয় মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুকরূপে পরিণত হয়; তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়; এইরূপে ক্রমেতে বিবিধ নদ নদী, সমুদ্র এবং পর্ব্বতাদি-সমাকীর্ণ ভূলোক ও তেজোময় সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ভাল এইরূপে সৃষ্টি হউক কিন্তু পরমাণুর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ যেরূপে পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"জালসূর্য্যমরীচিস্থং সূক্ষ্মতমং যদ্রজ উপলভ্যতে তৎ সাবয়ং। চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ। পটবৎ। ত্র্যণুকাবয়বোঽপি সাবয়বঃ মহদারম্ভকত্বাৎ। যোদ্ব্যণুকাবয়বঃ সএব পরমাণু।"

দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি পরিমাণমহত্ত্বের কারণ ; যে সকল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইবে তাহাদের পরিমাণ মহৎ হওয়া চাই, অর্থাৎ তাহাদের অবয়ব থাকা চাই। এক্ষণে দেখ আমরা গবাক্ষগত সূর্য্যকিরণস্থিত যে সকল অতি সূক্ষ্ম রজঃকণা দেখিতে পাই তাহাদের অবশ্যই অবয়ব আছে নতুবা তাহারা চাক্ষুষ হইত না। তাহাদের এক একটি ছয়টি ত্র্যণুক দ্বারা উৎপন্ন। আরও দেখ যাহারা সাবয়ব তাহারাই মহদারম্ভক অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদান হয় ; অতএব ত্র্যণুকের ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদান হইতেছে অতএব উহারাও সাবয়ব, উহাদের অবয়ব আছে। ত্র্যণুকের অবয়ব যে পরমাণু ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পরমাণুর আর অবয়ব নাই তাহা হইলে অনবস্থা হয়। পরমাণুর যদি অবয়ব থাকে, সেই অবয়বের অবয়বও মানিতে হয়, আবার সেই অবয়বাবয়বের অবয়বও মানিতে হয় এইরূপ মানিতে মানিতে এক স্থানে অবশ্যই বিশ্রাম করিতে হইবে। যেখানে বিশ্রাম করিতে হইবে সেই পরমাণু।

প্রথম প্রস্তাব

মেঘদূত

আম্রকূট পর্ব্বতের পর বিন্ধ্যপাদশোভিনী নর্ম্মদা নদী মেঘের নয়নপথে পতিত হয়। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর বিবরণ আধুনিক ভূগোলে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বর্ণিত আছে। পুরাণাদিতেও এই পর্ব্বত ও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুরাণের নির্দ্দেশানুসারে বিন্ধ্য পর্ব্বত সপ্তকুলাচলের অন্যতম।(১) মেজর উইলফোর্ড প্রাচীন ভূগোলানুসারে ইহা তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ভাগত্রয়ের মধ্যে প্রথম অথবা পূর্ব্বভাগ বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা ও শোণের উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঋক্ষ পর্ব্বত এই অংশের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অথবা পশ্চিমভাগ নর্ম্মদা ও শোণের উদ্ভবক্ষেত্র হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই দক্ষিণাংশ পারিপাত্র অথবা পারিযাত্র নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ ভাগ দিল্লী হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভাগ রৈবতক নামে অভিহিত হইয়া থাকে(২)। যাহা হউক, আধুনিক ভূগোলের মতে বিন্ধ্যাচল গুজরাট হইতে গঙ্গার তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা ১,০০০ (কোন কোন মতে ২৫০০) হইতে ৩০০০ ফীট। দৈর্ঘ্য প্রায় সার্দ্ধৈক শত মাইল। বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই ভাগদ্বয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীকগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে বিন্ধিয়ান (Vindian) নামে নির্দ্দেশ করিতেন।(৩)

মেঘদূতোক্ত রেবাই নর্ম্মদা নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কোষকার অমরসিংহ রেবা ও নর্ম্মদা উভয়কেই এক পর্য্যায়ে নিবেশিত করিয়াছেন(৪)। বিষ্ণুপুরাণে বিন্ধ্যপর্ব্বত-

(১) মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষ পর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

(২) As. Res. Vol. xiv. p. 382—Wilford, Ancient Geography of India.

(৩) Works of Sir W. Jones. Vol. i. p. 23.

(৪) "রেবাতু নর্ম্মদা সোমোদ্ভবা মেখলকন্যকা।" অমরকোষ।

সম্ভূত নদীসমূহের মধ্যে নর্ম্মদা নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৫)। বায়ুপুরাণের মতে এই নদী ঋক্ষপর্ব্বতসম্ভূত।* বস্তুত নর্ম্মদা বিন্ধ্যপর্ব্বত সংলগ্ন অমরকণ্টকের আলক্ষেত্র হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।† এক্ষণেও অমরকণ্টকে নর্ম্মদা নদীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। লোকে ভবানী বলিয়া এই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। মূর্ত্তির নিকটে একটি দাসী ও বৈবাহিক ভোজের অনুষ্ঠানকারী কতকগুলি লোকের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। এই দাসীর নাম জোহিল্লা। নর্ম্মদা এরূপভাবে অবস্থাপিত রহিয়াছেন যে দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন কোন গুরুতর অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ অপরাধিনী জোহিল্লার প্রতি বারম্বার রোষকষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে; প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে এইস্থলে তাহা যথাবৎ লিখিত হইল:—

একদা শোণ নদ নর্ম্মদার অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন; এবং এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে নর্ম্মদার নিকট আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। নর্ম্মদা শোণের বেশভূষা ও বৈবাহিক যাত্রার বিবরণ জানিবার নিমিত্ত জোহিল্লাকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন। জোহিল্লার প্রতি এরূপও আদেশ হয় যে, যদি শোণ মহার্হ-মণিমণ্ডিত, কমনীয় দেহ ও উন্নতচরিত্র হয়েন, তাহা হইলে যেন তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক অমরকণ্টকে আনা হয়। জোহিল্লা স্বামিনী কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া শোণের নিকট গমন করে। এ দিকে শোণ মহদাড়ম্বর সহকারে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ করেন। জোহিল্লা নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইয়া শোণের তদানীন্তন বেশপারিপাট্য, অনুপম সৌন্দর্য্য ও কমনীয় দেহভঙ্গিমায় এরূপ আকৃষ্ট হয় যে, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া স্বয়ংই নর্ম্মদার রূপ ধারণ পূর্ব্বক শোণকে পতিত্বে বরণ করে। অনন্তর শোণ ও জোহিল্লা অমরকণ্টকে সমাগত হইলে নর্ম্মদা দাসীর এই কুব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মুখ বিকৃত করেন। এইজন্য জোহিল্লার প্রতিমূর্ত্তি বিকৃতমুখ হইয়া রহিয়াছে। পরিশেষে তিনি শোণকে অধিত্যকা প্রদেশ হইতে পর্ব্বতপাদদেশে নিক্ষেপ করেন। এই পাদভূমি হইতে শোণের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপে উভয় পক্ষের শাস্তিবিধান করিয়া নর্ম্মদা অন্তর্হিত হয়েন। এই অন্তর্দ্ধান স্থান হইতেই নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এদিকে জোহিল্লার নয়নবারি একটি ক্ষুদ্র নদীরূপে পরিণত হয়। এই নদীও জোহিল্লা

---

(৫) "নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ।" বিষ্ণুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

* Wilson's Vishnu Purana. Ed. by Hall. Vol. ii. p. 131, note 1.

† Malcolm's Central India, Vol. ii. p. 507. Com. Thornton; Gazetteer of India Vol. iii. p. 724.

নামে প্রসিদ্ধ। অমরকণ্টক পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে (৫)।

আমাদের পিতৃপুরুষগণ সিন্ধু সরস্বতীর ন্যায় নর্ম্মদাকেও দেবীভাবে অর্চ্চনা করিতেন, নর্ম্মদার প্রতিও তাঁহাদের দেবীজনোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এতন্নিবন্ধন পুরাণাদিতে নর্ম্মদার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণে এবিষয়ে একটী সুন্দর স্তোত্র দৃষ্ট হয়। এই স্থলে উহার কিয়দংশ গৃহীত হইল :—

"সূর্য্য এবং চন্দ্র তোমার উজ্জ্বল চক্ষুঃ তোমার ললাট-নেত্র অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। * * তোমার সমক্ষেই অন্ধকাসুরের শোণিত বিশুদ্ধ হইয়াছে। তোমার তুষারদুর্গ মানবজাতির ভীতি নিবারণ করিতেছে। ব্রহ্মা ও শিব তোমার স্তুতিগান করেন, মর্ত্ত্যগণ তোমার অর্চ্চনা করে, এবং ঋষিগণ তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন; দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ তোমার সন্তান। সূর্য্য হইতে তোমার উৎপত্তি তুমি মহাসাগরে সম্মিলিত হইয়াছ। তোমার দ্বারাই মর্ত্ত্যগণ পবিত্র রহিয়াছে। তুমি সমস্ত অভাব মোচনকারিণী। যাহারা তদ্গত চিত্তে তোমার অর্চ্চনা করে, তুমি তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কুশল বর্দ্ধন কর। তোমাদ্বারাই মর্ত্ত্যগণ দুঃখের আগার পরিহার করিয়া সুখময় প্রদেশে পরিচালিত হইতেছে।"

সমুদ্রতল হইতে নর্ম্মদার উদ্ভবক্ষেত্রের উচ্চতা সম্ভবতঃ ৩,০০০ ও ৪,০০০ ফীটের মাঝামাঝি। এই উদ্ভব-স্থান ব্রিটিশাধিকৃত রামগড় বিভাগের অন্তর্গত। নর্ম্মদা গোন্দয়ানা হইতে মালব ও খান্দেশ প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক গুজরাট দিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০১ (কোন কোন মতে ৭৫৬) মাইল।* ইহা অতি সরল পথে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। নর্ম্মদার ন্যায় সরলগামিনী নদী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ গতির সারল্য বিষয়ে এই নদী সর্ব্বাগ্রগণ্য। নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৯ মিনিট, দ্রাঘিমা ৮১ ডিগ্রি, ৪৯ মিনিট এবং সাগরসঙ্গম-স্থানের অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭২ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট।†

যদিও নর্ম্মদার উপত্তি স্থান ব্রিটিশ সীমার অন্তর্গত, তথাপি ইহার বিষয় অদ্যাপি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই। টিফেনথলার ও কাপ্তেন ব্লাণ্ট যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদনুসারে নর্ম্মদা একটি অক্ষয়বারিপূর্ণ কুণ্ড হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে।‡ এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিক কারুকার্য্যখচিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রচলিত কিম্বদন্তী

(৫) As. Res. Vol. p. 102-103.

* Thornton, Gazetteer of India. Vol. iii. p. 728.

† Ibid. p. 725, p. 728.

‡ As. Res. Vol. vii. p. 100—Captain J. T. Blunt, Narrt. of a route from Chunarghar to Yartnagoodum.

অনুসারে রেবা নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রেবার নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যগত স্থান হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই নর্ম্মদার আর একটি নাম রেবা।(৬) মিসর দেশীয় ভূগোলবেত্তা টলেমী নর্ম্মদাকে "নমদাস" (Namadas) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।(৭)

নর্ম্মদার অন্যতম নাম মেখল (মেকল) কন্যকা। জনপ্রবাদ অনুসারে মেখল নামে একজন ঋষি নর্ম্মদার পিতা ছিলেন, এইজন্য নর্ম্মদা মেখলকন্যকা নামে অভিহিত হইয়াছে। বিন্ধপর্ব্বত শ্রেণীর যে অংশস্থ মালক্ষেত্র (Fable land) হইতে নর্ম্মদার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও মেখলাদ্রিনামে প্রসিদ্ধ।(৮) বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটে নর্ম্মদার পার্শ্বভাগে মেখল নামে একটি জনপদ আছে। রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশসমূহের বিবরণের প্রসঙ্গে বিন্ধ্য, নর্ম্মদা প্রভৃতির পর মেখল জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।(৯) মেজর উইলফোর্ডের তালিকায় বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে মেখল জনপদ সমাবেশিত হইয়াছে।* ইহাতে বোধ হয় এই মেখল জনপদ হইতেই মেখলাদ্রি ও মেখলকন্যকা নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর পর মেঘদূতে দশার্ণ জনপদের নাম দৃষ্ট হয়। মেঘসমাগমে দশার্ণের যেরূপ দৃশ্য হইবে, কালিদাসের রসময়ী লেখনী হইতে তাহার এইরূপ বর্ণনা বহির্গত হইয়াছে।

> "পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ
> নীড়ারম্ভৈ র্গৃহবলিভুজা মাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
> ত্বয্যাসন্নে পরিণত ফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
> সম্পৎস্যন্তে কতিপয় দিনস্থায়ী হংসা দশার্ণাঃ॥"

(হে মেঘ!) তুমি সন্নিকৃষ্ট হইলে অগ্রস্ফুট কেতকীকুসুমসমূহে দশার্ণের উপবন-বৃত্তি পাণ্ডুবর্ণ হইবে। গৃহবলিভোজী পক্ষিগণ (আপনাদের) কুলায় নির্ম্মাণে (ব্যতিব্যস্ত হইয়া) গ্রামের রথ্যা বৃক্ষসমূহকে আকুল করিবে। জম্বুবন পরিপক্ব ফলে

(৬) As. Res. Vol. vii p. 102.

(৭) Vide Professor Wilson's Vishnu Purana. Ed. by Fitzedward Hall. Vol. ii. p. 131, note 1.

(৮) Ibid. p. 160, note 4.

(৯) সহস্রশিরসং বিন্ধ্যংনানাদ্রুমলতাবৃতম।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগ নিষেবিতাম॥
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেখলানুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি॥
রামায়ণ। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ৪১ সর্গ ৮ ৯

* As. Res. Vol viii. p 337—Wilford, Essay on the sacred Isles in the west.

শ্যামবর্ণ হওয়াতে দশার্ণের রমণীয় দৃশ্য হইবে (এবং) হংসগণ কিয়ৎকাল (তথায়) অবস্থান করিবে।

এই দশার্ণ জনপদের ভৌগোলিক তত্ব তাদৃশ পরিস্কৃত ও সহজবোধ্য নয়। রামায়ণে সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে দক্ষিণবর্ত্তী স্থানাদির বিবরণমধ্যে এবং মহাভারতে ভীমসেনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে গঙ্গানদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহের মধ্যে দশার্ণের উল্লেখ আছে (১০)। টলেমী 'দশরেণ' (Dosarene) নামে একটি স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১১)। মেজর উইলফোর্ডের মতে এই দশরেণ ও দশার্ণ উভয়ই অভিন্ন স্থান। উইলফোর্ড পৌরাণিক স্থানসমূহের যে তালিকা করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে (১২)। অধ্যাপক উইলসন্ দশ (দশ সংখ্যক) ঋণ [দুর্গ] এই ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দশার্ণ জনপদ ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন। কারণ, ছত্রিশ গড় [ছত্রিশ ষড়ধিক ত্রিংশৎগড় দুর্গ] ও দশার্ণ একবিধ ব্যুৎপত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। (১৩) ডাক্তার হলের মতে দশার্ণ চান্দেরি বিভাগের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (১৪) পুরাণে দশার্ণ নামে একটি নদীর উল্লেখ আছে। (১৫) ইহার বর্ত্তমান নাম দশান। অধ্যাপক লাসেন ও মেজর উইলফোর্ড এই দশানকে দশার্ণ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নদী ভূপাল হইতে প্রবাহিত হইয়া বেত্রোয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। (১৬) আমাদের বিবেচনায় দশার্ণ জনপদ এই দশান নদীর নিকটবর্ত্তী। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারেও দশান নদীর সমীপবর্ত্তী প্রদেশ দশার্ণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। (১৭) চিরাগত জনশ্রুতি নিরবচ্ছিন্ন অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। এতদ্দ্বারা হল সাহেবের

---

(১০) ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেখলানুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি॥
রামায়ণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। (পূর্ব্বের নোট দেখ)।
"ততঃ স গণ্ডকান্ শূরো বিদেহান্ ভরতর্ষভঃ।
বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ॥"
মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়।২৮।
Comp. Journ. As. Soc. Beng. 1876 No iii. p. 373

(১১) Wilson's Meghaduta, verse 154, note.

(১২) As. Res. Vol. viii. p. 337.

(১৩) Wilson's Meghaduta, verse 154, note.

(১৪) Journ. Am. Oc. Soc. vi. p. 521, Comp. Wilson's Vishnu Purana. Vol. ii. p. 160. F. E. Hall's note.

(১৫) Wilford, Ancient Geography of India in As. Res. Vol. xiv. p. 405, 408.

(১৬) Wilson's Vishnu Purana, Vol. ii. p. 155. F.E. Hall's note Comp. As. Res. Vol. xiv. p. 408.

(১৭) Wilson's Vishnu Purana, Vol. ii. p. 160. F. E. Hall's note.

সিদ্ধান্তই ভ্রমশূন্য বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ চন্দেরীর পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী এবং বেতোয়া দশান ও ভিলশার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগকেই দশার্ণ নামে নির্দ্দেশ করা অধিকতর সঙ্গত।

মেঘদূতের বর্ণনানুসারে দশার্ণ জনপদের রাজধানী বিদিশা। (১৮) বেতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান ভিল্‌শা নগরই কালিদাসের দশার্ণ রাজধানী বিদিশা বলিয়া বোধ হয়। (১৯) রামগিরি হইতে সহজ পথে কৈলাসে যাইতে হইলে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী অতিবাহনের পর ভিল্‌শা নগরই সম্মুখে পতিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। এইজন্য আমরা অধ্যাপক উইল্‌সনের মতানুসারে ভিল্‌শাকেই বিদিশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

ডাক্তার হল ভিল্‌শার দুর্গে একখানি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হয়েন; এই ফলকে যে সকল কবিতা খোদিত ছিল, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ খণ্ডিত। হল সাহেব কবিতার অপরাংশের এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

"+ + + প্রিয়ময়মপি নগ্নাশ্রিতা নাহশ্রিতাংস্য
গেহং মে বেত্রবত্যা নিয়মিতজনতাক্ষোভমস্যাপ্যজস্রম্।
তেজোময্যত্র চোচ্চৈর্বিতত্তমিতি বিদিত্বাহ দরেণাস্বতুলাং
ভাইল্ল স্বামিনাম্না রবিরবতু ভুবঃ স্বামিনং কৃষ্ণরাজম্॥
চেদীশং সমরে বিজিত্য শবরং সংহৃত্য সিংহাহ্বয়ং
রাণামণ্ডল রোদপাদ্য বলিপো ভূম্না' প্রতিষ্ঠাপ্যচ।
দেবং দ্রষ্টুমিহাগতো রচিতবাংস্তোত্রং পবিত্রং পরং
শ্রীমং কৃষ্ণনৃপৈক মন্ত্রিপদভাক্‌কৌণ্ডিল্য বাচস্পতিঃ।"

এই কবিতা দুটির ভাবার্থ এই, "কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি নামক জনৈক ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান বেত্রবতী নদীর তটে অবস্থিত ছিল। তিনি একদা সমরে চেদীশ্বরকে পরাজয় ও তদীয় জনৈক সেনাপতিকে নিহত করিয়া রাণা ও রোদপাদি জনপদে আধিপত্য করেন। ইহার পর কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি রাজা কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি এইস্থানে আসিয়া স্বীয় প্রভু কৃষ্ণের রক্ষা বিধান জন্য ভাইল্ল স্বামী নামধেয় সূর্য্যের স্তব করিয়াছেন।" সংস্কৃত বিদিশা এই ভাইল্ল স্বামী হইতে ভিল্‌শা নামে পরিণত হইয়াছে। হল সাহেব বলেন এক সময়ে এই স্থানের লোকে সূর্য্যকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ মনে করিত। স্থানীয় নির্দ্দেশানুসারে এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম

(১৮) "তেষাং দিক্ষু প্রথিত বিদিশালক্ষণাং রাজধানীং" ইত্যাদি। মেঘদূত। ২৫।
(১৯) Vide Wilson's Meghaduta. verse 161, note.

"ভাইল্ল" (২০)। এই ভাইল্ল শব্দের উত্তর স্বামি-বোধক ঈশ শব্দ যোগ করিলে ভাইল্লেশ পদ সিদ্ধ হয়। 'ভাইল্লেশ' কালক্রমে সংহত ও অল্পাক্ষরগ্রথিত হইয়া 'ভেল্‌শ' অথবা "ভিল্‌শা" নামে প্রচারিত হইয়াছে (২১)।

ভিলশা নগর গোয়ালিয়র রাজ্যে বেতোয়া নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে উজ্জয়িনী হইতে ১৫৪ মাইল এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র হইতে ১৯০ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ সহস্র। এই স্থানে একটী দুর্গ আছে, ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের স্থানে স্থানে চতুষ্কোণ গুম্বজ আছে। একটী খাত এই দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে (২২)। এই নগরে সাড়ে নয় ফীট দীর্ঘ একটী উৎকৃষ্ট পিত্তলের কামান আছে। কামানের মুখ দশ ইঞ্চ প্রশস্ত। ইহা অতি সুগঠিত ও নানাবিধ কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। অনেকে বলেন, এই কামান মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল (২৩)। নগরের বহির্ভাগে কতিপয় প্রশস্ত রাস্তা ও সুন্দর গৃহ আছে। প্রাচীনকালে ভিল্‌শা একটী বৃহদায়তন রাজ্য ছিল। ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অজয়পালের প্রধান মন্ত্রী সোমেশ্বর ভিল্‌শা রাজ্যের দ্বাদশটি বিভাগে আধিপত্য করেন (২৪)। যাহা হউক ১২৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ভিল্‌শা হিন্দু রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল, পরে দিল্লীর সম্রাট সমসউদ্দীন আলতমাস উহা আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (২৫)। কালক্রমে এই স্থান দিল্লীর শাসনভ্রষ্ট হইলে ১২৯৩ অব্দে জেলালউদ্দীন ফিরোজের জনৈক সেনাপতি আবার উহা অধিকার করেন (২৬)। ইহার পরে ভিল্‌শা পুনর্ব্বার হিন্দুদিগের করতলগত হয়। হিন্দুগণ ভারতে মোগল রাজ্য সংস্থাপয়িতা বাবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে আধিপত্য করেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইহা বাবরের পুত্র

(২০) হল সাহেবের মতে ভা (দীপ্তি) ও প্রাকৃত ইল্ল (নিক্ষেপ করা) হইতে 'ভাইল্ল' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। F. E. Hall, Three Sanskrit Inscriptions, in Journ. As. Soc. Beng. No. ii 1862. p. 112 note. Comp. Wilson' Vishna Purana. ii. 150.

(২১) Journ. As. Soc. Beng. 1862, p. 112, note.

(২২) As. Res. Vol. vi. p. 30.—Hunter, Narr. of Journ, from Agra to Oujein.

(২৩) Or. Mag. Vol. viii. p. clxxxviii.

(২৪) "সংবৎ ১২২৯ বর্ষে বৈশাখসুদি ৩ সোমে। অদ্যেহ আমদণহিল পদাঙ্ক সমস্ত রাজাবলিবিরাজিত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর শ্রীঅজয় পাল দেব কল্যাণ বিজয়রাজ্যে তৎপাদপদ্মোপজীবি মহামাত্য শ্রীসোমেশ্বরে শ্রীশ্রীকরণাদৌ সমস্ত মুদ্রা ব্যাপারান্ পরিপন্থয়তীত্যে-বংকালে প্রবর্ত্তমানে নিজ প্রতাপোপার্জ্জিত শ্রীভাইল্ল স্বামি মহা দ্বাদশক মণ্ডল প্রভুজ্য মানে" ইত্যাদি। (প্রস্তর ফলকাঙ্কিত লিপি) Vide Journ. As. Soc. Bengal No. ii. 1862. p. 125-126—F. E. Hall, Three Sanskrit Inscriptions.

(২৫) Ferishta, i. 211

(২৬) Ibid. i. 303

হুমায়ুন কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। হুমায়ুনের পর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সেরসাহ এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পর ভিল্‌শা ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের রাজ্যান্তর্গত হয় (২৭)।

বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে ভিল্‌শাতে উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। অস্মদ্দেশে ভ্যাল্‌শা তামাক বলিয়া যে উৎকৃষ্ট তামাক প্রচলিত আছে, তাহা এই ভিল্‌শাতে জন্মিয়া থাকে। ভিল্‌শা নগরোৎপন্ন বলিয়া ইহা ভ্যাল্‌শা তামাক নামে প্রসিদ্ধ (২৮)। ভিল্‌শার অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি, ৩০ মিনিট এবং দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি, ৫০ মিনিট।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভিল্‌শা বেতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত ; মেঘদূতে বিদিশার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বেত্রবতী নদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এই বেতোয়া নদী। মেজর উইলফোর্ডের পৌরাণিক নদীসমূহের তালিকাসমূহের বেদস্মৃতি, বেত্রবতী প্রভৃতি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (২৯)। বিষ্ণুপুরাণেও পারিপাত্রসম্ভূত নদীসমূহের মধ্যে বেদস্মৃতি প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয় (৩০)। রাজনির্ঘণ্টতে বেত্রাবতী (পৌরাণিক বেত্রবতী, আধুনিক বেতোয়া) (৩১) নদীর জল সুমধুর, কান্তিপ্রদ পুষ্টিদ প্রভৃতি বিশেষণান্বিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩২)। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, বেত্রাসুর মানুষরূপিণী বেত্রবতী নদীর উদরে জন্মগ্রহণ করে। উক্ত পুরাণে বেত্রাসুরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই নদীর উল্লেখ আছে।*

এই বেত্রাবতী বা বেতোয়া ভূপালরাজ্যে—ভূপাল নগরস্থ প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকার দেড় মাইল দক্ষিণবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের

---

(২৭) Ibid. iv. 239

(২৮) Hunter, et supra, 30 Rennell. Hindustan, 233. Comp. Thornton, Gazetteer i. 399-400, Hamilton, Hindustan, i. 757-758.

অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মহাভারতোক্ত নদীসমূহের তালিকায় বিদিশা নামে একটি নদীর নাম দৃষ্ট হয়। ভিল্‌শার নিকটে "বেস্" নামে একটী নদী বেতোয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। উইলসনের মতে এই নদীই মহাভারতের "বিদিশা।" Vide Wilson's Vishna Purana ii. p. 150 note 6.

(২৯) As. Res. viii. p. 335—Wilford, Essay on the sacred Isles in the west.

(৩০) "বেদস্মৃতি মুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে!"

বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

(৩১) শব্দকল্পদ্রুমে বেত্রাবতী শব্দ দেখ। Comp. Wilson's Vishnu Purana ii. p. 147 F. E. Hall's note.

(৩২) "তত্রাম্ভো দধতে জলং সুমধুরং কান্তিপ্রদং পুষ্টিদম্।
বৃষ্যং দীপনপাচনং বলকরং বেত্রাবতী তাপনী॥"

* "ততঃ কালেন মহতী নদী বেত্রাবতী শুভা।
মানুষং রূপমাস্থায় সালঙ্কারা মনোরমম্।"
আজগাম যতো রাজা তেপে পরমকং তপঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বরাহ পুরাণ বচন।

অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি ১৪ মিনিট এবং দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি ২২ মিনিট। উৎপত্তি স্থান হইতে এই নদী ভূপাল হইতে হোসেঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া সুতাপুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সুতাপুর হইতে ইহা উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩৫ মাইল গিয়াছে। ইহার পর ভিল্‌শার নিকট গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রায় ১১৫ মাইল যাইয়া বুন্দেলখণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে, এবং বুন্দেলখণ্ড হইতে ১৯০ মাইল অতিবাহন করিয়া হামিরপুরের নিকট যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট এবং দ্রাঘিমা ৮০ ডিগ্রি ১৭ মিনিট। বেতোয়ার দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। ইহার অধিকভাগই উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদীর দৃশ্য আলেখ্যবৎ রমণীয়তায় সুশোভিত। এই রমণীয় দৃশ্য দর্শকমাত্রের হৃদয়েই অনুপম আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। দশার্ণ প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র নদী বেতোয়াতে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বেতোয়ার বিস্তার এক হইতে দুই মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (৩৩)।

বিদিশা ও বেত্রবতী নদী অতিক্রম করিয়া মেঘ নীচৈঃ পর্ব্বতে উপনীত হয়। কালিদাসের বর্ণানুসারে এই পর্ব্বত কদম্ববনে সমাকীর্ণ। মেঘসমাগমে এই কদম্ব-কুসুম বিকশিত হইয়া পর্ব্বতের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কালিদাস কোন্ পর্ব্বতকে নীচৈঃ নামে বিশেষিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ মালব প্রদেশের কোন অনুচ্চ পর্ব্বতই মেঘদূতে নীচৈঃ নামে আখ্যাত হইয়াছে। পুরাণাদিতে নীচৈঃ পর্ব্বতের কোন নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয় না। অধ্যাপক উইল্‌সনের মতে অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ ও অনুচ্চ পর্ব্বতই মেঘদূতের এই নীচৈঃ গিরি (৩৪)। নীচৈঃ (নিম্ন) এই সংজ্ঞাতেও পর্ব্বতের নিম্নত্ব ও ক্ষুদ্রাবয়বত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যক্ষদূত মেঘ নীচৈঃ গিরিতে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক নবজলকণা দ্বারা নগনদীতীরজাত মাগধী কুসুম মুকুল সমূহ আর্দ্র করিয়া পুনর্ব্বার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হয়। যথা ;—

"বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ নগনদীতীরজাতানি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকা জালকানি।"

মেঘদূতের এই "নগনদী" পাঠের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ নগনদীর অস্তিত্ব বিলোপ পূর্ব্বক "বননদী" কেহ কেহ আবার বননদীরও অস্তিত্ব বিলোপ পূর্ব্বক নদনদী অথবা নবনদী পাঠ করেন। পাঠের এইরূপ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন অর্থেরও বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটিত হয়। "বননদী" পাঠে "বনস্থিত নদী সমূহ"

---

(৩৩) Atkinson, Statistical Descriptive and Historical Account of the N. Western Provinces of India, Vol. i. p. 391 Comp. Thornton, Gazetteer of India, Vol. i. p. 378-379, Hamilton, Hindustan Vol. i. p. 732.

(৩৪) Wilson's Meghaduta, verse 167, note.

এইমাত্র অর্থ বোধগম্য হইয়া থাকে, সুতরাং এতদ্দ্বারা কোন বিশেষ নদীর নির্দ্দেশ হয় না। "নদনদী" অথবা "নবনদী" পাঠ অনেকে তাদৃশ সমীচীন বলিয়া গণনা করেন না। বস্তুতঃ এই পাঠে প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি ও স্ফুটত্ব সম্বন্ধে অনেকটা ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, মেঘের গতি এক্ষণে মালব প্রদেশ দিয়া হইতেছে। এই প্রদেশ বিবিধ স্রোতস্বতীতে পরিব্যাপ্ত। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, "মালব প্রদেশে দুই তিন ক্রোশ গেলেই স্রোতস্বতীসমূহ নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত নদীর জল অতি নির্ম্মল, তটদেশ বিবিধ বন্যবৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল এবং সুরম্য ও সুগন্ধ পুষ্পসমূহে সুশোভিত"। (৩৫) আবুল ফজিল মালববাহিনী নদী সমূহের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত কালিদাস কৃত বর্ণনার সম্পূর্ণ একতা লক্ষিত হইতেছে। কালিদাস যেরূপ মালবস্থ নদীর তীরজাত মাগধী কুসুমসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরে আবুলফজিলও সেইরূপ মালবের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার নদীসমূহের তটভূমি মনোহর পুষ্পরাজিতে সমলঙ্কৃত বলিয়াছেন। কালিদাস যে বর্ণনীয় স্থানাদির বিবরণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন এইরূপ সামঞ্জস্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিসর্গপটের ঈদৃশী সূক্ষ্ম বর্ণনায় কালিদাসের গ্রন্থ জগতে অতুল্য।

"নগনদী" পাঠ প্রশস্ত হইলে উহা কোন্ বিশেষ নদীর দ্যোতক এক্ষণে তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। নগনদীর সাধারণ অর্থ পর্ব্বতসম্ভবা নদী। এই অর্থের অনুসরণ পূর্ব্বক সন্নিবেশ স্থান নিরূপণ করিলে পার্ব্বতী নদীর সহিত নগনদীর অভিন্নতা কল্পিত হইতে পারে। (৩৬) পার্ব্বতী ও পর্ব্বতসম্ভবা উভয়ই একার্থবোধক শব্দ; সুতরাং উভয়কেই এক পর্য্যায়ে নিবিষ্ট করিয়া একতরের অবস্থানসন্নিবেশ নির্দ্ধারণ করিলেই অন্যের অবস্থানপরিজ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পারে। পরন্তু কৈলাসযাত্রী মেঘ এক্ষণে যে স্থান অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পার্ব্বতী নদীও ঠিক্ সেইস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল কারণে নগনদীকেই পার্ব্বতীনদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় আমাদিগকে তাদৃশ অসঙ্গত ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না।

(পার্ব্বতী) এই নদী মালব প্রদেশের অন্তর্গত। ইহা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরাংশে উৎপন্ন হইয়া চম্বল নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২২০ মাইল। এই নদী প্রথমে উত্তর পূর্ব্বদিকে ৮০ মাইল যাইয়া পরে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট, দ্রাঘিমা

---

(৩৫) Gladwin's Ayin Akbari, Vol. ii. p. 43.
(৩৬) Vide Wilson's Meghaduta, verse 171 note.

৭৫ ডিগ্রি ৩৩ মিনিট এবং সঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫০ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট (৩৭)

গোয়ালিয়র রাজ্যেও পার্ব্বতী নামে এক ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহা সিপ্রিনগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর দিকে ৪০ মাইল গিয়াছে, পরে পূর্ব্বদিকে ৫০ মাইল যাইয়া সিন্ধুনদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৩১ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি ৪৬ মিনিট। এই পার্ব্বতী নদী মালববাহিনী পার্ব্বতীর পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে (৩৮)। যাহাহউক, এই নদীর সহিত মেঘদূতের নগনদীর কোনও সংশ্রব নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই নদীর উৎপত্তি স্থান সিপ্রিনগরের নিকটবর্ত্তী! সিপ্রি গোয়ালিয়র নগরের ৬৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং ইহা মেঘ এক্ষণে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বহুদূরে পড়িতেছে। যদি পার্ব্বতীর সহিতই নগনদীর অভিন্নতা কল্পিত হয়, তাহা হইলে গোয়ালিয়রস্থ পার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে মালবস্থ পার্ব্বতীকেই নগনদী বলা অধিকতর সঙ্গত।

পুরাণাদিতে পারা নামে একটি ক্ষুদ্র নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩৯) মেজর উইলফোর্ড সিন্ধুসম্মিলিত পার্ব্বতীকেই পারা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৪০) অধ্যাপক উইলসনের মতে আবার মালবের পার্ব্বতীই পুরাণে 'পারা' নামে আখ্যাত হইয়াছে। (৪১) এইরূপে উভয় পার্ব্বতীকেই "পারা" নামে নির্দ্দেশ করা কতদূর সঙ্গত, বলিতে পারি না। মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যানে পারা নদীর উল্লেখ আছে। এই পারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদের প্রান্তবাহিনী। পূর্ব্বে এই নদী কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে পারা নামে অভিহিত হয়। (৪২) হিমালয়ের প্রস্থে বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হইলে মেনকা সদ্যোজাত কন্যারত্নকে

(৩৭) Thornton, Gazetteer of India Vol. iv. p. 84.
(৩৮) Ibid. Ibid.
(৩৯) As. Res. Vol. viii. p. 335.
(৪০) As. Res. Vol. xiv. p. 408.
(৪১) Wilson's Vishna Purana Ed. by Hall Vol, ii p 147, note 5
(৪২) শৌচার্থং যো নদীং চক্রে দুর্গমাং বহুভির্জলৈঃ।
যাং তাং পুণ্যতমাং লোকে কৌশিকীতি বিদুর্জনাঃ॥
বভার যত্রাস্য পুরাকালে দুর্গে মহাত্মনঃ।
দারান্মতঙ্গো ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি র্ব্যাধতাং গতঃ॥
অতীতকালে দুর্ভিক্ষে অভ্যেত্য পুনরাশ্রমম্।
মুনিঃ পারেতি নদ্যা বৈ নাম চক্রে তদা প্রভুঃ॥
মহাভারত। আদিপূর্ব্ব। সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়। ২৯২৪।২৯২৫।২৯২৬।
এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কেহ কেহ গঙ্গার অন্যতম করদা কুশী নদীকে "কৌশিকী" নামে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু মহাভারতের সহিত এইরূপ নির্দ্দেশের একতা লক্ষিত হয় না।

মালিনী নদীর তীরে রাখিয়া স্বস্থানে গমন করে। শকুন্তলা এই মালিনীতটবর্ত্তী মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েন। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে হিমালয় প্রদেশে কণ্বের আশ্রম ছিল।* সুতরাং মেনকার বিলাসক্ষেত্র পারা-তীরবর্ত্তী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম যে ইহারই সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এই উপাখ্যানানুসারে একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী লাডক প্রদেশে পারা নামে একটী নদী আছে। এই নদী পারাটি নামেও উক্ত হইয়া থাকে। ইহা পশ্চিম হিমালয়ের পর গিরিসঙ্কটের উত্তর পূর্ব্বাংশে উৎপন্ন হইয়া ১৩০ মাইল গমন পূর্ব্বক শতদ্রুর করদ স্পিটি নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। (৪৩) আমাদের মতে মহাভারত ও পুরাণাদির 'পারা' লাডক বাহিনী এই 'পারা' অথবা 'পারাটী' নদী। মহাভারতের বর্ণনানুসারে মহাভারতীয় 'পারা' নদী নিরূপণ করিতে হইলে লাডকের পারাকেই নির্দ্দেশ করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। এই নদীর সন্নিবেশস্থানের সহিত মহাভারতীয় উপাখ্যানের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, দাক্ষিণাত্যেও 'পারা' নামে একটি নদী আছে। ইহা পশ্চিম ঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া আহম্মদ নগর দিয়া গোদাবরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ইতালীতে একটি প্রবাদ আছে, "যে রোম দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই।" মেঘদূতের কবিও এই প্রবাদের অনুরূপ ধারণাবিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া মেঘকে নগনদীর তট হইতে উজ্জয়িনী পথে পরিচালিত করিয়াছেন। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে উজ্জয়িনী কবির আবাসভূমি; উজ্জয়িনীর গৌরব, উজ্জয়িনীর বৈভব ভারতীয় ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ঈদৃশ সৌভাগ্য সম্পত্তির বিলাস-ক্ষেত্র সন্দর্শন

---

* সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ হৈমবত প্রদেশের অন্তর্গত স্রুঘ্ন (বর্ত্তমান সুখ) জনপদ হইতে মতিপুলো নগরে উপস্থিত হয়েন। মসুর ভি ভি এন্ ডি সেণ্ট-মার্টিনের মতে হুহেন্থ সাঙ্গের এই মতিপুলো পশ্চিম রোহিলখণ্ডের মড়াবর নগর। এই বিষয় প্রসঙ্গে জেনারেল কানিংহাম লিখিয়াছেন :—"সেণ্টমার্টিন যে মড়াবরের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারই অধিবাসিগণ মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত ইরিনিসেস্ (Erineses) নদীর তীরবাসী মাথে (Mathæ) জাতি হইতে পারে। যদি ইহাই হয় তাহা হইলে এই ইরিনিসেস্ নিঃসন্দেহ মালিনী নদী। ইহারই তীরবর্ত্তী পবিত্র নিকুঞ্জে শকুন্তলা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মড়াবর পশ্চিম রোহিলখণ্ডে অবস্থিত। ইরিনিসেস্ ইহার প্রান্তবাহিনী হইলে উক্ত নদী নিঃসন্দেহ হিমালয়ের গর্ভ হইতে এই নগরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। যদি কানিংহামের অনুমান সমূলক হয়, তাহা হইলেও এই ধারণানুসারে মালিনীতটশোভী কণ্বের আশ্রম হৈমবত প্রদেশবর্ত্তী হইতেছে।

Vide Cunningham's Ancient Geography of India, p. 348-350

(৪৩) Cunningham, Ladak and Sourrounding Countries p. 131. Comp. Thornton, Gazetteer of India; iv. 83.

না করিলে কিছুই দেখা হয় না ভাবিয়া কবি যক্ষ-মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসারিত করাইয়াছেন :—

"বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং,
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈ স্তত্র পৌরাঙ্গনানাং,
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥"

তুমি উত্তরদিক্ যায়ী। সুতরাং উজ্জয়িনীর পথ যদিও তোমার পক্ষে বক্র হইবে, তথাপি উক্ত নগরীর অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগে কিয়ৎক্ষণ না থাকিয়া যাইও না। যদি তুমি উজ্জয়িনীর অঙ্গনাগণের বিদ্যুল্লতার স্ফুরণহেতু চমকিত ও চঞ্চল কটাক্ষলোচন দেখিয়া প্রীত না হও, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণ বৃথা।

ভারতমানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, উজ্জয়িনী মালব-বাহিনী পার্ব্বতীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং এই নদী হইতে কৈলাসপর্ব্বতে যাইতে হইলে উজ্জয়িনী গন্তব্যপথে পড়ে না। এই জন্যই উহার পথ এ স্থলে বক্র বলিয়া সূচিত হইয়াছে। যাহা হউক এইরূপে মেঘের গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইলে যাহাকে ক্রমাগত উত্তরবর্ত্তী পথ অতিবাহন করিতে হইত, তাহাকে এক্ষণে উজ্জয়িনীতে যাইবার জন্য পশ্চিমাভিমুখ হইতে হইল। নগনদী হইতে উজ্জয়িনীতে যাইতে হইলে যে স্থান দিয়া, যাইতে হইবে, কবি পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য"
+ + বেণীভূত প্রতনুসলিলা সাবতী তস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।"

পথিমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে জলগ্রহণ করিও। + + ঐ সিন্ধুনামক নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর জলধারা বেণীর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং তটসঞ্জাত বৃক্ষ হইতে জীর্ণ পত্র পতিত হওয়াতে পাণ্ডুবর্ণ।

মল্লিনাথ এই নির্ব্বিন্ধ্যাকে বিন্ধ্যপর্ব্বত নির্গত নির্ব্বিন্ধ্যা নামক নদী বলিয়া পরবর্ত্তী 'সিন্ধু'-কে উহার নদীত্ববোধক সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ নির্ব্বিন্ধ্যা নামক সিন্ধু (নদী)। (৪৪) অধ্যাপক উইলসন্ এতদুভয়কে পৃথক করিয়া প্রথমটিকে বিন্ধ্যপর্ব্বতনির্গতা কোন অপরিচিত নদী এবং দ্বিতীয়টিকে সম্ভবতঃ সাগরমতী নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৪৫) এই মতদ্বয় কতদূর সঙ্গত একবার বিচার করিয়া

(৪৪) "অসৌ পূর্ব্বোক্তা সিন্ধুঃ নদী নির্ব্বিন্ধ্যা [স্ত্রী নভাং না নদে সিন্ধুর্দেশ ভেদেংহবধৌ গজে ইতি বৈজয়ন্তী।]" মল্লিনাথের ব্যাখ্যা।

(৪৫) Wilson's Meghaduta, verse 191, note.

দেখা কর্ত্তব্য। পুরাণে নির্ব্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু এই উভয় নদীরই উল্লেখ আছে। প্রথমটি বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত, দ্বিতীয়টি পারিপাত্রোদ্ভূত। (৪৬) ভারতবর্ষের আধুনিক ভূবৃত্তান্তে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে কোনও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সিন্ধু নামে একটি নদী মালবপ্রদেশের ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া ২৬০ মাইল গতির পর যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই সিন্ধু নদীকে অনায়াসে পৌরাণিক সিন্ধু বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই নদী পার্ব্বতী নদীর পূর্ব্বে মেঘের গন্তব্য পথের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। সুতরাং ইহার সহিত মেঘদূতোক্ত সিন্ধুর কোনও সংশ্রব নাই। পার্ব্বতীর পশ্চিমবর্ত্তিনী নদীর মধ্যে কালীসিন্ধু নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। এই নদী বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া চম্বল নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা পার্ব্বতীর পশ্চিম ও উজ্জয়িনীর পূর্ব্ববাহিনী। সুতরাং পার্ব্বতী হইতে উজ্জয়িনীতে যাইতে হইলে এই নদী অতিক্রম করিতে হয়। আমাদের মতে এই কালীসিন্ধুই মেঘদূতের সিন্ধু নদী। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া ইহা নির্ব্বিন্ধ্যা এই বিশেষ সংজ্ঞায় বিশেষিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে মল্লিনাথের মতের সহিত এই বিশেষ সংজ্ঞায় আমাদের মতের একতা লক্ষিত হইতেছে না। মল্লিনাথ প্রচলিত অভিধানের অনুসরণপূর্ব্বক সিন্ধু শব্দের অর্থ নদী করিয়া ঐ নদী নির্ব্বিন্ধ্যা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান কালীসিন্ধুকেই সিন্ধু নামক নদী বলিয়া নির্ব্বিন্ধ্যাকে (বিন্ধ্য পর্ব্বত নির্গতা) উহার বিশেষ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতেছি। এক্ষণে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে কোন বিশেষ নদী বর্ত্তমান না থাকাতে আমরা মল্লিনাথের ব্যাখ্যা বিপর্য্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অধ্যাপক উইলসন অনুমানবলে সাগরমতীকেই সিন্ধু নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ আমাদের মতে সমীচীন বোধ হইতেছে না। সিন্ধু হইতে সাগরমতী নাম উদ্ধার করা নিরবচ্ছিন্ন কষ্টকল্পনামূলক। বিশেষতঃ যথাস্থানে 'সিন্ধু' নামক নদী বর্ত্তমান থাকাতেও দূরতরসম্বন্ধবিশিষ্ট নদ্যন্তরের সহিত তাহার অভেদ কল্পনা করা সর্ব্বথা অসঙ্গত। * পরন্তু পুরাণাদিতে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে যে নদীর উল্লেখ আছে, তাহাকে বর্ত্তমান কালীসিন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নয়।

---

(৪৬) As. Res. Vol. viii p 335.

বিষ্ণুপুরাণের মতে নির্ব্বিন্ধ্যা ঋক্ষপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

* সাগরমতী নদী কোথায় আছে, জানি না। আধুনিক ভূগোল ও মানচিত্রাদিতে শবরমতী নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। এই নদী রাজপুতানা হইতে উৎপন্ন হইয়া গুজরাট দিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পুরাণবর্ণিত স্থানাদির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সামঞ্জস্য নাই। যে নদী (মন্দাকিনী) বায়ুপুরাণে ঋক্ষপর্ব্বতোদ্ভব বলিয়া নিরূপিত আছে, মহাভারতে তাহাই চিত্রকূটোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৪৭) আমরা যে নদীর বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারও উদ্ভবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক পুরাণ ইহা ঋক্ষসমুদ্ভূত বলিয়াছেন, অন্য পুরাণ আবার বিন্ধ্যাদ্রিনির্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উৎপত্তিস্থানের ন্যায় নদীর নাম সম্বন্ধেও এইরূপ গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে নদীর নাম এক পুস্তকে চর্ম্মণ্বতী লিখিত আছে, অন্য পুস্তকে তাহা চৈত্রবতী আবার পুস্তকান্তরে বেত্রবতী লিখিত হইয়াছে। এক পারা নদীও বিভিন্ন স্থলে 'বাণী' এবং 'বেণা' নামে উক্ত হইয়াছে। (৪৮) লিপিকরপ্রমাদ বশতঃই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, পৌরাণিক ভূগোল যখন এইরূপ গোলযোগে পরিপূর্ণ, তখন পুরাণের মতানুসারে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে একটি বিশেষ নদীর অস্তিত্ব নিরূপণ করা একরূপ অসাধ্য। এই জন্যই আমরা মধ্যভারতের নদীসমূহ হইতে নির্ব্বিন্ধ্যা নাম উঠাইয়া লইয়া কালিদাসপ্রোক্ত সিন্ধুকেই (বর্ত্তমান কালী সিন্ধু) বিন্ধ্যপর্ব্বতনির্গতা বলিয়া 'নির্ব্বিন্ধ্যা' আখ্যায় বিশেষিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সিন্ধু (বর্ত্তমান কালী সিন্ধু)—এই নদী বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদিকে ২২৫ মাইল গমন পূর্ব্বক চম্বল নদে পতিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৬ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি, ২৬ মিনিট; এবং পতন-স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি, ৩০ মিনিট; দ্রাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি, ২৩ মিনিট। এই নদীর গতি মধ্যভারতের গিরিসঙ্কট দিয়া হইয়াছে। এই গিরিসঙ্কট মধ্যবর্ত্তিনী কালীসিন্ধুর দৃশ্য অতি মনোহর। কর্ণেল টড স্বপ্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে এই নয়নরঞ্জন দৃশ্যের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (৪৯) লডকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী কালী সিন্ধুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী অতি গভীর ও খরস্রোতা হইয়া থাকে। (৫০)

ছোট কালী সিন্ধু নামে আর একটি ক্ষুদ্র নদী চম্বল নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর সম্মিলন স্থান সিপ্রার সঙ্গমস্থলের ৮ মাইল উত্তরবর্ত্তী। পূর্ব্বোক্ত কালী সিন্ধু হইতে প্রভেদ করিবার জন্য সাধারণে এই ক্ষুদ্র নদীকে ছোটকালী সিন্ধু বলিয়া থাকে। (৫১)

(৪৭) Wilson's Vishna Purana Ed. by Hall Vol. ii. p. 153, note 6
(৪৮) Ibid, p. 147, note 5
(৪৯) Tod's Rajsthan, Vol. iii. p. 736-737
(৫০) Thornton. Gazetteer of India. Vol. iii. p. 21-22
(৫১) Ibid, Vol. i. p. 778

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর *

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ পরদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখন গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—সুতরাং সেখানে বহির্ব্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সম্বাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে ?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুইজনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছিলেন। সেরূপ লোক কখন সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওই করিতে লাগিল।

সোণা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে খুঁজেন ?"

নি। তোমাদেরই। বাবুকে সম্বাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব ?

---

* গত সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যে সকল ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় বৎসরের ঘটনা। কাপিতে "দ্বিতীয় বৎসরই" লিখিত ছিল। কিন্তু মুদ্রাকরের প্রেতগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে "প্রথম বৎসর" আদেশ করিয়াছেন। আমি চরিতার্থ হইয়াছি—পাঠকগণও হইয়া থাকিবেন।

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? একটী ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সম্বাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনাসম্বাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁফরে পড়িল। বলিল "না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সম্বাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া, উপরে সম্বাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এই ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি করিও না—যখন সম্বাদ আসিবে. তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সম্বাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এদিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ্ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখন গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানিনা—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এমত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

এমত সময়ে রূপো, বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা করিয়া খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন ?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন বাবুর কাছেই বলিব।"

বাবু বলিলেন, "তবে বল গিয়া সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই বা করি ? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না ?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর, গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী, এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো, তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস ?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন ?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমক চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনী বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, অন্য হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব। দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুয়ার গুণচো না কি ?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমি কো বিদা দি জিয়ে।"

কিন্তু বাবু সাহেব, তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর! প্রায় দুই বৎসর হইল!

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন।—পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে একছত্র লিখিয়া দিন যে আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর—আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমার কাছ হইতে লিখন লওয়া অনাবশ্যক—আমিও কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিবেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব ?"

"যা খুসি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু আজি দানেশ

খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না। সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি কিছু ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গত সকল ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থ বোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল সোণাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব—আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।—তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুই-ই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই!

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে পরদার পাশ হইতে একটা বড় পটলচেরা চোখ তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই, রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইসারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, "যা বলি তা পারবি?

বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্শিস দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ ত দেখ্ছি টাকা রোজগারের দিন। গরীব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিলেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখন পাই না—তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা কর্‌বো। বাবু তো রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখ্‌তে পায়। আর কেহ না দেখ্‌তে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি না বস্‌তে চায়, তবে দুটো কাকুতি মিনতি করিস্‌।

রূপো বখ্‌শিসের গন্ধ পাইয়াছে—যে আজ্ঞা বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কপাট, খিল, কবজা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি ?"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি ?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন। রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মুনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে ?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখন আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মাঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন কোথায় গেল দেখি ? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু

আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মাঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা হবে কি বল দেখি?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে।—অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মাঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না। আমি চলিলাম।"

রূপা দেখিল, পাঁচ টাকা হাত ছাড়া হয়। বলিল, আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না।

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে যায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মাঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সম্বাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুর মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর, রোহিণীর কাছে গিয়া, নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষে নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে রোহিণীর মনের ভাব এই। রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত, যে তাহার সম্বাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্যা হইবে এমত সম্বাদ আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচা আঁচী, হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্—পটল-চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল যে আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানী এক কথা—আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ, ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া

তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়।—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ, এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃতা হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ হইলেই, গোপনে গিয়া চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্যতাতের সম্বাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাবুর কাছে কতদিন আছ?"

সোণা। এই—যতদিন এখানে এসেছেন ততদিন আছি।

নিশা। তবে অল্প দিনই? পাও কি?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খান্সামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি এখানে আর কোথায় চাকৃরি যোটে।"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়বে?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাকরুন্ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত?

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কায ; পারবে কি ?

সোণা। ভাল কায হয় ত পার্‌ব না কেন।

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কায নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাকরুন্‌টি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ কর্‌বেন। বুঝেছ ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে তোমার মুনিবের চোক্ ফুটায়ে দিই, তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার ?

সোণা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখ্‌বে ঠাকরুন্‌টী ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে, তার পরে আমার সঙ্গে যুটো।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগাল কুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে, কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তরমধ্যে কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে, ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি ? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুকন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব ; পাপস্রোতের রোধ করিব ; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন ? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে ? আমার পাপপুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত, তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, "ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন। যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে, রোহিণী আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল "তুমি কে ?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশা। এত রাত্রি হলো কেন ?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্‌তে পারিনে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখ্‌তে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন ? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে রে ?"

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিলেন যে গোবিন্দলাল।

তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিকম্পিতস্বরে বলিল, "ছাড় ! ছাড় ! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি এই বাবুকেই না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে !"

গোবিন্দলাল বলিল, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।"

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদ্‌জি বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, "রোহিণি!"

রোহিণী বলিল, "কেন!"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নহি, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী যে, তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী যে, তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি, দাঁড়াও।" রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতরস্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাইব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না। রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন সে অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন। ইঁহাকে কখন ভুলিব না কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?"

রোহিণী বলিল। "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ বিদায় দেও।"

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না মারিও না; আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনি যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলাল পিস্তলের ঘোঁড়া টানিলেন। শব্দ হইল, গোলা ছুটিল, রোহিণীর মস্তক ভেদ করিল। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালক-নখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ, রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

:পঞ্চম বর্ষ : নবম সংখ্যা

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশনবীশ, জুয়াচোর লোক আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটী তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই কিন্তু আমি জানি ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এতদিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটী যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাঁহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধুজনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া

বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে শকারের উপর যে রেফটি আছে বোধ হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটী "বঙ্গদশন," অর্থাৎ বাঙ্গলার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "ইহার অর্থ পূর্ব্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি; অর্থাৎ A Guide to Eastern Bengal" এইরূপ বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজ প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে?

অতএব হে বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন "শ্রীশ্রী৺ নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসি বাবু শ্রীশ্রীঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে তিনি সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন পথে হইয়াছে তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে ইহলোকে তিনি নাই! অতএব আমারও আর আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোসনবিষ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিং পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রশক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্বরসে আপনি সুরসিক? স্থুল কথাটা গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরুবিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশুন

ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরুবিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরুবিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোসনবিশ মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,* তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁশ গলায় দিয়াছেন। গুরুবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনিমেগেজিন হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ড-স্মিথকৃত এনিমেটেড নেচরের সারাংশ সংকলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপন পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। বলা বাহুল্য যে শুনিয়া, লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশপনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালাসাহিত্য-সমালোচনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন (বলেন কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন) যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি গুরুবিষয় ছাড়িয়া লঘুবিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোসনবিশ পুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম

* ইউ—টিল—ইটি—আই

প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে ; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ, এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন ; এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা সখি !" এবং তেরটা "কি হলো ! কি হলো !" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোষনবিশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে বাজে নবেল না লিখিয়া ডন কুইক্‌সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এপর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি ?

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোষনবিশের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই ?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোষনবিশি রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব ! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না !

আপনি কি রাজি ? আপনি রাজি হউন না হউন, আমি রাজি। তবে আর একবার লেখ দেখি লেখনি ! চল দেখি, পাখীর পাখা। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী ! হায় ! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্ ! আর কি সে তান মনে আছে ? না তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুনেধরা বাঁশী—আমি ঘুনেধরা—আমি ঘুনেধরা কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি ? আর সে রস নাই, শুনিবে কে ? একবার বাজ দেখি হৃদয় ! এই জগৎ সংসারে,—বধির, অর্থ চিন্তায় বিব্রত, মূঢ়

জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স্ ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গাবাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না! ছি!—কেবল লোকহাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসিবাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন গোয়ালিনী নাই—তাহার সে মঙ্গলা গাভী নাই। সত্য বটে আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় একমাত্র। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি—যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম— কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধন গুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবেনা কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম—কাঁদিয়া মরিব। কি লিখিব, সম্পাদক মহাশয় আজ্ঞা করিবেন। সে রস আর নাই—কিন্তু আজিও আছি।

নিতান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের—জীবনবৃত্তের সমালোচনা

দ্বিতীয় প্রস্তাব—মিলপ্রদত্ত শিক্ষা

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, প্রথম প্রস্তাবে আমরা বুঝাইয়াছিলাম যে, আমাদের মানসিক বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল—সুতরাং মিলের জীবনচরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিলের জীবনবৃত্তের* বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাবিষ্কৃত চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। কিন্তু আমার তৎপক্ষে শক্তি ও সময়ের অভাব। ভরসা করি, কোন অধিকতর ক্ষমতাশালী লেখক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি এক্ষণে কেবল যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক ও লেখক, উভয়ের তুষ্টিবিধান করিব।

প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি মনোবৃত্তিগুলি বিবিধ—জ্ঞানার্জ্জিনী এবং কার্য্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনেও স্ফূর্ত্তি প্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যলোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্দ্ধেক পাইয়াছে—অর্দ্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন—এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্বসাধক হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না।

---

* জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রণীত। যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনিঙ লাইব্রেরি। ১৮৭৭।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটি উদ্দেশ্য ও ফল—প্রথম, জ্ঞানের অর্জ্জন, দ্বিতীয় বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তিবৃদ্ধি। বিদ্যালয়াদিতে যে শিক্ষা হয়, সচরাচর তাহাতে কেবল জ্ঞানার্জ্জনই হইয়া থাকে। বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষার তাদৃশ উদ্দেশ্য নহে। জন্ মিলের পিতা জেম্‌স্ মিল সেইজন্য পুত্রকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ জেম্‌স্ মিল স্বয়ং জ্ঞানী, মার্জ্জিতবুদ্ধি, চিন্তাশীল পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য পুত্র, তাঁহার শিক্ষায় অতি অল্পবয়সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাশীল এবং সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ—যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের জীবনবৃত্ত হইতে যাহা অধীত করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মিল গুরুদত্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সেই শিক্ষা সম্বন্ধে মিল স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাই যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিব। মিল বলেন, "পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমার দ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে,—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল—পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন—তাহারই ফল।

"শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটি মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনী না হইয়া বরং ম্লানভাব ধারণ করে। নিজের মত, ও নিজের চিন্তার

পরিবর্ত্তে—পরের মত, ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণশক্তির সংমার্জ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তাশক্তি অচিরকাল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

"আত্ম-গরিমা বাল-পাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহচর্য্যে অনেকের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষসূচক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি আমা অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না যে, আমার জ্ঞানও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এইমাত্র বোধ হইত যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃই সেই বালকই কেবল রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে আমি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছু ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র যে—আমি পাঠনা দ্বারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না—সুতরাং আমি পড়া-শুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম।"

তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরুদত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র—আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ—কাণ্ড ও শাখাপল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হই। মিলের জীবনীতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট—জেম্‌স্‌মিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রোবক কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা, তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয় রমণীপ্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অতিশয় মনোহর।—আমার ইচ্ছা করে এইটুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালির গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ সে আরও ভাল।

জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্য্যকারিণীবৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার।—জ্ঞানার্জ্জিনী-বৃত্তি সম্বন্ধে মিলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কার্য্যকারিণীবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সেই অসম্পূর্ণতা হেতু মিলের ন্যায় মার্জ্জিতবুদ্ধি মহাশয় পণ্ডিতের যে মানসিক শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাদৃশ অধ্যয়নীয় তত্ত্ব আর কিছুই দেখি না।

বৃত্তিগুলির কার্য্যকারিণী বৃত্তি নাম দিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই। যাহাকে ইংরেজেরা "Active faculties" বলেন, অনেকে কার্য্যকারিণী অর্থে তাহাই বুঝিবেন। তাহাতে সকলটুকু বুঝায় না। এইজন্য অনেকে এইগুলিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলেন। অন্তর্জ্জগতের সঙ্গে বৃত্তিগুলির যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ করিতে গেলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাম মন্দ হয় না।—কিন্তু বহির্জ্জগতের সঙ্গে উহাদের যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ করিলে মনোবৃত্তিগুলি বিভাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জিনী এবং কার্য্যকারিণী এই দুই নাম দিতে হয়। এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন্ বৃত্তিগুলির কথা বলিতেছি। যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকে এই সকল "কোমলতর" বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—নামটী বিশেষ দুষণীয়। বৃত্তিগুলি সুখদায়িনী বলিয়া কোমল নাম পাইয়াছে—নহিলে উহাদিগের আর কিছু কোমলতা নাই।

মিল নীতিশাস্ত্রে অশিক্ষিত হয়েন নাই। তিনি পৃথিবীতলে একজন প্রধান নীতিবেত্তা এবং তাঁহার জীবনে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু নীতিজ্ঞানের উপার্জ্জন কার্য্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলন নহে—সেও জ্ঞানার্জ্জিনীবৃত্তির

অনুশীলন মাত্র। "পিতামাতাকে ভক্তি করিও" এই নৈতিক তত্ত্ব যে শিখিয়াছে সে, নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে অতটুকু জ্ঞান উপার্জ্জিত করিয়াছে। যে সেই নৈতিক সূত্রকে কার্য্যে পরিণত করিয়া পিতামাতাকে ভক্তি করে, সে একটী পুণ্যকর্ম্ম অভ্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু সে মানসিকবৃত্তির অনুশীলন কিছুই করে নাই। কার্য্যের অভ্যাস, এবং কার্য্যকারিণীবৃত্তির পরিমার্জ্জন স্বতন্ত্র।

কার্য্যকারিণীবৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনের একটী শ্রেষ্ঠ উপায় কাব্যাদির অনুশীলন। যদি মনের এই ভাগের পরিপুষ্টি শিক্ষার মধ্যে ন্যস্ত করিতে হয়, তবে শিক্ষার মধ্যে কাব্যের একটী প্রধান স্থান পাওয়া আবশ্যক। মিলের শিক্ষা মধ্যে কাব্য স্থান পায় নাই। জেমস্ মিল কবিত্ব বুঝিতেন না—কাব্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সম্প্রদায়ের ইংরেজের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালিগণ কাব্যকে "লঘুসাহিত্য" বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন জেমস্ মিল সেই সম্প্রদায়ের ইংরেজ ছিলেন—অর্দ্ধমাত্রার মনুষ্য। সুতরাং জন্ মিল সেই শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শিক্ষার সেই অসম্পূর্ণতানিবন্ধন চিন্তাশীল এবং উৎকর্ষাভিলাষী জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ঘোরতর মানসিক শঙ্কট উপস্থিত হইল। বাঙ্গালা সংবাদপত্রলেখকের সেরূপ শঙ্কটের অতি অল্প সম্ভাবনা কিন্তু মিলের ন্যায় মনুষ্যের তাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই বৃত্তান্ত আমরা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সংশ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তাসকল অতিশয় পরিপক্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসর কালে তাঁহার চিন্তাসকল বাহ্য জগত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জ্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল বেন্থামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। এতদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গলসাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা—তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ—এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশে একখান চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখ-সূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, "মনে কর তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল; তুমি যে সকল

সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্ত্তেই সংসাধিত হইল; ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?" সহসা অনিবার্য্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল "না!" এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য,—তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্যসংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরি কর্ণধার শূন্য হইল। মিল ভাবিলেন এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্য্যে যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভন পরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূঢ় গভীর বেদনাকে বিস্মৃতিজলে ভাসাইতে পারিল না। এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তকরাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাঁহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একবারে পর্য্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, অপরের নিকট তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন না। কোন নিবার্য্য বিপদ পড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এরূপ অনিবার্য্য কাল্পনিক বিপৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল; পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সে শিক্ষার পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাঁহার রোগ একপ্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃচিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন।

সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

"মিল্ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল; আমাদের যে কোন বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোন বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে সুখ এবং কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে এই এই কার্য্য করিলে আমরা সুখী এবং এই এই কার্য্য করিলে আমরা অসুখী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্য্যের সহিত দুঃখ ও কতকগুলি কার্য্যের সহিত সুখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের এরূপ শিক্ষাজনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেম্স্ মিল সর্ব্বদা বলিতেন যে, যে কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ, এবং যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সম্বন্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য। মিল পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেম্স—প্রশংসা ও নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিস্বরূপ যে পূর্ব্বপরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে এইরূপ বলপূর্ব্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্য্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটাই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক; সুতরাং মনুষ্যের কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ ও দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনাবিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসম্বন্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ ও দুঃখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা শীর্ণ অরণ্য ও জল বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক

হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি যে সকল গ্রন্থির ছেদসাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের অবতারণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি সকল তদীয় বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্য্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন জীবন নূতন ভাবে পুনরারম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

"১৮২৬—৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠনা তাঁহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাদিগের তর্কসভার জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, মিলের কার্য্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার নিকট দিন দিন ভার বোধ হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল "যখন জীবন এরূপ দুর্ভর বোধ হইতে লাগিল তখন আর আমি ইহা কতকাল বহন করিতে পারিব?" তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল "তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক বৎসর কাল অতীত না হইতেই আশাসূর্য্যের একটি সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। একদিন তিনি মার্ম্মনটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে—বাল্যাবস্থায় মার্ম্মনটেলের পিতৃবিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপ শ্রবণে ও দুরবস্থা দর্শনে মার্ম্মনটেলের হৃদয়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্ত্তৃক পরিবারবর্গের সান্ত্বনা—এইসকল ঘটনা লিখিত হইয়াছিল সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিযুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অনুভূতি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা

হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য নহে—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্য্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে চিন্তামেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েকবার তাঁহার অন্তর এই চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ের ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতর দুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই।

"এই সকল ঘটনায় মিলের মতে দুইটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বে এই মত ছিল যে আত্মসুখই মানবজীবনের সমস্ত কার্য্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান মতে আত্মসুখ—কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মকার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্মসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে না; পরের দুঃখ বিমোচনে, পরের সুখ বর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত বিরত থাক, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। পরের দুঃখবিমোচন ও পরের সুখবর্দ্ধন তোমার গন্তব্য স্থান হউক; পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত সুখ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কখন আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ সুখ,—ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে 'আমি কি সুখী?' তখনই সুখ অপসৃত হইবে। ফলতঃ আত্ম-বহির্ভূত কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ হইল। মিলের মতবিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা এই;—এত দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধানে উভয় প্রকার

বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা করে না বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরন পাঠ করেন। মিল্ স্বয়ং যে দুঃখপ্রবণতা (Melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চাইল্ড হেরল্ড ও ম্যান্‌ফ্রেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং বাইরণ পাঠে তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা বিশেষরূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাববর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; স্বভাবসৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে প্রকৃতি পর্য্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। ওয়ার্ডসওয়ার্থই তাঁহার কবিত্ব-শূন্য হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন। এবং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা কবি সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।”

আমরা এইখানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ দোষ সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব—উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্ল্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অতি বিরল। তার পর, তাহার সঙ্কলন ও গ্রন্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্র বাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি। এবং ইহা হইতে যুবকগণ মহতী শিক্ষালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সেস্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহালও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃত দেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া, গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন আর প্রবেশ করেন নাই। একরাত্রি একদিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কতদূরে গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্‌দিকে পলাইয়াছেন কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখন নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই, সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন তাহা ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত জানিত না। দারগা কিছুদিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠি পত্র তিনি বাড়ী তল্লাসিতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে নিশাকর দাস সে করাল কাল সমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন "কায ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনী হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন দারগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া তথাচ অত্যন্ত বিষণ্নভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইযাছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন তিনি তাহা আপন পত্নীর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমর জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর সঙ্গে সেই সকল কথার আন্দোলন করিতেছিল। যামিনী বলিতেছিল, "এখন, তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তাহ'লে বোধ হয় কোন আপদ থাকিবে না।"

ভ্র। আপদ থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্র। শুন নাই কি যে হলুদগাঁয়েও পুলিসের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জানে না কি প্রকারে?

যামিনী। তাই না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে সে পরামর্শ দিব? বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন না কি?"

যামিনী। পুলিসের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন। কিন্তু আমার বোধ হয় গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের বাবু এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্যই বোধ হয়, এতদিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদিই আসেন।

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয় তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায় ভগিনি তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি তিনি কোন দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি না হয় আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন।"

যা। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে—আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর, মানসচক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না। কোন সম্বাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল গোবিন্দলালও আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানী কাশীরোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে—একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সম্বাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমারও বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয় এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সম্বাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি আজিই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে তোমার আট চল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইনস্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপা-সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপা কোন দেশে গিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া, নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন—আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলী বিলাতী—সুশাসন জন্য সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন, তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশ্যনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌঁছিলেন তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতে ছিলেন। মাধবীনাথ পৌঁছিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগের বলিলেন, "বাপু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাফ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দ্দশ পুরুষমধ্যে কখন হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশ্যনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলালকে ওরফে চুনিলালকে চেন?

সাক্ষী। কই—না—মনে ত হয় না।

উকীল—কখন দেখিয়াছ ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে ?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী ?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল ?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখন প্রসাদপুরের কুঠিতে যায় নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে ?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান ?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, সাক্ষী, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন তুমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে ?"

সাক্ষী। হাঁ বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না তবে কেন বলিয়াছিলে ?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল ! দুই চারি দিন পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল ; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আদেশ করিলেন।

বিচারকালীন সাক্ষীদিগের এইরূপ সাপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান,

তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চার পাঁচ দিন, তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সম্বাদ দিলেন গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন সে অট্টালিকায়, তাঁহার যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচজনে লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট চৌকাট পর্য্যন্ত বারভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই একদিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইটকাট জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব,—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্রমর!

ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয়, পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার একস্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

"তাই, মনে করিয়াছি আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্রধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিল তাহাদিগকে বলিল, আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না। ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির

করিয়াছিলেন এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য ; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"—

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রি আপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজ সম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আর এই পাঁচ বৎসরে আমি কয় লক্ষ টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটী বাড়ী প্রস্তুত করিব ; বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই।

আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল—কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয় এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর লিখিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটী নিবেদন—বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলেই ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন সেই ভাল।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাঙ্ঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া, নিকটে থাকিয়া নিস্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষমাস ঐরূপে গেল। মাঘমাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধ সেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি—সম্মুখে ফাগুন মাস,—ফাগুনমাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্র পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্র পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস্ না। রোগে হউক, অন্তরটিপনীতে হোক—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এতদিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিমকাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য, এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন,—"আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা;—আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়টা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল—"আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন "দিদি রাত্র কি জ্যোৎস্না?"

যামিনী, জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজ সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া, বলিল, "কই এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না আজ আবার আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি একটী বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম আমি যদি সতী হই তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল, "দেখিবে ?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল—"কার কথা বলিতেছ ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন।—তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল সাত বৎসরের পর নিজশয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুইজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল—অনেকক্ষণ রহিল—ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।
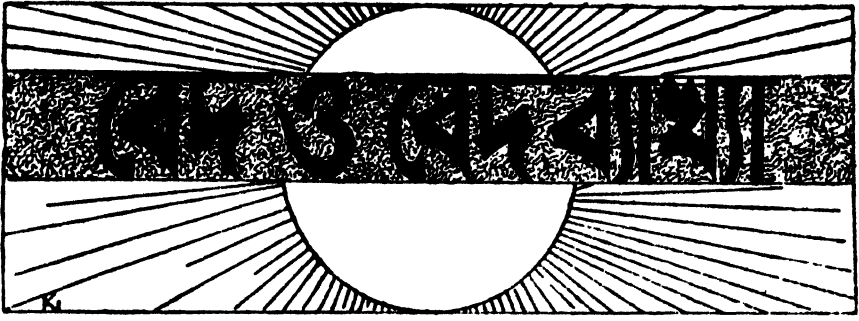
বেদপ্রকাশিকা, ঋগ্বেদ সংহিতা ভাষা সংক্ষিপ্ত টীকা বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনীর সহিত শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম এ কর্ত্তৃক বিশদীকৃত, ব্যাখ্যাত। ভাষান্তরীকৃত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালা টীকা বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বেদের প্রকাশ এক নূতন জিনিস। বাঙ্গালা তন্ত্রময়, বাঙ্গালা পুরাণময়, বাঙ্গালা অনার্য্যজাতি-পরিপূর্ণ বাঙ্গালা হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর বেদের চাস উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গালায় যিনি আর্য্যজাতির গর্ব্বহেতু বেদের প্রকাশ, বেদের চর্চ্চা, বেদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্য্যদিগের একজন প্রধান বন্ধু তাঁহার নিকট আমরা আপনাদিগকে বাস্তবিকই ঋণী বলিয়া বোধ করি। রমানাথ সরস্বতী এই দুরূহ কার্য্যের ভার লইয়াছেন এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আজি আমরা রমানাথ সরস্বতীর বেদপ্রকাশিকা উপলক্ষ্য করিয়া বেদের বিষয় কিছু লিখিব বাসনা করিয়াছি। বেদ জিনিসটা কি, বেদের কিরূপে অর্থ করিতে হয়, বেদের উপর কত ব্যাকরণ, কত অভিধান, কত ছন্দোবোধ, কত দর্শন লেখা হইয়াছে, বেদের উপর দেশীয় লোকের ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের কিরূপ আদর, এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় একটা পড়ে না। তাঁহারা যদি বেদ ও বেদ ব্যাখ্যার উপর দুই ফর্ম্মা আর্টিকেল দেখেন অমনি বঙ্গদর্শনের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া লইবেন এইজন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব যত অল্পে পারি গোটাকত মোটা কথা বলিয়া বেদপ্রকাশিকা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিব।

বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়-ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যে বেদব্যাখ্যা করিল সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল সে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন অমনি দ্বাদশ বৎসর

অনাবৃষ্টির পর মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম দিল্লীতে আমার শত্রুনিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্দ্ধনের ধন হয়। লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলেই "বেদের বচন" বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয় কিন্তু উহা দুর্ব্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন।

প্যালগ্রেভস গোল্ডন ট্রেজরি অফ সংস এণ্ড লিবিস (Palgrave's Golden Treasury of Songs and Leaves) হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষিপ্রণীত সূক্ত বেদে গ্রথিত আছে। যদি গোল্ডন ট্রেজরির সহিত তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভিয় সাগা সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরীমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন তাহার এক সাগা মৃত্যুগীত রহিল, কালি মার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগা হইল, এইরূপ সাগা একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ।

কিন্তু সাগা সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীতসংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্ম্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা ব্যথা কেন?

প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয় সময়তালিকাকারগণকৃত সময় নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক, আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদ-সংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই, উঁহারা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদিই তুরাণীয় বা অন্য জাতির অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে তবে তাহা অপেক্ষাও আর্য্যজাতির বেদ যে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই যে, যেকালে বেদ রচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল কেবল গোল্ডন ট্রেজরি রহিল। তখন গোল্ডন ট্রেজরিরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহা ভিন্ন ইংরেজজাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্মমাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য মত নহে কিন্তু বেদের এক একটী সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশবকাল, বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নি নহে, অগ্নিই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন—সকলই উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান যে পরিশ্রম অন্তর্জ্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীরতার ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন! সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয়মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল, ও মহীয়ান্ ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্, অলঙ্কারের দোষ পরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সংপ্রসারণ হয় প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় কল্পনার আমোদ কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার ঔৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড তাহাই সুন্দর ও নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্ব্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই তাঁহারা সামান্য পর্ব্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধনভয়ে আমরা মনের অনেক ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না

তাঁহারা সেই ভাব শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময়, কবিহৃদয়ের সর্ব্বব্যাপী ভাব তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন, আধুনিক কবিরা তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্ম্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই জন্য বেদ পড়েন যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্ম্ম গ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে "সেকেলে লোক নির্ব্বোধ ছিল" বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকেরা ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি আমি অকবি দুই জনেই একত্র থাকি একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা বলে জগৎ সংসার কত সুন্দর দেখ আমি অকবি মাটীকে মাটীই দেখি আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ আমরা জানি যে আমাদের দুই জনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্ব্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন, দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল আমরা যাহা পারি না এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা ইহাকেই সাহেবেরা *inspiration* বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন সেই দেবতাই বেদ-রচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন যিনি মন্ত্র দেখিলেন তিনিই ঋষি। ঋষ ধাতুর অর্থ দর্শন। এই জন্যই কালিদাসের "মন্ত্রকৃত্যং" লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন মন্ত্রকৃতাং নহে মন্ত্রদৃশাং। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান মত দাঁড়াইল দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্ম্মময়, জ্ঞানময়; এইরূপে কতকগুলি গান ধর্ম্মপুস্তকরূপে পরিণত হইল।

বেদ কি জিনিস কেন উহার এমন সম্মান এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু আমরা

এখন বেদ বলিতে ঋক্‌বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদই যে কেবল বুঝি তাহা নহে। প্রথম বুঝি বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত; প্রকৃতি উপাসনা ও যজ্ঞবাহুল্য। প্রকৃতি উপাসনা ঋগাদি বেদত্রয়ে বর্ত্তমান, যজ্ঞকার্য্য প্রণালী ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উক্ত। এই দুই সময়ের সাহিত্য সংসারের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা সেই সমস্তকেই বেদ এই সাধারণ আখ্যা দিয়া থাকি। বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া যায়।

বেদ হইল, এখন বেদব্যাখ্যার কথা কিছু বলা চাহি। কারণ রমানাথ সরস্বতীর বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত কথা কহাইতেছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। প্রকৃতি উপাসনা যে সময়ে হয় তাহার অনেক পরে ভারতভূমি যজ্ঞপ্রধান হইয়া উঠে। বেদের অনেক পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয় ভাষাই তাহার প্রধান সূচিকা। পাণিনি ছান্দস প্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি উপাসনা সময়ে যে যজ্ঞ ছিল না তাহা নহে দেবতার উদ্দেশে খাদ্য পুষ্প চন্দনাদি দান সকল সময়েই ছিল। কিন্তু তখন এত বাড়াবাড়ি ছিল না। যখন যজ্ঞবাহুল্য হইল তখন কি বলিয়া দেবতা উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে এই লইয়া গোল বাঁধিল। পূর্ব্বে ঋষিরা আপন আপন মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন ইহারা এখন কি বলিয়া দিবেন কাজেই বেদের মন্ত্রই ইহাদের অবলম্বন হইল। বাস্তবিকও আমি যখন ভক্তিভাবে গদ গদ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার ভাষা যদি বাহির হয় কেমন শুনায়, যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্তু যদি এক জন মহৎ কবির বচন ধরি "Father of life and light" অথবা "These are Thy glorious work Father of Light বলিয়া ধরি কত যেন অধিক ভাব প্রকাশ হয়। যে কবির বচন উদ্ধার করিলাম তাঁহারা পার্থিব কবি যদি আবার সেই কবি ঈশ্বরপ্রেরিত হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের বচন হয় আরও অধিক ভাব প্রকাশ হইল বোধ হয়। এই অনুমানে ব্রাহ্মণসময়ের লোক যজ্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা চাহি; ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ভূরিভূরি ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যাই বেদের প্রথম ব্যাখ্যা। বেদ রচনার অল্প পরেই ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অনেক কথার অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বিদ্যাপতির গ্রন্থের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারি না, ইংরেজেরা যেমন অনেক চসরের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা অনেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। অনেক স্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন; আজগবি ধাতু প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের সময় হয়। এই সময় বেদের উপর ব্যাকরণাদি লিখিত হয়। স্বরপ্রক্রিয়া, ধাতুপ্রক্রিয়া, আদি অভিধান ছন্দোবোধাদি পুস্তক লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রয়োজন মত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; ইহাঁরা সেই ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ যে প্রণালী আরম্ভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার পরিশিষ্ট হইল। নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণই এই ব্যাখ্যা।

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তি। পৌরাণিক ধর্ম্ম দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নাশে, পৌরাণিক ধর্ম্ম নাশের জন্য শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অদ্বৈতধর্ম্ম প্রচারে, প্রায় ১৫০০ শত বৎসর গত হইল। বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রচার শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচারকগণ বেদব্যাখ্যার তত চেষ্টা করেন নাই। কেবল যাগযজ্ঞের যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য আধুনিক সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়া ও বেদমন্ত্র কেবল মুখস্থ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য দেখিলেন লোকে কেবল মুখস্থ করিয়াই কার্য্য শেষ করে, এইজন্য তিনি বিজয়নগরের রাজার সাহায্যে সরল সংস্কৃতে ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎকালে যে বহুলপ্রচার ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, ঋক্‌বেদ অনুক্রমণিকায় মাধবাচার্য্য একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে মতটি এই যে "বেদমন্ত্র যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আবশ্যকতাই নাই।" এই মত খণ্ডন করিয়াছেন আর শুদ্ধ মুখস্থ মতাবলম্বীদের বিলক্ষণ গালি দিয়াছেন।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।

যে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে সে কেবল গোঁড়া মাত্র ; সে কেবল ভার বহন করে। মাধবাচার্য্যের টীকার এক প্রধান দোষ তাহার টীকা তাঁহা নিজের লেখা নহে, তাঁহার ছাত্রদিগের লেখা ; তাঁহার কেবল তত্ত্বাবধারণ মাত্র। উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কোথায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দি তর্জ্জমা সংস্কৃত, কোথাও দ্রাবিড়ীতর্জ্জমা সংস্কৃত। আর এক প্রমাণ আরও গুরুতর। বেদের প্রথম ঋক্ তিন চারি পাতা ধরিয়া সব ব্যাকরণের সূত্র দিয়া লেখা হইল। তাহার পর বরাবর খানিক দূর ঐ ঋকের টীকার বরাত দেওয়া হইল। দুই তিনটি সূক্তের পর আবার প্রথম ঋকের টীকা। তিনি চারি পাত টীকায় সব ব্যাকরণের সূত্র দেওয়া আছে কিন্তু অনেক কথার বরাত দিলে বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই। এইরূপে একস্থানে যে কথার যে অর্থ যেরূপে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে আর একস্থানে সেই কথার সেই অর্থে অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি। আবার তামাসা এই, প্রথমটি হয়ত যথার্থ ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়টী ভুল। যাঁহারা বৈদিক ব্যাকরণ

উত্তমরূপ পড়িয়াছেন তাঁহাদের উচিত এই সকল ভুল সংশোধন করিয়া লন। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া লইতে যেন বিশেষ যত্ন করেন।

চতুর্থ ব্যাখ্যা রোথ সাহেবের। রোথসাহেব ব্যাখ্যা করেন নাই কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই যে ব্রাহ্মণ কালে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহাতে এমত অনেক বিষয় আছে যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব আমাদের উচিত ঔপমিকভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া সমগ্র বেদ নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল তাহা ত ভিন্ন আকারে ভাষান্তরে থাকিতে পারে। সেই ভাষা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাখ্যা করিতে হইবে এ কথায় অনেক সত্য আছে বটে, কিন্তু কোন্‌টি ঠিক অর্থ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। হয় ত বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে গ্রীকে সেইটী অন্য অর্থে আছে। এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাই।

মাক্ষমূলার রোথমতাবলম্বী। তাঁহার নূতন মত এই ;—তিনি ঋক্‌বেদ হইতেই ঋগ্বেদের অর্থ করিতে চান। এবং এই উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদের একখানি নির্ঘণ্ট করিয়াছেন। উহাতে এক একটি শব্দ ঋগ্বেদের কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে সব ধরিয়া দেওয়া আছে। মাধবাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ এক কথায় সতের জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিয়াছেন। এরূপ গোলমাল অনেক এবার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংস্কৃত এক কথার যে একই অর্থ হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক কথায় নানা অর্থ হয় বলিয়াই সকল অভিধানে নানার্থকোষ বলিয়া এক এক অধ্যায় দেওয়া আছে।

রেবরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সায়নাচার্য্য ও প্রাচীন টীকা পরিত্যাগ করা অন্যায় বটে কিন্তু যেখানে যেখানে ভিন্ন দেশীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে সেখানে এ টীকা গ্রাহ্য নহে। অনেক কথা সায়নাচার্য্য যাহার অর্থে মেঘ জল বা অন্য জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মধ্যে পারস্য রাজা বা সেনাপতির নাম দেখেন। তিনি বলেন শরফলাকৃতি যে সকল শাসন পারস্যের পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদব্যাখ্যায় বিশেষ উপযোগী। একস্থানে পনিশব্দে সায়ন গো লিখিয়াছেন ; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইবে আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে সকল মতামতের কথা কহিতেছিলাম সে ত সামান্য। সায়ন ও প্রাচীন টীকাই সকলের মূল। কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে মিলেন কেহ কোথায় মিলেন না এই পর্য্যন্ত। কিন্তু বেদের যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা কোনকালে হইবে না তাহার এক সম্ভাবনা হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতী একজন একাকার লোক,

তিনি সমাজসংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান।" তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য্য কর, এই এই কর্ম্ম করিও না, কে তাঁহার কথা শুনিবে? এইজন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রী স্বাধীনা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর, বলেন। অগ্রে নীয়তে এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন; অতএব ঈশ্বর ধান্য। তাঁহার মত এই—সায়নাচার্য্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্ব্বে যে টীকা লিখিত হয় সে টীকা, সেই প্রমাণ। নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সায়ন নিজের মত কোথাও দেন নাই। সর্ব্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় বলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনি জিনিস্!

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্য্যকলাপ রীতিনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে; প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল, সেইটি বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে যেখানে যেখানে আর্য্যজাতি সেই সেইখানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি।

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়িয়াছেন, বেদের ব্যাকরণ তাঁহার সুন্দররূপ জানা আছে, ইংরেজি বেশ জানা আছে। আপনাকে সাধ্যমত বৈদিক আর্য্যসমাজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদব্যাখ্যা বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, ব্যাকরণ অভিধান কোনরূপে বজায় রাখিয়া সহজ অথচ মহান্, সরল অথচ উচ্চ প্রকৃতির মনোগত ভাব বা প্রকৃতি চিত্র দেখাইতে পারিলেই বেদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

রমানাথ সরস্বতী বেদের ব্যাকরণখানি তাঁহার বেদপ্রকাশিকায় ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষা অতি কটমট অথচ কথায় কথায় তর্জ্জমা নহে। তাঁহার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমাদের কিছুই তৃপ্তি হইল না। অনুক্রমণিকায় তিনি পুরাণশাস্ত্র হইতে অনেক বচন তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই বচনগুলি পরিপাক করিয়া সুন্দররূপে আপনার মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে কেন রাশি রাশি বচন উদ্ধার হইয়াছে সহজে অনুমান করা যায় না। তিনি প্রথমবারেই আপনার কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ষষ্ঠ সূক্ত ব্যাখ্যাস্থলে ম্যাক্সমুলরের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হওয়ায় "ম্যাক্সমুলার আমাদের দেশের কথা কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দিয়াছেন। "ম্যাক্সমুলার মধ্যে মধ্যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন বলিয়া, ঋগ্বেদের প্রথম প্রকাশক, বেদব্যাখ্যা বেদপাঠে ক্ষয়িতজীবন মহাপুরুষকে সরস্বতী মহাশয়ের "কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দেওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার উচিত ছিল ভূমিকায় ম্যাক্সমুলারের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। যদি ম্যাক্সমূলারের ঋগ্বেদ না বাহির হইত তবে সরস্বতী মহাশয়ের বেদপ্রকাশিকা কোথায় থাকিত ?

যখন মহাভারত অনুবাদ তিন চারিবার মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন বেদ যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই সে কেবল বাঙ্গালার কলঙ্ক। সরস্বতী মহাশয় সে কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রতিকুটীরে বেদ প্রকাশিকা থাকা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের একান্ত উচিত ইহার উৎসাহ দেওয়া। তাঁহাদের নিজের দলের ত কেহ করিল না, শেষ একজন কায়স্থ বেদপ্রকাশ করিল। তাঁহাদিগকে ধিক্ ! কিন্তু তাঁহাদের উচিত ইহার সহায়তা করা। তাঁহাদের কার্য্য আর একজন করিল, ইহার সহায়তা না করিলে, তাঁহাদের কলঙ্ক ধুইলেও যাইবে না। সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ, হোম, সর্ব্বত্র যে বেদের দরকার, সে বেদ তাঁহাদের গৃহে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তান হইয়া থাকে ; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হইয়া পিতামহ বা মাতামহের ন্যায় হইয়া থাকে, আবার অনেক সময় প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ বা তদূর্দ্ধ কোন পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর পৌত্র ও পিতামহ একত্রে দেখিতে পাই বলিয়া তাহাদের আকৃতির সাদৃশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু তদূর্দ্ধ কোন পুরুষের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও দেখিতে পাই না বলিয়া তাহা জানিতে পারি না। যেস্থলে পূর্ব্বপুরুষেরা আপন আপন চিত্রপট রাখিয়া যান বা আপন আপন আকৃতি প্রস্তরে খোদিত করাইয়া যান, সেস্থলে তাঁহাদের সহিত পরবর্ত্তী পুরুষের অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যে গঠন বা ভঙ্গী এক্ষণে বংশে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে হয় ত তাহা কোন না কোন পূর্ব্বপুরুষের ছিল, চিত্রপট না থাকায় তাহা চিনিতে পারা যাইতেছে না। এমন কখন কখন দেখা যায় যে অতি দূরজ্ঞাতি বা মাতৃকুলোদ্ভব কোন দূর সম্বন্ধীয়দিগের পরস্পরের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ এক ছিলেন বলিয়া উভয়েই সেই পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি পাইয়াছেন।*

আকৃতির এইরূপ সাদৃশ্য যে কত পুরুষ অন্তর ঘটিতে পারে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, শত পুরুষ, সহস্র পুরুষ অন্তরেও ঘটিতে পারে। সে বিষয়ে অনেক প্রমাণও আছে, কিন্তু সে সকল প্রমাণ পরীক্ষা করিতে গেলে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহা এই :—আমরা এক্ষণে যে যে জাতীয় জীব দেখিতে পাইতেছি, ইহার মধ্যে অনেকগুলি পূর্ব্বে ছিল না, ক্রমে একজাতি হইতে অপর জাতি উৎপন্ন হইয়া নানা জাতি হইয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি ব্যতীত নূতন নূতন প্রকার জন্তু কি প্রকারে জন্মিল তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু তাহা যে জন্মিতে পারে এক্ষণে কেবল এইটী স্বীকার

*Variation of animals and plants. Vol. II page 7-8

করিয়া লইতে হইবে; তাহা হইলে পূর্ব্বসাদৃশ্যের আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা যত জাতীয় পায়রা দেখিতে পাই, সে সকলের-আদি "গোলা" পায়রা। সিরাজু বলুন, গৃহবাজ বলুন, লক্কা বলুন, লোটন বলুন ইহার কোন জাতিই পূর্ব্বে ছিল না। প্রথমে "গোলা" হইতে দ্বিতীয় এক জাতি উৎপন্ন হয়, সেই দ্বিতীয় জাতি হইতে ক্রমে আর এক তৃতীয় জাতি জন্মে এইরূপে ক্রমে ক্রমে ২৮৮ জাতি পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যায় এই সকল নূতন জাতীয় পায়রার বংশে মধ্যে মধ্যে গোলা পায়রার ন্যায় শাবক জন্মে। কেন জন্মে তাহা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যে লক্কার অমলশ্বেত পক্ষ দেখিয়া আমরা প্রশংসা করি সেই লক্কার বংশে যদি অকস্মাৎ গোলার ন্যায় ডোরাবিশিষ্ট শাবক জন্মে তবে কি বিবেচনা করা যায়? লক্কা এবং আদি "গোলা" কত সহস্র সহস্র পুরুষ অন্তর হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই আদি গোলার আকৃতি লক্কার বংশে জন্মিতেছে। ঘোটক আদিজাতি নহে। জেবরা নামক চতুষ্পদের অঙ্গ রেখার ন্যায় রেখাঙ্কিত একজাতীয় চতুষ্পদ হইতে ঘোটকের উৎপত্তি। সেই চতুষ্পদের সহিত এক্ষণকার ঘোটকের কত সহস্র পুরুষ অন্তর হইয়া গিয়াছে কিন্তু সেই চতুষ্পদের ন্যায় রেখাযুক্ত শাবক অদ্যাপিও ঘোটকের বংশে মধ্যে মধ্যে জন্মে।

জনকজননীর দোষ গুণ, আকৃতি প্রকৃতি সন্তানে জন্মে ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই বলিয়া আর তাহা আশ্চর্য্য বোধ করি না। বৈজিক কারণ তৎপ্রতি নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে দোষ গুণ জনক জননীর ছিল না, পিতামহ বা মাতামহের ছিল অথবা তৎপূর্ব্বগামী শত পুরুষ বা সহস্র পুরুষ অন্তরে কাহার ছিল, সেই শত পুরুষ বা সহস্র পুরুষ উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা কেবল এক পুরুষই উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহা কিরূপে অধস্তন কোন সন্তানে আইসে ইহা স্থির করা অতি কঠিন। ডারউইন সাহেব অনুভব করেন যে আমাদের অনেক দোষ গুণ বীজবাহী হইয়া অবসন্ন অবস্থায় বংশস্রোতে চলিতে থাকে কারণ পাইলেই কার্য্যক্ষম হয় নতুবা সেইরূপ অবসন্নভাবে থাকে। এই অনুভব সত্য হইলে হইতে পারে। কেন না দেখা যায় কাশ কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎকট রোগ দুই এক পুরুষে অদৃশ্য থাকিয়া আবার দুই এক পুরুষে প্রকাশ পায়। যদি মধ্যবর্ত্তী পুরুষে বীজে সেই রোগ গোপনভাবে না থাকিবে তবে পরবর্ত্তী পুরুষে আবার কেন পুনঃপ্রকাশ হইবে। কেবল রোগ কেন? অন্য বিষয়েও কতকটা এইরূপ দেখা যায়। দুগ্ধবতী গাভীর গর্ভজ বৃষদ্বারা যে বৎস উৎপাদিত হয় সে বৎস স্বল্পদুগ্ধার গর্ভে জন্মিলেও

দুগ্ধবতী হয়।* দুগ্ধবতীর গর্ভজ বৃষদেহে দুগ্ধবীজ না থাকিলে তাহার ঔরসজাত বৎস অবিকল পিতামহীর ন্যায় দুগ্ধবতী কেন হইবে। আবার চমৎকার এই যে ঐ বৃষজাত বৎস যে কেবল বহুদুগ্ধা হইবে এমত নহে তাহার দুগ্ধের স্বাদুতা পর্য্যন্ত অবিকল পিতামহীর ন্যায় হইবে।

বৃষ সম্বন্ধীয় কথাটী বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে স্ত্রীজাতির গুণ পুরুষেরও মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। দেখা যায় পুরুষকে মুষ্কশূন্য করিলে অর্থাৎ খোজা করিলে সেই পুরুষের স্ত্রীপ্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্ত্রীজাতির ন্যায় তাহার মৃদুস্বর হয় ভীরুস্বভাব হয়; পুরুষের ন্যায় আর তাহার শ্মশ্রু বা ওষ্ঠলোম জন্মে না। ছাগকে ছিন্ন বৃষণ বা খাসি করিয়া দিলে ছাগীর ন্যায় তাহার মুখ লম্বা হইয়া পড়ে। কুক্কুটকে খাসি করিয়া দিলে আর তাহার দাম্ভিক চীৎকার থাকে না পক্ষশিখা বা মাথায় ঝুট আর জন্মে না† কুক্কুটীর ন্যায় তাহার আকৃতি প্রকৃতি হয়। প্রসূতির প্রবৃত্তি তাহাতে বলবতী হইয়া থাকে আর হয় ত অণ্ডে বসিয়া তা দিবে তাহার একান্ত ইচ্ছা জন্মে। কোন্ কুক্কুটী কখন অণ্ড ছাড়িয়া আহার অন্বেষণে যায় তাহা দূর হইতে লক্ষ্য করিতে থাকে, সময় পাইলেই দৌড়িয়া আসিয়া তা দিতে আরম্ভ করে। এই সকল স্ত্রীপ্রকৃতি পুরুষশরীরে অবশ্যই ছিল বলিতে হইবে। একজন পুরুষ আপনার পৌত্রকে প্রতিপালন করিত, পৌত্রটীর গর্ভধারিণী ছিল না বা অপর স্বসম্পর্কীয় কোন স্ত্রীলোকও ছিল না কাজেই শিশু ক্রন্দন করিলে তাহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত বৃদ্ধ আপনার স্তন দিত। মাতৃস্তনভ্রমে শিশু তাহা ওষ্ঠদ্বারা টানিত; ক্রমে বৃদ্ধটির বামস্তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে তাহাতে দুগ্ধসঞ্চারও হইল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া একপ্রকার প্রতীতি জন্মে যে পুরুষে স্ত্রীপ্রকৃতি এবং তদনুরূপ আবার স্ত্রীতে পুরুষের প্রকৃতি হীনভাবে অবশ্যই আছে। কিন্তু পুরুষে কি প্রকারে স্ত্রীপ্রকৃতি আসিল জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে তাহা মাতৃবীজের দ্বারা আসিয়াছে। পুত্র হউক আর কন্যাই হউক প্রত্যেকেই জনকজননীর উভয়ের অংশ পায়, কাজেই পুত্রে স্ত্রীর প্রকৃতি ও কন্যাতে পুরুষের প্রকৃতি থাকা সম্ভব। তবে বিপরীত প্রকৃতিগুলি কেবল অস্ফুট ও অপ্রকাশিত ভাবে থাকে মাত্র।

উপরে যাহা বলা গেল তাহা যদি বিচারে প্রকৃত বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে আর একটী কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যে সকল চিহ্ন প্রকৃতি বা শক্তি এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হয় তাহা ব্যতীত আরও শত শত

---

* Variation of animals. Vol. II page 27.

† Variation of animals. Vol. II page 26.

প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক পূর্ব্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যতিক্রম বা যথাক্রম বীজবাহী হইয়া আমাদের শরীরে আসিয়া অপ্রকাশ্যভাবে রহিয়াছে উপযুক্ত কারণ পাইলেই তাহার কোন কোনটি প্রকাশ পাইবে নতুবা পূর্ব্বমত অপ্রকাশ্যভাবে আমাদের শরীরে থাকিয়া আবার যথারীতি বীজানুগামী হইয়া সন্তানে যাইবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজের চিহ্নও লইয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সমুদয় তারতম্যের চিহ্ন বা অঙ্কুর যদি বংশপরম্পরা সকলের শরীরে আছে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষের সহিত আমাদের সাদৃশ্য কেন হয় বুঝিবার কতক উপায় পাওয়া যায়। কিন্তু বলা গিয়াছে যে সেই সকল চিহ্ন বা অঙ্কুর প্রায় অধিকাংশই অবসন্ন অবস্থায় থাকে, কারণ পাইলেই কার্য্যক্ষম হয়, ফলতঃ কি কি কারণে কোন্ কোন্ অঙ্কুর কার্য্যক্ষম হয় তাহার এ পর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই। কত সহস্র সহস্র কারণ থাকিতে পারে তাহা মনুষ্য দ্বারা কখন যে আবিষ্কার হইবে আপাততঃ এমত কোন ভরসা নাই।

অনেকে বলেন যেস্থলে দ্বিজাতীয় জন্ম হয় সেস্থলে পূর্ব্বপুরুষের সহিত সাদৃশ্য ঘটিবার কারণ জন্মে। কেন জন্মে তাহা বলা যায় না, অথচ এইটী দেখা যায়। ঘোটক ও গর্দ্দভে যে বৎস উৎপন্ন হয় দেখা যায় যে প্রায় তাহাদের পদে একরূপ ডোরা অঙ্কিত থাকে অথচ হয় ত ঘোটক কি গর্দ্দভ উভয়ের মধ্যে কাহারও পদে সেরূপ ডোরা ছিল না। তবে কোথা হইতে আসিল? ঘোটক যে জাতীয় চতুষ্পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঐরূপ ডোরা ছিল, গর্দ্দভ সংশ্রবে ঘোটকের যে বৎস জন্মে তাহার পদে ডোরা থাকিলে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে সেই বহু পূর্ব্ববর্ত্তী চতুষ্পদ হইতে ঐ ডোরা আসিয়াছে। শ্বেত লক্কার গর্ভে শ্বেত লোটনের ঔরসে যে শাবক জন্মে অনেক স্থলে তাহার পালকে কাল ডোরা হয়। গোলা সকল জাতি পায়রার আদি পুরুষ; এই জন্য বলিতে হইবে সেই কাল ডোরা গোলা পায়রা হইতে আসিয়াছে।

যেরূপ অবয়ব সম্বন্ধে বলা গেল—প্রকৃতি সম্বন্ধেও ঐরূপ পূর্ব্বসাদৃশ্য ঘটে। আমাদের যেসকল শান্তস্বভাবসম্পন্ন গৃহপালিত চতুষ্পদ আছে ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বন্য ছিল এবং কাজেই তাহাদের প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল। এখনকার এই শান্তপ্রকৃতি পশুদিগের মধ্যে যদি দুই স্বতন্ত্র জাতি হইতে বৎস উৎপাদন করান যায় তাহা হইলে সে বৎস গৃহপালিতের ন্যায় শান্ত হয় না, তাহাদের বন্য পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় উগ্রস্বভাব হয়। *

* The parents of all our domesticated animals were of course aboriginally wild in disposition, and when a domesticated species is crossed with a distinct species, whether this is domesticated or only a tamed animal the hybrids are often wild to such a degree, that the fact is intelligible only on the principle that the cross has caused a partial return to a primitive disposition. *Darwin's Variation of Animals Vol. II.*

ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আমাদের মতে উগ্র জাতিই এই নিয়মটির এক প্রধান কারণ। আদিম অবস্থায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি বন্যজাতিদিগকে শূদ্র বলিতেন এবং ঘৃণাবশতঃ আপনাদের সমাজের সংস্পর্শে আসিতে দিতেন না, কিন্তু কালক্রমে তাহার কতক অন্যথা ঘটিল; আবার কালক্রমে আর্য্য ও শূদ্র এই দুই স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে বর্ণশঙ্কর ঘটিল। বর্ণশঙ্কর সন্তানদিগের প্রকৃতি অতি ভয়ানক হইল। ক্ষত্রিয় ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছিল তাহারা "উগ্র" এক্ষণে উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি।† তাহাদের এই নামকরণ প্রকৃতি অনুসারে হইয়াছিল জাতি অনুসারে নহে। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে যে সন্তান হইল তাহার নাম হইল চণ্ডাল। চণ্ড শব্দে উগ্র। অতএব দুই স্বতন্ত্র জাতীয় মনুষ্যজাত সন্তান যে অতি নীচ প্রকৃতি ও অতি নিষ্ঠুর হয় তাহার প্রমাণ আমাদের ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইতেছে। জাম্বসী নদীর ধারে বিলাতিদিগের ঔরসে এবং তদ্দেশীয় কৃষ্ণবর্ণা কাফ্রীদিগের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহাদের পৈশাচিক প্রকৃতি দেখিয়া লিবিংষ্টন সাহেব বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই দেশীয় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলে যে মহাশয়, শ্বেত পুরুষ দেবতার সৃষ্ট, কৃষ্ণকায় পুরুষও দেবতার সৃষ্ট; আর, এই দোআঁসলারা পাপ পুরুষের সৃষ্ট।‡

---

† এক্ষণকার উগ্রক্ষত্রিয়েরা আর উগ্র নাই। যে কারণে তাহাদের উগ্রপ্রকৃতি হইয়াছিল সে কারণও আর নাই।

‡ Many years ago, long before I had thought of the present subject, I was struck with the fact that, in South America, men of complicated descent between Negroes, Indians, and Spaniards, seldom had, whatever the cause might be, a good expression. Livingstone—and a more unimpeachable authority cannot be quoted—after speaking of a half caste man on the Zambosi, described by the Portuguese as a rare monster of inhumanity, remarks, "It is unaccountable why half castes, such as he, are so much more cruel than the Portuguese, but such is undoubtedly the case." An inhabitant remarked to Livingstone "God made white men and God made black men, but the Devil made half castes." When the two races, both low in the scale; are crossed the progeny seems to be eminently bad. It was the noble hearted Humboldt, who felt no prejudice against the inferior races, speaks in strong terms of the bad and savage disposition of the Zambos, or half-castes between Indians and Negroes, and this conclusion has been arrived at by various observers. From these facts we may perhaps infer that the degraded state of so many half castes is in part due to reversion to a primitive and savage condition, induced by the act of crossing, even if mainly due to the unfavourable moral conditions under which they are generally reard. *Darwin's variation of animals and plants Vol. II. Chap. XIII.*

আমাদের দেশে দ্বিজাতীয় বংশ আবার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে সচরাচর "মেটে ফিরিঙ্গি" বলিয়া থাকি, এই দেশীয়াদিগের গর্ভে এবং বিলাতিদিগের ঔরসে তাহাদের জন্ম। শুনিতে পাওয়া যায় মেটে ফিরিঙ্গিরা নীচপ্রকৃতির লোক, কিন্তু আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ নীচ বলিয়া বোধ হয় না। যে নীচত্ব দেখা যায় তাহা বোধ হয় শিক্ষার দোষজনিত। হইতে পারে যে বিলাতিরা আর্য্যবংশোদ্ভব, ও এদেশীয়েরাও আর্য্যবংশোদ্ভব, এই জন্য বিলাতীয়দিগের সহিত এদেশীয় রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় বিশেষ দোষ স্পর্শে নাই। যে দ্বিজাতীয়ের বংশের কথা হামবোল্ড বা লিভিংষ্টোন প্রভৃতি সাহেবেরা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় কাফ্রী ও ফরাসী, অথবা চিনা ও আরবী, বা তদ্রূপ অন্য কোন দুই স্বতন্ত্র গঠনের মনুষ্য দ্বারা যে সন্তান উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে। ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে গঠনের বিশেষ কোন বৈজাত্য লক্ষ্য হয় না। কাজেই এই দুই দেশীয় লোক দ্বারা যে বিজাতীয় জন্ম হয় এমত বলা যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তান যে জনকের ন্যায় কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। জনকের ন্যায় না হইয়া সন্তান যে কতদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় হয় সে বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইল। সন্তান, আবার বংশের কাহারও মত না হইয়া একেবারে ভিন্ন বংশোদ্ভব লোকের ন্যায় যে হইতে পারে, এক্ষণে সেই বিষয় বলা যাইতেছে।

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর ন্যায় না হইয়া মৃত স্বামীর ন্যায় হয়। সন্তান উৎপত্তির দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে যে স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহার আকৃতি তাহার অবয়ব অন্য ব্যক্তিজাত সন্তানে কিরূপে জন্মে ইহা বিবেচনা করিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার কারণ অনেকে অনেক প্রকার অনুভব করেন। কেহ বলেন কখন কখন গর্ভে পূর্ব্বস্বামীর বীজ সঞ্চিত থাকে তজ্জন্যই এরূপ সন্তান জন্মে, কিন্তু এ কথা অতি অগ্রাহ্য। কেহ বলেন গর্ভধারিণী যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন সন্তানের সেই মূর্ত্তি হয়; বিরহকাতরা স্ত্রী পূর্ব্বস্বামীর মূর্ত্তি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন বলিয়া পূর্ব্ব স্বামীর ন্যায় তাঁহাদের সন্তান হয়। কিন্তু এ অনুভব অনেকে অগ্রাহ্য করেন; তাঁহারা বলেন যে, যদি কাহারও মূর্ত্তি ভাবনাই এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হইত তাহা হইলে গোমেষাদি পক্ষে এই কারণ খাটিত না, কেননা চতুষ্পদেরা

অশ্বের আকার ধ্যান করিতে পারে না ; অথচ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে চতুষ্পদের মধ্যেও ঐরূপ সাদৃশ্য ঘটে। গর্দ্দভের ঔরসে কোন ঘোটকী প্রথম গর্ভবতী হইয়া থাকিলে যদি সেই ঘোটকী আবার কোন সুন্দর ঘোটকের দ্বারা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়, তথাপি হয় ত সেই পূর্ব্ববর্ত্তী গর্দ্দভের ন্যায় তাহার বৎস জন্মে। ঘোটকজাত বৎসও যে গর্দ্দভের ন্যায় হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু এইরূপ ঘটনা ঘোটক, কুক্কুর, মেষ, শূকর প্রভৃতি অনেক চতুষ্পদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকথিত আপত্তিকারীরা বলেন এইরূপ সাদৃশ্য গর্ভধারিণীর চিন্তাজনিত নহে, ইহা কেবল রক্তসংশ্রব জনিত। তাঁহারা বলেন যে গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ত সংশ্রবে মাতৃদেহ পিতৃচিহ্নগ্রস্ত হয় এবং সেই চিহ্ন পরবর্ত্তী সন্তানে মধ্যে মধ্যে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই অনুভব সম্বন্ধে আর একপক্ষ আপত্তি করেন যে যদি রক্তসংশ্রবে মাতৃদেহ পিতৃচিহ্নগ্রস্ত হয়, তবে পক্ষী সম্বন্ধে ত এই নিয়ম খাটে না, কেননা পক্ষীর গর্ভস্থ অণ্ডের সহিত মাতৃরক্তের কোন মতে সংস্পর্শ হয় না, অথচ চতুষ্পদের ন্যায় পক্ষীরও শাবক পূর্ব্ব গর্ভকর্ত্তার ন্যায় কখন কখন হইয়া থাকে। পক্ষীদিগের মধ্যে যে এরূপ সাদৃশ্য জন্মে একথা সকলে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ডাক্তার সেপিয়াস সাহেব এরূপ সাদৃশ্য কপোতমধ্যে দেখিয়াছেন। কিন্তু ডারউইন সাহেব বলেন যে ইহার আরও প্রমাণ চাই। বাঙ্গালা দেশে এ সকল বিষয়ে বড় মনোযোগ নাই অতএব আমাদিগের মধ্যে কেহ যে ইহার কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এমত সম্ভব নহে, কাজেই এই সহজ পরীক্ষার নিমিত্ত ইউরোপের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে।

গর্ভিণী যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন সন্তানের সেই মূর্ত্তি হয় পূর্ব্বে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্র ছিল এবং আমাদের দেশে অদ্যাপি আছে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা গর্ভিণীর পক্ষে যে নিয়ম বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে তাঁহাদেরও এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল। গর্ভিণী কুদৃশ্য বা কুৎসিত ব্যক্তি দেখিবে না, কেননা তাহাতে সন্তান কুৎসিত হইবে ; সর্ব্বদা স্বামীকে দেখিবে এবং স্বামীর ন্যায় সন্তান হয় এমত কামনা করিবে কেননা যে ব্যক্তিকে সর্ব্বদা দেখা যায় বা সর্ব্বদা ভাবনা করা যায় সন্তান তাহারই মত হয়।

মুসলমানদিগের মধ্যেও বোধ হয় এই বিশ্বাস কতক ছিল ; কেন না, জনশ্রুতি আছে যে মুরসিদাবাদের কোন নবাব একবার একটি গর্ভিণী ঘোটকীর সম্মুখে আপনার ইচ্ছামত বর্ণ চিত্রিত করাইয়া একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত অশ্ব রাখিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে সেই চিত্রিত অশ্বের ন্যায় বৎসের বর্ণ হইবে এই অনুভবে মৃৎমূর্ত্তি চিত্রিত করাইয়াছিলেন। লোকে বলে বৎসও সেই চিত্রিতবর্ণ পাইয়াছিল। একথা কতদূর সত্য তাহা স্থির করিবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। কিন্তু লোকের যে

এ বিষয়ে কতদূর বিশ্বাস তাহা এই প্রবাদ দ্বারা বুঝা যাইতেছে এবং তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত আমারা এই নবাবি কৌশলের উল্লেখ করিলাম।

পশুদিগের মধ্যে রূপচিন্তা অসম্ভব বলিয়া যে আপত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলে হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্য সম্বন্ধেও যে সেই আপত্তি অবশ্য বলবতী হইবে এমত বোধ হয় না, কেননা অনেক সময় চিন্তা হেতু গর্ভস্থ সন্তানের গঠন সম্বন্ধে তারতম্য হইতে দেখা গিয়াছে। একবার সূর্য্যগ্রহণের সময় একটি গর্ভবতীকে আত্মীয়েরা নির্জ্জন ঘরে শয়ন করাইয়া রাখেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে গ্রহণের সময় গর্ভিণীকে কতকগুলি বিষয়ে বড় সাবধানে থাকিতে হয়। পাছে তাহার অন্যথা ঘটে এই আশঙ্কায় একজন প্রবীণা আসিয়া গর্ভবতীর নিকটে বসিয়াছিলেন, এমত সময় বাহিরে হঠাৎ একটা গোলযোগ হওয়ায় প্রাচীনা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভবতীও উঠিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনি নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, অমনি পুনরায় শয়ন করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সময় প্রাচীনা দেখিলেন যে গর্ভবতী বামপদ চাপিয়াছেন এবং ঈষৎ বাঁকাইয়াছেন। অমনি প্রাচীনা চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের পা বাঁকিয়া গেল; অন্যান্য আত্মীয়েরা আসিয়া সকলেই গর্ভবতীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, গর্ভবতী ভয়ে অধোবদনা হইলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ যাইয়া বুঝাইবার এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না; গর্ভবতীর স্থিরবিশ্বাস হইল যে তাঁহার সন্তানের পা বাঁকা হইবে। তিনি অনবরত তাহাই ভাবিতেন। সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল কিন্তু গর্ভধারিণী যাহাই ভাবনা করিতেন তাহাই হইয়াছিল। সন্তানটীর বামপদ বাঁকা দেখিয়া আমরাও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম। প্রায় ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানটির বামপদ এত বাঁকা ছিল যে তাহার জুতা ফরমাইস দিতে হইত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল সে বক্রতা বিনা চিকিৎসায় সারিয়া গিয়াছে। এই অঙ্গবৈলক্ষণ্য গর্ভধারিণীর সর্ব্বদা ভাবনার ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?*

আর একবার একজন ডাক্তার সাহেব কোন দীনহীন গৃহস্থকে অনুগ্রহ করিয়া চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। গৃহস্থের স্ত্রী তৎকালে গর্ভিণী ছিল। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, গর্ভিণী সেই সাহেবকে দেখিতে থাকে। এত নিকটে কখন সাহেব দেখে নাই অতএব সুবিধা পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। সাহেব চলিয়া গেলে গর্ভিণী সকলের নিকট সাহেবের চুলের পরিচয় দিতে লাগিল। সাহেবের বর্ণই শ্বেত হয় কিন্তু তাঁহাদের চুলের বর্ণও যে শ্বেত হয় একথা গর্ভিণী

* যদি এই পরিচয় কেহ বিশেষ করিয়া জানিতে চাহেন, কাষ্ঠশালী গ্রামে গেলে জানিতে পারিবেন।

একেবারে জানিত না, অতএব সাহেবের চুল দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে কেবল তাহাই ভাবনা করিত। পরে তাহার সন্তান জন্মিলে দেখা গেল যে তাহার চুল সম্পূর্ণ ইংরেজিবর্ণের হইয়াছে। সন্তানটি ৮।১০ বৎসর অবধি জীবিত ছিল, তাহার চুল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইত। বালকটি উপস্থিত প্রস্তাবলেখকের প্রতিবাসী ছিল।

এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা আমাদের বিশেষ জানা আছে। একজন যুবা একখানি ইংরেজি পট ক্রয় করেন। পটখানিতে একটি সুন্দর শিশুর নিদ্রাভঙ্গ চিত্রিত ছিল। যুবা একদিন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী অতি আগ্রহের সহিত পটখানি একা দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়া যুবতী অপ্রতিভ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের কি এমত সুন্দর সন্তান হইতে পারে? এই সময় তিনি গর্ব্ভবতী ছিলেন। তাঁহার স্বামী দেখিলেন যে গর্ব্ভবতী সর্ব্বদাই সেই পটখানির নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। পরে যথাকালে তাঁহার পুত্র জন্মিল; প্রায় ছয় মাস বয়সের সময় দেখা গেল যে সন্তানটীর উদর ও বক্ষের গঠন পটের চিত্রিত শিশুর ন্যায় হইতেছে। পরে ক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সেই মত অবিকল হইল। এই সময় যিনিই পটখানি দেখিতেন তিনিই মনে করিতেন যে উহা বালকটির প্রতিমূর্ত্তি। এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বালকের প্রায় দুই বৎসর বয়স অবধি ছিল। কিন্তু পরে আর রহিল না। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে গর্ব্ভবতীর চিন্তানুরূপ সন্তান হওয়া নিতান্ত অমূলক নহে।

সাদৃশ্য জনক জননীর সহিত হউক, অথবা অপর কাহারও সহিত হউক, অনেক সময় তাহা কেবল অল্পকাল স্থায়ী হয়; কখন বা তাহা কেবল সময়ে সময়ে হয়। ডারউইন সাহেব বলেন এইরূপ সাদৃশ্য কেবল পশুদিগের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি একবার কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুটের দ্বারা শ্বেত পক্ষযুক্ত কুক্কুটীর শাবক উৎপাদন করেন। কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে অমল শ্বেত হইল, পর বৎসরে কাল হইয়া গেল। আবার কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে কৃষ্ণবর্ণ ছিল দ্বিতীয় বৎসরে অমল শ্বেত না হউক এক প্রকার শ্বেতপক্ষ বিশিষ্ট হইল। ডারউইন সাহেব বলেন তিনি হোফাকার নামক বিদেশীয় পণ্ডিতের গ্রন্থে পড়িয়াছেন যে রক্তবর্ণ ষাঁড়ের ঔরসে কৃষ্ণবর্ণা গাভীর গর্ভে যে বৎস জন্মে, অথবা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের ঔরসে রক্তবর্ণা গাভীর গর্ভে যে বৎস জন্মে তাহা কখন কখন প্রথমে রক্তবর্ণ হয় পরে কালবর্ণ হয়। আমাদের দেশে এরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন গো জাতির মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন।

আকৃতির পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হইতেছে সকলেই তাহা দেখিতেছেন, বাল্যকালে এক আকৃতি, বার্দ্ধক্যে আর একরূপ। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে যে

পরিবর্ত্তন হয় তাহা সচরাচর এক আকৃতির পরিবর্ত্তন মাত্র, কিন্তু যাহা বলা যাইতেছিল তাহা স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকথিত শিশু ছয়মাস বয়স্ হইতে প্রায় দুই বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত পটের চিত্রিত বালকের ন্যায় হইয়াছিল পরে আর এক প্রকার হইল। আমাদিগের কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে এই পরিবর্ত্তন কেবল বয়োবৃদ্ধি অনুসারে মূল আকারের তারতম্য মাত্র; এমত কথা বলিতেছি না যে সেই আকার রহিল, বয়োভেদে তাহার কিছু ভিন্নতা হইল। আমরা স্বতন্ত্র প্রকার পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি। পূর্ব্ব আকার লুপ্ত হইয়া ভিন্ন আকার পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ মূল আকারের পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহাই বলিতেছি। আমাদের বিশ্বাস যে একব্যক্তির আকৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া অনেকের বোধ হইবে, পূর্ব্বে আমাদেরও তাহা বোধ হইতে পারিত, কিন্তু যাঁহারা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহারা যেন অন্যের ন্যায় অগ্রাহ্য না করেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, এম-বি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তৃতীয় সংস্করণ। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এই গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। ১০৬০ পত্রের গ্রন্থ যে স্থলে অল্পকালের মধ্যে তিনবার মুদ্রাঙ্কান করিতে হইয়াছে সে স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গ্রন্থখানি দেশে বিলক্ষণ পরিচিত এবং আদৃত। আর সমালোচনা দ্বারা ইহার পরিচয় দিতে হইবে না, তথাপি গঙ্গাপ্রসাদ বাবু স্মরণ করিয়া সমালোচনার্থ গ্রন্থখানি পাঠাইয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানি না পাঠাইলে আমরা ক্রয় করিতাম, গৃহস্থমাত্রেরই গ্রন্থখানি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিপাটী হইয়াছে, ব্রজমাধব বাবু এ বিষয়ে আপনার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

উপন্যাসমালা। শ্রীযুক্ত রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর প্রণীত। নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে প্রায় ৩২ বৎসর হইল, এই উপন্যাসগুলি ইংরেজিতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান আকারে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার ভরসা যে গল্পগুলি জন-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু বোধ হয় এ ভরসা তাঁহার সম্প্রতি জন্মিয়াছে, নতুবা এতদিন গল্পগুলি ইংরেজিতে লুকাইয়া রাখিবেন কেন? যৎকালে গল্পগুলি ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার পাঠক ছিল না, কিন্তু বোধ হয় এই গল্পলেখকের ন্যায় লেখক যদি তৎকালে চেষ্টা করিতেন বাঙ্গালায় পাঠক জুটিত। পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না বলিয়াই লোকে তখন পড়িত না। পাঠ্যগ্রন্থ নাই তবু লোকে পাঠ করিবে এরূপ প্রত্যাশা কেবল হিন্দুকালেজ হইতেই জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে আমাদের কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজি সাহিত্যের সহায় হইয়াছিলেন। তাহাতে ফল কি হইয়াছিল বলিতে পারি না,

কিন্তু আমরা দূর হইতে দেখিতাম কয়েকজন যুবা সমুদ্র বাড়াইবার নিমিত্ত ঝিনুক হস্তে জলসিঞ্চন করিতেন। উপস্থিত উপন্যাসমালা ইংরেজিতে কয়জন পড়িয়াছিল শুনি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে শত শত শত লোকে পড়িয়া আপ্যায়িত হইবে তাহা আমরা কতক নিশ্চয় বলিতে পারি। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে, ভাবান্তরীকৃত বলিয়া একেবারে বোধ হয় না। কিন্তু যে প্রণালীতে গল্প বলা হইয়াছে তাহা ইংরেজী প্রণালী ; যাঁহারা ইংরেজিতে ক্ষুদ্র গল্প পাঠ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ইহা নূতন বলিয়া বোধ হইবে, সে প্রণালী ইংরেজি হউক কিন্তু সুন্দর।

ভারত-উদ্ধার অথবা **(ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা)** চারি আনা মাত্র। শ্রীরামদাস শর্ম্মা বিরচিত।

কিরূপে ইংরেজ হইতে ভারত উদ্ধার হয়, কাব্যখানিতে তাহাই রচিত হইয়াছে। কিরূপে—

"————————দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানাপাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসর্জি' সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন এবে—
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।"

ভারত উদ্ধারের সূত্র এই :—একদিন বুদ্ধিমান বিপিন গোলদীঘি তটে একা ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন—

"ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ, বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।

গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তা'ত যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! * * *
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
* * *
—বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরাজে।"

বিপিন বাবু শেষ "প্রিয়বন্ধু কামিনীকুমারের" সহিত মিলিত হইয়া একস্থানে সভা সংস্থাপন করিলেন।

"অজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
শোভিছে সুরম্য, রাজ-পথের উপরে,
আঁকা বাঁকা, উঁচু নীচু, কাষ্ঠ দণ্ড-শ্রেণী-
আবৃত অলিন্দ তার ম্লান ভাবে ঝুলি,
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়া র
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান; মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাই'ছে দেহে।
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা পাখা, চীর আবরিত;
পড়িত সে এতদিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।

এ হেন মন্দিরে "আর্য্য কার্য্যকরী সভা" প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ! ধন্য অনুরাগ!

বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার স্থির হইল। ছাতু, লঙ্কা, পটকা আর পিচকারি বঁটি এই কয়েক দ্রব্য যুদ্ধের উপকরণ। ছাতু দ্বারা সুয়েজ সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ হইবে, বলিয়া ছাতু ক্রয় করিয়া, সমুদ্রধারে পাঠান হইল। আর আর সকল উদ্যোগ হইল। বিপিন বাবু স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় হইবার নিমিত্ত বলিলেন—

"স্বদেশ-উদ্ধার কল্পে বাহিরিব আজ
করিব বিচিত্র রণ ইংরাজের সনে
শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন।"

বিপিন বাবুর স্ত্রী বিস্তর বুঝাইলেন—

"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হবে না
কোথায় বাজিবে অঙ্গে————
—–——— বলি প্রাণনাথ
দেশ ত দেশেই আছে কি আর উদ্ধার ?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দেও নাথ, ল'ব শিরঃপাতি।"

বীরশ্রেষ্ঠ তাহা শুনিলেন না। বঙ্গবীর সকল যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

"গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইয়া ব্যূহ রচি————–
করাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন আদেশে
প্রসারি' দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্র নাদ করি।"

এইরূপে ভারত উদ্ধার হইল।

এখন কথা এই। রামদাস শর্ম্মা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত; কল্পতরুর মূলে আমাদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। আমরা তাঁহার মাই ডিয়ারের মধ্যে; এক্ষণে অনেকের ভয় পাছে রামদাসকে দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালিরা কোনদিন "বঁটাইয়া" দেয়। কিন্তু তাহার কারণ দেখি না। বাঙ্গালিরা চিরকাল বীরপুরুষ, তাঁহাদের বীরত্ব বর্ণনায় তাঁহারা অবশ্য আপ্যায়িত হইবেন।

মানব ও যৌন নির্ব্বাচন

মানবসমাজে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য সমালোচন করিবার পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, যৌননির্ব্বাচন কি? কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে স্থির করা উচিত, বিষয়টা কি? সে জন্যও বটে, আর অন্য কারণে এ স্থলে বিষয় নির্ণয় আবশ্যক। যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুপরিচিত নহেন, এবং যাঁহারা অল্পপরিচিত, তাঁহাদের কাছে বিষয়টা নূতন ;—অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায় এবিষয়ের আন্দোলন যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা আমি অবগত নহি। অনেকের কাছে কথাটাও নূতন।

যৌননির্ব্বাচন একটা শক্তি। শক্তিমাত্রেরই পরিচয় কার্য্যের দ্বারা। কোন শক্তিরই কার্য্যনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সম্ভবে না। আমরা যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দেখিয়া যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি বুঝাইব।

সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রী এবং পুরুষ, এতদুভয়ের মধ্যে অনেক শারীরিক প্রভেদ দেখা যায়, অনেক মানসিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিভিন্নতা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

স্ত্রী এবং পুরুষ বলিতে গেলেই কতকটা প্রভেদ আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। সে প্রভেদ না থাকিলে স্ত্রীপুরুষে পার্থক্যও থাকে না। সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়ের যে সকল শারীরিক গঠনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, স্ত্রীপুরুষে তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। এইগুলিকে নৈসর্গিক অথবা মুখ্য যৌনচিহ্ন বলা যায়।

অনেক জীবের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আর একপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ পার্থক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, সুতরাং এ সকল স্ত্রীপুরুষ পার্থক্যেরই ফল নহে। কোন কোন জাতীয় জীবের মধ্যে চলৎশক্তির উপায়ীভূত অনেক শারীরিক গঠন পুরুষে দেখা যায়, তাহা সেই জাতীয় স্ত্রীতে নাই। পুরুষে ধৃত-রক্ষার্থ কতকগুলি গঠন আছে, স্ত্রীতে নাই। সন্তানরক্ষার সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী শারীরিক গঠন অনেক জাতীয় স্ত্রীর আছে, পুরুষের নাই—যেমন, মানবীর স্তন ইত্যাদি। এ সকল পার্থক্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। স্ত্রীকে পাইলে ধরিয়া

রাখিবার জন্য অনেকস্থলে পুরুষ উপায় আবশ্যক হইয়া পড়ে'। ডাক্তার ওয়ালেস বলেন, এমন কীট আছে যাহাদের পুরুষের পদ কোন কারণে ভগ্ন হইয়া গেলে আর তাহারা স্ত্রীসংসর্গ করিতে পারে না। এমন অনেক সামুদ্রিক জীব আছে, যাহাদের পুরুষের পদ সকল প্রাপ্তযৌবনে অসামান্য পুষ্টিলাভ করে। এস্থলে অনুমান করা যায় যে, এই সকল জীব নিয়ত সাগরোর্ম্মি দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, সুতরাং স্ত্রীকে আপন আয়ত্তে ধরিয়া রাখিবার উপায় না থাকিলে অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়া অসম্ভব অথবা দুর্ঘট হইয়া উঠে। কাজেই ইহাদের পদ সকলের দৈর্ঘ্য এবং পুষ্টির অভাবে তজ্জাতীয় জীবপ্রবাহের রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য বলিতে হইবে।

আর কতকগুলি পার্থক্য আছে, সেগুলি যৌননির্ব্বাচনের ফল—অর্থাৎ সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল বলিয়া স্ত্রীলাভচেষ্টায় একজন পুরুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছে—সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল না বলিয়া একজন পুরুষ অপরের ন্যায় স্ত্রীলাভ করিতে পারে নাই। একটি স্ত্রী আছে;—তোমাতে এবং অপর এক ব্যক্তিতে সেই স্ত্রীলাভ লইয়া প্রতিযোগিতা। মনে কর সেই স্ত্রী সুকণ্ঠসংগীতানুরাগিণী। এখন, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি দাঁড়াইবে? তোমাদের দুইজনের মধ্যে যিনি সুকণ্ঠ, অথবা যাহার কণ্ঠধ্বনি সেই স্ত্রীর কর্ণে সু, সেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। তুমি যদি সুকণ্ঠ না হও, তোমাকে মনোদুঃখে, ম্লানমুখে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি সেই জাতীয় জীবের সকল স্ত্রীই সংগীতানুরাগিণী, সুকণ্ঠপক্ষপাতিনী হয়, তাহা হইলে অবশ্য এই ফল দাঁড়াইবে যে, যাহারা সুকণ্ঠ নহে তাহাদের অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইবে না, সুতরাং তাহাদের বংশলোপ হইবে। যাহারা সুকণ্ঠ তাহারাই কেবল স্ত্রীলাভ করিবে—কেবল তাহাদেরই বংশ থাকিবে।

এইস্থলে আর একটী কথা বুঝাইতে হইতেছে। উত্তরাধিকার নিয়মের কথা সকলে শুনিয়া থাকুন বা না থাকুন, গাল্টনের 'প্রতিভার উত্তরাধিকার' গ্রন্থ সকলে পড়িয়া থাকুন বা না থাকুন, পিতৃপ্রকৃতি যে অনেকটা পুত্রে বর্ত্তে তাহা সকলেই জানেন—অন্ততঃ এতৎ সত্যমূলক প্রচলিত প্রবাদটা সকলেই শুনিয়াছেন। প্রবাদটা সত্য। এতৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ সংগৃহীত এবং সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অবতারণার এ উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া আমরা প্রমাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম। তবে দুই চারিটা মোটামুটি কথা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

ইহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ রুচি, বুদ্ধিমত্তা, সাহস, বিশেষ বিশেষ পরিবারের সকলের মধ্যেই দেখা যায়। প্রতিভার ন্যায় জটিল শক্তিরও উত্তরাধিকার হয়। এবিষয়ে গাল্টন সাহেব বহু যুক্তি দিয়াছেন, বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তন্মধ্যে পিতাপুত্র হর্শেল, পিতাপুত্র মিল, পিতাপুত্র কস্স,

পিতাপুত্র পিটের কথা সকলেই জানেন। প্রুসিয়ার বিখ্যাত 'গ্রেণেডিয়ার' সৈন্যদলের কথাও সকলে জানেন। যে সকল গ্রামে এই দীর্ঘকায় পুরুষ এবং তাহাদের দীর্ঘকায় স্ত্রীগণ বাস করিত, সে সকল গ্রামে বহুতর দীর্ঘকায় লোকের জন্ম হইত। ডারুইন সাহেব এবিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। *

এই নিয়মানুসারে সুকণ্ঠদিগের বংশধরেরা সুকণ্ঠ হইল। এবং অনুশীলনে সেই ক্ষমতা আরও পরিপুষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যেও আবার ঐরূপ নির্ব্বাচন হইল,—সেই সুকণ্ঠদিগের মধ্যে যাহাদিগের কণ্ঠ অধিকতর সু তাহাদেরই বংশ থাকিল, অন্যের থাকিল না, কেন না তাহাদের দগ্ধ অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইল না। এইরূপে সেই জাতীয় জীবের মধ্যে ক্রমশঃ কণ্ঠমাধুর্য্যগুণের পুষ্টি হইতে লাগিল। ইহারই নাম যৌন-নির্ব্বাচন। /

কিন্তু সকল জাতীয় জীবেরই স্ত্রী কিছু কণ্ঠরবে মোহিতা হয় না—সকলেরই প্রেম প্রলোভন কিছু শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয় না। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী—পুরুষের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এস্থলে যৌননির্ব্বাচনে বর্ণের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্যের চটক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কেহ বা নৃত্যের পক্ষপাতিনী—তজ্জাতীয় পুরুষের নৃত্যক্ষমতা ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সুগন্ধে মুগ্ধ—পুরুষের শরীরনিঃসৃত সৌরভে উন্মত্তা হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে যৌননির্ব্বাচন পুরুষের সৌরভবিকীরণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে।

সকল সময়ে আবার এত সহজে স্ত্রীলাভ ঘটিয়া উঠে না। যখন একজন স্ত্রীর অনেক প্রয়াসী, অথবা অল্পসংখ্যক স্ত্রীর অধিক সংখ্যক প্রেমপ্রার্থী জুটে, তখন মহা-কলহ উপস্থিত হয়। তখন কাজেই তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইবে। স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে স্ত্রীলাভ চেষ্টা প্রায়শঃই যুদ্ধে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে এমন কলহ, এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত না গড়াইয়া তাহার অবসান হয় না। শশকের ন্যায় ভীরু এবং শান্তপ্রকৃতি জীবের মধ্যেও স্ত্রীলাভের জন্য বিবাদ করিয়া একজন অপরকে মারিয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে। †

যাহারা দুর্ব্বল তাহারা হয় মরিয়া যায়, নয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। যাহারা বলবান্ তাহারা থাকে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং বংশধরেরা পিতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নির্ব্বাচনে পুরুষেরা বলবান্ হইয়া উঠে। এইরূপ নির্ব্বাচনে স্ত্রীপুরুষে বলের তারতম্য, আকারের তারতম্য, সাহসের তারতম্য, বুদ্ধির তারতম্য।

এইস্থলে একটি সমস্যা উপস্থিত হয়। যে সকল পুরুষেরা অন্য পুরুষকে পরা-

---

* The variation of animals and plants under domestication Vol. ii, Chap. xii.

† Zoologist, Vol. i. p. 2ii.

জিত করে, অথবা স্ত্রীদিগের চক্ষে অধিকতর মনোহর বলিয়া প্রতীত হয়, কিরূপে তাহারা অধিকসংখ্যক বংশধর রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়, ইহা বুঝা কিছু কঠিন। অধিকতর বংশধর রাখিয়া যাইতে না পারিলে, যে সকল গুণে তাহারা স্ত্রীলাভ ব্যাপারে অন্য পুরুষ অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, তাহা কখনই যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংখ্যার তারতম্য বড় না থাকে, এবং যদি পুরুষেরা বহুবিবাহপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে কি ভাল কি মন্দ সকল পুরুষেই অবশ্য অগ্রপশ্চাৎ স্ত্রীলাভ করিবে। যাহারা বলবান্, অথবা সুন্দর, অথবা সুগায়ক, তাহারা না হয় অগ্রেই স্ত্রীলাভ করিবে—যাহারা সেরূপ নহে, তাহাদিগকে না হয় দুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে—স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান হইলে কেহই একেবারে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু দুদিন অগ্রপশ্চাতে বড় আসে যায় না। সৌন্দর্য্য অথবা সুকণ্ঠ অথবা সুনৃত্যের সঙ্গে জীবনোপায়াহরণের সম্বন্ধ অল্প সুতরাং ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, সুকণ্ঠ কুকণ্ঠ সুনর্ত্তক কুনর্ত্তক সকলেই—যে অগ্রে স্ত্রীলাভ করিবে সেও যেমন, যাহার মেওয়া সবুরে ফলিবে সেও তেমনি—সমান-সংখ্যক অপত্য রাখিয়া যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে সংখ্যার তারতম্য তাদৃশ থাকিলে স্ত্রীসংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইলে অবশ্য অনুমান করা যাইত যে স্ত্রীগণ উত্তম পুরুষদিগের মধ্যে বিলি হইয়া গেল, সুতরাং অধমেরা পাইল না, কিন্তু তেমন ন্যূনাধিক্য সর্ব্বত্র দেখা যায় না*। বহুবিবাহও

* ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার ন্যূনাধিক্য নির্ণয় করিবার জন্য যে সকল তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য—এত অল্প যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার উপর আর এক শঙ্কট এই যে যৌননির্ব্বাচনের পক্ষে কেবল মাত্র জন্মকালের ন্যূনাধিক্য স্থির করিলে চলিবে না—পরিণত বয়সে কিরূপ দাঁড়ায় তাহাই দেখিতে হইবে। এবং ইহা স্থির করা এক্ষণে একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। ইহা নিশ্চয় যে মনুষ্য মধ্যে প্রসবকালে, তৎপূর্ব্বে এবং শৈশবে বালিকার অপেক্ষা বালকের অধিক মৃত্যু হয়। মেষ এবং সম্ভবতঃ আরও কোন কোন শ্রেণীর জীবের মধ্যেও ঐরূপ। কতকগুলি জীবের পুরুষেরা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে। কতকগুলি পরস্পরকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় এবং ক্রমে শীর্ণকায় হইয়া পড়ে। যখন তাহারা ব্যগ্রতা সহকারে ইতস্ততঃ সঙ্গিনী খুঁজিয়া বেড়ায়, সে সময়েও অনেক বিপদ ঘটে। কতকগুলি মৎস্যের পুরুষেরা স্ত্রীগণ অপেক্ষা অনেক ছোট; তাহারা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অথবা অন্য মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার অন্যদিকে, স্ত্রীগণ যখন কুলায় বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, তখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোন কোন স্থলে পরিণতদেহ স্ত্রীগণ পুরুষের ন্যায় লঘুগতি নহে, সুতরাং ভাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এই সকল কারণে বন্য জীবের মধ্যে পরিণত বয়সে স্ত্রীপুরুষের ন্যূনাধিক্য স্থির করা দুঃসাধ্য। তবে ইহা এক প্রকার জানা আছে যে কোন কোন স্তন্যপায়ী জীবের, কতকগুলি পক্ষীর এবং কোন কোন শ্রেণীর মৎস্যের এবং কীটের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ নহে। *Vide Darwin's Descent of Man. Part II. Chap. VIII. supplement.*

সকল জাতীয় জীবের মধ্যে প্রচলিত নাই†। তবে কেমন করিয়া উত্তমেরা অধিকতর অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারিল? কেমন করিয়া এই সকল স্ত্রীমোহন-গুণের পুষ্টিসাধন যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা হইল?

ডারুইন সাহেব এ সমস্যা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছেন। মনে কর কোন প্রদেশস্থ বিশেষ এক জাতীয় বিহঙ্গীসমূহকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিলাম—একভাগে, যাহারা অধিকতর সবলকায়; অন্য ভাগে, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায়। এক্ষণে ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ যে, যাহারা অধিকতর সবলকায় তাহারা বসন্তকালে অন্য দলের অগ্রেই অবশ্য গর্ভধারণে সক্ষম হইবে—জেনর উয়ের সাহেবের ন্যায় একজন বিখ্যাত পক্ষিচরিত্রবিৎও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়েও সন্দেহ অল্প যে, যাহারা সবলকায় এবং অগ্রে গর্ভ-ধারণের উপযুক্তা, তাহারা অধিকসংখ্যক বলবান্ অপত্য সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইবে। বসন্তাগমে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অগ্রেই যৌনসম্বন্ধ-লোলুপ হয়; যাহারা বলবান্ তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাড়াইয়া দিয়া, সবলকায় স্ত্রীদিগের সঙ্গ লাভ করে, কেন না দুর্ব্বলকায় স্ত্রীরা তখনও পুরুষ-সংসর্গে প্রস্তুত নহে। এই সকল বিজয়ী পুরুষ এবং সবলকায় স্ত্রী অবশ্য অধিক-সংখ্যক বলবান্ অপত্য সংরক্ষণ করিবে। পরাজিত পুরুষেরা দুর্ব্বলকায় স্ত্রী-সাহচর্য্য করে, সুতরাং তত অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারে না। এইরূপ নির্ব্বাচন বহুকাল ধরিয়া হইয়া যায়—বৎসর যায়, শতাব্দী যায়, সহস্রাব্দী যায়, যুগ যায়, কল্প যায়—কালে সেই জাতীয় পুরুষদিগের শারীরিক আয়তন, শক্তি, সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আরও একটা কথা আছে। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই যে স্ত্রীলাভ হয় এমন নহে। বিজয়ী বীর যদি সেই স্ত্রীর মনের মত না হয়, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যাত হয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীলোকের মন পুরুষে সহজে পায় না—অনেক উপাসনা করিতে হয়, বিহঙ্গীগণ, কেহ রূপের ভিখারিণী, কেহ সংগীতপাগলিনী, কেহ নৃত্যোন্মাদিনী, সুতরাং যুদ্ধ-জয়ীর অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ ঘটিতেও পারে, না ঘটিতেও পারে। ডাক্তর কোভালেভ্স্কি বলেন যে কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যায় যে, পুরুষেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, স্ত্রী হয় ত সেই অবসরে কোন যুদ্ধভীরু নবীন যুবার সঙ্গে সরিয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীগণ শক্তির পক্ষে একেবারে অন্ধ নহে—যেমন রূপ চায়, নৃত্যগীত চায়, তেমনি সামর্থ্যও চায়। জেনর উয়ের সাহেব বলেন যে, যে সকল পক্ষীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ মৃত্যু

† অনেকগুলি স্তন্যপায়ী জীব এবং কতকগুলি পক্ষী বহুবিবাহ পরায়ণ; কিন্তু নিম্নতর জীবশ্রেণীতে এ প্রবৃত্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহাদের মধ্যেও পুরুষ আহত হইলে অথবা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে স্ত্রীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং অধিকতর পরিণতদেহ স্ত্রীগণ—যাহারা প্রথম বসন্তে যৌনসাহচর্য্যোৎসুক হয়—অনেক পুরুষের মধ্য হইতে মনোমত সঙ্গী বাছিয়া লইতে পায়; এবং যদিও তাহারা কেবল মাত্র শক্তি দেখিয়া আত্মসমর্পণ না করুক, যাহাদিগকে তাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা নারীহৃদয়জিৎ অন্যান্য গুণের সঙ্গে সবলতা এবং সামর্থ্যেরও অধিকারী। পিতা মাতা উভয়েই সবল-দেহ হওয়ায় অপত্যসংরক্ষণ উত্তম হয়—অন্যের অপেক্ষা ভাল হয়। কালের স্রোতঃ বহিয়া যায়; পুরুষেরা ক্রমে অধিকতর বলবান্ অধিকতর যুদ্ধশীল অধিকতর সুন্দর, অধিকতর মনোহর হইয়া উঠে।

এইস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দ্বিবিধ। একপ্রকার কার্য্যে পুরুষেরা কলহ বিবাদ করে, দুর্ব্বলেরা পলাইয়া যায়, সবলেরা স্ত্রীলাভ করে। ইহাতে স্ত্রীগণ কোনপ্রকার বাছনি করে না—তাহারা নির্ব্বাচনচেষ্টাশূন্যা—জোর যার, স্ত্রী তার। দ্বিতীয় প্রকার কার্য্যে, পুরুষেরা স্ত্রীলাভ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু স্ত্রীগণও চেষ্টাশূন্য নহে—তাহারা আপন মনের মত পুরুষকে আত্মসমর্পণ করে।

প্রায়শঃই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেই যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা অধিকতর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ জীবের মধ্যেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের সঙ্গে শাবকদিগের অধিকতর সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে, প্রায় সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রীদিগের অপেক্ষা পুরুষের আগ্রহ অধিক। অধিকতর ব্যগ্র বলিয়া পুরুষেরাই পরস্পর যুদ্ধ করে, আপনা-দের বর্ণবৈচিত্র্য লইয়া স্ত্রীদিগের সমক্ষে ঘটা করে, স্ত্রীগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য উন্মুক্ত-কণ্ঠে স্বরলহরী বিস্তার করে। যাহারা জয়লাভ করে, তাহারা সিদ্ধ-মনোরথ হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এই সকল গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেনই যে প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষেরাই অধিকতর ব্যগ্র ইহা বুঝা সুকঠিন। তবে ইহা বুঝা যায় যে, স্ত্রী অনুসরণে কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে ব্যগ্রতা প্রয়োজনীয়; এবং যাহাদের ব্যগ্রতা অধিক তাহাদের অপত্য সংখ্যাও অধিক হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রায়শঃই পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অনুসরণ এবং অন্বেষণ করে, এবং তজ্জন্য যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা পুংপ্রকৃতিরই অধিকতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যায় যে স্ত্রীগণই সমধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—সামর্থ্য, শারীরিক বৃহত্ত্ব, কলহপ্রবণতা, বর্ণ বৈচিত্র্য উপার্জ্জন করিয়াছে। কোন কোন জাতীয় পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায়, যৌন-সাহচর্য্য সংস্থাপন প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগণই অধিকতর ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে—পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত ধীর। কুকুট

জাতীয় কোন কোন বিহঙ্গী এইরূপে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্ণৌজ্জ্বল্য এবং অলঙ্কারাধিক্য লাভ করিয়াছে—অধিকতর বলশালিনী এবং কলহরতা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা মুখচোরা, স্ত্রীলোকেরা গায়েপড়া—সাহচর্য্য করিতে এত ব্যগ্র যে গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। এ স্থলে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যৌন-নির্ব্বাচনের স্রোতঃ উজান বহিয়াছে।

উজান হউক ভাঁটা হউক, এ উভয়বিধ প্রক্রিয়াতেই যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য এক তরফা। কিন্তু কোন স্থলে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দুই তরফাও হইয়াছে। পুরুষেরাও বাছনি করিয়াছে, স্ত্রীলোকেরাও বাছনি করিয়াছে—"বিনা গুণ পরখিয়া" কেহই মজে নাই—স্ত্রীগণ যেমন মনোহর পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, পুরুষেরাও তেমনি মনোহারিণী স্ত্রী দেখিয়া অনুগত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বাহ্য দৃশ্যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য বড় লক্ষিত হইবে না, কেননা যাহা পুরুষের চক্ষে সুন্দর তাহাই যদি স্ত্রীর চক্ষে সুন্দর হয়, তাহা হইলে উভয়েতেই সেই সৌন্দর্য্যের পুষ্টি হইবে। তবে যদি স্ত্রীপুরুষের সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী রুচি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের স্ত্রীপুরুষে রুচির স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যে কোন স্থলে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনচিহ্ন সকলের পরিপুষ্টি উপলক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই যে বুঝিতে হইবে উভয় পক্ষ হইতেই সমসাময়িক বাছনি হইয়াছে, এমন কিছু কথা নহে। বরং তাহা না হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা, কেননা প্রায় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যেই পুরুষেরা এত ব্যগ্র যে প্রায় বাছাবাছি করে না—স্ত্রী হইলেই হইল, যাহাকে পায় তাহারই সাহচর্য্য করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যৌনচিহ্নের পরিপুষ্টি অন্য কারণেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, পুরুষে প্রথম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্ত্তন পুত্র কন্যা উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, কোন কারণ বশতঃ বহুকাল ব্যাপিয়া তজ্জাতীয় জীবের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে; এবং পরে হয় ত আবার অন্য কোন কারণে তেমনি বহুকাল ধরিয়া স্ত্রীসংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। এরূপ হইলে সহজেই বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ হইতে বাছনি হইয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ণবৈচিত্র্য প্রভৃতি যে সকল চিহ্নকে আমরা যৌনচিহ্ন বলি, সে সকল যে সর্ব্বত্রই যৌননির্ব্বাচনের ফল, অন্য প্রকারে ঘটিতে পারে না, এ কথাও বলা যায় না। কোন কোন জীবের মধ্যে অসামান্য বর্ণবৈচিত্র্য এবং বর্ণৌজ্জ্বল্য দেখা যায়, অথচ তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে, তাহাদের মধ্যে যৌননির্ব্বাচনের অস্তিত্ব সম্ভবে

না। এরূপ অনেক সামুদ্রিক জীব * আছে, যাহাদের বর্ণ অসামান্য উজ্জ্বল, কিন্তু তাহাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ইহাকে যৌননির্ব্বাচনের ফল বলিয়া গণ্য করা যায় না, কেননা তাহাদের কতকগুলির মধ্যে স্ত্রীপুং উভয় প্রকৃতিই একই ব্যক্তিতে সংস্থিত, কতকগুলি স্থানৈকসংবদ্ধ এবং চলৎশক্তিবিরহিত, এবং সকলেরই মানসিক স্ফূর্ত্তি অতিসামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ইহাদের বর্ণৌজ্জ্বল্য কখনই যৌননির্ব্বাচনের ফল নহে।

এ সকল স্থলে হয় ত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বর্ণৌজ্জ্বল্য উপার্জ্জিত হইয়াছে;—হয় ত জীবনসংগ্রামে বর্ণদীপ্তি তাহাদের রক্ষার উপায়ীভূত—হয় ত এতদ্দ্বারা তাহারা শত্রুর লক্ষ্য অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যে অনেক গুণ উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণও দেওয়া যায়। ওয়ালেশ † সাহেব বলেন, যে "গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে অরণ্যানী কখনই পত্রবিরহিত হয় না, যেখানে বৃক্ষ সকল চিরশ্যামশোভায় পরিশোভিত, সেখানে বহুসংখ্যক শ্রেণীর পক্ষী দেখা যায়, তাহাদের একমাত্র বর্ণ, শ্যাম।" সুতরাং যখন তাহারা বৃক্ষে থাকে, তখন তাহাদের শ্যামবর্ণ পাদপের শ্যামলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—শত্রুকর্ত্তৃক তাহারা সহজে দৃষ্ট হয় না। বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণের শ্যামবর্ণ বোধ হয় এই প্রকারে লব্ধ। আবার যে সকল পক্ষী ভূম্যাশ্রয়ী তাহারা মৃত্তিকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়—যেমন চাতক প্রভৃতি।‡ ট্রিসট্রাম সাহেব বলেন যে, সাহারা মরুভূমের অধিকাংশ অধিবাসী জীব জন্তুর বর্ণ বালুকার ন্যায়। কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যৌননির্ব্বাচন উভয়ের কার্য্য একত্র দেখা যায়। সাহারা প্রদেশে এরূপ কতকগুলি পক্ষী আছে যাহাদের মস্তক এবং গাত্র বালুকার ন্যায় বর্ণপ্রাপ্ত, কিন্তু পাখার নিম্নভাগ অপূর্ব্ববর্ণে রঞ্জিত। পক্ষ বিস্তার করিয়া যখন তাহারা দেখায় তখনই তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়—যাহাকে দেখায় সেই দেখে—নতুবা দেখা যায় না। এস্থলে ইহাই অনুমেয় যে তাহাদের মস্তকের এবং গাত্রের বর্ণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-লব্ধ এবং পক্ষনিম্নভাগ যৌননির্ব্বাচনে রঞ্জিত।

অনেকেই বলিবেন যে, বৃক্ষাশ্রয়ীর শ্যামবর্ণ, ভূম্যাশ্রয়ীর মৃদ্বর্ণ, মরুভূমবাসীদিগের বালুকাবর্ণ যেন সংরক্ষণের উপায়ীভূত বলিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা সিদ্ধ হইল, কিন্তু বর্ণের ঔজ্জ্বল্য অথবা বৈচিত্র্য কিরূপে সংরক্ষণের উপায় হইতে পারে? যাহার বর্ণ উজ্জ্বল সে বরং শত্রুকর্ত্তৃক আরও সহজে উপলক্ষিত হইবে। সুতরাং

---

* For instance, many corals and sea anemones (Actiniae), some jelly-fish (Medusae, porpita &c.), some Planeriae, many star-fishes Ascidiaus &c.

† Westminster Review July 1867. p. 5.

‡ Partridge, snipe, wood-cock certain plovers, lark, nightjars, &c.

লোহিত অথবা তদ্রূপ নয়নাকর্ষক কোন বর্ণ কখনই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সিদ্ধ নহে; অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, যাহাদের মধ্যে যৌননির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই, অতি সমুজ্জ্বল বর্ণোপেত। ইহাদের বর্ণদীপ্তি কিরূপে, কোথা হইতে আসিল?

ইহার ত্রিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম,—হাকেল বলেন যে, কেবল জেলি-মৎস্য বলিয়া নহে, অনেক ভাসমান মলস্কা, ক্রুসটেসিয়ান এবং ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্য এইরূপ অতি প্রোজ্জ্বল বর্ণশোভিত। অতএব এমন হইতে পারে যে এই সকলের সাহচর্য্যে উহারা বাঁচিয়া যায়। উজ্জ্বলবর্ণ জীবের নিকটে থাকায় ইহাদের ঔজ্জ্বল্য রক্ষার উপায় স্বরূপ হইতে পারে—সহজে এক হইতে অন্যকে চিনিয়া লওয়া যায় না। দ্বিতীয়,—অনেকস্থলে উজ্জ্বল বর্ণ আস্বাদকটুতার পরিচায়ক—যাহাদের শরীরের বর্ণ দীপ্তিমান, তাহারা অখাদ্য। অতএব এমনও হইতে পারে যে, এই সকল জীবের বর্ণ সমুজ্জ্বল বলিয়া ইহারা শত্রু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এ উভয় ব্যাখ্যাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অনুকূল। তৃতীয়,—হয় ত ইহাদের বর্ণৌজ্জ্বল্য ইহাদের শারীরিক গঠনের ফল—লাভালাভের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ডারুইন সাহেব এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, লাভ না থাকিলেও শারীরিক অংশবিশেষের রাসায়নিক প্রকৃতির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মনে কর, মনুষ্যদেহের শোণিতের ন্যায় সুন্দর বর্ণ বোধ হয় কিছুরই নাই; কিন্তু শোণিতের বর্ণ লইয়া কোন লাভই নাই—শরীরের রক্ত শ্বেত অথবা পীত হইলেও বোধ হয় কিছু ক্ষতি হইত না। হয় ত কোন নবেল-প্রিয় পাঠক বলিয়া বসিবেন—রক্তের লৌহিত্যে কোন লাভ নাই কে বলিল?—ইহাতে সুন্দরীর গণ্ডের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। তা বটে; স্বীকার করি, শোণিতের লৌহিত্য সুন্দরীর সুন্দর গণ্ড সুন্দরতর করে; স্বীকার করি, তাহা দেখিয়া উষ্ণশোণিত যুবার হৃদয়শোণিত আলোড়িত হয়; কিন্তু সুন্দরীর গণ্ড সুন্দর করিবার জন্যই শোণিত লোহিত বর্ণ পাইয়াছে, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবে না। এতটা বাড়াবাড়ি করিতে বোধ হয় কাহারও সাহস হইবে না।

এতক্ষণ পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, কোন্ কোন্ স্থলে বর্ণ বৈচিত্র্য যৌন-নির্ব্বাচনের ফল, কোথায় বা অন্য কারণ সমুদ্ভূত, ইহা স্থির করা অতি সুকঠিন ব্যাপার। তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, সকল জীবের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে বর্ণের তারতম্য আছে—স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বর্ণ অধিকতর সুন্দর, অধিকতর বিচিত্র—অথচ ইহাদের জীবনপ্রণালীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে, সেস্থলে বর্ণ-বৈচিত্র্য যৌননির্ব্বাচনের ফল বুঝিতে হইবে। ইহার উপর যদি স্ত্রী পুরুষের কাছে

অথবা পুরুষ স্ত্রীর কাছে অপরের কাছে এই সৌন্দর্য্য লইয়া ঘটা করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে আর সন্দেহ থাকে না—তখন নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, এ বর্ণ বৈচিত্র্য যৌননির্ব্বাচনেরই ফল।

এতক্ষণ আমরা যে সকল কথা লইয়া আন্দোলন করিলাম তাহাতে বোধ হয় এক প্রকার বুঝা গেল যৌননির্ব্বাচন কি—ইহার কার্য্য কিরূপ—ইহার ফল কিরূপ? এক্ষণে যৌননির্ব্বাচনে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে একবার তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। যদি এ উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এ তুলনার অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কার্য্যপ্রণালী যেরূপ কঠোর, যৌননির্ব্বাচনের তেমন নহে। জীবন এবং মৃত্যু লইয়া প্রকৃতির নির্ব্বাচনের ব্যবসায়। যৌননির্ব্বাচনের কার্য্যেও কোথাও কোথাও মৃত্যু সংঘটিত হয়—সময়ে সময়ে পুরুষদিগের মধ্যে স্ত্রী লইয়া এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে, একজন না মরিলে আর তাহার অবসান হয় না। কিন্তু প্রায়ই এতদূর গড়ায় না। অধিকাংশ স্থলেই এই পর্য্যন্ত হয় যে, পরাজিত পুরুষে হয় ত স্ত্রীলাভ করিতে পারে না—হয় ত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পুরুষ স্ত্রী বিলম্বে প্রাপ্ত হয়—তজ্জাতীয় জীব যদি বহুবিবাহপরায়ণ হয়, তাহা হইলে হয় ত অল্পসংখ্যক স্ত্রী প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অধিকসংখ্যক এবং বলবান্ অপত্য রাখিয়া যাইতে পারে না—হয় ত অপত্যই রাখিয়া যাইতে পারে না।

অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের সীমা আছে। একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সে শ্যামবর্ণের সীমা আছে—বৃক্ষপত্রের যে শ্যামবর্ণ সেই শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হইলেই বর্ণ পরিবর্ত্তনের সীমা হইয়া গেল, কেননা তদপেক্ষা গভীরতর শ্যামবর্ণ রক্ষার উপায় না হইয়া বরং ধ্বংসের কারণ হইবে—শত্রুগণ সহজে চিনিতে পারিবে শরীরের শ্যাম আর বৃক্ষশ্যামে ঢাকিবে না। যৌননির্ব্বাচন সম্পাদিত পরিবর্ত্তনের এরূপ সীমা নাই—ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং নির্ব্বাচন প্রক্রিয়া সমান চলিবে। তবে, কোন গুণ কতদূর পুষ্ট হইবে তাহা অবশ্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। তত্তৎ গুণের সমধিক পুষ্টি যদি ক্ষতিজনক এবং বিপদসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে অবশ্য তত পুষ্ট হইবে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে এতদ্বৈপরীত্যও দেখা যায়, অর্থাৎ যৌননির্ব্বাচনে অঙ্গবিশেষের এরূপ পরিণতি হয় যে তাহা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিজনক। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন কোন শ্রেণীর মৃগের শৃঙ্গপরিণতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের শৃঙ্গ এত বড় হইয়া

উঠিয়াছে যে তদ্দারা ক্ষতির সম্ভাবনা—শত্রু-হস্ত হইতে পলায়নের অন্তরায় হইয়া উঠে। মনুষ্যদেহের লোমহানি ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত। শীতপ্রধান দেশের ত কথাই নাই, গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও লোমহানি ক্ষতিজনক, কেননা ইহাতে শরীরে অধিকতর সূর্য্যোত্তাপ লাগে। অথচ যৌননির্ব্বাচনে এই ক্ষতিজনক পরিণতি ঘটিয়াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় অথবা স্ত্রী চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া পুরুষের যে লাভ, অবস্থার উপযোগিতা নিবন্ধন লাভের অপেক্ষা তাহা অধিক।

এবারে আমরা যৌননির্ব্বাচন কি, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। আগামীতে মনুষ্য সমাজে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য কি প্রকার, তাহার সমালোচনা করা যাইবে।

প্রথম প্রস্তাব

মণিপুরীয়গণ আর্য্য কি না ?

ভীষ্মপর্ব্বারম্ভে লিখিত আছে যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সঞ্জয়, যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আমার অন্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি আমার নিকট, সেই ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন কর।" তৎপরে সঞ্জয় ভারতবর্ষের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সঞ্জয় প্রথমে সাতটী প্রধান পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির জন্য এক "প্রভৃতি" শব্দে শেষ করিলেন। পরে ১৬৯টী নদ নদীর নাম উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ বলিলেন, "ইহা ভিন্ন সহস্র সহস্র নদী অপ্রকাশিত আছে। তৎপরে জনপদগুলির নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর দিকে ন্যূনাধিক ১৫০ ও দক্ষিণাপথে ৬৯টী জনপদের নাম করিলেন। কিন্তু ইহার এক স্থানেও মণিপুরের নাম নাই। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে ভ্রমক্রমে একটি প্রধান আর্য্যরাজ্যের উল্লেখ করেন নাই, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

আদি ও অশ্বমেদ পর্ব্বে মণিপুরের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহাকে তদানীন্তন একটি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভীষ্মপর্ব্বে ইহার নাম উল্লেখ না থাকাতে মণিপুর একটি আর্য্যরাজ্য কি না আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

কোন ইংরেজি লেখক বলেন, মহাভারতে মণিপুরের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদায়ই অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচায়ক মাত্র। আমরা ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া মহাভারতের মত উপেক্ষা করিয়া সাহেবের মত পোষণ করিতে চলিলাম, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। হুইলার সাহেব মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিকাল

এজেণ্টের রিপোর্টের* উপর নির্ভর করিয়া মহাভারতের ঐ সকল অংশ অলীক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দৃঢ় প্রত্যয়োপযোগী চাক্ষুষ ও অবস্থাঘটিত প্রমাণ না পাইলে কখনই হুইলার সাহেবের মত সমর্থন করিতাম না।

আমাদের বিবেচনায় মণিপুর প্রাচীন অসভ্যদিগের আবাসভূমি। মণিপুরের রাজবংশও অনার্য্যবংশসম্ভূত। তবে এইরূপ উল্লেখের কারণ কি? আদিপর্ব্বে অর্জ্জুনবনবাসে মণিপুরের নাম প্রথম দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, অর্জ্জুনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর বনবাস সম্পূর্ণ কল্পনামূলক।† কেবল অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য এই অধ্যায়ের সৃষ্টি। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "ভারত" রচনা করেন। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে তাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোমহর্ষণসুত সৌতি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণের নিকট সেই ভারত উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। সাধারণে একটি প্রবাদ অবগত আছেন, "তিন নকলে আসল খাস্ত।" মহাভারত সম্বন্ধেও যে তদ্রূপ কিছু না হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আবার পরবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীও যে মধ্যে মধ্যে তন্মধ্যে স্বরচিত শ্লোকের সমাবেশ করেন নাই তাহাও নহে। পুরাণগুলির বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের এই সকল যুক্তি অকর্ম্মণ্য বোধ হয় না। আমাদের মতে মণিপুরের বিবরণাংশটি এইরূপে ভারতে স্থানলাভ করিয়াছে।

আদৌ মণিপুরীয়দিগের মুখাকৃতি দর্শন করিলে, ইহাদিগকে কোন মতেই আর্য্যজাতি বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ইহাদের ভাষায় সংস্কৃতের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।‡

তৃতীয়তঃ, মণিপুরীয়দিগের আচার ব্যবহার।¶

চতুর্থতঃ মণিপুরীয় জাতি। আমরা যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে মণিপুরে তিনটি শ্রেণীই প্রধান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ। এতদ্ব্যতীত আর যে কয়েকটী নীচদাসশ্রেণী আছে তাহারা সকলেই মণিপুরের পার্শ্বস্থ অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতি। তাহার প্রথম উদাহরণ "কাছাড়া"। ইহারা সর্ব্ব প্রথমে কাছার বা হেরম্ব রাজ্যের অধিবাসী ছিল। কাছারের যে সকল অংশ মণিপুরপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত বিজিত হইয়াছে সেই অংশই তাহাদের প্রধান বাসস্থান। এতদ্ব্যতীত আর একটি প্রবাদ আছে, মণিপুরপতি কাছার বিজয় করিয়া যে সকল লোককে

---

* In Culloch's account of Manipuri.

† হুইলার সাহেব এই সম্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

‡ মণিপুরীয় ভাষায় শতভাগে একভাগ মাত্র বাঙ্গালা ভাষা পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

(See Jorn. Bengal A. Society Vol. vi.) এ সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ হইবে।

¶ ইহাও প্রস্তাবান্তরে লেখা যাইবে।

বন্দী করিয়া আনেন তাহাদিগকেও "কালাছা" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ দাসরূপে পরিগণিত হয়।

যে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়গণই মণিপুরের প্রকৃত প্রাচীন অধিবাসী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেকদিন পরে বঙ্গদেশ হইতে তথায় গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ অবশ্য বাঙ্গালির উপনিবেশের কথা শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা সপরিবারে তথায় গমন করেন নাই। কোন কার্য্য উপলক্ষে মণিপুরে গিয়া তত্রত্য কোন ক্ষত্রিয়কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রণয়িনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া জন্মভূমির মমতা "বরাক" নদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এ কারণেই মণিপুরে "ব্রাহ্মণ" ও "কায়স্থ" জাতির উৎপত্তি। তাহাদের সন্তান সন্ততি, "বন্দ্যোপাধ্যায়" "মুখোপাধ্যায়" "চক্রবর্ত্তী" "ঘোষ" "বসু" "দত্ত" প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন।* মণিপুরীয় ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু স্বীয় সহধর্ম্মিণীর পাকান্ন ভোজন করেন না। তদ্‌গর্ভজ সন্তানগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পাকান্ন পিতা কিম্বা অন্য কোন ব্রাহ্মণের ভোজন করিতে নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে, যথা "আরিবম" ও আনৌবম।"

আরিবম" অর্থাৎ "পূর্ব্বাগত" অর্থাৎ যাহারা বহুকাল পূর্ব্বে মণিপুরে গমন করিয়াছেন, "আনৌবম" অর্থে "নবাগত" অর্থাৎ যাহারা অল্পকাল মাত্র মণিপুরে

---

* জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর ও মাইজখাড়ের ঘোষ বংশের "বংশাবলিতে" দৃষ্ট হইতেছে, পদ্মলোচন রায় উজিরের তিনি পুত্র ছিল? জ্যেষ্ঠ কবিবল্লভ পিতৃপদ "উজিরি" (ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান সচিব) লাভ করেন। দ্বিতীয় কবিরত্ন ত্রিপুরার সুবা (সৈন্যাধ্যক্ষ) হন। তৃতীয় পুত্র কবিচন্দ্র ত্রিপুরার অন্যতর সেনাপতি ছিলেন। কবিচন্দ্র যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যে মণিপুরে গমন করিয়া তত্রত্য কোন ক্ষত্রিয় বালিকার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া, মণিপুরে দক্ষিণরাঢ়ীয় সৌকালীন ঘোষ বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অধস্তন দশম ও একাদশ পুরুষ এইক্ষণও জীবিত আছে। সময় নির্ণয় করিবার জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রতি পুরুষে গড়ে ১৬ হইতে ২৩ বৎসর ধরিয়া থাকেন। এস্থলে আমরাও কবিচন্দ্রের মণিপুর গমন সময় অবধারিত করিবার জন্য দশ পুরুষে (১৬ বৎসর হিসাবে) ১৬০ বৎসর নির্ণয় করিতে পারি প্রকৃত পক্ষেও খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল এমত বোধ হয় না। মণিপুরের বর্ত্তমান পলিটিকাল এজেন্ট ডেমেন্ট (Damant) সাহেব মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশের সময় খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ অবধারিত করিয়াছেন। (See Jorn. Bengal A. Society Vol. XLVI. Part I.) হুইলার সাহেবও এরূপই লিখিয়াছেন। "And it is somewhat remarkable that no trace of Brahmanism can be found in Manipore of an earlier date than the beginning of the last century."

W. History of India Vol. I. Page 149.

উপস্থিত হইয়াছে। নবাগত যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, কাহারও পিতা বা পিতামহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মণিপুরে বাস করিয়াছেন ; যদিও সেই প্রাচীন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের সন্তানসন্ততিগণ মণিপুরের ভাষা ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, তথাপি কোন কোন শব্দ দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রকৃত মণিপুরিয়া অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ পিতাকে "পাবা" বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি "বাবা" শব্দটী বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে "তাদা" বলে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সেই অতি আদরের "দাদা" শব্দটী অদ্যাপি স্মরণ রাখিয়াছেন। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কায়স্থগণ "লাইরিএংবম" নামে পরিচিত। "লাইরিক" অর্থ পুস্তক, "এংবা" অর্থ দেখা। মণিপুরীয় ভাষার এই দুইটী শব্দ যোগ করিয়া "লাইরিএংবম" হইয়াছে। ইহার যৌগিক অর্থ "যে জাতি পুস্তক দেখে," আর একটি বিস্ময়ের বিষয় আমরা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর তিন জন মণিপুরীয় একবারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যত অবিলম্বে বলিতে শিখে, একজন ক্ষত্রিয় তত শীঘ্র পারে না। এমন কি ক্ষত্রিয়েরা কখনই তাহাদিগের স্থায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারে না।

আমাদের বিশ্বাস যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারাই মণিপুরের প্রাচীন প্রকৃত অধিবাসী। তাহারা যদিও এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে তথাপি তাহাদিগকে অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালে কেবল ক্ষত্রিয়গণই যে মণিপুরে বাস করিতে গিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না ; কারণ তাহাদের সহিত আর যে দুটী মিশ্র* আর্য্যজাতির উল্লেখ করিলাম তাহারা যে অল্প কাল হইল তথায় গিয়াছেন তাহা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। হুইলার সাহেব মণিপুরীয়দিগকে নাগ নামক অসভ্য বংশ হইতে সমুৎপন্ন লিখিয়াছেন।

বোধ হয় পাঠকগণ অনবগত নহেন যে অদ্যাপি মণিপুরের পার্শ্বে "নাগা পর্ব্বত" আছে। ঐ স্থানেই নাগাদিগের বাস। বোধ হয় এই নাগাগণই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণকর্ত্তৃক "নাগ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মণিপুরের বর্ত্তমান রাজবংশজগণ আপনাদিগকে নাগকুলে উৎপন্ন বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। মণিপুরের রাজসিংহাসনের নিম্নে একটি সর্প বাস করিতেছে বলিয়া অদ্যাপি প্রবাদ আছে।

* মণিপুরীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ "মিতাই" বলিয়া পরিচিত। "মিতাই" অর্থ মিশ্রজাতি। অধুনা ক্ষত্রিয়গণও আপনাদিগকে "মিতাই" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

সেই সর্পের নাম "পাখংবা।" পাখংবা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ অথচ কুলদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মণিপুরীয়গণ এইরূপ অনার্য্য বংশোদ্ভব হইয়া কিরূপে হিন্দুসমাজভুক্ত হইল, বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের পতিতপাবন বৈষ্ণব প্রভুদিগকে মনে পড়ে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই "হরি" "হরি" বলাইয়া উদ্ধার করিতেছেন, মণিপুরীয়গণ তাঁহাদের দ্বারাই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭৫ বৎসরের অধিক অতীত হয় নাই, তাহারা অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতিদিগের ন্যায় কদর্য্য আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে তাহারা মহিষ, বরাহ, কুক্কুট প্রভৃতির মাংস ভোজন করিত তাহা তাহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মণিপুরীয়গণ এতদূর গোঁড়া বৈষ্ণব যে পাঁঠার নাম উল্লেখ করিতে হইলে "বাঙ্গালির তরকারি" বলে।

মণিপুরপতি রাজা চিংতোমখোম্বার* রাজত্ব সময়ে, শ্রীহট্টবাসী জনৈক অধিকারী মণিপুরে উপস্থিত হইয়া, চৈতন্যের প্রেমতরঙ্গে "মণিপুর" ভাসাইয়া দিলেন। রাজা প্রজা সকলেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই মণিপুরীয়গণ রাসক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভাগ্যচন্দ্র (এই রাজা) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণিপুর-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

ডেমেন্ট সাহেবের মতে এই ঘটনাটি আরও কিছু পূর্ব্বে হইয়াছিল। তিনি বলেন "চারাইরংবার"† রাজ্যশাসন সময়ে মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হয়। আমরা স্বীকার করি চারাইরংবার রাজত্ব সময়েই হিন্দুধর্ম্মের নির্ম্মল আলোক মণিপুরে প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মণিপুররাজকুলতিলক ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালেই তাহা সংশোধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মণিপুরের প্রাচীন অধিবাসী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের পূর্ব অসভ্য সময়ের দেবতা "পাখংবা" "লেইমরেন" প্রভৃতির অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এই সকল দেবতার উপাসনা করে না। বরং প্রকাশ্যরূপে ঘৃণা করে। তাহারা কেবল রাধাকৃষ্ণের উপাসনানিরত।

অধিকারী মহাভারত খুলিয়া মণিপুরেশ্বরকে বুঝাইয়া দিলেন,—যে তাঁহারা

---

* চিংতোমখোম্বার সময় হইতেই মণিপুরপতিদিগের হিন্দুনাম দৃষ্ট হয়। এই নৃপতির "ভাগ্যচন্দ্র" "কর্ত্তা" প্রভৃতি কতকগুলি নাম ছিল। এচিসন সাহেব ইহাকে "ভরতসাহি" লিখিয়াছেন।
Aitchison's Treaties. Vol. I. Page 120.

† চারাইরংবা ভাগ্যচন্দ্রের পিতামহ। চারাইরংবা ১৭১৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়। কেবল এতকাল আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। উপদেশ দ্বারা অসভ্যদিগকে যত সহজে ধর্ম্মান্তরে আনিতে পারা যায়, সভ্যদিগকে আনা ততদূর সহজ নহে। তাহার উদাহরণ "সাঁওতাল"। একদিকে আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ কালীপূজা ও চণ্ডীপাঠের উপলক্ষ করিয়া সাঁওতালদিগের অর্থশোষণ করিতেছেন, অপরদিকে পাদ্রিমহাশয়গণ টানিতেছেন।

মণিপুরপতি ক্ষত্রিয় হইলেন। স্বজাতীয় প্রজাবর্গকে ভিন্ন রাখিতে পারিলেন না। দেশশুদ্ধ লোক পবিত্র হইয়া গেল।

বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার পার্ব্বত্যজাতি আছে মণিপুরীয়গণ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। † প্রায় সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মণিপুরীয় মহিলাগণ যখন পুষ্পাভরণে সজ্জিত হন, তখন আমাদের ঋষিগণের বর্ণিত গন্ধর্ব্বকুমারী বলিয়া ভ্রম জন্মে। বোধ হয় তাহাদের রূপরাশিই মণিপুরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশ সৃষ্টির প্রধান কারণ। এইরূপে বাঙ্গালিবংশ বৃদ্ধি হওয়া আমাদের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরস্পর ধর্ম্মবিদ্বেষ জন্মান নিতান্ত দুঃখের কারণ। মণিপুরীয়গণ একজন বৈষ্ণব দর্শন করিলে অনায়াসে তাহার চরণামৃত গ্রহণ করে। কিন্তু শাক্ত ব্রাহ্মণকেও তাহাদের বাসভবনে প্রবেশ করিতে দেয় না। "পাঁঠাখোর" বলিয়া ঘৃণা করে। ‡

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

† মণিপুরীয়দিগের মুখাকৃতিতে ইহাদিগকে "ইণ্ডুচায়নিজ" বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কিন্তু চীনাগণ অপেক্ষা ইহারা সুশ্রী। ইহাদের নাসা ও চক্ষু যদিও আমাদের ন্যায় উন্নত ও বিস্তৃত নহে, তথাপি চীনাদিগের ন্যায় কদর্য্য নহে।

‡ গোস্বামী মহাশয়দিগের দ্বারাও যে মণিপুরীয়দিগের অনিষ্ট না হইয়াছে ইহা কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে সক্ষম নহেন। গোপীভাবে উপাসনা করিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যবত্তার ক্রমশঃই লাঘব দেখা যাইতেছে।

বঙ্গদর্শনে এই কাব্যের প্রথমখণ্ড সমালোচিত হইয়াছিল, পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথম খণ্ডের শেষে, দানবপত্নী ঐন্দ্রিলাকৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের আরম্ভে দ্বাদশসর্গে সেই ক্রোধাগ্নিশিখা দেখিয়া, বৃত্রাসুর স্তম্ভিত, ভীত।

> শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী দাঁড়ায়ে,
> ভূধর-অঙ্গেতে স্বীয় অঙ্গ হেলাইয়া,
> একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
> যেখানে শিবের ক্রোধ-চিহ্ন দেখা দিল।

বৃত্র, শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখিয়া আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে, মহিষীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় শচীকে মুক্ত করিয়া শিবকে প্রসন্ন করেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সখ, শচী তাঁহার সেবা করিবে। প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টি মিটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আবদার মিটে না। ঐন্দ্রিলা লেডি মাকবেথের মত স্বামীর আশঙ্কা মুখঝামটায় উড়াইয়া দিলেন। বৃত্র দেখাইয়া দিলেন,

> চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
> এখনও ভাতিছে মৃদু সুমেরু উপরে দীপ্ত
> অন্ধকার যথা!

ঐন্দ্রিলা কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষণ হইয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। অথবা দেবতার মায়া!"

> আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
> হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!—

বৃত্রসংহার। কাব্য। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ১৭ সংখ্যক ভবানীচরণ দত্তের লেন্ ‍। ১২৮৪ সাল।

ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে !

বৃত্রের প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেবসেনাপতির বন্ধন ঐন্দ্রিলা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বৃত্র বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক" ! ঐন্দ্রিলা বড় কোপ করিয়া বৃত্রকে গর্ব্বিতলোচনে, গর্ব্বিত বচনে ইন্দ্রজেতাকে ভর্ৎসনা করিল। বৃত্র, ঐন্দ্রিলার ক্রোধ বড় গ্রাহ্য না করিয়া, রতিকে আদেশ করিলেন, যে শচীকে ডাকিয়া আন। আমি তাহার কারাক্লেশ ঘুচাইব। বৃত্র, স্বয়ং প্রাচীরশিরে উঠিয়া দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। হেমবাবুর একটি মণিময় বর্ণনা—

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে !
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল—
কোথা অবিরলশ্রেণী—দু' একটি কোথা !
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেখিতে তেমতি
হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবীর জলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমাবস্যা উৎসব নিশিতে,—
মত্ত যবে কাশীবাসী দেয়ালি-উল্লাসে।
অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে রজনীরে ঘেরি !
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,
কোদণ্ড বিশাল মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত তনু তূণীর, ফলক,
তোমর, মার্গণ, ভীম টাঙ্গী খরশান।
কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি ; কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ—নেমি দীপ্তিময় ;
কোথাও শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।

* * *

কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপু, দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেবরণস্থল।

ত্রয়োদশ সর্গারম্ভে, ইন্দ্র, পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দধীচির আশ্রমে যাইবেন। অরণ্যমধ্যে দৈত্যভয়ে স্বর্গচ্যুতা দেবকন্যাগণ পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া দিনযাপন করিতেন। এখন, রজনীর আশ্রয় পাইয়া স্ব স্ব দেহধারণ করিয়া দিব্যাঙ্গনাগণ সেই অটবী মধ্যে কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন। অল্প কথায় এই চিত্রটী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভুলিবে না। দেবকন্যাগণ ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথ বলিয়া দিলেন। লোকহিতৈষী পরহিত-ব্রত, শান্তিরসনিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর। বাসব, ঋষির আশ্রমে দেখা দিলেন। ঋষি, ইন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু, ইন্দ্র, ঋষির প্রাণভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন—কি প্রকারে তাহা বলিবেন ? মুখে বলিতে পারিলেন না—নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণ ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ

মহাচিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। এই সরল, সুধাময়, কথাগুলি বিস্তৃত হইলেও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত ?—কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম !
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত !
এতেক কহিয়া মহা তপোধন ধীরে,
শুদ্ধচিত্তে পটবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা,
সাশ্রুনেত্র-শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়,
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।

জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্ গুল,
সর্জ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতি সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে !

বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে !
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎস মণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে, পায় কত জন !"

*　　　*

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিয়া এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে, কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধন শিরঃ স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর !"

*　　　*

বলিয়া রোমাঞ্চ-তনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল !
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ-গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বনলতা তরুকুল শোকে অবনত !
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাস শূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে ! বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পসার বরষিল মুনিন্দ্রে আচ্ছাদি !
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

সুশীতল সুস্থির সাগরবৎ, এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে—ইঁহার অতল রসপ্রবাহে মন ডুবিয়া যায়।

চতুর্দ্দশসর্গে "চিন্তময়ী" সর্গে ইন্দ্রাণীর বন্দিনী

——শোভিছে তেমতি।
চির পরিচিত যত অমর বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি।

কিন্তু স্বর্গ আজি অসুরপীড়িত, পরাধিকৃত দেশ—

চিন্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পোড়া দহন আজি।

দেশবৎসলগণকে এই দেশবৎসলার রোদনটুকু পড়িতে অনুরোধ করি। শচী রোদন করিতেছিলেন, এমত সময়ে বৃত্রপ্রেরিতা রতি শচীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, দৈত্যপতি শচীকে মুক্ত করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। শচী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পঞ্চমসর্গে যখন নিঃসহায়ে অরণ্যে, সম্মুখীন ভীষণাসুর দেখিয়া, চপলা, তাঁহাকে ছদ্মবেশ ধরিতে বলিয়াছিল—শচী তখন বলিয়াছিলেন—

আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন।
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন।

এখনও সেই শচী। রতি মুক্তিসূচক শুভসম্বাদ শুনাইতে আসিলে, শচী বলিলেন—

——শুভ সমাচার
শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ! কিম্বা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে হে অনঙ্গরমে,

* *

না রতি, কহ গে দৈত্যে—চাহি না উদ্ধার
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতি হস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম!"

এত কহি স্থির নেত্রে শূন্য দেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগে—"হে শিবে শৈলজে,
জীব দুঃখ বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ—দেখিবে তা তুমি?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম-তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ! প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্!
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা;
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে।

পঞ্চদশ সর্গে স্বর্গদ্বারে সুরাসুরের যুদ্ধ এবং অসুরের পরাভব। অসুরের পরাভব দেখিয়া বৃত্র স্বয়ং দেববিজয়োদ্দেশে শিবদত্ত ত্রিশূল পরিত্যাগ করিলেন। অব্যর্থ

ত্রিশূলের ত্রাসে সকল দেবগণ লুক্কায়িত হইলেন—ত্রিশূল লক্ষ্য না পাইয়া বৃত্রের করেই ফিরিয়া আসিল। এই যুদ্ধ বর্ণনায় অনেকটা মহাভারতি গন্ধ আছে—এবং স্থানে স্থানে মহাভারতি অত্যুক্তিও আছে—যথা—

পড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য)

কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিত্ব-কুসুমও আছে।

যথা, যেখানে বৃত্র,

মথিতে লাগিলা বেগে, দেব মূরাশি
উড়িল অমরতনু আচ্ছাদি অম্বর
যথা সে কার্পাস রাশি উড়ায় ধুনারি
টঙ্কারি ধুননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।

অথবা যেখানে

ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ।

যেমন পঞ্চদশ সর্গে, বৃত্রের রণজয়, ষোড়শ সর্গে তেমনি ঐন্দ্রিলার রণজয়। বৃত্রের রণজয় শিবের ত্রিশূলে,-ঐন্দ্রিলার রণজয় মন্মথের ফুলধনু লইয়া। রসিক কবি, বৃত্রের রণজয়ের অপেক্ষা ঐন্দ্রিলার রণজয় গাঁথিয়াছেন ভাল। আমরা তাঁহার এই পক্ষপাতিতা দেখিয়া, মনে মনে তাঁহাকে অনেক নিন্দা করিয়াছি।

ঐন্দ্রিলার মনে মনে বড় সাধ, শচী তাঁহার সেবাকারিণী পরিচারিকা হইবে। কিন্তু তাঁহার কৃত শচীপীড়নে রুদ্রদেব-রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। তাহাতে বৃত্র ভীত হইয়া, শচীকে ছাড়িয়া দিতেছিলেন। শুনিয়া, ঐন্দ্রিলা সে ভয় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ব্যঙ্গ শুনিয়া বৃত্র, বীরসুলভ ঘৃণার সহিত মহিষীকে বলিয়াছিলেন, "বামা তুমি ?" ঐন্দ্রিলার সে কোপ মনে ছিল—

"বামা আমি, অহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ মৃদু-স্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার এতই হেলা॥
আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার,
বাসনা পুরাতে আছে অধিকার
তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার;
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার বামা কেমন!"

ঐন্দ্রিলার আদেশে, মদন তখন স্বর্গে এক অতুল্য শোভাসমন্বিত নিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিলেন, যথায়—

নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর, থর থর থর মঞ্জরী দোলে।
যথায়
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে॥

ঐন্দ্রিলা সেইখানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে রতি আসিয়া শচীর কঠিন,

দর্পিত উত্তর শুনাইল। ঐন্দ্রিলা বলিলেন, "তবে আমি স্বয়ং তাহাকে আনিতে যাইব। রতি, তুমি আমাকে ভাল করিয়া সাজাইয়া দাও দেখি—"

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন মুকুট মণি-ময় হার,
জয়লক্ষ্মণ,—ধনেশ ভাণ্ডার ঢাল যুবতি ॥

আন যান, পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস পঙ্কজ ফুটাব আজ ॥

রতি তাহাকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইল। এমত কালে বৃত্রাসুর রণজয় করিয়া আসিল। কুঞ্জের শোভা, ও ঐন্দ্রিলার সাজ দেখিয়া, অসুরেশ্বর মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে ঐন্দ্রিলার বৈভব সকল কুঞ্জমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐন্দ্রিলা বলিল—

"কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি অহে হৃদয়-বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব !
শচী-ভবন !

শুনিয়া অসুর বড় ক্রুদ্ধ হইল
অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার !—কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ?—চাহে না সে ধনি
কারা মোচন।

"আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?"
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি ;—হেরি দৈত্যরাণী

বামা চতুর নিল ফুলধনু আপনার হাতে ;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।

অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ ;
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব কামিনী
* * লাবণ্য রাশি !

কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র সহচরী ;
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি,
পূরাও মহিষি ;—ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী।"

সপ্তদশ সর্গে, রুদ্রপীড়ের যুদ্ধে যাত্রা। রুদ্রপীড় অগ্নি এবং জয়ন্তের কাছে পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই দুঃখে তাঁহার শরীর দহিতেছিল। পিতার নিকট, পুনর্ব্বার যুদ্ধগমনের আজ্ঞা লইলেন। মাতার কাছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। এবং পত্নী ইন্দুবালার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। পরদুঃখকাতরা ইন্দুবালার প্রাণে সহে না যে, কেহ যুদ্ধ করে—স্বামী যুদ্ধ করে একান্ত অসহ্য। ইন্দুবালা কিছুতেই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দুবালা বলিল—

'যাবে নাথ ? যাবে, কি হে, ছিঁড়িয়া এ লতা ?
বেঁধেছি তোমায় বাহে এত সাধ করি !
ছিঁড়ে, কি হে, তরুবর, যেরে যদি তায়,
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

ছিঁড়িলে, তবুও নাথ, লতিকা ছাড়ে না—
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?
কোথা নাথ, বলো বলো তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ ?

রুদ্রপীড় তাহাতেও শুনিল না। তখন—

কহিলা সরলা বালা—নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন—
"যাবে যদি, নাশো আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এত দিন ;
এই পুষ্প-তরুরাজি, কিসলয়ে ঢাকা—
হের দেখ কত পুষ্প দুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা—
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে !
নাশো আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধবর্ণে—নয়নরঞ্জন !
প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুগ্ধদানে ;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর !
নাশো এই সখিগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম—আজীবন কাল
সম্প্রীতে পালিলা, সদা—সেবিলা, প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ স্নেহ-রসে মিশাইয়া।
নাশো পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহিত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ—
পাতিয়া দিলাম বক্ষ, হানো এ হৃদয়ে
সে রক্তপিপাসু অসি—রণে যাও বীর।"
বলি, মূর্চ্ছাগতা ইন্দুবালা ইন্দুমুখী ;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন ;
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর, ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।
নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানবকন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন !
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ।"

ইন্দুবালা পতির মঙ্গলের জন্য শিবপূজা করিতে গেলেন। পূজার ঘট মহাদেবের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া গেল।

অষ্টাদশ সর্গ প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য। বিষয়ও গীতিকাব্যের—কাব্য ও গীতি। এরূপ ওজস্বিনী, তূর্য্যধ্বনিসদৃশা গীতি, হেমবাবু ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। মন্দাকিনীতীরে—

কুলু কুলুধ্বনি !—চলে মন্দাকিনী,
দেবকুলপ্রিয়, পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
পীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায়।

যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ ছিল না দৈত্যের ;
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত ;
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে !
যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে ;
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃতহ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী করে গরিমা গুণে।

সেই মন্দাকিনী-তীরে বিমনা,
মন্দির-অলিন্দে, শচী সুলোচনা ;
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশ, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-রাণী।

এই সর্গে শচীর নিকট রতি ইন্দুবালাকে লইয়া গিয়াছে। সেখানে শচী তাহাকে নানা কথায় ভুলাইতেছেন এমত সময়ে ঐন্দ্রিলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রবধূকে শক্রপত্নীপদতলস্থা দেখিয়া ঐন্দ্রিলার গুরুতর ক্রোধ উপস্থিত হইল। এবং ইন্দুবালাও তাঁহার আগমনে সশঙ্কিতা হইল। তাঁহার রক্ষার্থ শচী অগ্নি এবং জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন। এদিকে ঐন্দ্রিলা ইন্দ্রাণীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পদাঘাতের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবদূত আসিলে, সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। বীরভদ্র শচীকে সুমেরুশিখরে লইয়া গেলেন। এবং বৃত্রনিধন যে নিকট তাহা বৃত্রমহিষীকে শুনাইয়া গেলেন।

ঊনবিংশ সর্গে বজ্রের নির্ম্মাণ। বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায়, ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়া উপস্থিত।—হেমবাবুর কবিতা, সর্ব্বত্র সমান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায় তাঁহার সঙ্গে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়—কর্ণ বধির হইয়া যায়। অগ্নির গর্জ্জনে, মুদ্গরের আঘাতে, ধূমের তরঙ্গে, ধাতুনিঃস্রবে, রবে মহাকোলাহল—আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সত্য সত্যই দেবশিল্পীর কারখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সর্গ কবির কল্পনাশক্তির এবং মৌলিকতার বিশেষ পরিচয়স্থল। আমরা এই কাব্য হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি—এই সর্গ হইতে কিছুই উদ্ধৃত করিব না—অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার মহিমার পরিচয় দেওয়া যায় না। এই সর্গে বজ্র নির্ম্মিত হইল, এবং তাহাতে ত্রিদেবের তিন-শক্তি প্রবেশ করিল।

পাঠক দেখিবেন, আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল একত্রে বৃত্রসংহার পাঠ করিতেছি—প্রচলিত প্রথানুসারে আমরা বৃত্রসংহারের সমালোচন করিতেছি না। আমরা উদ্যানের শোভা বর্ণনে প্রবৃত্ত নহি—আমরা পুষ্পচয়ন করিতেছি মাত্র। উদ্যানের শোভা কীর্ত্তনে মালীর সুখ হইতে পারে, কিন্তু দর্শকের সুখ পুষ্পচয়নে। অতএব সম্প্রতি আমরা পুষ্পচয়নই করিব। তারপর, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়, বলা যাইবে। কিন্তু বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, বৃত্রসংহার পাঠের যে সুখ তাহা যদি পাঠককে প্রাপ্ত করাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম মনে করিব।—বড় ভারি রকম বাগাড়ম্বর করিলে অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু অনেকে বুঝিবেন না, এবং কার্য্যসিদ্ধির তাদৃশ সম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ।
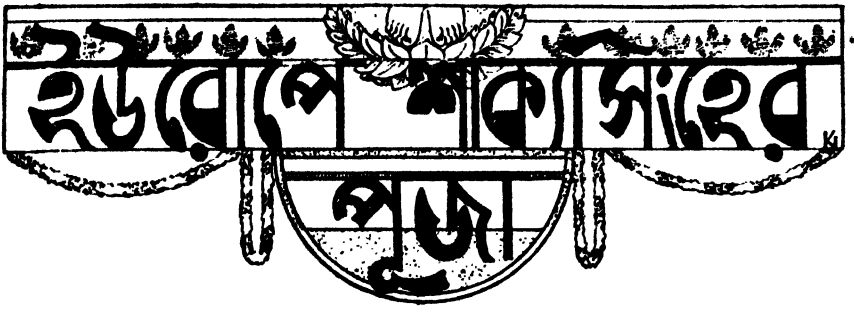
বোধ হয় শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন যে রোমনগরে বা লিস্‌বন সহরে বা অন্যত্রে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি পরম পবিত্র খ্রীষ্টীয় ঋষিদিগের বলিয়া গিরিজায় গিরিজায় সন্নিবেশিত এবং পূজিত হইতেছে, তাহার মধ্যে আমাদের শাক্যসিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। শাক্য ভারতবর্ষে ঋষি, ইউরোপে সেণ্ট (saint) পূজ্য উভয় স্থানে, কেবল নামভেদে মাত্র। এ অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধদেব; বিলাতে তিনি সেণ্ট জোসেফট্‌।

শাক্যসিংহের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের দেশে অনেকেই জানেন। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত শাক্যবংশোদ্ভব রাজকুমার ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া বলেন যে, সন্তানটি হয় অতি প্রবল মহারাজাধিরাজ হইবেন, নতুবা পিতৃসিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। রাজা এই গণনা শুনিয়া সাবধান হইলেন, যাহাতে রাজপুত্র সন্ন্যাসী না হন, রাজা তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতত বিলাস-সম্ভোগী করিবার নিমিত্ত রাজপুত্রকে এক রম্য উদ্যানে রাখিলেন। পৃথিবী যে সুখময়, সুখ ভিন্ন এ সংসারে যে আর কিছুই নাই এই সংস্কার জন্মাইবার নিমিত্ত তদুপযোগী উপকরণ রাজপুত্রের চারিদিকে রক্ষিত হইল। রাজপুত্র মহাবিলাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে একদিবস হঠাৎ একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে কখন বৃদ্ধ দেখিতে পান নাই অতএব দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি?" পারিষদেরা তাহা বুঝাইয়া দিল। রাজপুত্র অতি গম্ভীর হইলেন। পরে আর একদিবস রুগ্নদেহ দেখিলেন, তাহার পর মৃত্যু পর্য্যন্তও দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার যে সুখময় বলে তাহা মিথ্যা, এ পৃথিবী কেবল দুঃখময়, অতএব দুঃখনিবারণ* এ যাত্রার একমাত্র উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এই

* চলিত কথায় বুঝাইবার নিমিত্ত উপরে দুঃখনিবারণ শব্দ প্রয়োগ করা গেল বস্তুত দুঃখনিবারণ বৌদ্ধদেবের প্রকৃত উদ্দিষ্ট ছিল না। তিনি মনুষ্য প্রকৃতিকে এইরূপ উন্নত করিতে চেষ্টা করেন যে দুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারিবে না;—মনুষ্য উন্নত হইলে দুঃখ অনুভব করিতে পাইবে না।

উদ্দেশ সাধন করিবার জন্য কি করা উচিত মনে মনে চিন্তা করিতেছেন এমত সময় এক দিবস এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া রাজকুমার আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী, লোভ নাই, সুখ-ইচ্ছা নাই, কোন ইচ্ছাই নাই। রাজকুমার ভাবিলেন দুঃখনিবারণ জন্য এই অবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব তিনি রাজ্য ত্যাগ করিলেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, বনে গিয়া নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিরূপে দুঃখ নিবারণ হইবে তাহা স্থির করিলেন। এবং স্থির করিয়া অপর সকলকে তাহার উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলে নত শিরে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল, পারত্রিক বিষয়ের পূর্ব্ব পদ্ধতি সকলে ত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধদেব বলিয়া পূজা করিতে লাগিল।

বহুকাল পরে সন্ন্যাসী পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, পিতা তখনও জীবিত আছেন—রাজ্য করিতেছেন। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ে পুত্রের মত অবলম্বন করিলেন।

এই পরিচয় দিগদিগন্তর ব্যপিতে লাগিল। ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া এই পরিচয় নানাদেশে চলিতে লাগিল। যখন এই পরিচয় যবনরাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন বোগ্দাদ নগরে খলিফা আলমানসরের দরবারে জন নামে একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ইটালিদেশস্থ কোন পণ্ডিত পাদরি দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ ঐকান্তিকতা জন্মিয়াছিল অতএব রাজপদ ত্যাগ করিয়া তিনি দামস্কস নগরে মঠবাসী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেন; তন্মধ্যে "সেণ্ট জোসেফট্‌" প্রভুর পরিচয় তিনি একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখেন:—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ান্‌দিগের চিরশত্রু কোন রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল। জ্যোতির্জ্ঞগণ গণনা করিয়া বলেন যে, রাজকুমার নবধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। রাজা এই কথা শুনিয়া যাহাতে রাজকুমার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন এবং পৃথিবীর দুঃখ যাতনা হইতে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বিলাসসম্ভোগে কালযাপন করিতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। এক সময় কোন খ্রীষ্টীয়ান সন্ন্যাসীর সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসীর উপদেশে তিনি নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান্‌ হইলেন; এবং ঐহিক সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। এবং যাইবার সময় নিজ পিতাকে নবধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া গেলেন। জন আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহার এই গল্পটি প্রকৃত। এবং তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে এই গল্প শুনিয়াছিলেন।

গল্পটি প্রথমে গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়; পরে কালডিয়া, আরব্য, মিশর, আরমানি, ইহুদি, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্ম্মণী, স্পেনীয়, ইংরেজি ও আইসলণ্ডিক ভাষায় অনুবাদিত হয়।

জনের লিখিত সেণ্ট জোসেফটের জীবনবৃত্তান্ত, ও "ললিত বিস্তর" গ্রন্থের লিখিত বৌদ্ধদেবের পরিচয় এই উভয় সম্বন্ধে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া মক্ষমূলর অনুভব করেন যে, জন্ কেবল বাচনিক পরিচয়ের উপর নির্ভর করেন নাই, বোধ হয়, তিনি 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন। কেননা 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থে মানবদেহের জীর্ণতা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ আছে, জন্ অবিকল সেই সকল বিশেষণ পর্য্যন্ত আপনার গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

এইরূপে গৌতম শাক্যমুনি তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজ্য হইয়াছেন। প্রতিবৎসর ২৬এ আগষ্ট ও ২৭এ মে তারিখে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান্‌দিগের মধ্যে তাঁহার পূজা নবেনা পর্ব্ব বলিয়া পরিচিত। হুগলি নগরের নিকটবর্ত্তী বলাগোড় গিরিজায় এই নবেনা পর্ব্ব অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে বলিলে অসংগত হয় না কিন্তু চীনরাজ্য ব্রহ্মরাজ্য প্রভৃতি অনেক দেশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত। খ্রীষ্টীয় মহম্মদীয় প্রভৃতি পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল। ইউরোপে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রবেশ করে নি সত্য কিন্তু তথাপি তথায় তিনি পূজ্য। মহান্‌দিগের পূজা সর্ব্বত্র।
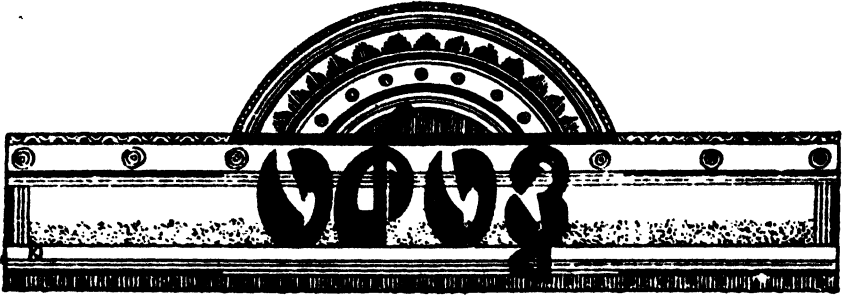
বঙ্গদেশ, ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গীয় ন্যায়শাস্ত্র এক্ষণে আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত করে না। ন্যায়, বিজ্ঞানের সহচরী, বা শিক্ষয়িত্রী। যে ন্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ উপযোগিনী না হইল, তাহার জন্ম বৃথা। বঙ্গীয় ন্যায়শাস্ত্র হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন উপকার হয় নাই। তাহা যে বিজ্ঞানের উপযুক্তা সহচরী নহে, ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ভিন্ন দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে অন্য কোন ফল যে কখন জন্মে নাই, তাহা জনসমাজে সুপ্রকাশিত। পাশ্চাত্য ন্যায় বিজ্ঞানের যথার্থ সহায়, উপকারিণী এবং উন্নতিকারিণী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি সুতরাং পাশ্চাত্য ন্যায় শিক্ষা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।—সেই শিক্ষাপ্রদানের জন্য বাবু প্রমথনাথ মিত্র এই গ্রন্থখানি* প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ অতিশয় পরিশ্রমের ফল। এই গ্রন্থে কতদূর পরিশ্রম, ও চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণেই বুঝা যাইবে।

পুস্তকখানি দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে নামকরণ, প্রসঙ্গ, ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবন্ধন—এই কয়টি বিষয় সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমান, ন্যায়াবয়ব, অনুমান শৃঙ্খল, অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞান এবং গাণিতিকতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধগুলি পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ কি না—এই কয়টি বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। তর্কতত্ত্বের এই খণ্ডের বিষয় কেবল অবনয়ন (Deduction) মাত্র। অবনয়নের ভিত্তি যে উন্নয়ন (Indyction)—অর্থাৎ আমরা যে বিশেষ সত্য হইতেই বিশেষ সত্যকে অনুমান করিয়া থাকি—তাহা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় গুলির প্রমাণের নিমিত্ত ভাষার বিশ্লেষণ,

---

* তর্কতত্ত্ব বা পাশ্চাত্য ন্যায়। শ্রীপ্রমথ নাথ মিত্র প্রণীত। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র ১৮৭৮।

শ্রেণীবন্ধন এবং ব্যাখ্যা এই তিনটি সাতিশয় প্রয়োজনীয়। অতএব শেষোক্ত বিষয়গুলি প্রথম পরিচ্ছেদেই ন্যস্ত হইয়াছে।

সমস্ত বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় প্রসঙ্গ দ্বারা মাত্র প্রকাশিত হইতে পারে। অতএব প্রসঙ্গই ন্যায়ের প্রধানতম যন্ত্র। অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃতি না জানিলে আমরা এ বিজ্ঞানে এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না। প্রসঙ্গ আবার দুইটি নাম বিরচিত। প্রত্যেক প্রসঙ্গে দুইটি করিয়া নাম আবশ্যক। তন্মধ্যে একটি প্রসঙ্গের প্রবাচ্য (Subject) আর অপরটি প্রসঙ্গের প্রবচন (Predicate) অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে নামের প্রকৃতি জানিতে হয়। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে নাম সম্বন্ধেই প্রথমে বিচার করা হইয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে আধুনিক পণ্ডিত সমাজে নামের অন্যান্য বিভাগ সমূহের মধ্যে নাম স্বীকার বাচক বা অস্বীকার বাচক—এই বিভাগটি করা হয়। কিন্তু তর্কতত্ত্বকারের মতে উক্ত বিভাগটি সম্যক্‌রূপে দুষ্ট। কারণ নাম স্বীকারবাচকই হউক আর অস্বীকার বাচকই হউক নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে স্বীকারই করে। তবে স্বীকার-বাচক নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে নির্দ্দিষ্টরূপে স্বীকার করে; আর অস্বীকারবাচক নাম অনির্দ্দিষ্টরূপে স্বীকার করিয়া থাকে। 'মনুষ্য' বলিলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল ও তৎসঙ্গে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম—যথা বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনীশক্তি, ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার—সংচিহ্নিত হইল। 'অ-মনুষ্য' বলিলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল এবং তৎসঙ্গে 'অ-মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ সংচিহ্নিত হইল। 'অ-মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু 'অমনুষ্যত্ব' বলিয়া বিশ্বে কতকগুলি ধর্ম্ম আছে তাহার সন্দেহ নাই। 'মনুষ্যত্ব' ব্যতীত—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার ও জীবনীশক্তি এই তিন ধর্ম্মের সমষ্টি ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্ম্মই 'অমনুষ্যত্ব' নামে বিবৃত হইতে পারে। অতএব 'অ-মনুষ্য' এই নামটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে অস্বীকার করে না বরং এক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলী ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্ম্মকে স্বীকার করে। অতএব দেখিতে গেলে স্বীকারবাচক ও অস্বীকারবাচক নামে বিশেষ কোন প্রভিন্নতা নাই।

নাম বলিলেই সতের নাম বুঝায়। নাম হইলেই সতের নাম হইতে হইবে। অতএব নামের পরে নাম চিহ্নিত সৎনিচয় সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। জগৎস্থ সমস্ত সৎ নিম্নলিখিত মতে বিভক্ত হইয়াছে;—

(১) অনুভূতিনিচয় বা অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ।

(২) উক্ত অনুভূতিনিচয়ের অনুভবকারী মনঃ।

(৩) শরীর—যাহারা উক্ত অনুভূতি সমূহকে উৎপন্ন করে বা যাহাদিগের উক্ত অনুভূতি নিচয়কে উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে।

(৪) পারম্পর্য্য, সমবর্ত্তিতা, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য।

তাহার পর প্রসঙ্গ বিবেচিত হইয়াছে। সমস্ত প্রসঙ্গই দুইটী নাম অর্থাৎ দুইটী সং হইতে বিরচিত। অতএব জগৎস্থ সমস্ত সংসম্বন্ধে সতের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃতি জ্ঞাত হইলে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান হইল। তাহার পর প্রসঙ্গ কিরূপে নির্দ্দেশ হয় তাহার বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গের প্রকৃতি এবং তাহার পরের অধ্যায়ে প্রসঙ্গের অর্থ বিবেচিত হইয়াছে। নাম এবং নাম চিহ্নীয় সং সমূহের প্রকৃতি জানা থাকিলে প্রসঙ্গ বা তদর্থ স্বতঃই আমাদের সম্মুখে আইসে।

বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে শ্রেণীবন্ধন সাতিশয় প্রয়োজনীয়। কতকগুলি সং এক সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধকরাতে স্মৃতির অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায়াবয়বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে শ্রেণীবন্ধন কার্য্যটি বিজ্ঞানে সাতিশয় প্রয়োজনীয়। স্বীকার্য্য পঞ্চ (The five predicables) নিম্ন-লিখিতরূপে বিভক্ত হইয়াছে ;—

পরজাতি অপরজাতি

প্রভিন্নকধর্ম্ম উৎপন্ন নিত্যধর্ম্ম নৈমিত্তিকধর্ম্ম

যে শ্রেণী অপর এক শ্রেণীকে অন্তর্ভূত করে তাহা শেষোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পরজাতি আর শেষোক্ত শ্রেণী প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে অপরজাতি। 'মনুষ্য প্রাণী'—এস্থলে 'প্রাণী' শ্রেণীটি 'মনুষ্য' শ্রেণীপ্রথা সম্বন্ধে পরজাতি ; আর 'মনুষ্য' শ্রেণীটি 'প্রাণী' শ্রেণী সম্বন্ধে অপরজাতি 'প্রাণী' শ্রেণী অপেক্ষা 'মনুষ্য' শ্রেণী অধিক ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে। 'প্রাণী' বলিলে 'জীবনীশক্তি' মাত্র সংচিহ্নিত হয় ; আর 'মনুষ্য' বলিলে 'জীবনীশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার, সংচিহ্নিত হয়। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' 'মনুষ্য' অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম। অর্থাৎ প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাপর অপরজাতি সমূহ হইতে 'বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' এই ধর্ম্মদ্বয় 'মনুষ্য' অপরজাতিকে ভিন্ন করিয়া দিতেছে। অপরজাতীয় ধর্ম্মকে তবে প্রভিন্নক-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর নিত্য ধর্ম্ম হইতে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহাকে উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম বলে। 'বুদ্ধিবৃত্তি' 'মনুষ্য' শ্রেণীর একটি নিত্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তি' না থাকিলে নির্দ্দিষ্ট সংকে 'মনুষ্য' শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায় না। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি (নিত্যধর্ম্ম) আছে বলিয়াই 'বাক্‌শক্তি'ও আছে ; অর্থাৎ বাক্‌শক্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন। অতএব 'বাক্‌শক্তি' মনুষ্য শ্রেণীর একটি উৎপন্ন ধর্ম্ম। আবার যেখানেই 'বুদ্ধিবৃত্তি' দেখিতে পাওয়া যায় সেইখানেই 'বাক্‌শক্তি' দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 'বাক্‌শক্তি' একটি উৎপন্ন নিত্যধর্ম্ম। আবার এমত কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যাহাদের নির্দ্দিষ্ট অপরজাতি সম্বন্ধে প্রায়ই

দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যাহারা নিত্য নহে। এইরূপ ধর্ম্মকে নৈমিত্তিকধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কাকের 'কৃষ্ণবর্ণত্ব' এইরূপ নৈমিত্তিকধর্ম্মের একটি উদাহরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানে প্রযুক্ত পরিভাষা-সমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সাতিশয় প্রয়োজনীয়। ব্যাখ্যার প্রকৃতি, ব্যাখ্যা কিরূপে করিতে হয় ও কিরূপে করিলে বিশুদ্ধ হয় এবং ব্যাখ্যা ও বিবরণে কি প্রভিন্নতা আছে—এইগুলি দেখান এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ পুস্তকের প্রকৃত বিষয়—অর্থাৎ অনুমান—বিবেচিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে অনুমানের প্রকৃতি সমালোচিত হইয়াছে। জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যকে অনুমান করণকেই প্রকৃত অনুমান বলে। তদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সামান্য প্রসঙ্গ হইতে তদীয় বিশেষ প্রসঙ্গ অনুমিত করণ ইত্যাদি অনেক প্রকার অপ্রকৃত অনুমানও আছে। এই অধ্যায়ে ঐ সমস্ত অপ্রকৃত অনুমানের উদাহরণ সমালোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায়াবয়ব বিবেচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকেরা ন্যায়াবয়বকে মধ্যবাক্যের (Middle Term) স্থানানুসারে চারিটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু তর্কতত্ত্বকার বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত্যনুসারে উক্ত বিভাগকে নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন। এখানে বলা উচিত যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করণকে (Quantification of the predicate) একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তর্কতত্ত্বকার এ বিষয়ে হামিল্টনের মতাবলম্বন করিয়া প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করণকে অধিকতর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে ন্যায়াবয়বের চারিটি বিভাগ একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান (Major Premiss) যে একটি উন্নয়ন (Induction) মাত্র তাহা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা যে এক বা বহু বিশেষ সত্য হইতে অপর একটি সত্যকে অনুমান করি—তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং ন্যায়াবয়বের কার্য্য যে কেবল সেই অনুমানটী অদুষ্ট কি না তাহা স্থির করা,—ন্যায়াবয়ব যে নিজে অনুমান কার্য্য নহে—কেবল অনুমান কার্য্যটি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষক মাত্র—তাহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে অনুমানশৃঙ্খল (Chain of Inference) ও অবনয়নসিদ্ধবিজ্ঞান (Deductive sciences) সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে যে অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানবৃন্দ সকলেই উন্নয়ন (Induction) সাপেক্ষ। এবং তজ্জন্য ইউক্লিডের পঞ্চদশ প্রতিজ্ঞা ন্যায়াবয়বের মতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধগুলিকে ও ব্যাখ্যাগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ উন্নয়নবৃন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি যে বাস্তবিকই পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ উন্নয়ন তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং এই মতানুসারে যাহাকে আমরা অসংশয়িত সত্য (Necessary truth) বলিয়া থাকি তাহা যে কতদূর অসংশয়িত তাহা দর্শিত হইয়াছে ; এবং অবনয়নসাপেক্ষ (Deductive) বিজ্ঞানপুঞ্জ যে উন্নয়নসাপেক্ষ (Inductive) বিজ্ঞানপুঞ্জ অপেক্ষা কতদূর অসংশয়িত তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমরা গ্রন্থের যে এত বিস্তৃত পরিচয় দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেন না, এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় ইহার উপযুক্ত প্রশংসা। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে যতদূর চিন্তাশক্তির বিকাশ দেখা যায়, ইহাতে যে বিদ্যাবত্তা এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা আমরা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণীকৃত করিতে পারিতাম না। এতদ্রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন বিস্তর আয়াসসাধ্য। প্রথমতঃ, বিষয় অতি কঠিন ; এইরূপ কঠিন বিষয় অধীত করিয়া নিজের আয়ত্ত করা, অল্পলোকের সাধ্য। তার পর কেবল ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেই ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্যক। শেষে ভাষার কষ্ট। পাশ্চাত্য ন্যায়ের উপযোগী ভাষা, বাঙ্গালায় ইতিপূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই। মিত্র মহাশয়কে তদুপযোগিনী ভাষারও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহাও অল্প শক্তির কার্য্য নহে। নূতন ভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রথম পাঠে তাঁহার গ্রন্থ একটু দুর্ব্বোধ্য দেখা যায়, কিন্তু একবার ইহার পরিভাষা হৃদয়ঙ্গম হইলে সে কষ্ট আর থাকে না।

বাঙ্গালির যেরূপ প্রগাঢ়চিন্তায় অক্ষমতা এবং পল্লবগ্রাহিত্ব দেখা যায়, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় দুইটী শিক্ষা বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, গণিত, এবং পাশ্চাত্য ন্যায়। তাঁহাদিগের চিত্তরোগের এই দুইটি মহৌষধ। যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন, তাঁহাদিগের এই দুই শাস্ত্রে কতক শিক্ষা হয়, নিতান্ত পক্ষে একটাতে কতক ব্যুৎপত্তি জন্মে। আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাশূন্যতা এবং পল্লবগ্রাহিতা দোষ তাঁহাদিগের তত থাকে না। কিন্তু যাঁহাদিগের শিক্ষা কেবল বাঙ্গালা পুস্তকের উপর নির্ভর করে, তাঁহাদিগের চিত্তোন্নতির সে সদুপায় নাই। ইদানীং বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে কিছু গণিত শিক্ষা হইতেছে—ন্যায়ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। তর্কতত্ত্ব বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অধীত হওয়া বিহিত।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সংকার হইল। সংকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল—সরোবরে কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল—পৃথিবী আলোকের হর্ষে হাসিয়া উঠিল—যেন কিছুই হয় নাই—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত স্বাদবিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধ স্বরূপ, দিবারাত্র স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর

অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ উপন্যাস লিখিলাম।*

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া, স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্ত-করে আসিয়া দাঁড়াইতেন, বলিতেন, "আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও," যদি বলিতেন "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি তাহা হইলে ভ্রমর তাঁহাকে ক্ষমা করিত। কেন না রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী;—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ; ঈশ্বরের অংশ; পুরুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?

গোবিন্দলাল তাহা পারিলেন না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।—ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি না যে সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন।

---

* অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"রোহিণীকে মারিলেন কেন?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট হইয়াছে।" কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।

বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—মুখে, মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া!

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনা বাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থ ই বলিয়াছেন সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পূরিয়া গিয়াছে—দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী পুষ্করিণীতটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে স্ফাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানা পুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেইদিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চীর বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন—ভ্রমর বলিয়াছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন ফটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ফুলগাছ নাই—কেবল উলু বন, আর কচু গাছ, ঘেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রস্তরমূর্ত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ঝিল-মিল সাশি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে—মর্ম্মর প্রস্তর সকল কে হর্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাগানে আর ফুল ফুটে না—ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্র অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। এক-বার ভ্রমর, তাহার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখন বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখন বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখন বোধ হইল তাহারা দুই জনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্কপত্র নড়িতেছে—বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বনমধ্যে বন্য কীট পতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্ন পুত্তল পদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্তচিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে, "**এইখানে**"।

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে কি?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে "**এমনি সময়ে।**"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণি?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে, আমি ডুবিয়াছিলাম।"

গোবিন্দলাল, আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার অপ্রাপ্তবয়ঃ ভাগিনেয়, শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। কয়েক বৎসর পরে শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

শচীকান্ত যখন মানুষ হইল, তখন সে প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভা কাননে—যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল—এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল।—প্রত্যহ সেইস্থানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া, আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারী করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিলফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো। প্রমোদভবনের পরিবর্ত্তে একটী মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব দেবীর স্থাপনা করিল না। বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া, ভ্রমরের

একটি প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপনা করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে,
ভ্রমরের সমান হইবে,
আমি তাহাকে
এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"

সমাপ্তঃ

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিত

কিছুদিন পরে একদা নিশীথে জ্যোৎস্নাময়ী রাজপথে একটি স্ত্রীলোক একাকিনী গমন করিতেছিল। তাহার গতি অতি বিচিত্র। উহা দেখিলে বোধ হইবে যেন বিনা পাদবিক্ষেপে, বিনা মৃত্তিকাস্পর্শে গমন করিতেছে। চন্দ্রমাশোভিত নীল নভোমণ্ডলে পবনসঞ্চালিত মেঘখণ্ডের ন্যায় গতি অমানুষিক এবং অনৈসর্গিক। সেই গভীর নিশীথে জনহীন রাজপথে নির্ভীক চিত্তে একাকিনী গমন করিতেছে। পথিপার্শ্বে ভীমতরুর ছায়ান্ধকারে হিংস্রপশুদিগের কখন কখন ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, তাহাতে ভয় নাই। গ্রাম্য প্রহরীদিগের ভয়াবহ চীৎকারে ভয় নাই। মস্তক আবরণহীন রহিয়াছে, লজ্জা নাই, ঊর্দ্ধদৃষ্টে সেই বিচিত্র গতিতে গমন করিতেছিল। রমণী রাজপথ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষবাটিকার গলি রাস্তায় চলিল এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে-ছিল। সেও সেই রাস্তা লইল। বৃক্ষবাটিকার বাগানের নিকট আসিয়া রমণী কলের পুত্তলিকার ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া মস্তক ফিরাইল এবং পরক্ষণেই সেইরূপে অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিল। তৎপরে সেইরূপ বিচিত্রগমনে গঙ্গার তীরে আসিয়া কূলেতে অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে যখন জলের নিকট আসিল তখন পশ্চাদনুসারী ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফিরাই-লেন। রমণী নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চমকিত হইয়া এবং সম্মুখে তরঙ্গময়ী নদী দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইল, এবং বলিয়া উঠিল "আমি কোথায়, একি স্বপ্ন ?" অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর না করিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। রমণীর ধীরে ধীরে স্মরণ হইল যে তিনি গতরাত্রে তাহাদিগের বাটীতে একটি কক্ষে শয্যোপরে শয়ন করিয়াছিলেন। নদীকূলে ত শয়ন করেন নাই, তবে কি প্রকারে নিদ্রিতা-বস্থায় এখানে আসিলেন ? আর এ অপরিচিত পুরুষ কে ? তাহার নিকট দাঁড়াইয়াই বা কেন ? সহজেই তাঁহার অনুধাবন হইল যে ঐ অপরিচিত ব্যক্তি

কোন দুরভিসন্ধিতে কোন কৌশলে গৃহপ্রবেশ করিয়া নিদ্রিতাবস্থাতে তাঁহাকে এখানে তুলিয়া আনিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত রমণীর মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র তিনি ভীতা হইয়া অতি দ্রুত বৃক্ষবাটিকার দিকে যাইবার উদ্যম করিলেন কিন্তু অপরিচিত পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল। রমণী অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "স্থির হও—বিধু চীৎকার করিও না—কোন ভয় নাই।" অপরিচিত পুরুষ নাম ধরিয়া ডাকাতে তাঁহার সাহস হইল, ভাবিলেন যখন এ ব্যক্তি তাঁহাকে জানে, তখন সে অবশ্য কোন পরিচিত ব্যক্তি, বসন দ্বারা মুখের কিয়দংশ আবৃত আছে বলিয়া তিনি চিনিতে পারিতেছেন না, এবং সে কারণ কোন ভয়ের কারণ নাই—এই সিদ্ধান্ত করিয়া রমণী অথবা বিধু আর চীৎকার করিল না, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

অঃ পুঃ। পরে জানিবে, এখন আমার সহিত আইস।

বিধু। কোথায় যাইব? আপনি আমাকে ঘুমন্ত তুলিয়া আনিয়াছেন কেন?

অঃ পুঃ। তুমি ঘুমন্ত এখানে আসিয়াছ বটে, কিন্তু আমি আনি নাই—তুমি আপনি হাঁটিয়া আসিয়াছ।

বি। মিথ্যা কথা, তুমিই আনিয়াছ। মানুষে কি ঘুমন্ত হাঁটিতে পারে?

অঃ পুঃ। পারে বই কি, তুমি কি কখন নিশিতে পাওয়া শুন নাই—সেও ত নিদ্রিতাবস্থাতে হাঁটিয়া বেড়ায়।

এই কথা শুনিবামাত্র বিধুর হৃৎকম্প হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "সে যে ভূতে ডাকে তাই ঘুমন্ত যায়।"

অঃ পুঃ। সে সকল নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকদিগের কথা। নিশিতে ডাকার অর্থ এই যে, যে সকল কর্ম্ম মানুষ দিবসে করিয়া থাকে বা করিতে ইচ্ছা করে কেহ কেহ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার ন্যায় সেই সকল কর্ম্ম করিয়া বেড়ায়। তুমি বোধ হয় দিবসে এই ঘাটে সর্ব্বদা আসিয়া থাক, অথবা আসিতে বাঞ্ছা করিয়া থাক, তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও এখানে আসিয়াছ। নিশিতে ডাকা আর কিছুই নহে।

বিধু এই শেষোক্ত কথাতে লজ্জিতা হইয়া মস্তক নত করিলেন। পরে চকিতের ন্যায় তাঁহার স্মরণ হইল, যে সে দিবস প্রাতে কুমুদিনী যে ঘটনাটি তাহার পিতার নিকট বিবৃত করিতেছিল, সে তবে তাহার কৃত। অর্থাৎ সেই গভীর নিশীথে অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে যে স্ত্রীলোকটি প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীর গাত্রে হাত দিয়াছিল সে তবে তিনিই—নিশ্চয় তিনিই, কেন না বিনোদিনীর অতিশয় জ্বর হওয়াতে তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া প্রথম রাত্রে মধ্যে মধ্যে সেই কক্ষমধ্যে যাইয়া বিনোদিনীর গাত্রোত্তাপ পরীক্ষা করিতেছিলেন। অপরিচিত পুরুষের যুক্তিমতে তাহার স্থিরবিশ্বাস হইল যে তিনিই সে রাত্রে কক্ষমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস

মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র বিধু অতি কাতর হইয়া বলিল, "যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আমার পরমায়ু আর অল্পদিন, কেন না ঘুমন্ত এই প্রকার বেড়াইতে বেড়াইতে আমি হয় কোন দিন জলে ডুবে মরিব, না হয় ছাদ হইতে পড়িয়া মরিব। কিন্তু আজ আমায় আপনি প্রাণদান দিলেন আপনি আমার বাপ—আপনি কে ?

অঃ পুঃ। পরে বলিব, আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইবে। আমি অবধৌতিক মতে অনেকের এই প্রকার পীড়াশান্তি করিয়াছি, তোমাকেও আরোগ্য করিব—অদ্য রাত্রেই ঔষধ দিব, আমার সহিত আইস।

বিধু যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অপরিচিত অতি দ্রুত গঙ্গাজলে নামিয়া বলিলেন, "শুন বিধু, আমি এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইলে, আমার দ্বারা তোমার কখন কোন অনিষ্ট হইবে না—বরং ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কেন না আমি তোমার রোগ আরাম করিব। কিন্তু তুমি যদি আমায় পিতার ন্যায় জ্ঞান কর তা হলে তুমিও এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে ও যাহাতে আমার উপকার হয় তাহা করিবে।" তাঁহার জীবনরক্ষাকর্ত্তা, অপরিচিতের কথায় বিধুর প্রথম হইতে বিশ্বাস জন্মিতে ছিল, এক্ষণে তাহাকে শপথ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। তিনিও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অপরিচিতের আদেশানুসারে শপথ করিলেন। তৎপরে অপরিচিতের আজ্ঞামত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর রজনীতে বৃক্ষবাটিকার একটি কক্ষে দীপালোকে এক যুবা কি পড়িতেছিল। যখন বিধু নদীকূলে অপরিচিত পুরুষকে প্রথম দেখিয়া চীৎকার করিয়াছিল, সেই চীৎকার শুনিয়া যুবা কক্ষ হইতে দ্রুত আসিয়া বাগানের কোন স্থান হইতে লুক্কায়িতভাবে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। যখন অপরিচিত এবং তৎপশ্চাতে বিধু নদীগর্ভ হইতে উপরে উঠিতেছিল যুবা তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "এ কি—সহিত কুমুদিনীর সহচরী কেন ? কি অভিপ্রায়ে আর এত রাত্রে কোথায় যাইতেছে।"

বিধুকে পাঠকের নিকট পরিচিত করা আবশ্যক।

বিধু পিতৃমাতৃহীনা একটী দরিদ্র কায়স্থকন্যা। বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া হরিনাথ বাবুর বাটীতে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভাকে লালনপালন করিত, সেইজন্য তাঁহার বড় অনুগত হইয়াছিল। যখন স্বর্ণ শ্বশুর বাড়ীতে ছয়মাস বাস করিয়াছিল, তখন বিধু তাহার সহিত রজনীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে হরিনাথ বাবুর বাটীতে পুনরায় আসিয়া বাস করিল। বিধু পরিচারিকার ন্যায় ছিল না—হরিনাথ বাবুর কন্যার এবং

ভ্রাতৃকন্যার সহচরীর ন্যায় ছিল, বিনোদিনীকে বিশেষ ভালবাসিত, বিধু কুমুদিনীর সমবয়স্কা, দেখিতে ভদ্রকন্যার ন্যায় বটে, বর্ণ খুব টকটকে না হউক, গৌরবর্ণ বটে, গঠন যদিও সুন্দর ছিল না, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থূলকায় জন্য উহা সুন্দর দেখাইত। বিধু পান খাইত না, গহনা পরিত না, বা পাড়ওয়ালা কাপড় পরিত না—কিন্তু মিহি চন্দ্রকোণা ধুতি পরিত। বিধুর শরীর পরিষ্কার এবং নয়নরঞ্জক বটে, বিধু অতিশয় গম্ভীর, শরীরে কোন দোষ ছিল না। কেবল কুমুদিনী সম্প্রতি একটি মাত্র দোষ দেখিত। বিধু অগ্রে বসুন্ধরার ঘাটে স্নান করিত কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষবাটিকার ঘাটে স্নান করে। অগ্রে একবার যাইত—এখন সকালে বৈকালে দুইবার স্নান করিতে যায়—আর অধিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকে, এ ভিন্ন আর কোন দোষ ছিল না। কখন কেহ কোন প্রকার নিন্দা করিতে পারিত না, বিধু কাহারও সহিত কলহ করিত না, সকলের প্রিয় ছিল, এবং সকলকে ভালবাসিত, কেবল বোধ হয় যেন ইদানীং কুমুদিনীকে দেখিতে পারিত না। বিধু অপরিচিতের সহিত সেই গভীর যামিনীতে চলিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাননে

রাত্র দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া প্রায় তৃতীয় প্রহর—আকাশে তরল মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে কাকজ্যোৎস্না হইয়াছে, তজ্জন্য দূরের মানুষ লক্ষ্য হয় না। অপরিচিত পুরুষ এবং বিধু গ্রামপ্রান্তরে সেই নিবিড় অন্ধকারময় বনমধ্যে প্রবেশ করিল, কিঞ্চিৎ পরেই অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই যুবা প্রবেশ করিল। বিজন এবং অগম্য বন দেখিয়া বিধু অতিশয় ভীতা হইয়া দাঁড়াইল এবং বলিল "কোথায় যাইব, আর আমি যাইব না।"

বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদে বনপ্রান্তে অদূরে তরঙ্গিণী নদী দেখা যাইতেছিল, সেই জ্যোৎস্নাময়ী তটিনীর নিকটে অপরিচিত পুরুষ বিধুকে লইয়া গিয়া আপনার গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বিধু এখন আমায় চেন?"

বিধু স্তম্ভিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; চিনিবেন না কেন, চিনিলেন, কিন্তু চিনিয়া মুমূর্ষুবৎ হইলেন। যে রতিকান্তের নাম শুনিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইত সেই রতিকান্ত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—সেই গভীর যামিনীতে নির্জ্জন অন্ধকারময় বনমধ্যে একাকিনী সেই নৃশংসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—বিধু ভয়ে বিহ্বল হইয়া তাঁহার

প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রতিকান্ত তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বিধু, তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? আমার বেশ দেখিয়া বুঝিতেছ না যে আমি দেবার্চ্চনায় এ শরীর অর্পণ করিয়াছি। আমার দ্বারা কি কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করা উচিত? আমি কি কখন কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি?—রজনীকান্ত আমার পৈতৃক বিষয় ভোগ করিতেছিল তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ভৈরবীর সেবায় অর্পণ করিবার মানসে কেবল তাহারই সহিত বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিয়াছ কি আর কাহারও আমি অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি? আর আমি অতিশয় পাষণ্ড হইলেও তোমার ভয় কি? তুমি না আমার কন্যা? ছিঃ এ অবিশ্বাস তোমার অনুচিত, তোমার নিতান্তই যদি ভয় হইয়া থাকে, তবে চল তোমায় গৃহে রাখিয়া আসি, কিন্তু তোমাকে ঔষধ দিতে পারিব না, কেন না যে দেবীকে পূজা করিয়া ঔষধি দিব রোগীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

ঈদৃশ তর্কের দ্বারা রতিকান্ত বিধুর ভয় অথবা অবিশ্বাস দূরীকৃত করিলেন, তৎপরে উভয়ে বনের নিবিড়াংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূরে একটী আলো দেখিতে পাইলেন। সেই আলো দেখিয়া বিধু বলিল "আর কতদূর যাইব? আমায় যে আবার প্রভাত না হইতেই বাড়ী ফিরে যাইতে হইবে।"

রতি। ঐ আলো আমার আশ্রমে জ্বলিতেছে, ঐ স্থানে তোমার ঔষধি আছে আর ঐ স্থানে তুমি জানিতে পারিবে যে আমার উপকারার্থে তোমায় কোন কর্ম্ম করিতে হইবে—তোমায় রাত্র চারিটার মধ্যে বাটী রাখিয়া আসিব।

বিধু নিঃশব্দে রতিকান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিঞ্চিত বিলম্বে এক বৃহৎ ও পুরাতন দেবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রতিকান্ত বলিলেন "মন্দিরমধ্যে দেখিতেছি দেবীর পূজার জন্য কেহ আসিয়াছে, তাহাকে বিদায় দিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, তুমি আপাততঃ এই কুটীর মধ্যে থাক।" এই বলিয়া মন্দিরপার্শ্বে একটী পর্ণকুটীরে বিধুকে রাখিয়া রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, পশ্চাৎঅনুসারী যুবা এই অবকাশে মন্দিরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি শীতবসন দ্বারা সমুদায় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। অপর ব্যক্তি আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়—

রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখাবৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি স্থির করিয়াছেন?"

উত্তর। আমি পূর্ব্বে যাহা আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই স্থির—আপনার সহিত যদি কখন বৈরভাব প্রকাশ করিয়া থাকি তবে তাহা ভুলিয়া যাউন,

এক্ষণে আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলাম আপনি যাহা করেন—কুমুদিনী ব্যতিরেকে আমার এ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কঠিন, যাহাতে কুমুদিনীকে পাই আপনি তাহা করুন এ উপকারের বিনিময়ে আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহাই দিব।

রতি। আপনার সহিত আমার প্রথম যে দিবস দেখা, সেই দিবস হইতে আমি কুমুদিনীকে গোপনে ধরিয়া আনিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি—এ পর্য্যন্ত তাহারা সফল হয় নাই। একদিবস ভুলক্রমে তাহার ভগিনী বিনোদিনীকে ধরিয়াছিল। যাহা হউক অতি শীঘ্র তাহারা সফল হইবে।

উ। আগামী কল্য তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে, ইতিমধ্যে সফল হওয়া আবশ্যক।

র। আগামী কল্য রাত্রে আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিব—এইই মন্দির-মধ্যে দেবীর সম্মুখে বিবাহ হইবে,—পুরোহিত প্রভৃতি সকল উপস্থিত থাকিবে, নিশ্চয় জানিবেন—কাল গায়ে হলুদ দিব, দিবসে একবার এখানে আসিবেন। মুখাবৃতকারী এই উৎসাহান্বিত বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহা এক্ষণে দিব, না সেই সময়ে দিব।"

র। এক্ষণে রাখুন সেই সময়ে দিবেন, অগ্রে আপনার কার্য্যোদ্ধার করি তবে পুরস্কার লইব।

এই কথোপকথন শেষ হইলে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "ভাই, আমি তোমার ভগিনীপতি আমি যে তোমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছি আমাকে কি দিবে?"

অপরিচিত বলিল, "মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি চান।"

দেব। কি চাই? অর্দ্ধেক রাজ্য আর এক রাজকন্যা চাই—আর কিছু নয়। পরে হাসিয়া বলিলেন "কি চাই এর পর বলিব।" তৎপরে রতিকান্ত দেবনাথকে ও বসনাবৃত যুবককে বিদায় দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিধুকে মন্দিরমধ্যে আনিলেন। বিধু দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই পাষাণমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত দেবীর নিকট বসিয়া কোশাকুশি ঠন্ ঠন্ করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন—তৎপরে উঠিয়া আসিয়া বিধুর হস্তে একটি রূপার মাদুলি দিয়া বলিলেন "ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবে এবং প্রত্যহ দেবীকে স্মরণ করিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইবে—অদ্য হইতে সেই উৎকট রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।" বিধু উহা অতি যত্নে হস্তে লইয়া দেবীকে পুনরায় প্রণাম করিয়া, বসিয়া বলিলেন "আপনার জন্য আমায় কি করিতে হইবে বলুন।"

রতিকান্ত সহসা উত্তর করিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "বিধু, কুমুদিনীকে তুমি ভালবাস না ; তাহার অনিষ্ট হইলে সুখী হও।"

বিধু চমকিয়া উঠিল। বলিল "সে কি—সে আমার কি করিয়াছে যে ভালবাসিব না।"

রতি। কিছু করে নাই—তবে তোমরা উভয়েই—বলিয়া আর বলিলেন না। বিধু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আবার বলিতে লাগিলেন। "কোন দুইটি স্ত্রীলোকে এক পুরুষকে ভালবাসিলে সেই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শক্রতা জন্মে—তেমনি তুমি ও কুমুদিনী উভয়েই রজনীকে ভালবাসাতে, তুমি কুমুদিনীকে দেখিতে পার না।"

বিধু। আপনি বড় অসঙ্গত কথা বলিতেছেন, আমি চলিলাম।

রতি। কিছু অসঙ্গত নহে। যখন তুমি রজনীর বাটীতে স্বর্ণপ্রভার সহিত বাস করিতে তখন হইতে এই ভালবাসা জন্মিয়াছে, ভৈরবীর সম্মুখে মিথ্যা কহিও না।

বিধু কোন উত্তর না করিয়া মস্তক নত করিয়া রহিল। রতিকান্ত পুনরপি বলিলেন, সে সকল কথা যাউক—কুমুদিনীকে আমি একজন দরিদ্রহস্তে সমর্পণ করিব, তুমি সাহায্য করিবে ?

বিধু। সে আপনার কি করিয়াছে যে তাহার এত অনিষ্ট করিবেন।

রতি। তুমি ত সকলি জান—সে আমার ভ্রাতৃজায়া হইয়াও আমার মন্দ করিয়াছে—মনে পড়ে না কি ? শরৎকুমার আমায় তাহার বিষয় দান করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে রহিত.করিয়াছিল।

বিধু নিরুত্তর হইয়া রহিল। তৎপরে রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ ?"

বিধু। কিরূপ সাহায্য ?

রতি। তুমি আগে দেবীর নিকট স্বীকার কর যে সাহায্য করিবে তবে বলিব।

বিধু। স্বীকার করিলাম।

রতি। তবে শুন, আগামী কল্য তাহার বিবাহ হইবে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহাকে এই স্থানে ধৃত করিয়া আনিয়া সেই দরিদ্রসন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিব।

বিধু। কি প্রকারে ইতিমধ্যে ধৃত করিবেন।

রতি। রাত্রি দুই প্রহর সময়ে বিবাহলগ্ন—সন্ধ্যার পর তাহাকে তুমি একবার কোন কৌশলে খিড়কিতে আনিবে—সে স্থানে আমার লোক থাকিবে—তাহারা ধৃত করিয়া আনিবে—মুখ বন্ধ করিয়া আনিবে যে চীৎকার করিবে না—আর সম্মুখ অন্ধকার আছে, কি বল, তুমি সম্মত আছ ?

বিধু। আচ্ছা।

রতি। তুমি দেবীর নিকট স্বীকার করিলে ?

বিধু। করিলাম।

এই বলিয়া দুইজনে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই বিধু হরিনাথবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যে যুবা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল, তিনিও বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে কুমুদিনী একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরের পত্র পাইলেন। তাহার অর্থ এই "অদ্য সন্ধ্যার পর খিড়কির বাহির হইও না, সমূহ বিপদ।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা সধবা হলো

কুমুদিনীর বিবাহের দিন উপস্থিত। বিধবার বিবাহ; বড় সমারোহ নাই। বালিকা কন্যা নহে—বালক বর নহে—সুতরাং বাজনাবাদ্য, রেশেলা, রোশনাই, বরযাত্র কন্যাযাত্রীর হুড়াহুড়ি নাই; লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই; উদ্যোগের বড় তাড়াতাড়ি নাই। বিশেষ বিধবার বিবাহ—হিন্দুয়ানি ছাড়া কাণ্ড, যে বরযাত্র বা কন্যাযাত্র আসিবে তাহারই জাতি যাইবে—লোকজনের বড় শব্দ নাই। সব চুপি চুপি, সব লুকাইয়া, চুপি চুপি বর আসিবার জন্য একটী ঘরে একটা বিছানা হইল; লুকাইয়া মালী একটা টোপর দিয়া গেল; লুকাইয়া নাপিত পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; লুকাইয়া স্ত্রী-আচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। —কিন্তু স্ত্রী-আচারে কতকগুলা মেয়ে দল না বাঁধিয়া উলু না দিলে, গণ্ডগোল দাঙ্গা ফেসাদ না বাঁধাইলে সকল শাশুড়ীর মন উঠে না। অন্ততঃ সাতটি এয়ো চাই—নহিলে বরণ হয় না। বিধবার বিবাহ—কেহ আসে, কেহ আসিতে চাহে না; হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেখিলেন সাতটি এয়ো জুটে নাই। তাঁহার মনটা চটিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। বলিলেন "পাড়ার মাগীদের ন্যাকরা দেখে আর বাঁচি না। যা ত বিনোদিনি—মাগীদের ডেকে আন্‌গে ত। মাগীরে সে দিন কায়েতের ছেলের ভাতে লুচি মণ্ডা মেরে এলো, আর আমার মেয়ের বিয়েতে আসিতে পারে না। যা দেখি, প্যারীর মা, রামের দিদি, কানাইয়ের বউ, গিরিশের শ্যালী, সবাইকে ডাক গিয়া। না আসে ত যা হবার তা হবে।"

বিনোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জ্যেঠাইমার কথা না শুনিলে নয়। বলিল, যে "রাত হয়েছে একেলা যাব কেমন করিয়া ?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন বিধি সঙ্গে যাক্ না।"

অগত্যা বিনোদিনী চলিল। অগত্যা বিধু সঙ্গে চলিল। উভয়ে খিড়কীর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাত্রি অধিক হইল তথাপি বিধু কি বিনোদিনী ফিরিল না, অথবা সাতটা এয়োর একটা জুটিল না, ও দিকে বরও এলো না, কি হবে, কুমুদিনীর মা, ঘর আর বার করিতে লাগিলেন। শেষেতে বিধু ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া কর্ত্রী চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে বিধি, বিনোদ কই ?"

বি। ওমা সে কি, বিনোদ আসেনি ? সে যে খানিক দূর গিয়ে আমায় বল্লে বিধু তুই সবাইকে ডেকে আন্‌গে, আমি বড় কাহিল, আমি বাড়ী ফিরে যাই।

কর্ত্রী। কই সে ত আসেনি, "হ্যাঁরে বিনোদ ঘরে এসেছে ?" বলিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলই বলিল "না, আসে নি।"

এই কথা শুনিয়া কর্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মেয়ের বিবাহ ও সাতজন এয়োর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বিনোদিনী বয়ঃস্থা। বয়ঃস্থা কন্যাকে রাত্রে খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না, শুনে দশে দশ কথা বলিবে, সেই ভয়ে চুপি চুপি অনুসন্ধান হইতে লাগিল। যেমন কুমুদিনীর বিবাহ-উদ্যোগ চুপি চুপি হইতেছিল তেমনি বিনোদিনীর অনুসন্ধানও চুপি চুপি হইতে লাগিল। বিনোদিনীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে অধিক রাত্রি হইল তথাপি বর আসিতেছে না, লগ্নভ্রষ্ট হইবার সম্ভব ; ইহাও মহাবিপদ্। হরিনাথ বাবু ভাবিলেন বিধবাবিবাহ কি জগদীশ্বরের মনোমত নহে ; যাহা হউক সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি কি কুকাজ করিয়াছেন !

সেই রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় এক যুবা আপাদমস্তক একখানি বহুমূল্যের কাশমিরি শালের দ্বারা আবৃত করিয়া একটীমাত্র পরিচারক সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং বরাবর হরিনাথ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হরিনাথ বাবু বর বলিয়া চিনিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া বরাসনে বসাইলেন। বর আসিলে একটি শঙ্খের একবার মাত্র ধ্বনি হইল, কিন্তু হুলুর ধ্বনি হইল না।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল তথাপি সম্প্রদানের কোন উদ্যোগ না দেখিয়া হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বর ডাকিয়া বলিল "লগ্ন অতীত হইয়া যায়, সম্প্রদানের আর বিলম্ব কি ?" ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তর করিল—"মহাশয় আপনার নিকট গোপন

করা উচিত নয়, আমার একটি ভগিনীকে সন্ধ্যা হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, সেইজন্য আমরা সকলে বড় কাতর আছি।” বর উত্তর করিলেন, “বিনোদিনীকে পাচ্চেন না—তাঁর বুঝি আজ বিয়ে—এতক্ষণ হয়ত হয়ে গিয়াছে, আর সুপাত্রে পড়েছেন আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। এ ভগিনীর সম্প্রদানের আর বিলম্ব করিবেন না।” এ কথায় অথবা তামাসায় হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে হরিনাথ বাবু বরকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন। বিধুর আহ্বানেই হউক আর বিধবার বিয়ে দেখিবার জন্যই হউক এখন সাতটি এয়ো জুটিয়াছে, সুতরাং কর্ত্রীর একবার সাধ হইল যে স্ত্রী-আচারটা হয়। বর স্ত্রী-আচারস্থানে দাঁড়াইল কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত দেখিয়া সকলে জ্বলে পুড়ে উঠিল, কত প্রকার তামাসা করিল, বর তবু মুখ খুলিল না। আকার ইঙ্গিতে বরকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু চোকটি কেমন নাকটি কেমন, বর্ণ কেমন না দেখিলে স্ত্রীলোকদের মন উঠে না। একজন—সম্বন্ধে শ্যালী পশ্চাৎ হইতে বলিল “ভাই তোমার খোলসটা ছাড় না একবার তোমায় দেখি—” বর খোলস ছাড়িল না, কিন্তু পুরুষের চাতুরি স্ত্রীলোকের নিকট অধিকক্ষণ খাটে না, পশ্চাৎ হইতে সেই যুবতী তাহার শাল ধরিয়া এমত টান দিল যে শাল তাহার গাত্র হইতে খুলিয়া গেল। বর অনাবৃত হইল, এখন বরের মুখ ও শরীর সম্পূর্ণরূপে সকলে দেখিতে পাইল, কিন্তু দেখিবামাত্র সকলে স্তম্ভিত ও নিস্পন্দ হইল, ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ ভর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হইতেছে এই বাসনায় কুমুদিনী একটি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া বরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন বর অনাবৃত হইল তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। সম্মুখে বিধু অতি ম্রিয়মানা হইয়া বরকে দেখিতেছিল, নিকটস্থ একটী পাত্রে বাটা হলুদ দেখিতে পাইয়া কুমুদিনী সেই অগ্রহায়ণ মাসের শীতে হঠাৎ যাইয়া বিধুর মুখে এবং গায়ে মাখাইতে লাগিল। এবং বলিল “পোড়ার মুখি, আমার বর দেখে কি তোর হিংসা হয়েছে, আয় আজ তোরও এই সঙ্গে বিয়ে দেবো”—এই কথায় এবং ব্যবহারে বিধুর যে প্রকার মুখভঙ্গী হইল, তাহা যদি কুমুদিনী দেখিতে পাইত তাহা হইলে ভয় পাইত। বিধু উত্তর করিল, “ও যে রজনীকান্ত, ও তোমার বর কেমন করে—ও যে স্বর্ণের বর—যদি তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে স্বর্ণ রাগ করিবে, আজ রাত্রেই কেড়ে নিয়ে যাবে।” বিধুর এই নিষ্ঠুর এবং অমঙ্গলজনক বাক্যে কুমুদিনী বড় ক্ষোভিত এবং ভীত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। এদিকে রজনীকান্তকে দেখিয়া কুমুদিনীর মাতা “আমার সোণার চাঁদকে আবার ফিরে পেলুম” বলিয়া দাড়ি ধরিয়া চুম খাইলেন। তার পর কন্যা-সম্প্রদান হইল। কুমুদিনী আবার

সধবা হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিরবাঞ্ছনীয় চিরহৃদয়বিহারী প্রতিমা রজনীর সহিত কি মিলন হইল ? না এখন না ; বিনোদিনী যে কোথায় তাহা রজনী ভিন্ন আর কেহ জানিত না, সুতরাং বিবাহের পর রজনীকান্ত বিনোদিনীর উদ্দেশ্যে চলিলেন। কুমুদিনী কাঁদিতে লাগিল। বিধুর অমঙ্গলজনক বাক্যে মনে করিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর আর তাঁহাকে নয়নের আড় করিবেন না, কিন্তু বিবাহের পরে তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল, অবিশ্রান্ত নয়নবারি ঝরিতে লাগিল।

পঞ্চম বর্ষ ঃ একাদশ সংখ্যা
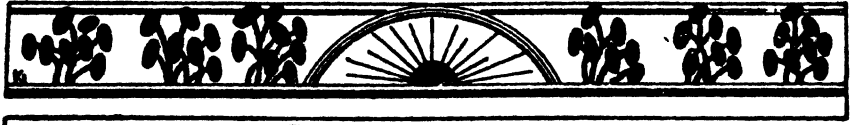
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোজনামচা লিখিবার অভ্যাস

বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলি মধ্যে লিখিয়াছেন—

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী ॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত ॥

পাঠক !

জটাধারীর চরিতাবলীতেই ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাইবে। হঠাৎ অবতার হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে সকলে সেণ্টপল হন না, সকল ঋষি দেবর্ষি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, কলেজের সকল ছাত্র "দর্শনের" সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। স্বর্গারোহণের পথে কেহ ছাত্রবৃত্তি প্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ বি এর পথে, কেহ মৃতদেহ চিরে চিরে, কেহ রসায়নের অগ্নিপার্শ্বে পট্‌কে যান। যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি বা প্রতিভা সকলের সমান নহে, কেবল বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কখন কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান কারণ। কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্মা কেবল অবস্থার অধীন ছিলেন না, সময় দেখিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন।

আমি যখন বিদ্যারম্ভ করি তখন সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। রাম খড়িতে ভূমিতে লিখিতে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না; তালপত্রে লিখিয়া রৌদ্রে কালী শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধূলা ছড়াইতে হইত; তখন "ইরেজার" বিনিময়ে চা-খড়ি, ব্লটিং বিনিময়ে চূণের থলি "গম-আরেবিক" বিনিময়ে, আতাতরাবিনিন্দিত কাল গঁদের ভাণ্ড, স্বর্ণনির্ম্মিত চিরকাল-পটু পেটেণ্ট-পেনের বদলে,

বাতার কলম, মরক লেদর আবৃত ইসক্রুটপ মস্যাধার বিনিময়ে চাল চুয়ানি ও ভূষাজড়িত মৃত্তিকাপাত্র, তখন থেকার স্পিঙ্ক এবং কোং, পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতা, মুখরজি পুত্র বা চাটুর্য্যা কোম্পানীর কোন প্রসঙ্গ ছিল না।

শৈশবাবস্থায় "আগডুম বাগডুম" খেলায় বড় আমোদ ছিল, তখন "হাডু-ডুডু" প্রণয়সম্ভাষণ বাক্য নূতন হইয়াছিল। নামটী কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না, বোধ হয় ইংরেজদিগের How do you do? হাউডু ইউডু কথা হইতে জন্মিয়াছিল। হাউডু অর্থাৎ কেমন আছ, এই সম্ভাষণ করিতে গিয়া তখন যুদ্ধ বাঁধিত। যাহা হউক মুসলমান বাদসাদিগের অনুকরণে মোগল পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ অনুকরণে এই খেলা হইয়া থাকিবে। এটি ঘোর যুদ্ধময় খেলার নাম ছিল—যাহা-হউক সে খেলার সর্দ্দার গঙ্গাধর শর্ম্মাই ছিলেন। তদ্ভিন্ন দৌড়াদৌড়ির সাঁতার শিক্ষার ও গুলি দণ্ড ক্ষেপণের একটী প্রধান "গ্রেজুয়েট" ছিলাম। পাঠশালার পাঠ কতক্ষণে শেষ হয় কেবল তাই সময়ে সময়ে ভাবিতাম; কিন্তু পাঠেও একবারে অনাস্থা ছিল না, দুষ্ট ছিলাম কিন্তু ধরা ছুঁয়া দিতাম না, এই জন্যই গুরুমহাশয় কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া "ভিজে বিড়ালটা" বলিয়া উঠিতেন, তাহাতে আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম; গুরুমহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আনাগনা ঘ গাঁড়র শিঙ্গে ম, হাড়গোড় ভাঙ্গা দ, কান্দে বাড়ি ধ, তিনপুটুলি শ, মিষ্ট সুরসহ লিখিতাম। তখন মূর্দ্ধণ্য ষ, ও মূর্দ্ধণ্য ণয়ের নামও ছিল না, কয়ে ষ যোগ করিলে যে ক্ষ হয় তাহা গুরুমহাশয়ও জানিতেন না। এই কথার বর্ণ পরিচয়ে পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় একদিন ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন "বিদ্যাসাগর বিদ্যাপচার করিয়াছেন, বাপ পিতামহের অপেক্ষা তাঁর অনেক বিদ্যা।"

আমাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর, প্রকৃত শ্রীমন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী; এখানে পাঠশালা, মক্তব, চতুষ্পাঠী সকলই উজ্জ্বল ছিল। গুরুমহাশয় আখন্ধি মল্লা সাহেব, ও নবদ্বীপের ফেরত "লদের পণ্ডিত" আখ্যাধারী অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাগাভাগি করিয়া ছাত্রবর্গ মধ্যে রাজত্ব করিতেন। তখন বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, উপক্রমণিকার নামও ছিল না, অল্পেই শিক্ষা শেষ হইত। শিক্ষালাভে অপেক্ষাকৃত পরিশ্রম করিতে হইত কিন্তু "লাউসেন দত্ত" মহাশয়ের বেত্রাঘাত আরও কষ্টকর ছিল। কয়েক বৎসর পাঠশালার পিটনি সহ্য করিয়া পাঠ সাঙ্গ করি। পরে পিতৃব্যগণের অনুজ্ঞায় আখন্ধি মিয়ার রুলের আঘাত ও তৎপরে অবসরমতে চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ সূত্র মুখস্থ করিতে বাধ্য হই। লতান লাউ-লতা স্বরূপ লম্বাকৃতি লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, রক্তচক্ষু বেত্রপাণী, "দেড়ে" আখন্ধি মিয়ার দয়া ও সুপক

বেলবিনিন্দিত চাক্‌চিক্যমান বৃহৎ মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণানুবাদ ক্রমে কীর্ত্তিত হইবে, ইহাদের মধ্যে কাহার গুণ বেশী কাহার তাড়না সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশজনক তাহা দুই এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। আপাততঃ রোজনামচা বা দৈনিক বৃত্তান্ত লিখনারম্ভ নির্দ্দেশ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

আমাদের গ্রামে দীঘীর নিকট পুরাণ থানা ঘর ছিল, যদিও থানা স্থানান্তরিত হইয়াছে তথাপি ঐ পথে গমন করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই বৃহৎ হাতার মধ্যে বৃহৎ শ্মশ্রুধারী গোলাম সরদার দারগা সাহেব পঞ্চ অঙ্গুলিতে গণ্ডতলস্থ কেশরাশি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতেছেন। দারগার নামে সকলে কাঁপিত কিন্তু আমি ত সময় পাইলেই তাঁহার চৌকির পাশে যাইয়া বসিতাম। বলিতে পারি না কেন তিনিও আমায় ভালবাসিতেন ও কহিতেন "লেড়কা বড়া হুঁসিয়ার"। যে সময়ে দারগা সাহেবের কাছারি গরম হইত, বিরুবরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খাঁ, সমসের খাঁ, রামচাঁদ শ্যামচাঁদনামা মুষ্টিপ্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়া রাখিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাঁধিত, তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদ মধ্যেও যাইতাম না। রবিবারে, চৌকিদার হাজিরির সময় শিষ্ট বালকের মত যাইতাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার মুন্সিজির তামাক ক্রয়জন্য এক একটি পয়সা দিত ও মুন্সিজি রোজনামচা পুস্তকে দিন দিনের ঘটনা লিখিতেন, আমি তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে দুই একটী মিষ্ট কথা কহিতেন, হয় ত কোন দিন দুই চারিটি পয়সা দিয়া নিকটস্থ দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আনাইয়া দিতেন ও দারগা সাহেব কহিতেন "বাবা থানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহাকেও কহিতে নাই, যদি কেহ বলে, শ্যামচাঁদের প্রহার লাভ হয়।" আমি থানার ঘটনা ভয়ে কাহাকেও বলিতাম না, দারগা সাহেব আমার উপর আরও সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমিও ভাবিতাম রোজনামচা লেখা ভাল কর্ম্ম, তাহাতে কাঁচা পয়সা আমদানী হয় ও অনেক খৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এই সময় আবার আমাদের গ্রামে নববিদ্যালয় বিভাগের এক জন তত্ত্বাবধারক আসিয়া এক দিন অবস্থিতি করিলেন—তাহাকে কেহ "ইনষ্টপিষ্টি" কেহ "ষ্টুপিড" কেহ "পেক্‌টর বাবু" কহিতে আরম্ভ করিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক বিবরণসহিত আত্মস্বাস্থ্যসম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন "বাবুর বাটীর বৃহৎ আরসিতে অদ্য নিজ মুখ দেখিয়া জানিলাম যে, ক্রমাগত পরিভ্রমণে মুখশ্রী শুষ্ক হইয়াছে এবার স্বস্থানে পৌঁছিয়া প্রতিদিন অজামাংস ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিব।" কেহ রোজনামচা লিখে খৈচুর কেহ প্রতিদিন অজামাংস আহরণে সক্ষম হন। এত ভাল রোজনামচা, ইহা লেখা কর্ত্তব্য বোধে আমিও সময়ে সময়ে ইহাদের অনুকরণ করিতাম। প্রাত্যহিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিখিতে চেষ্টা করিতাম। সেই অবধি আমার রোজনামচা লিখিবার হাতে খড়ি হয়—

আজও লিখি, এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। সেই বৃহৎ পুস্তক হইতে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বোধ হয় কোন স্থল পাঠকগণের হৃদয়রঞ্জক হইলেও হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মপরিচয়

শরৎ কাল, সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল—সে আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পূজার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নিবিড় আম্রতলে খেলিতে খেলিতে সুদূরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম সূর্য্যদেব রক্তকলেবর, বৃহৎকায়, ধীরে ধীরে রাশি রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেন সোণার চক্‌চকে মোহর, সাটিনের থলিতে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বারা প্রবিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণ থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল রোহিত হইল, যেন ছায়া বাজিতে কত মূরতি আকাশপটে শ্রেণীবদ্ধ হইল—ঐ আকাশবুড়ি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে—ঐ শিপাই তরবাল হস্তে দণ্ডায়মান—ঐ বাঘ পশ্চাৎ পা কুঞ্চিত করিয়া থাবা উত্তোলন করিয়া লম্ফ দিবার মনন করিতেছে—ঐ কুমির পাটিযুগল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; আবার আরও দূরে নৌকা পতাকা সুরঙ্গে রঞ্জিত, তার উপর বালশশিরেখা শ্বেত ফোঁটার মত আকাশ ললাটে ভাসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, এমন সময় সুদূরে গ্রামে বাবুর বাটীতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার পরেই নৌবতের বাদ্য সানায়ের স্বরসহিত বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব্দ হওয়া মাত্র শস্য ক্ষেত্র হইতে শত শত বকদল উড়িয়া ইণ্ডীয় রবরের ন্যায় ক্ষণেক লম্বা ক্ষণেক ক্ষুদ্র শ্বেত মালা গাঁথিল, গ্রামের বৃক্ষরাজি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল—আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে—

"বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যাও
যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও"

কহিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে দৌড়িলাম। মনে হইল আজ আমোদের কেবল আরম্ভ নহে। নৌবতখানা, ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়া, সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া পূজার বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূজার বাজানা জলদ বাজিতেছে, কত কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে বেলোয়ারি মালা গাঁথা হইতেছে, কোথাও কেহ সারি সারি সেজে বাতি, লণ্ঠনশ্রেণীতে নারিকেল তৈল সম্প্রদান করিতেছে। কেহ কহিতেছে

এই ছবিটি নিম্ন হইল, সঙ্গের শিষ্ট শ্যহারাধনের ক্ষিপ্তবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে, কেহ কহিতেছেন মাঝের ঝাড়ের ঝালর বাসদেবের মাথায় ঠেকিবে, কেহ কহিতেছেন সাদা গোলক লণ্ঠনের মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা বেল-লণ্ঠন দাও, কেহ পরামর্শ দিতেছেন আলতা গুলিয়া গেলাসে রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়, আবার কেহ সুনির্ম্মিত সোলার কান্দি কান্দি কলা, আঁসাঙ্কিত মৎস্য, নবরঙ্গ রঞ্জিত ফুল-ঝারা, তরবালহস্ত তালপেতে শিপাইশ্রেণী, নাট্যশালার চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে আলম্বিত করিতেছে। পূজার বাড়ী যেন প্রফুল্ল-মুখী কণের মত বড় সেজেছে। যথা প্রতিমার চালচিত্র ও কারিকরগণের তুলিকা চলিতেছে তথা হইতে যেখানে লণ্ঠন গেলাসে উড়কি প্রমাণ তৈল বণ্টন হইতেছে, সকল দেখিলাম। এ আমার কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি না কিন্তু প্রতিমানির্ম্মিতা মিস্ত্রি-জ্যেঠা কহিতেন যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত তদবধি বিসর্জ্জনের দিন পর্য্যন্ত আমি সুস্থির থাকিতাম না, কখন মিস্ত্রির অসাক্ষাতে গড়িতে যাইয়া ভাঙ্গিয়া রাখিতাম; কখন আমার তুলিতে চালচিত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কাজ বাড়াইয়া দিতাম; কখন বৃদ্ধ মিস্ত্রি, গুরুমহাশয়ের দুষ্টতানিবারণী ক্ষমতা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতেন ও যখন আমাদের উপদ্রবে তাঁহার তুলিকাচালনার নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিতেন "দত্তজা মহাশয় রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, প্রতিমা গঠন ও রঙ্গ ফলান হইতে যাত্রাদলের বাসায় যাইয়া পূর্ব্বাহ্নে সঙ্গের সংবাদ মনোযোগপূর্ব্বক সংগ্রহ করা এক বিশেষ কার্য্য ছিল, সতত ব্যস্ত সমস্ত থাকিতাম ও প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটী মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ উপস্থিত হইত; মনে হইত কাল না হয় পরশ্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তের লম্বা বেত দর্শন করিতে হইবেক। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, হাতছড়ি এ সকল অকথা কুকথার এখন সময় নহে।

সমারোহে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেন, তন্মধ্যে বাবুদ্বয়ের আদেশই প্রবল, সকলে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতেই শশব্যস্ত—ইহাদের মধ্যে একজন অমরেন্দ্রনাথ বড়বাবু আর একজন নরেন্দ্রনাথ ছোটবাবু মহাশয়। উভয়ের আকার প্রকার, কথাবর্ত্তা বেশভূষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্ হয় নাই, আলবার্ট ফেসনের নামও নাই, উভয় বাবুর মস্তকে দশ আনি ছয় আনি বাটওয়ারার টেরি কাটা হইয়া উজ্জ্বল কাল কেশরাশি উভয় কর্ণের উপর সাপ খেলান হইয়া ঝুলিতেছে, "গুয়া-থুপি" কেশগুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। গোঁফ যুগলও অনেক হেফাজতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম এক একটি বক্র মিহিরেখাতে শেষ হইয়াছে, তাল করিয়া

দেখিলে বোধ হয় বেল-আটা বা মম সংযুক্ত হইয়া ঘড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র রহিয়াছে। উভয়েরই যোড়া ভ্রূ, ভ্রূযুগলমধ্যে পূজার শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, গলায় মিহি তুলসিমাল্য তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ, একটি রক্তবর্ণ পলা ও দুইটি সোণার দানা গ্রন্থিত। চাদরখানি কুঞ্চিত, যেরূপ আলনাতে থাকে সেইরূপই বামস্কন্ধে দুলিতেছে। পূজার বাজার,—চৌড়া কাল কিনারা শোভিত মিহি ঢাকাই ধূতি উভয়ের অঙ্গলাবণ্য সংবর্দ্ধন করিতেছে, কোঁচার দিকটি ময়ূরপুচ্ছের মত গিলা কুঞ্চিত, কাছাটি রেশমি ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা ; উভয় বাবুই খালি ভূমে রুমাল পাড়িয়া বসিয়া আছেন, নিকটে এক একটী আঁকাবাঁকা কাল কাষ্ঠনির্ম্মিত যষ্টি রহিয়াছে, যষ্টির শিরোভাগে রৌপ্যনির্ম্মিত বাঘ মুখের অনুকরণ, সেই মুখে আবার হরিৎ প্রস্তর খচিত আঁখিদ্বয় জ্বলিতেছে। উভয় বাবুরই এক একটি পুঁতির নল সংযুক্ত ও রজতনির্ম্মিত কলিকা শিরাবরণভূষিত গুড়গুড়ি মকমলের কিংখাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও মুহুর্মুহু খাম্বিরা তামাক পরিবর্ত্তিত হইয়া ভুড় ভুড় শব্দ করিতেছে। জ্যেষ্ঠ বাবু মহাশয় যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানেই ধূমপুঞ্জ উড়াইতেছেন, তাঁহার কাছে কাহারও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যো নাই। কনিষ্ঠ বাবু মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে স্তম্ভপার্শ্বে যাইয়া ফরসির নল ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম সংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও রকম বরকম কমটান সটান শব্দে জ্যেষ্ঠ সোদরের কর্ণ সুখসম্পাদন করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন "ইহার অপেক্ষা সম্মুখে হইলে ভাল হয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চক্ষুলজ্জা উৎপত্তি হয়, নচেৎ সময়ে নময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ টান টানেন যে আমাদের জন্ত কিছুই থাকে না।" পারিষদের সহিত বাবুগণ এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেন, ও উৎসবের উদ্যোগের সহায়তা করিতেছেন। ভৃত্য, অনুচর যে আসিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইতেছে ও "বৈঠকখানায় জেও, পার্ব্বণী প্রস্তুত আছে" শুনিয়া সানন্দ হৃদয়ে বিদায় হইতেছে। উভয় বাবুই উদার, সকলের সমদুঃখগ্রাহী, লোকপালক, প্রিয়বাদী, ধনী, শ্রীমন্তের সন্তান তাহাতেই এত আদর। আমি বাবুগণের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিকটস্থ হইলাম। আমার বেশ ভূষা তাদৃশ পরিষ্কার ছিল না, বষ্ঠীর দিন পার্ব্বণী বস্ত্র বাহির করিয়া আমিও বাবু সাজিবার আশয়ে সুখী ছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন "ওরে সেই জটা এত বড় হয়েছে, আয়রে ভাই" কহিয়া হস্ত ধরিয়া নিকটে লইলেন। "শ্যামবর্ণের উপর জটায় কেমন শ্রী দেখ; "তুই বড়লোক হবি কিন্তু তোর পিতা তোরে ভালবাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় দিতেন," এই কথা কহিতে কহিতে যেন চমকিয়া উঠিয়া ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ওরে হঁকা লয়ে যা কর্ত্তামহাশয় আসিতেছেন।" এই কর্ত্তা মহাশয় কে? কর্ত্তা

শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘুতা অন্তরিত হইল, বৃথা কথা থামিল, সব স্বর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়মান। বাবু আশুতোষ রায় কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের পূজার বাটীতে আবির্ভাব, যেমন গৌরকান্তি তেমনি গম্ভীরভাব, তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র আমরা এক কোণে প্রস্থান করিয়া সুস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলাম ও ভাবিতে লাগিলাম, আমি ইঁহার মত বাবু হইতে পারিব না।

পাঠক! হেস না, আজ কাল বাবু হওয়া অতি সহজ কর্ম্ম; বোধ হয় তদপেক্ষা আর সহজ কর্ম্ম নাই; চুলে তেল দাও, তিন আনা মূল্যের কাঁকুয়ে টেরি কাট ও দশ আনা গজের কাল আল্পাকার চাপকান ঝুলাও। বাজারে সাইড-স্প্রিং সংযুক্ত চক্‌চকে পাদুকার অভাব কি? চীনেবাজারে দ্বাদশ আনা মূল্যের ফুলদার টুপি ক্রয় কর অভাব কি? আবার বাবু হইবারই বা ভাবনা কি? এখনও শামলা কিনিতে পার না, সোণার চেনের বাহার দিতে পার না? নাই পরিবে? বড়বাবু নাই বা হলে, কেরাণি বাবু হও, কনেষ্টবল বাবু হও, না হও—পাচকঠাকুর বাবু হও,—না হয় রেলওয়ে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ কর "টিকিট বাবু" "ডাক বাবু" "তার বাবু" "টোল বাবু" "পাইণ্টমেন বাবু" "ঘণ্টা বাবু" হও; নিতান্ত তা না হও কণ্ট্রাক্‌ট বা ঠিকার কার্য্য গ্রহণ কর, তাহাতে "শিলিপট বাবু" "ইট বাবু" না হয় "ঘুটিং বাবু" ও ত হইবেই হইবে?

কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্মা যে বাবু হইতে আকাঙ্ক্ষী সে বাবু এরূপ নহে—তখন বাবুর অন্য অর্থ ছিল। পাঠক! একবার চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সজ্জার কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজা ও তৎপ্রতিরূপ দুর্ভিক্ষের ফেমিনী রাজা, রঙ্গের গোলাম-বিনিন্দিত বড় দরবারের শস্ত্রভীত কানায়ে নাইট, বাহাদুরীহীন রায়বাহাদুর, ভূমি-শূন্য রাজা, রাজ্যশূন্য মহারাজা, এক পলের জন্য ভুল, বোধ হয় চিরকালের জন্য ভুলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। জটাধারী যে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন, সে ভদ্রের দৃষ্টান্ত স্থল, এখন বিরল, সেই বাবু সকল কেবল বেতন তালিকার গেজেটের বাবু নহেন, এক এক বৃহৎ দেশ সেই পূর্ব্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। সেই বাবুদের অন্তঃপুরের মহিলাগণ কেবল হীরার খেলনা, বা অলঙ্কারের বা বারাণসী শাটীর গর্ব্বে গর্ব্বিত হইতেন না, তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মে, ব্রত দানে, দেবালয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে পাগলিনীপ্রায়। আবার সেই বাবুগণ কেবল শ্বেত বস্ত্রে ও শুভ্র লম্বা কোঁচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাঁহাদের একদিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজনপ্রতিপালনই প্রধান ধর্ম্ম জানিতেন; যাহাদের দান ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন উপকথা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের সুনাম, দানের যশ ও সুখ্যাতির স্রোত সহস্র সহস্র দরিদ্র ও অতিথের মুখে মুখে বৃন্দাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত প্রবাহিত

হইত। সেইরূপ একটি বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোর মন বিচলিত হইয়াছিল—সেইরূপ রাজ্যধর ও রাজ্যপালনসক্ষম বাবুর কুল এখন লুপ্তপ্রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিসর্জ্জনের বাজনা

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিসর্জ্জনের বাজনায় নূতন কি আছে? পিতা পিতামহ, প্রপিতামহের সময় হইতে ঐ বাজনা একই ভাবে বাজিয়া আসিতেছে। বাদ্যকরের হাতের জোরও কম দেখি না, শানায়ের সুরেরও খর্ব্বতা নাই, সে গলা ধরিবার নহে, ঢোল কাঁশি বরং আজকাল শুনিতে বেশী খন্খনে বোধ হয়, কারণ আমরা সুমিষ্ট জয়-ঢাক ও বুগল শুনিতেছি। বাজনার সময় একবার শোকের আবির্ভাব হয়, মিত্রবিলাপ, বিচ্ছেদ ধ্বনি হৃদয় ধমনীকে বিলোড়িত করে, দুই একটি নিমজ্জিত প্রিয়তমের বিগত মলিন মুখশ্রীর ছায়ামাত্র স্মৃতিদর্পণে দেখা যায়। বিসর্জ্জনের বাজনা সাঙ্গ হইলে আমরাও দুই এক বিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করি কিন্তু দিনান্তে বাজনাও ভুলি শোকও ভুলি, ভুলিয়া আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকি ইহার নূতন কথা কি? নূতন কথা পুরাণ কথার বিস্মরণ, ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই বাজনার আনুষঙ্গী যাহা ছিল তাহা একবার মনে করে দিই, বোধ হয় তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উন্নতির প্রকৃত পরিমিতি নয়নগোচর হইবে।

ঐ শুন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে—গ্রামের ঈশানকোণে প্রান্তে উচ্চ জাঙ্গালের পদতলে একটী ক্ষুদ্র খালে শরতের জল খর খর চলিতেছে, খালটি আঁকা বাঁকা, একটি মোড়ে নব-দুর্গা-দহ, গম্ভীর ও প্রশস্ত, একদিকে উচ্চ বাঁধ অপর প্রান্তে বিস্তৃত তৃণময় হরিৎ প্রান্তর; নিকটবর্ত্তী পঞ্চক্রোশব্যাপী সপ্তগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক, আবালবৃদ্ধবণিতা ঐ প্রান্তরে মিলিত হইয়াছে; সকলের শিরোভূষণ স্বরূপ, প্রশস্ত প্রশান্ত অঙ্গশালী, গম্ভীরমূর্ত্তি আশুতোষ বাবু সসন্তান, আত্মীয় পারিষদ অনুগত সহ নবদুর্ব্বাদলশোভিত উচ্চ ভূমিশিরে দণ্ডায়মান; উপর্য্যুপরি পূজার তিন দিন প্রায় অনশনে যাপন করিয়াছেন, প্রত্যূষে সকলের অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রাত্রে সকলের শেষে সকল কার্য্য নির্ব্বাহান্তে ও পর দিবস প্রাতে যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হইবে তদুপদেশ প্রদান করিয়া শয্যায় গমন করিয়াছেন। কেবল কর্ম্মক্ষেত্রের আমোদে, অন্নদানে, মিষ্টান্নদানে, বস্ত্রদানে, পার্ব্বণী প্রদানে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক হইতে দিগম্বরী কাল মুচিনীর পর্য্যন্ত দুঃখ-হরণে তিন দিনরাত্র প্রায় অনিদ্রা অনাহারে যাপন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কোমল

শরীর ক্লান্তিশূন্য মুখশ্রী প্রসন্ন, সকল বিষয়েই সম উৎসাহী মর্ম্মান্তিক ভক্তি ও ধর্ম্মবলে বলবান। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে, সকলের দৃষ্টি হইতে এই মাত্র সজ্জিত প্রতিমাখানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল, জলে উর্ম্মি রেখা আর দেখা যাইতেছে না, গগনের রাঙ্গা রঙ্গ সেই জলে প্রতিবিম্বিত, যেন আরসি উপরে সিন্দুর বিন্দু ছড়ান হইয়াছে। ক্রমে গগন আঁধারে ঘোর হইতেছে, তথাপি জনতা কমিতেছে না, দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ ভদ্র অভদ্র, সকলেই একটি তামাসা দেখিতে ঠেলাঠেলি করিতেছে, ছড়ি বেত পশ্চিমে পদাতিক বাবাজিদের হস্ত হইতে দরিদ্রের পৃষ্ঠে পট্ পট্ পড়িতেছে, পড়ুক সহ্য হয়, তবু তামাসা দেখিব এই ভাবিয়া ঠেলিতেছে ভিড় আরও বাড়িতেছে। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে—গঙ্গাধর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্কন্ধে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে খেলা দেখিতেছেন। আজ কাল অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন এ আবার কিসের ভিড়? এ কিছু ইটালিয়ন অপেরা নহে, গিলবার্টের বাজি নহে, মমের পুত্তলের মত যুবতী মেমদলের বল বা নৃত্য নহে, বড় সাহেবের লেভি নহে, ছোট সাহেবের দরবার নহে, ইংরেজি ছায়াবাজি নহে, তবে ছাই কিসের ভিড়? নিগারদলের হট্টগোল! পাইক-দলের সর্দ্দার রঘুবীর রায় বাঁশ ঘুরাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িতেছে। ভিড় ঠেলিয়া দেখ তাহার কেমন অঙ্গসৌষ্টব, সে মিছরির বাতাসা খায় না, সোডা এসিডের নামও জানে না, পাচক সিরপ্ দেখিলে গোচোনা বলিয়া হাস্য করে, ব্যায়াম তাহার সালসা, ঐ খালের জলই তাহার হজমের আরক, কাহাকেও বিস্ফোটকের জ্বালায় অস্থির দেখিলে হাস্য করে ও কহে "আমার হইলে কুস্তির সময় একটিপে বসাইয়া দিতাম," সে ডিস্পেন্সরি ডাক্তারখানার ধার ধারেনা, বৈদ্যের নাম শুনিলে গালি দেয়—তথাপি তাহার শ্রী দেখ। বক্ষ-দেশ বিস্তৃত লোহার কপাট—হস্তপদ কুঁদে নির্ম্মিত গোল গোল মুদগর প্রায়; কেশরাশি প্রচুর আলুথালু, তাহার কপালে দুলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে আঁখি ঢাকিতেছে; সেই আঁখি রক্তবর্ণ, সেই কাল চুলের মধ্য দিয়া সিন্দুর মেঘের ন্যায় জ্বলিতেছে। রঘুবীর নাচিতেছে, লাফাইতেছে, চামর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাপরিবেষ্টিত একখানি বৃহৎ সুপক্ক তেল চক্চকে রায় বাঁশ ঘুরাইতেছে; তাহার উপযুক্ত তিনশত অনুচর ঢাল, তরবাল, বল্লাম, সড়কি, তীর, গদকা, রায়বাঁশ, লম্বা লম্বা বন্দুক হস্তে তাহার দিকে দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে সাবাস দিতেছে। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে—অপর গ্রামের আবার একজন খেলোয়ারের সর্দ্দার দুইশত অনুচরসহ খেলিতে আসিয়াছে। ইহাদের পাঁচ সাত জন পালোয়ান পঞ্চু সরদারের সঙ্গে লাঠি চালাইতেছে, রঘুবীরকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দ্বাদশ জোয়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক বর্ষণ করিতেছে—কিন্তু রঘুবীরের

এক রায়বাঁশ ঘুরিতেছে, বন্ বন্ শব্দ হইতেছে, দর্শকের মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে বিপক্ষদলের লাঠি তাহার লোম মাত্র স্পর্শ করিতেও অক্ষম। অমরেন্দ্রনাথ বাবু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া স্কন্ধ হইতে চাদর লইয়া রঘুবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রঘুর আর খেলা আবশ্যক হইল না, শিরপা মাথায় বান্ধিয়া প্রণাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিয়া উঠিল—আবার তীরন্দাজ মুচিরাম সর্দ্দার রঙ্গভূমে প্রবিষ্ট হইল। নানাপ্রকার জঙ্গুলে ফল কচি বেল ডাল সেঁকুল পারিকুল দূরে জাঙ্গালের জঙ্গলের উপরিস্থিত হইল, মুচিরাম তিন চারিটী অনুচর সঙ্গে, সুসন্ধানে তির বন্ বন্ শব্দে দৌড়িল। ফলগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল, চারিদিক হইতে "জিও মুচে" শব্দ গগন ভেদ করিল। চতুষ্পাঠীর তর্কালঙ্কার মহাশয় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দন্তহীন ওষ্ঠে হাসিতে হাসিতে নিজ চরণের ধূলি সংগ্রহ করিয়া মুচিরামের কপাল ভরিয়া দিলেন, মুচিরাম চরিতার্থ জ্ঞানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার জোরে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিল—আবার খেলা বড় মাতিল। ময়দানে আর জায়গা হয় না, তামাসা দেখিবার আশায় কেহ বটবৃক্ষশাখে কেহ তালবৃক্ষের অর্দ্ধেক উঠিয়া স্কন্ধ ধরিয়া জড়াজড়ি করিয়া খেলা দেখিতেছে। গদকা লাঠি খেলান্তে মল্লযুদ্ধে মহীতল কাঁপিয়া উঠিল। তরবাল খেলা হইবার উদ্যোগে বড় দাড়ী গোলাম সর্দ্দার দারগা সাহেব কি হুকুম দিলেন সে খেলা আর হইল না।

অমরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই বিশেষ ব্যায়ামপটু ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে মল্লযোদ্ধাদের বিশেষ আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। নিয়ত প্রাতে বালকগণকে কেদারায় বসাইয়া এক হস্তে এক পায়া ধরিয়া শূন্যে উঠাইতেন; যে লোক এক হস্তে ঢেঁকি ঘুরাইয়া এক বিঘা অন্তরে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিত তাহাকে একসের কাঁচা ছোলা খাইতে দিতেন; যে দুই হস্তে আড়াই মণ করিয়া পাঁচমণ বস্তা উঠাইত সে একসের ময়দা পাইত; যে মাথা ঠুকিয়া বৃক্ষ হেলাইতে পারিত সে এক টাকা বক্সিস পাইত। যে পশ্চিমে পালোয়ানকে কুস্তিতে পরাভব করিত সে উভয় হস্তে রূপার বালা পাইত। তাঁহাদের উৎসাহে বীরত্বের উৎসাহ হইত। এখন সন্ধ্যাকাল—প্রায় নিশান্তে পর্য্যাপ্ত—হস্তী ঘোটক পতাকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পদাতিক সহ দাঁড়াইল। দুই একটি খেলার মাত্র সময় আছে। প্রথমতঃ নবমীপূজার বলীর মধ্যে একটি বুড় ছাগলের বৃহৎ কাটা-মুণ্ড দর্শক পাইকদলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, বলে যে পাইক তাহা দখল করিতে পারিবে মুণ্ডটী তারই হইবে, আবার একটী টাকা পুরস্কার পাইবে। পলে পলে মুণ্ডটী এক হাত হইতে অন্য হস্তে পতিত হইতে লাগিল, সমস্ত প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া আসিল, অনেকেরই মুষ্টিশক্তির পরীক্ষা হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে মুণ্ডটী লোমহীন হইল, ক্রমে

তাহা রঘুবীরেরই করগত হইলে, চারিদিক্ "রঘুর জয়! রঘুরই জয়" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলের অনুরোধে অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ অশ্বারোহী হইলেন। নদীজলে দুইটি বোতল নিক্ষিপ্ত হইল, কাল মুখদ্বয়ের গোল রেখামাত্র কাল সন্ধ্যা-জলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। দূর হইতে উভয় অশ্ব দৌড়িল, নদীস্রোতসহ সমান্তরালে দৌড়িতে দৌড়িতে দুটি বন্দুক ছুটিল, ধূমপুঞ্জসহ নদীবক্ষে ঠন্ ঠন্ শব্দ হইয়া বোতলাগ্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল—একটী পশ্চিমা সিপাহী কহিয়া উঠিল "বাহবা! বাহবা! খোদা খয়ের করে! খোদা খয়ের! যব সরদার এসা হ্যায় তব তাঁবেদার লোক কাহে নাহি খেলা শিখে?" আশুতোষ বাবুর প্রফুল্ল ওষ্ঠে তাড়িতের ক্ষীণ রেখার ন্যায় হাস্য ঈষৎ খেলিল।

মুহূর্ত্তে বাহ্যস্বর পরিবর্ত্তিত হইল। সমারোহে সুসজ্জিত অশ্ব, গজ পদাতিক, পতাকাশ্রেণীসহ শত শত রসদীপালোকে লোকস্রোত উৎসব শেষে বৈরাগ্যমনে গৃহাভিমুখে প্রবাহিত হইল, বৃক্ষশাখা হইতে স্থানে স্থানে ভীত পিককুল হুর হুর করিয়া উড়িয়া গেল; ক্রমে স্থূল জনস্রোত শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত হইয়া নানা পথে, অলি গলিতে দশ দিকে ছড়িয়া পড়িল ও ক্রমে বিলীন হইল। শত শত লোক আবার মিষ্টান্ন ও সিদ্ধি পানাশয়ে বাবুজীর গৃহাভিমুখে চলিল, অনেকে কহিতে লাগিল "আবার এক বৎসর বাঁচি ত দেখিব।"

পরদিবস গঙ্গাধরশর্ম্মা স্বহস্তে লাঠি তরবার প্রস্তুত করিয়া, নিজমুখে বাজনা বাজাইয়া সমবয়স্ক সঙ্গীসঙ্গে, বিসর্জ্জনের খেলা আরম্ভ করিলেন; সেই খেলার অভ্যাস অনেকদিন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা কারণবশতঃ গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র হইয়াছে আমরা সভ্য হইয়াছি। সতীরা পতিপূজা ত্যাগ করিয়াছেন, পুরুষ সকল স্ত্রীর অধীন হইয়াছে—আমরা তথাপি সভ্য হইতেছি, স্ত্রী পুরুষ "উচ্চ শিক্ষার" দোহাই দিয়া পুস্তক পড়িতে সক্ষম হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসিতেছে, তরিবত মণ্ডলের ছেলে পর্য্যন্ত তরিবত পাইতেছে, কালা জেলে মৎস্য ধরে না, নাইট স্কুলে এ-টেও দিতে শিখিয়াছে। আল্লা রাখী মুসলমানী, হেমলতা ব্রাহ্মণী, এক বেঞ্চে বসিয়া সুশিক্ষিত হইতেছে, ভবিষ্যতের একই বাঞ্ছা বৃদ্ধি করিতেছে। সাহসশিক্ষা গোঁয়ারের কার্য্য হইয়াছে, শস্ত্রশিক্ষা চোয়াড়ের ব্যবসা, পুস্তক রচনা শান্ত লোকের সার উদ্দেশ্য, সকলে আইন পড়, বাক্‌পটু হও এই সকল শিক্ষা হইতেছে, আর শিক্ষার আর উন্নতির বাকি কি? এদিকে বীরত্ব সম্বন্ধে বিসর্জ্জনের বাজনা উঠিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কোলাকোলি

বিসর্জ্জনান্তে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ! আশুতোষ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা এখন উৎসবরব-শূন্য। বাদ্যের সুরও আর এক রকম, চির প্রথানুসারে সন্ধ্যার পরে চণ্ডীবেদির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চৌকির এককোণে একটীমাত্র ক্ষীণ দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে বৃহৎ কক্ষের সীমান্তরের অন্ধকার মাত্র পরিদৃশ্যমান—ছবি কি ঝাড়ের বেলয়ারি ঝুল যেন শোকসূচক নীল বস্ত্রাবৃত ঘেটাটোপে আবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির রূপান্তর নাই—সমাজসুখে প্রকৃতির মুখ বিমল করে না—দশমীর চাঁদ সমান উজ্জ্বল তাহাতে আবার পূজার বাটীর শুভ্র বৃহৎ প্রাচীরচূড় দীপ্তিমান্। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ পরে বিসর্জ্জনের বাজনা থামিয়াছে, আশুতোষ রায় স্বজন সমভিব্যাহারে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর বেদি লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন পরে, অধিষ্ঠাতৃগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন, তর্কালঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকোলি আরম্ভ করিলেন। অশীতি বর্ষীয় গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্থির মস্তক নড় নড় করিতে করিতে আসিতেছেন, পলিতকেশ সিদ্ধান্ত মহাশয় একটী মাত্র জীর্ণ দন্তে হাসি প্রকাশ করিয়া বাহু প্রসার করিতেছেন এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী গিরিধারী, গোপাল, ভূপাল বালকগণকে আশুতোষ বাবু সমসমাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন—গঙ্গাধরও একবার বড়লোকের অঙ্গস্পর্শনে আপনাকে বড়লোক জ্ঞান করিলেন। আবার আশুতোষ বাবু কাহারও দাড়ি চুম্বন করিতেছেন, কাহারও মস্তকে করপল্লব প্রদানে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যেন আত্মীয় স্বজন, ভৃত্যশ্রেণী, গ্রামস্থ, দেশস্থ, অধীন প্রজাপুঞ্জকে, তাবৎ দেশ তাবৎ পৃথিবীকেই প্রণয়পাশে পরিবদ্ধ করিতেছেন—সৌহার্দ্দ্যস্রোত চারিদিকে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে। শক্তিপূজান্তে এই প্রথাটি কেমন প্রীতিকর? সভ্যতার প্রভাবে এটিও কি পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথায় আমোদ আছে কিন্তু এই আমোদের বেলাভূমে যেন শোক উর্ম্মি স্মৃতিবায়ুতে উত্থিত হইয়া এক একবার প্রতিঘাত হইতেছে—আশুবাবু এক একবার কহিয়া উঠিতেছেন "আজ ঈশান কৈ? থাকিলে কত হাসি হাসাইত, গুরুদাস থাকিলে দশগণ্ডা মিঠাই উঠাইত, কৈলাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমোদ উঠিয়া গিয়াছে।" সিদ্ধান্ত কহিতেছেন "তপস্যার ফল—সব অন্ন ভোগীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।" আবার কেহ কহিতেছে "আমাদের এই কোলাকোলিই শেষ—আর বৎসর এ দিন দেখ্‌তে কি আর মহামায়া রাখবেন্।" অমনি সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে আবার এই সময়ে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কোন হতভাগ্যের জননীর ক্রন্দনধ্বনি হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে—"সবাই নেচে

খেলে বেড়াচ্চে কেবল আমার সেই নাই"—কেহ অধীরা হইয়া জগজ্জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমাকে কে দয়াময়ী বলে ?" এইরূপ আমোদে শোকে সংশ্লিষ্ট হইয়া কোলাকোলি ব্যাপার প্রায় শেষ হইল। আমি অন্তঃপুরদিকে মহিলাগণের নিকট আসিয়া দেখিলাম গ্রামের ভদ্রবংশের সমস্ত কুলনারীগণ একত্রিত—চাঁদের আলোকে একটী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছেন। সকলের চারু প্রতিমা অলঙ্কার ভূষণসহ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চাঁদের হাটের কেন্দ্র স্বরূপ রাঙ্গাঠাকুরুণ বিরাজিত অল্প বয়সে বৈধব্য শোকে তাঁহার রাঙ্গামুখের রাঙ্গা আভা যেন কিঞ্চিৎ পাণ্ডুর হইয়াছে, তবু শ্বেত বস্ত্রাবৃত মুখলাবণ্য চন্দ্রকিরণে যেন শ্বেত গোলাপের ন্যায় দেখা যাইতেছে, যেন শ্বেতকিরণ শ্বেতকুমুদে আকাশের চাঁদ মর্ত্তের চাঁদে মিলিত হইয়াছে। আমি মাতার কোলে উঠিলাম। রাঙ্গাঠাকুরুণ হেসে বলিলেন "উঠিল, এত বড় ছেলে আবার কোলে চড়ে ?" দাইমা কহিল "হউক চিরকাল চড়ুক।" জননী সস্নেহে চুম্বন করিলেন ও কহিলেন "ওমা আমার হৃদের গোপাল—খোকা বৈকি ?" আবার একটি নারী কহিল "রাম খোকা।" নারীনিকরমধ্যে একটি মাতৃক্রোড়স্থ শিশু এই সময় কহিয়া উঠিল "মা আমি সটোর খোকা।" খোকার মা কহিলেন "কি মিষ্ট কথা আমার নীলমণির।" আমি নীলমণির দিকে দেখিলাম। নীলমণি একটী দ্বাদশ বৎসরের গৌরবর্ণ বালক কিন্তু খর্ব্ব অশিষ্ট মুখশ্রী মোটা মোটা ভোজা অঙ্গাবয়ব, পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি ও মূল্যবান্ স্বর্ণতারবিনির্ম্মিত রত্নখচিত ফুলদার কিনখাপের চাপকান, পীতবর্ণ সাটিনের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পপুঞ্জ সুশোভিত পায়জামা, তাহার নীচে গোলাপী রেসমী মোজাদ্বয়ের কিঞ্চিৎ অংশ দৃশ্যমান, পদদ্বয়ের অগ্রভাগে জরির পাদুকা শোভমান। এ দিকে আবার চাপকানের উপর বক্ষঃদেশে স্থূল সুবর্ণনির্ম্মিত হীরাকাটা চন্দ্রসূর্য্যের আভাপ্রকাশক তারাহার, তার উপর রামধনুপ্রভাসম কোমল কেরেপের জলতরঙ্গিনী ফিনফিনে উড়ানী; মস্তকে জাজ্বল্যমান জরির জারখ বরখ কারুকার্য্যপূর্ণ রত্নখচিত টুপি উভয় কর্ণে কুণ্ডল দোলায়মান, নাসাগ্রে দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ডিম্বাবয়ব মুক্তা ঝলমল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় নীলমণি কোন হঠাৎ অবতারের আহ্লাদে ছেলে! আমি কহিলাম "এস ভাই খেলা করি।" নীলমণির মাতা কহিলেন "বাছা বড় তরাসে, সেই প্রতিমা বের হবার পূর্ব্বে বন্দুকের শব্দ শুনে পর্য্যন্ত আমার কোল ছাড়ে নাই, বাজনার শব্দ শুনে কাণে আঙ্গুল দিয়ে চক্ষু মুদে ছিল, বাছা—এই এতক্ষণে বাজনা থেমেছে তবে বাছা চেয়েছে।" নীলমণির প্রতি আমি দেখিতেছিলাম এমন সময় আশুতোষ বাবুর কয়েকটি কথা আমার কাণে বাজিল "অমরেন্দ্রনাথ কোথায় ? অনুসন্ধান করিয়া একটী ভৃত্য আসিয়া কহিল যে কালিন্দী সরোবর ঘাটে সোপানে একক বসিয়াছিলেন। পরক্ষণেই অমরেন্দ্রনাথ

আগত হইলেন। তিনি সকলকে মর্য্যাদানুসারে প্রণাম করিলেন, নমস্কার করিলেন, কোলাকোলি করিলেন; কিন্তু অন্যমনস্ক, কোন বিষয়ে মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইল। যে সময়ে তিনি বিসর্জ্জনের ঘাটে গুলিতে বোতল ভাঙ্গেন সেই সময় একটী রত্ন দেখিয়াছিলেন দেখিয়াই আবার হারাইয়াছেন, আবার কেমন করে পাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন।

বোতল চূর্ণ হইলে, ঘোটক হইতে অবতরণ সময়ে খালের অপরকূলে জাঙ্গালের দিকে আমরেন্দ্রনাথ নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নব তৃণময় হেলান বাঁধ লোকাকীর্ণ, কেবল সর্ব্বোচ্চস্থানে একটী নব্য বনতমাল তলে দেখিলেন যে সুসজ্জিত পার্ব্বণী অলঙ্কার বেশভূষিতা কয়েকটি কামিনী দণ্ডায়মান; তন্মধ্যে একটী কুমুদ মুখ প্রস্ফুটিত; প্রায় কন্যাটী দ্বাদশ বর্ষ মাত্র উত্তীর্ণ, নীলাম্বরপরিবেষ্টিত তাহার সুন্দর মুখ সুনীল স্বচ্ছ সরোবরে কোমল শতদলস্বরূপ লাবণ্যময়। অমরেন্দ্রনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ সময়েই জাঙ্গাল হইতে লোক সঙ্কুল ছড়ান হইল সেই ভিড়ে তাঁহার রত্নটি মিশাইয়া গেল। সেটি কে? কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোন গৃহ উজ্জ্বল করিতে চলিল? আর কি তারে দেখিব? এমন সুললিত প্রেমময়ী স্বর্গীয় কনক কমল কি সমলবারি স্বরূপ দুঃখিজনগৃহে দুঃখ শয্যাশায়িনী হইবে? না রাজগৃহে রাজমহিষী হইয়া বিরাজ করিবে?

অমরেন্দ্রনাথ আজ মনশ্চাঞ্চল্য প্রথমে অনুভব করিলেন, বাল্য সুখ আজ বিচলিত হইল। সকলের সহিত বিসর্জ্জনান্তে কোলাকোলি ও অপর আমোদে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু প্লাবিত গঙ্গাবক্ষে স্রোত চলিতে চলিতে তাঁহার বাঞ্ছাবারি কোন নিগূঢ় আকর্ষণী গুণে জলচক্রে পাতিত হইতেছে মধ্যে মধ্যে সুগভীর হৃদয় খণিতে একটি মণি স্পর্শন জন্য পাক মারিতেছে ডুব দিতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

অহোরাত্র নিরম্বু একাদশীর উপবাস কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে উহা দৃষ্ট হয় না। তথায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরা ফলাহার করিয়া এ ব্রত করিয়া থাকেন। নিরম্বু উপবাস আদবে নাই এমন নহে; উহা বৎসরে কেবল এক দিবস মাত্র করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে। বিধবাদিগের একাদশীব্রত যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এ সংস্কার বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে একাদশীর উপবাস হিন্দুদিগের মধ্যে এক সাধারণ পুণ্য-ক্রিয়া। ইহাতে বিধবা কি সধবা, স্ত্রী কি পুরুষ সকলের সমান অধিকার। হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা বিধবাই হউক আর সধবাই হউক, যাহার ইচ্ছা, একাদশীব্রত করিয়া থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে বিধবারা একাদশীর উপবাস না করিলে, কেহ তজ্জন্য তাহাদিগকে দোষ দেয় না। যাঁহারা এ ব্রত করেন, পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্তই করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, (পেঁড়া প্রভৃতি) এবং পানিফল প্রভৃতি ফলাহার করিয়া থাকেন।

পঞ্জাব প্রদেশে একপ্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। উহার নাম "চাদর ডাল্‌না"। বর ও কন্যার উপর একখানা কাপড় ফেলিয়া দিয়া উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ বিবাহে বিবাহের সকল অনুষ্ঠান হয় না। বর ও কন্যাকে কাপড় দিয়া আবৃত করা এবং ধর্ম্মশালায় উপস্থিত লোকদিগকে কড়া প্রসাদ অর্থাৎ মোহন-ভোগ বিতরণ করা হয় মাত্র। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতিতে এ বিবাহ বৈধ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পরিবারে এ প্রকার বিবাহ হইলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। কেবল নিকৃষ্ট কুল বলিয়া গণ্য হইতে হয়; এবং কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করিবার অধিকার থাকে না। প্রধান নগর লাহোর ও অমৃতসরে এ প্রকার বিবাহের সংখ্যা অল্প। সেখানে কিছু বিচার অধিক। পল্লীগ্রামেই এরূপ বিবাহ অধিক ঘটিয়া থাকে। সীমান্ত প্রদেশের (Frontier) নিকট যাঁহারা বাস করেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের উদারতা অনেক অধিক।

উড়িষ্যা প্রদেশেও এক প্রকার বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। উহা কেবল দেবরের সহিত হইয়া থাকে। কিন্তু পঞ্জাবের "চাদর ডাল্‌না" বিবাহ যে কেবল দেবরের সহিতই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। স্বজাতীয় লোক হইলেই তাঁহার সহিত বিধবার বিবাহ হইতে পারে। এ বিবাহ আদালতে আইনসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

পঞ্জাবের একটি বিশেষ রীতি এই যে, সেখানে চারিবর্ণের মধ্যে অন্নের স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার নাই। শূদ্রে রন্ধন করিলে ব্রাহ্মণেরা তাহা অম্লানবদনে আহার করিয়া থাকেন। তবে যবনের স্পৃষ্ট অন্নজল তাঁহাদিগের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। "ভারতে একতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, লাহোরের বাজারে শূদ্রে মাংস রন্ধন করিয়া বিক্রয় করিতেছে, অতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণেও উহা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিতেছেন।

পঞ্জাবে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় এত অধিক নহে। পল্লীগ্রামে সর্ব্বদাই ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু লাহোর অমৃতসর প্রভৃতি নগরে বাল্যবিবাহ প্রথা অধিকতররূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

লাহোর নগর প্রকাণ্ড প্রাচীরপরিবেষ্টিত। কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও নগর সীমা বহুকাল হইতে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। উহার নাম "আনার কলি"। আনার শব্দের অর্থ দাড়িম্ব। "আনার কলি" অর্থাৎ দাড়িম্বের কলি। জাহাঙ্গীর বাদসাহের জনৈক বেগমের নামানুসারে উক্ত নগরাংশের নামকরণ হইয়াছিল। আনার কলি অতি সুন্দর স্থান। তথায় প্রশস্ত রাজপথ ও সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী বিদ্যমান।

কিন্তু প্রাচীরের মধ্যগত নগরাংশের ভাব অন্যরূপ। অধিকাংশ পথই এমন সঙ্কীর্ণ যে, পদব্রজে ভিন্ন শকট লইয়া গমন করিবার সুবিধা নাই। পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল সেই সঙ্কীর্ণ গলির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। গলির ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। পবনদেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই বুঝি নগর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সূর্য্যদেব অতি কষ্টে ও অতি অল্পকালের জন্যই স্থানে স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বারাণসী দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা অনেক পরিমাণে আমার বর্ণনার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যেমন রাজপথ, গৃহ গুলিও তদনুরূপ। এক একটী ঘর যেন এক একটী সিন্দুক। তন্মধ্যে কোন প্রকারে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিতে পারে মাত্র। জীবাত্মার এত বদ্ধভাব আর কোথাও নাই। নগরের

প্রাচীর, তৎপরে গৃহের প্রাচীর, তৎপরে দেহের প্রাচীর, এই প্রকার প্রাচীরের পর প্রাচীর বদ্ধ হইয়া জীবাত্মাকে বড়ই জড়সড় হইয়া বাস করিতে হয়।

প্রাচীরের বাহিরে মেখলার ন্যায় সমগ্র নগর পরিবেষ্টন করিয়া অতি রমণীয় উদ্যান শোভা পাইতেছে। নগর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইলে সেই উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মহানগর লণ্ডনের উপবন সকলের ন্যায় লাহোরের এই উদ্যানকে উহার শ্বাসনালী বলিলেও চলে। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সমাধি, রণজিৎ সিংহের সমাজ, ও সালিমাবাগ লাহোরে এই কয়েকটি স্থান বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। সালিমাবাগ অতি রমণীয় ও আশ্চর্য্য উদ্যান। উহা জাহাঙ্গীরের সৃষ্ট। এ প্রকার ত্রিতল উদ্যান আর কোথায় আছে কি না জানি না।

আজি আমরা শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিব, লিখিবার পূর্ব্বে একটি কথার মীমাংসা চাই। সেই কথাটি এই, শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিতের জন্য যে দুই-খানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। সেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসের সঙ্গে বিচার করিতেছেন, অথচ বেদব্যাস তাঁহার জন্মিবার হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নিতান্ত ভক্তি-অন্ধ লোক ভিন্ন এ সকল কথা কাহারও বিশ্বাস করিবার যো নাই। এরূপস্থলে কি করা উচিত? একদল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, সত্য বাছিয়া লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। আর একদল আছেন, তাঁহাদের মতে এরূপস্থলে কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমোক্ত মতের উত্তর এই যে, কোন্ ঘটনাটী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা স্থির করিয়া উঠা যায় না। অনেক সময়ে লেখক সকলই সত্য বিবেচনা করিয়া লিখেন। অনেক সময়ে ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত হইয়া গুরুদেব বা ধর্ম্মপ্রচারককে ঈশ্বরতুল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া লিখিয়া বসেন। সেস্থলে কোন্‌টী লেখকের স্বকপোলকল্পিত ও কোন্‌টিতে কত পরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য আছে স্থির করা যায় না। সুতরাং সত্য বাছিয়া লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগের চেষ্টা বিফল। আবার এইরূপ অর্দ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে কিছুমাত্র সত্য নাই, ইহা বলাও নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ। আমাদের মত এই যে, যখন শঙ্করবিজয়ের ন্যায় কোন অর্দ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমরা পাইব, আমরা এমত বিবেচনা করিব না যে উহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত জীবনচরিতের ন্যায় প্রকৃত ঘটনাসমূহ বিশেষরূপে বিচার করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা শঙ্করাচার্য্যের নিকটেও যাইব না। আমরা দেখিব, লেখকের মনে শঙ্করাচার্য্য বলিলে কিরূপ ভাব হইত অর্থাৎ তাঁহার মনে শঙ্করাচার্য্যের ideal কিরূপ। আবার যখন সেই গ্রন্থ তৎকালীন জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত দেখিব তখন জানিব গ্রন্থকারেরও যেরূপ ideal তৎকালীন লোকেরও তদ্রূপ। আমরা জানিব শঙ্করাচার্য্য যে ঐরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন ইহা এককালে অনেক

লোক বিশ্বাস করিত। গ্রন্থকার যতই শঙ্করাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী কালের লোক হইবেন ততই সে ideal যথার্থ বলিয়া মনে করিব।

এই মত অনুসারে আমরা শঙ্করবিজয় ও শঙ্করদিগ্বিজয় হইতে সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিব না। যেমনটী দেখিব, ঠিক তেমনটি লিখিব। দুই গ্রন্থে অনেক স্থানে মিল হয় না, তাহার দুই একটা দেখাইয়া দিব। প্রধানতঃ শঙ্করবিজয় আমাদের অবলম্বন।

শঙ্করবিজয়ের প্রথমেই আছে, একদিন নারদমুনি পৃথিবীতে নানারূপ অসদ্ধর্ম্মের প্রচার দেখিয়া; কাপালিক, ভৈরব, বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক প্রভৃতি নানা মতের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপ হইতেছে দেখিয়া, ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা নারদকে লইয়া, শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরামর্শ হইল, শিব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতার হইবেন। শিব আসিয়া চিদম্বর নামক দেশে আকাশলিঙ্গ নামক শিবমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন। সেখানে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্ব্বজ্ঞ নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী কামাক্ষী চিদম্বর পুরেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়া বিশিষ্টা নামে এক তনয়া লাভ করেন। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিশিষ্টা "আমার স্বামী বিশ্বজিৎ আর আকাশলিঙ্গ শিব দুই এক" এই ভাবনা করিয়া এক সন্তান লাভ করেন, সেই সন্তানই অদ্বৈত মতের গুরু শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্করদিগ্বিজয়ে অবতারের কথা কিছু অধিক। শিব বলিলেন আমি ত অবতার হইবই, আমার সঙ্গে আরও পাঁচজনের ত অবতার হওয়া চাই, তা কার্ত্তিক তুমি আগে ভট্টপাদ কুমারিলনামে অবতার হইয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, জৈমিনীর যে পূর্ব্বমীমাংসা আছে, তাহার টীকা কর। ইন্দ্র তুমি সুধন্বা নামে রাজা হইয়া ভট্টপাদের সহায়তা কর ও বৌদ্ধদিগের বিনাশ কর, বিষ্ণু ও শেষনাগ তোমরা সংকর্ষণ ও পতঞ্জলি হইয়া ও ব্রহ্মা মণ্ডনমিশ্ররূপ ধরিয়া ভট্টপাদের সহকারী হও। এক বাল্মীকি দেবতাদিগকে বিষ্ণুর দোসর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। আবার মাধবাচার্য্য কবি তাঁহাদিগকে আনাইলেন। সুধন্বা রাজা প্রথম বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিকমণ্ডলীতে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

> "মলিনৈশ্চের সংসর্গো নীচৈঃ কাককুলৈঃ পিক।
> শ্রুতিদূষক নির্হ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদাভবেঃ॥"

"হে কোকিল তোমার যদি শ্রুতিদূষক (বেদনিন্দক) শব্দকারী কাককুলের সহিত সংসর্গ না থাকিত তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে।" রাজা শীঘ্রই ভট্টপাদের শিষ্য হইলেন। বৌদ্ধেরা প্রতিপদে অপদস্থ হইতে লাগিল। শেষ এই বন্দোবস্ত হইল যে, ভট্টপাদ ও বৌদ্ধেরা একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে পড়িতে

হইবে, যে বাঁচিবে তাহারই মত সত্য। ভট্টপাদ পড়িলেন, বাঁচিয়া রহিলেন। বৌদ্ধেরা পড়িয়া মরিয়া গেল।*

শঙ্করের বংশাবলী সম্বন্ধে দুই গ্রন্থে বিশেষ গোলযোগ। দিগ্বিজয় বলেন, কেরল দেশে পূর্ণানদীর পুণ্য তটে বৃষাদ্রি নামক স্থানে মহাদেব অধিষ্ঠান করিয়া একজন রাজাকে স্বপ্ন দিলেন; সে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। সেই রাজার অধীনস্থ ব্রাহ্মণদিগের কালটি নামে একজন প্রধান ছিলেন, কালটীর অধীনে বিদ্যানিবাস নামে একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র শিবগুরুও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি প্রথমে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজীবন গুরুকুলে বাস করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে পিতামাতার দুঃখে কাতর হইয়া বিবাহ করিলেন, তিনি বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যান নাই। কন্যাই কন্যাযাত্র লইয়া বরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিল। এই নূতনতর বিবাহের ফল শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করবিজয়োক্তবংশাবলীর কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

গোবিন্দ ভগবৎপাদের নিকট শঙ্করাচার্য্য বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পঞ্চম বৎসরে বিদ্যারম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন। গুরুর আজ্ঞা লইয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ব্রহ্মাসনে উপবেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা অদ্বৈত মত। চৈতন্য একমাত্র সমস্ত জড়পদার্থের পরিচালক বা অধিষ্ঠাতা। অথচ দেখিতেছি সকল মনুষ্যই চৈতন্যবান্ অতএব সকল মনুষ্যের চৈতন্যই এক। অতএব ব্রহ্ম ও আমি এ দুইএ অভেদ। নৈয়ায়িকেরা যে জীবাত্মা বলিয়া এক জাতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন সেটুকু সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, যখন সকল চৈতন্যই এক, তখন এ জীবাত্মগত চৈতন্য, ও পরমাত্মগতচৈতন্য এইরূপ প্রভেদই হইতে পারে। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশ ও বাক্স-মধ্যবর্ত্তী আকাশ এ দুইয়ে অভেদ আছে এইরূপ। কিন্তু জীব স্বতন্ত্র পদার্থ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা কদাপি সম্ভব নহে।

শঙ্করের পিতা শিবগুরু অনেক চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই কিন্তু শঙ্কর প্রথম বয়সেই সন্ন্যাসী হইলেন। সন্ন্যাসী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ব্যাসোক্ত বেদান্ত সূত্রের টীকা করিলেন। তৎপরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

দিগ্বিজয় শব্দে কি বুঝায় প্রাচীনলোক অনেকেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু একালের কেহই বুঝিবেন না। সেকেন্দর, তৈমুরলঙ্গ, জঙ্গিস যেমন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এ তেমন দিগ্বিজয় নহে। ইহাতে দিগ্বিজয়ীর সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ হয় না।

---

* আধুনিক পণ্ডিতগণকে এইরূপ পরীক্ষা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে ভাল হয় না? তাহা হইলে অনেক কুতর্ক মিটিয়া যায়। বং সং।

বরং যাহা থাকে, তাহাও দুরন্ত দায়াদেরা বেদখল করিয়া দেয়। প্রথম দিগ্বিজয়ের অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত, দ্বিতীয়টির অস্ত্র, কণ্ঠনিঃসৃত গালি-বালি-শাণিত উড়িয়াদিগের মত দ্রুত উচ্চারিত বচন-পরম্পরা। এরূপ বিদ্যা অস্ত্রে দিগ্বিজয় শুদ্ধ আমাদেরই দেশে ছিল। ইহার আদি জানা যায় না এবং আজিও "আমার ছেলে যেন দিগ্বিজয়ী হয়" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দিবানিশি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। সেকালে যেমন এক নাইট আর এক নাইটের নিকট "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইলে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত; সেইরূপ একজন পণ্ডিত আর একজনের নিকট "বিচার কর" বলিয়া দাঁড়াইলে যদি শেষোক্ত পণ্ডিত ইতস্ততঃ করিতেন, তখনি তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে অপদস্থ হইতেন। এইরূপ দিগ্বিজয় বহুকাল প্রচলিত ছিল, আজিও আছে। শঙ্করাচার্য্য সেই দিগ্বিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য।

তিনি চিদম্বরপুর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ, হস্তামলক, বিষ্ণুগুপ্ত, আনন্দগিরি প্রভৃতি শিষ্য সমভিব্যাহারে মধ্যার্জ্জুন নামকস্থানে উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর মধ্যার্জ্জুনেশ্বর শিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্ দ্বৈতবাদ সত্য না অদ্বৈতবাদ সত্য?" শিব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে তিনবার বলিলেন, "সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং?" তত্রত্য লোকদিগকে অদ্বৈতমতে আনিয়া শঙ্কর সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর শৈবদিগের এক প্রধান আড্ডা। সাত প্রকারের শিবোপাসক তাঁহার সহিত বিচারার্থ উপস্থিত হইল। শঙ্কর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক অনন্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তশয়ন বৈষ্ণবদিগের কেন্দ্রস্থান। সেখানে ছয়প্রকারের বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহারাও হারি মানিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। তাহার পর একদল কর্ম্মহীন বৈষ্ণবকে স্বীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া পনর দিন পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। সুব্রাহ্মণ্য স্থানে কুমারধারা নদীতটে তাঁহার বাসা হইল। সেখানে হিরণ্যগর্ভ অগ্নি ও সূর্য্য উপাসকদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিচার হয়। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের তিন সহস্র শিষ্য। শঙ্খঘণ্টা করতালাদি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া চামরাদি দ্বারা গুরুদেবকে ব্যজন করিতে করিতে শিষ্যগণ ক্রমাগত বায়ুকোণে যাত্রা করিতে লাগিল। কৌমুদী নদীতীরবর্ত্তী গণেশের মন্দিরে তাহারা একমাস বিশ্রাম করে। এই সময়েই পদ্মপাদাদি পাঁচজন প্রধান শিষ্য দিগ্‌গজ বলিয়া অভিহিত হন এবং এইখানে সকলে মিলিয়া মহাসমারোহে গুরুর স্তুতি করেন। ছয় প্রকার গণপতি উপাসক এইখানে স্বীয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করে। এখান হইতে ভবানীনগরে পৌঁছিয়া শঙ্করাচার্য্য দুর্গা, লক্ষ্মী,

শারদা উপাসক ও কতকগুলি বামাচারী শাক্তকে শিষ্য করিয়া লয়েন। বামাচারীদিগের বাস ঠিক ভবানীনগর নহে, তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়াছিল।

ভবানীনগর হইতে শঙ্করাচার্য্য উজ্জয়িনীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহুসংখ্যক কাপালিক ভৈরবোপাসক আসিয়া আচার্য্যকে কহিল, "তুমি অতি সৎপাত্র, কাপালিক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি কেন সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াও।" আচার্য্য কহিলেন, "পাজী মাতাল লম্পট তোর আবার ধর্ম্ম? আজ তোকে মারিয়াই ফেলিব।" বলিয়াই মার। কাপালিক গুরু মারি খাইয়া তিনবার হুঁ হুঁ হুঁ করিয়া শব্দ করিল; অমনি খড়্গ-কপাল-ঘণ্টা শূলপাণি দিগম্বর সংহার ভৈরব উপস্থিত। ভৈরব শঙ্করকে প্রণাম করিয়া কাপালিকগণকে শঙ্করের শিষ্য হইতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ইহার পর উন্মত্ত ভৈরব সংবাদ (বঙ্গ ৫ম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা) ও চার্ব্বাক এবং সৌগত, কাল, জৈন, বৌদ্ধমত নিরাকরণ। এই বৌদ্ধ মত প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে অনেক ভিন্ন। (২৮ অধ্যায় শং বিং) উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য অনুমল্ল, মরুন্ধ, মাগধ, ইন্দ্রপ্রস্থ, যমপ্রস্থপুরে গমন করত মল্লারিমত, বিষ্বক্‌সেনমত, মন্মথমত, কুবেরমত, ইন্দ্রমত, যমমত নিরাকরণ করতঃ গঙ্গাযমুনামধ্যবর্ত্তী প্রয়াগনগরে উপস্থিত হইয়া বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, উপাসক-দিগকে স্বদলাক্রান্ত করিয়া লইলেন। প্রয়াগে একজন শূন্যবাদী আসিয়া বলিল, "স্বামিন্ এ সকলি ফাক, সবই শূন্য আমার নাম নিরালম্ব, পিতার নাম কল্পিতরূপ মাতার নাম নির্ভরিতা। সবই শূন্য, ব্রহ্মও নাই।" আচার্য্য ইহাকেও নিজমতে আনয়ন করিলেন। প্রয়াগে বরাহমত, লোকমত, গুণমত, সাংখ্যমত, যোগমত এবং কাশীতে পীলুমত, কর্ম্মমত, চন্দ্রমত, গ্রহমত, কালব্রহ্মবাদী ক্ষপণকমত, পিতৃমত, শেষ ও গরুড়মত, সিদ্ধমত, গন্ধর্ব্বমত, তালবেতালমত খণ্ডন করেন। কাশীতে একদিন ভগবান্ মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া নিদিধ্যাসন করিতেছেন; এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি না ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছ? বল দেখি কোথায় অর্থ করিতে তোমায় বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে?" শঙ্কর বলিলেন "তুমি কোথায় ঠেকিয়াছ বল আমি অর্থ করিয়া দিই।" বৃদ্ধ বলিল "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং" এই সূত্রের অর্থ কি? দুইজনে দুইপ্রকার অর্থ করিলেন। কেহই ছাড়িবার পাত্র নহেন। এক কথায় দুই কথায় দুইজনেই মহাগরম। শঙ্করাচার্য্য বৃদ্ধের গালে এক চড়। চড় মারিয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন "বুড়াটার পাছুটা উপরপানে করিয়া ঝুলাইয়া দূর করিয়া দিয়া আইস।" বৃদ্ধ বেগতিক দেখিয়া আপনা হইতেই সরিয়া গেল। তখন পদ্মপাদ আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া কহিলেন।

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎব্যাসো নারায়ণঃস্বয়ং।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিংকরঃ কিংকরোম্যহং॥

তখন শঙ্কর অনেক করিয়া ব্যাসকে ফিরাইলেন। তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্যাস অদ্বৈতবাদের সর্ব্বত্র জয় হইবে ও ১শ বর্ষ পরমায়ু হইবে বলিয়া শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, কেদারলিঙ্গ নামক শিবদর্শন করিয়া শঙ্কর কুরুক্ষেত্র দিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শীতজলে স্নান করায় আচার্য্যের বড় কষ্ট হয়, এইজন্য নারায়ণ তাঁহার জন্য উষ্ণজলের নদী সেইখান দিয়া প্রবাহিত করিয়া দেন। তাহার পর আচার্য্য অযোধ্যা, গয়া, দ্বারিকা, জগন্নাথ ভ্রমণ করিলেন। রুদ্ধাখ্যপুরে ভট্টাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচয়। সে ব্রাহ্মণ উত্তরদেশ হইতে রুদ্ধাখ্যপুর অঞ্চলে আসিয়া বৌদ্ধদিগকে জয় করেন। তিনি তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন এবং অনেককে উদুখলে চূর্ণ করেন। শেষ জৈনাচার্য্যের নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ হওয়াতে মনে করিলেন "কি সর্ব্বনাশ জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে ত আমি গুরু বধ করিয়াছি।" এই ভাবিয়া বিজন প্রদেশে হোমাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। জানু পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিচারার্থ ভট্টাচার্য্যকে আহ্বান করিলেন। ভট্টাচার্য্য কতকগুলি গালি দিয়া বলিলেন "যদি এত কণ্ডুয়ন বাসনা হইয়া থাকে, আমার ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও। আমি মরিলাম, এই বলিয়া তিনি গতাসু হইলেন।"

মণ্ডনমিশ্র কর্ম্মকাণ্ডে অতি সুদক্ষ। তিনি জ্ঞানকাণ্ডাবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেষী। নিবাস হস্তিনাপুর হইতে অগ্নি কোণে, বিজিলবিন্দু নামক বিদ্যালয়ের অতি নিকটে, একটি বিস্তৃত তালবনে। তিনি এই সময়ে পুরদ্বার রোধ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে ছিলেন। স্বয়ং ব্যাস নারায়ণ মন্ত্রবলে আহূত হইয়া তথায় রহিয়াছেন। মণ্ডন-মিশ্রের অধ্যাপনার এমনি আশ্চর্য্য গুণ, যে, তাঁহার দাস দাসী সারিশুক পর্য্যন্ত বড় বড় সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারে।

শঙ্কর পুরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়াই মিশ্রঠাকুর চটিয়া লাল। ক্ষণেক বচসার পর ব্যাসের কথায় বন্দোবস্ত হইল, যে, আহারান্তে বিচার আরম্ভ হইবে, যিনি হারিবেন তিনি জেতার মত অবলম্বন করিবেন। সারসবাণী—মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী—মধ্যস্থ থাকিবেন। প্রত্যহ মিশ্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন কতদূর। শত দিন বিচার। শত দিনের দিন সারসবাণী বলিলেন, নাথ, চল ভিক্ষা করি গিয়া। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্ন্যাসী হইলেন। পতিব্রতা সারসবাণী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্ব্বেই স্বামী

জীবিত থাকিতে বিধবা হইতে হইল, দেখিয়া আকাশপথে ব্রহ্মলোক অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, সারসবাণী যাও কোথা, আমার কাছে তোমারও পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। সারসবাণী তথাস্তু বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্র আলাপ আরম্ভ করিলেন। শঙ্করের চক্ষুঃস্থির। শঙ্করাচার্য্য একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "মাতঃ আপনি ছয়মাস এই ভাবে থাকুন আমি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসি।" এই বলিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইতেছে। অমনি মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে রাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বদেহ রক্ষার্থ চারিজন শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। রাজদেহমধ্যবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য রাণীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। কিন্তু রাণী অতি চতুরা, রাজার আচার ব্যবহার তাঁহার কাছে ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কেমন একটুকু সন্দেহ হইল। তিনি হুকুম দিলেন "নিকটে কোথায় মৃতদেহ আছে খুঁজিয়া দাহ কর।" কর্ম্মচারীরা শঙ্করের দেহ দাহ করিতেছে। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে এমন সময়ে শঙ্কর রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ স্বদেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চিতা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। নৃসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাঁহার আরোগ্য সাধন করিলেন। শঙ্কর ত্বরান্বিত হইয়া সারসবাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সারসবাণী দেখিলেন অশ্লীল আলাপ হইবার সম্ভাবনা। আপনিই বলিলেন আমি পরাস্ত হইয়াছি।

এই বলিয়াই সারসবাণী ব্রহ্মলোক গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করাচার্য্য যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সারসবাণী স্বয়ং ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। শঙ্কর সরস্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। শৃঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে। সেখানে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলিলেন, তুমি এইখানে চিরকাল স্থির থাক। শৃঙ্গগিরিস্থ শিষ্যমণ্ডলীর নাম হইল ভারতীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে মূর্খ লোক ছিল না এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। কিন্তু এক্ষণকার ভারতীদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, অনেকে ভারতী লিখিতে ভারথি লিখিয়া থাকেন।

বিদ্যামঠে অনেকদিন বাস করিয়া পরমগুরু সুরেশ্বর নামে একজন শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভার দিয়া আবার স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। অহোবল নামক স্থানস্থিত নৃসিংহ উপাসকদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়া বৈকল্যাগিরি পার হইয়া কাঞ্চী নগরে উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চীনগরে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের নিকটে আচার্য্য শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামক নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করিলেন

এবং উপাসকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন। কাঞ্চীনগর ত্যাগ করিয়া বহুকাল গুহাবাসিনী বিদ্যাকামাক্ষী নাম্নী রুদ্রশক্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। নগর নির্ম্মাণের পর শ্রীচক্রনির্ম্মাণ। তান্ত্রিকদিগের নিকট চক্র অতি আদরণীয়। শ্রীচক্র নয়টি ক্ষেত্রে নির্ম্মিত। ত্রিকোণ চতুষ্কোণ অষ্টকোণ দশকোণ বিন্দু ইত্যাদি। বেদান্তিকেরা মনে করেন, এই নয়টী ক্ষেত্র প্রকারবিশেষে সংস্থাপন করিলে হরগৌরীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়। শ্রীচক্রনির্ম্মাণের পর মোক্ষধর্ম্মোপদেশ।

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শঙ্করাচার্য্যের মতই সর্ব্বত্র চলিত থাকিবে, কিন্তু অল্পদিনেই জানা গেল যে লোকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। আবার অনেকেই পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের মনে বড়ই আশঙ্কা হইল আবার বুঝি নানা অসৎ মতের প্রাবল্য হয়। তিনি নিজ শিষ্য পরমত কালানলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কলিতে লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই আমার অদ্বৈত মত কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই, অতএব তুমি অদ্বৈত ধর্ম্মের অবিরোধে শৈব মত প্রচার করত দিগ্বিজয় কর।" পরমত কালানল তাহাই করিলেন, এইরূপে আবার শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের সঙ্গে যোগ হইয়া চলিত হইল এবং এইভাবেই আজিও চলিয়া আসিতেছে।

কাঞ্চীনগরেই শঙ্করাচার্য্য অলীক দেহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময়ে বিলীন হন। শিষ্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি করিল।

এতদূরে শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত শেষ হইল। শঙ্করদিগ্বিজয়ের সঙ্গে উপযুক্ত জীবনী অনেক স্থানে মিলিবে না। না মিলিলেও এইটুকু পড়িয়াই বুঝা যাইবে যে শঙ্করাচার্য্য কি প্রকারের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনীর সার এই, তিনি একজন অতি বড় ভট্টাচার্য্য ও একজন প্রধান মোহন্ত এই দুইয়ের সমষ্টি।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"তুমি তবে কে? বিনোদিনী?"

যখন বিবাহ রাত্রে বিনোদিনী বিধুর সঙ্গে এয়ো ডাকিতে খিড়কির দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন সেইখানে রতিকান্ত প্রেরিত নৃশংসেরা অপেক্ষা করিতেছিল। বিধুকে এবং তার সঙ্গে একটী যুবতীকে দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হইল এবং বলপূর্ব্বক বিনোদিনীর মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। বিনোদিনী প্রথমতঃ অচেতন প্রায় হইয়াছিলেন; যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন এক নিবিড় বনমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া ছুটিতেছে। বিনোদিনীর প্রথমতঃ মনোমধ্যে ভয় সঞ্চার হইল, এবং দুষ্টেরা কি অভিপ্রায়ে এবং কোথায় তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই ব্যক্তি কানন মধ্যে এক মন্দিরের নিকট তাঁহাকে নামাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল। বিনোদিনী দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মধ্যস্থলে পাষাণময়ী এক কালী মূর্ত্তি, তৎসম্মুখে পিত্তলের ছেপায়ায় একটি শালগ্রামশীলা, তাঁহার সম্মুখে দুইখানি আসন, এবং তাহার পার্শ্বে একস্থানে একটি তাম্রপাত্রে কতকগুলি ফুল, চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে ও মন্দিরের এক পার্শ্বে দুই তিন ব্যক্তি বসিয়া আছে। তম্মধ্যে একজন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কতক কথা বলিতে পারিল কতক পারিল না। তাহার মর্ম্ম এই যে "তোমায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনাতে তুমি রাগ করিও না। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী না হইলে আমার এ জীবন বৃথা, এবং সেইজন্য তোমায় ধরিয়া আনিয়াছি। সে জন্য তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণে ক্ষমা কর—তোমার দাস আমি, আমায় বিয়ে কর। এ জীবন তোমায় দিলাম।" বিনোদিনী আস্তে আস্তে বক্তার প্রতি মুখ ফিরাইয়া

দেখিলেন যে, বক্তা শরৎকুমার। ভাবিলেন শরৎকুমার কবে পাগল হল—কই আমি ত শুনি নাই—বোধ হয় অনেকদিন হইতে সূচনা হইয়াছে—যখন বিষয় দান করিয়াছিল বোধ হয় সেই সময় হইতে। বিনোদিনীর মনে মনে বড় দুঃখ হইল, ভাবিলেন ইহাকে কোন কৌশলে বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "আচ্ছা তোমার জীবন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু বাড়ী গিয়া গ্রহণ করিব। এখানে গ্রহণ করিতে পারিব না, এস বাড়ী যাই।"

শ। বাড়ী গেলে কি আমার সহিত তোমার বিয়ে দিবে? আজ যে তোমার অন্যের সহিত বিয়ে হবে।

বি। সে আমার দিদির—কুমুদিনীর বিয়ে। এতক্ষণ হয় ত হয়ে গেছে।

এই কথায় শরৎকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন, "তুমি তবে কে? বিনোদিনী?"

বিনোদিনী বলিল, "হাঁ আমি বিনোদিনী। চিনিতে পারিতেছ না কি?"

বিনোদিনী তখন বুঝিল তাঁহাকে কুমুদিনী ভাবিয়া শরৎকুমার কথা কহিতেছিল—কেন না কুমুদিনীরই আজ বিয়ে। কুমুদিনীতে শরৎকুমার যে অতিশয় অনুরক্ত বিনোদিনী তখন এই পর্য্যন্ত বুঝিল, এবং তাঁহাকে কুমুদিনী ভাবিয়াই শরৎকুমার বিবাহ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু আর কিছুই ত বুঝিতে পারিল না। বলিল, তোমার পাগলামি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি বিনোদিনীকে কুমুদিনী ভাবিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছ, এইটুকু বুঝিতেছি। কিন্তু দিদিকে আজ তুমি ত ঘরে বসিয়া পাইতে। কোথায় বর সাজিয়া আমাদের বাড়ী গিয়া বিবাহ করিবে—না কোথায় ডাকাতি করিয়া আমাকে ধরিয়া আনিলে?"

শ। আমি তোমাকে ধরিতে পাঠাই নাই; কুমুদিনীকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম।

বি। তাই বা কেন? সেও ত তোমারই জন্য ছিল। ধড় পাকড় টানাটানি কেন?

শরৎকুমার অতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "সে যদি আমারই জন্য থাকিত তা হলে আমার এ অধঃপতন কেন?"

যে স্বরে শরৎকুমার এই কথা বলিলেন তাহাতে বিনোদিনীর অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল। বলিলেন, "তোমার অধঃপতন যে হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তুমি যে ঘরে বসে দিদিকে পাইতে না তাহা বুঝিতেছি না।"

শরৎকুমার উত্তর করিলেন না। অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে হঠাৎ বলিলেন, "বিনোদিনি, তোমার ভগিনীর মন কখন তুমি জানিতে পারিয়াছ?"

বি। পেরেছি—কেন?

শ। বল দেখি তবে কুমুদিনী কাহাকে বিবাহ করিলে সুখী হইবে?

বি। রজনীকান্তকে।

শ। সেই রজনীকান্ত আজ তাহাকে ঘরে বসে পাবে অথবা এতক্ষণ পাইয়াছে —আমি ত নয়।

এবার বিনোদিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে বিনোদিনী বলিল, "এখন আপনার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। আমায় আর আবশ্যক কি? আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দিন।"

শ। চল। আমার সহিত একা এই রাত্রিকালে যাইতে সঙ্কোচ করিবে না?

সরলা বিনোদিনী উত্তর করিল, "কেন? কি জন্য?"

শরৎ বলিল "তবে চল।" এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইতে বলিল। উভয়ে দাঁড়াইলেন, এবং দেখিলেন যে রতিকান্ত অতি দ্রুতপদে তাহাদিগের দিকে আসিতেছে, নিকটবর্ত্তী হইয়া শরৎকে বলিল "ভাই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ কর।"

শ। আমার মনস্কামনা কি প্রকারে সিদ্ধ হইল।

রতিকান্ত ভ্রূভঙ্গি করিয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "আমার সহিত অসৎ ব্যবহার করিবেন না। আমি উহার প্রতিশোধ করিতে জানি।"

শ। আমি ত কোন অসৎ ব্যবহার করি নাই—

রতিকান্ত অতিবেগে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল "তোমার সহিত কি কথা ছিল? কুমুদিনীকে ধরে এনে দিলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ তুমি তোমার সমুদায় বিষয় আমাকে দান করিবে। কই দানপত্র কৈ?" এই বলিয়া দানপত্র তাঁহার বসনের ভিতর বলপূর্ব্বক খুঁজিতে লাগিল, ইত্যবসরে শরৎকুমারের বসনচ্যুত হইয়া একখানি কাগজ পড়িল। রতিকান্ত কি শরৎকুমার তাহা দেখিতে পাইল না। বিনোদিনী তাহা দেখিতে পাইয়া পদদ্বারা চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রতিকান্ত ও শরৎকুমার উভয়ে ক্রোধে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত বলপূর্ব্বক দানপত্র কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত, শরৎকুমার উহা নিবারণ করিতে চেষ্টিত। বিনোদিনী এই অবকাশে কাগজখানি যত্নে অঞ্চলে বাঁধিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দ্রুত আসিয়া রতিকান্ত ও শরৎকুমারকে পৃথক্ করিয়া দিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদিনি কোথায়?" রতিকান্ত এবং শরৎকুমার আগন্তুককে রজনীকান্ত বলিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগের চিরশত্রু বিবেচনায় অতি বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রজনীকান্ত কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু শত্রুদিগের অপেক্ষা আপনাকে হীনবল দেখিয়া পশ্চাৎ হটিতে

লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু দূর আসিতে লাগিলেন, পশ্চাতে এক বৃহৎ গহ্বর ছিল তাহাতে ভগ্ন মন্দিরের ইট ও বন্যলতা ও কাঁটা ছিল; অন্ধকারে পশ্চাৎ হটিতে হটিতে ঐ গহ্বর মধ্যে পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন হইলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"আর একবার এসো"

যখন রজনীকান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন যে তিনি একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কুটীরে একখানি জীর্ণ তক্তপোষে শয়ন করিয়া আছেন। পূর্ব্বদিকের গবাক্ষ দিয়া উষার মুকুটজ্যোতিতে কুটীরের অন্ধকার অপেক্ষাকৃত অপনীত হইয়াছে, মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে, পশ্চিমদিকের গবাক্ষও মুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্য দিয়া এক বিস্তীর্ণ বহুজলপূর্ণ বিল দেখা যাইতেছে; জলচর বিহঙ্গমকুল নিঃশব্দে তাহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে। উষার সুমন্দ বায়ু সরসীরুহগণকে দোলাইয়া এবং বিস্তৃত তড়াগবক্ষে অস্ফুট অসংখ্য বীচিমালা প্রক্ষিপ্ত করিয়া গবাক্ষ দিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কুটীর মধ্যে নিঃশব্দ; যেন কেহ নাই। কেবল অপর পার্শ্বে একটি ইতর জাতীয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নিদ্রিত আছে, তাহার নাসিকাগর্জ্জন শুনা যাইতেছে। রজনীকান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক তাঁহার শিয়রে নীরবে বসিয়া তাহার অঙ্গের ক্ষত সকলে সাবধানে ঔষধি লেপন করিতেছে। রজনী পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। রমণী রজনীর উদ্যম দেখিয়া অতিমধুর এবং অস্ফুট স্বরে বলিল "স্থির থাক, চঞ্চল হইও না।" কিন্তু রজনী তাহা শুনিল না; সকলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখনি ক্ষত হইতে দরবিগলিত রক্তধারা পড়িতে লাগিল, এবং ক্রমে চেতনারহিত হইল। সেই দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় রজনীর অতিশয় জ্বর হইল, জ্বরে জ্ঞানশূন্য হইলেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার চৈতন্য হইতেছে এবং রমণীর প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন "বিনোদিনি! তুমি এখানে কেন? বাড়ী যাও।" এমত অবস্থায় একদিন এক রাত গেল। দ্বিতীয় দিনে অনেক দূর হইতে একটি কবিরাজ আসিল। কবিরাজ মহাশয় রজনীর নাড়ী টিপিবামাত্র মুখ গম্ভীর করিয়া এবং দুই ওষ্ঠ লম্বিত করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। যে রমণী রজনীর শিয়রে বসিয়া অনুদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল, তিনি উহা দেখিয়া ভয়সূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁগা বড় জ্বর কি?"

ভিষকের দৃষ্টি ভাল নহে এইজন্য কুটীর প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পায় নাই, এখন ভালরূপে দৃষ্টি করিতে লাগিল। দেখিল একটি স্ত্রীলোক নীলাম্বরে বালেন্দুর জ্যোতির ন্যায় কুটীর আলো করিয়া রহিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সেই ভুবনমোহিনী সুন্দরীকে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে তাঁহার ঠোঁট দুখানি আরও ঝুলিয়া পড়িল, গোল নয়নদ্বয় আরও গোল হইল, দন্ত পাটিদ্বয় পৃথক্ হইয়া গেল, এবং মুখগহ্বরের সৌন্দর্য্য নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইল। রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বড় জ্বর কি গা?" ভিষক্ উত্তর করিল "হাঁ জ্বর হইয়াছে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দরী চমকিত নেত্রে ভিষকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভিষক্ পুনরপি বলিল "জ্বর হইয়াছে মারা যাইবে আমিই মেরে দিব" সুন্দরী অতি কঠিন স্বরে বলিলেন "আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতেছি না।" ভিষক্ অতি তীব্র দৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না—কিন্তু যুবতীর বিরক্তিব্যঞ্জক ভঙ্গি দেখিয়া ভীত হইয়া উত্তর করিল "জ্বর হইয়াছে বটে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দরী কিছু বুঝিতে না পারিয়া কুটীর অধিকারিণী তারার মাকে কহিলেন "হাঁগা কেমন বৈদ্য আনিলে—কি কথা বলিতেছে।" তারার মা বলিল "ঠাকুরুণ ভয় পেওনা, যে জ্বর হইয়াছে, ও জ্বর মারা যাবে ঐ বদ্দি মেরে দিবে।" যুবতী তখন বুঝিতে পারিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। তৎপরে কবিরাজ গুটি কতক বড়ি দিয়া গেল। যুবতী সেই বড়ি সেবন করাইতে লাগিলেন; সে ঔষধে কিছু হইল না, জ্বর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবতী তাঁহার অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি তারার মার হাতে দিয়া বলিল, এদেশের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিরাজ, তাহাকে আন। সপ্তম দিবসের প্রাতে সেই কবিরাজ আসিল। আসিয়া, রজনীর নাড়ী টিপিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী ধরিয়া রহিলেন, কবিরাজের মুখ ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, অর্দ্ধঘণ্টা এই প্রকারে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "বিকার সম্পূর্ণ—অদ্য রাত্রে দুই প্রহরে জ্বর ত্যাগের সময় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, যদি সেই সময় সুধরাইয়া যান তবে বাঁচিলেন—ইতিমধ্যে তিনটি বড়ি খাওয়াইবেন—ইহাতে রক্ষা হইতে পারে। আমি পুনরায় বৈকালে আসিব।" এই বলিয়া কবিরাজ অন্তর্হিত হইল। কোন প্রকারে সে দিন কাটিল। রজনীকান্ত মধ্যে মধ্যে এক একবার নয়ন উন্মীলিত করিতেছেন আর যুবতীর প্রতি চাহিতেছেন, যেন কি বলিবেন আর বলিতে পারিতেছেন না। যুবতী আপনার উরুপরে তাঁহার মস্তক রাখিয়া অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করিতেছেন। যখন রজনীকান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার প্রতি চাহিতেছেন, যুবতীর অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এবং কাঁদিয়া উঠিতেছেন। ক্রমে দিনমণি অস্তে গেল—সন্ধ্যা হইল, যুবতীর যদি প্রাণ দিলেও

সূর্য্যদেবের গতি রহিত হইত তাহাও তিনি করিতেন—কিন্তু তাহা হইল না—সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন। সেই বিস্তৃত বিলের চতুঃপার্শ্বস্থ বনরাজির অগ্রভাগ সোণার বর্ণে রঞ্জিত হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইল, কোমল নীলাকাশে দুই একটি তারা উঠিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল—কিন্তু রাত্রিকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল—কুটীরাধিকারিণী তারার মা কোন মতেই রাত্রিতে রজনী-কান্তকে তাহার কুটীর মধ্যে মরিতে দিবে না। যুবতীকে বলিল "আমি দুঃখীলোক কাট কুড়াইয়া গুজরাণ করি আমার এই এক বৈ দুই কুঁড়ে নাই। এ কুঁড়ের মধ্যে যদি তোমার বাবু মরে তবে আমি কি আর ভূতের দৌরাত্ম্যে বাস করিতে পারবো—" যুবতী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "ওগো আমায় এ বিপদে নিরাশ্রয় করো না, তুমি আজ আমায় যদি আশ্রয় দাও তবে কাল তোমার এ কুঁড়ে কোটা করিয়া দিব।" যুবতীর অঙ্গে আর কোন আভরণ নাই দেখিয়া তারার মা সে কথা বিশ্বাস করিল না। অকাতরে তাহাদের বহিষ্কৃত করিল। তারার মার সাহায্যে যুবতী রজনীকে বুকে করিয়া কুটীরের সন্নিকটে সেই বিস্তৃত অন্ধকারময় বিলের ধারে একটী বৃক্ষমূলে একটী মাদুর পাতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয়ন করাইলেন। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া রজনীর জন্য যে গাত্রবসন কিনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা রজনীর দেহ আবৃত করিয়া তাহার মস্তক নিজক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, নিকটে একটি দীপালোক রাখিলেন। রাত্রি অধিক হইল, আজ রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না, কিন্তু নীলাম্বরে অসংখ্য তারা উঠিল, এবং বিলের স্বচ্ছবারিতে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। তথাচ গাঢ়, অনন্ত সর্ব্বা-বরণকারী, অন্ধকারে পৃথিবী আবৃত হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল সেই বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত বিলের জল নক্ষত্রালোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল আর উহার অপর পার্শ্বে বহুদূরে অন্ধকারময় বনরাজির মধ্য হইতে কোন কুটীরের দীপালোক প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সেই তড়াগকূলে, অন্ধকারে, নিরাশ্রয়ে, যুবতী রজনীকে ক্রোড়ে লইয়া একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেছেন অবিশ্রান্ত নয়নবারি পড়িতেছে, কত প্রকার রাত্রিচর হিংস্র জন্তু সেই স্থানে আসিতেছে এবং দূর হইতে কত প্রকার ভীষণ রব করিতেছে। বিলের মধ্য এবং চতুষ্পার্শ্ব হইতে কত প্রকার শব্দ হইতেছে, শিরোপরি বৃক্ষের ডালপালা নড়িতেছে; এবং ক্ষীণ দীপালোকে বৃক্ষতলে নানারঙ্গে খেলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই রমণী ভীতা হইতেছেন না। বিধাতা আজ যে ভয়ে তাঁহাকে ভীতা করিয়াছেন তাঁর কি আর কোন ভয় আছে? রমণী ঘন ঘন নাড়ী টিপিতেছেন, সাত দিন সাত রাত রজনীর নাড়ী টিপিয়া নাড়ী চিনিয়াছিলেন। নাড়ী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। গাত্রে হস্ত দিলেন, দেখিলেন, অনবরত ঘামিতেছে, কবিরাজ এক প্রকার ইংরেজি আরোক সেই সময়ে খাওয়াইতে দিয়া গিয়াছিল, তাহা খাওয়াইলেন, আবার

গায়ে হাত দিলেন। অবিশ্রান্ত ঘামিতেছে, রমণী ভাবিলেন আর কি? সময় উপস্থিত—কত রাত্রি হইয়াছে? একবার আকাশ পানে চাহিলেন। আজ আকাশে চাঁদ উঠে নাই—চারিদিক্ অন্ধকার—অন্ধকারে ভীমতরু সকল যেন যমদূতের ন্যায় রজনীকে রমণীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইবার মানসে দাঁড়াইয়া আছে। রমণী রজনীকে হৃদয়ে টিপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আজ হইতে আকাশে আর চাঁদ উঠিবে না—আর চাঁদ উঠিবে না, আর তারা জ্বলিবে না,—কেবল, অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার—চিরকাল অন্ধকার—হাঁ মা—অন্ধকারে কি মানুষ থাক্‌তে পারে? বলিতে বলিতে তাহার আর্ত্তনাদ বন্ধ হইল, রজনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে পাশ ফিরিলেন, এবং রমণীর হস্ত ধরিয়া অতি মৃদু-স্বরে বলিলেন "বিনোদিনি, ভয় কি? আমি মরিব না—আর ভয় নাই—তুমি অমন করে কেঁদো না—বড় তৃষ্ণা—" বিনোদিনী চকের জল মুছিয়া রজনীকে ক্রোড় হইতে উপাধানে রাখিয়া অল্প অল্প করিয়া তাহাকে দুদ খাওয়াইতে লাগিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে রজনী ভালরূপে কথা কহিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিনী, আমরা এখানে কেন?"

বি। তোমার কি কিছু মনে পড়ে না—বিবাহ রাত্রে তুমি যখন সেই বনে পড়িয়া অজ্ঞান হইলে, রতিকান্ত ও শরৎকুমার সেই অবস্থায় তোমাকে এবং সেই সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে এক নৌকায় তুলিল, এবং এক খাল দিয়া এই বিলে আসিয়া এই স্থানে উঠিল, এবং আমাদের বরাবর সঙ্গে লইয়া যাইত, কিন্তু উপরে উঠিয়া নিভৃতে শরৎকুমারকে আমি তাহার কৃত দানপত্র তাহাকে দিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলাম এমত সময়ে রতিকান্ত উহা দেখিতে পাইয়া কাড়িয়া লইবার মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে উভয়ে অদৃশ্য হইল, আর আসিল না, আমরা এই কুটীরে আশ্রয় লইলাম।

র। তোমার অলঙ্কার সকল কোথায়? বিনোদিনী কোন উত্তর করিল না—মস্তক নত করিয়া রহিল।

র। বুঝেছি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আমায় বাঁচাইয়াছ।

এই বলিতে বলিতে রজনীর চক্ষে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল। পুনরায় বলিলেন "সুবর্ণপুরে সংবাদ পাঠাও নাই কেন?"

বি। লোক পাই নাই, কুটীরবাসিনী তারার মা অনেক খুঁজিয়াছিল, তবু পায় নাই।

র। এখান হতে সুবর্ণপুর কত দূর?

বি। প্রায় এক দিনের পথ।

র। কাল [illegible]

বি। আসবে।

এই কথোপকথনের পর রজনী কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন, "বিনোদিনি, আমি এখন একটু ঘুমাই তাহাতে ভয় পাইও না। আমি ভাল হইয়াছি।"

এখন রজনী রক্ষা পাইয়াছে। এখন বিনোদিনীর সেরূপ দারুণ মনঃপীড়া নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর এক যন্ত্রণা উপস্থিত—সে যন্ত্রণা লজ্জা—লজ্জা এই যে, রজনীকে মৃতপ্রায় ভাবিয়া কত কথা বলিয়াছেন—কত আদর করিয়াছেন—রজনী ত তাহা শুনিয়াছে—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—লজ্জায় বিনোদিনী রজনীর শিয়র হইতে সরিয়া বসিলেন—লজ্জায় রজনীর নিদ্রিত মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন—আকাশ প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন—দেখিলেন পূর্ব্বদিকে একটি বড় উজ্জ্বল তারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—ভাবিলেন শুকতারা উঠিয়াছে—আর রাত নাই—এখনি ফরসা হবে, তিনি কেমন করে রজনীকে মুখ দেখাইবেন? কিঞ্চিৎ বিলম্বে পূর্ব্বদিক্ ফর্‌সা হইল, বিহঙ্গমকুল কলরব করিয়া উঠিল, বিলের বক্ষ হইতে অন্ধকার অন্তর্হিত হইল, দূরপ্রান্তে বনরাজি সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হইতে লাগিল, রজনীকান্তের নিদ্রা ভাঙ্গিল, তারার মা কুটীরের আগড় খুলিয়া তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল, এবং পুনরায় কুটীরমধ্যে যাইতে অনুরোধ করিল। অনুরোধের আবশ্যক ছিল না, আগড় খুলিবামাত্র বিনোদিনী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষে বিছানা করিলেন, এবং পরক্ষণেই রজনীকান্তকে সেইখানে লইয়া শয়ন করাইলেন। বেলা হইলে কবিরাজ আসিল, কবিরাজ রজনীকে বলিল আপনি নির্ব্যাধি হইয়াছেন। রজনী তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে সুবর্ণপুরে ত্বরায় তাঁহার অবস্থার সংবাদ পাঠান। কবিরাজ আগামী কল্যই সংবাদ পাঠাইবেন, স্বীকার করিয়া গেলেন। রজনী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ কুটীর মধ্যে থাকিতেন। একাকী থাকিতেন। বিনোদিনী আর তাঁহার শিয়রে বসিয়া থাকিত না। বিনোদিনীকে এক্ষণে দিনান্তে দুই তিনবার মাত্র দেখিতে পাইতেন। পথ্য দিবার সময়ে, এবং ঔষধি দিবার সময়ে। বিনোদিনী লজ্জায় আর তাঁহার নিকট আসিত না, সেই বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া আপনার চিন্তায় একাকিনী দিন যাপন করিত। বিনোদিনীর আর সে কেশবিন্যাস নাই, তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সকল গণ্ডদেশে পড়িয়াছে; সে কর্ণাভরণ নাই, কর্ণাভরণ কি কোন আভরণ নাই; বিধবার ন্যায় অলঙ্কার হীন—অতিদীন দুঃখীর ন্যায় পরিধানে মলিন এবং জীর্ণ বসন। আরোগ্য লাভের পর এইরূপ দুই তিন দিন গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় হরিনাথ বাবু অনেক দাসদাসী দুই তিনখান পাল্কি সহিত আসিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তাঁহারা সুবর্ণপুর যাত্রা করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে রজনী পূর্ব্ববৎ সবল হইয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার মনন করিলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে রজনীকান্তের নৌকা বসুন্ধরার ঘাটে লাগিল, তাহাতে দাসদাসী জিনিস পত্র সকল উঠিল, কেবল কুমুদিনী সকলের নিকট বিদায় হইয়া বিনোদিনীর নিকট গেলেন। ভগিনীদ্বয় গলা ধরাধরি করিয়া অনেক কাঁদিল, বিনোদিনী ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ খিড়কিদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। তৎপরে কুমুদিনী স্ত্রীলোকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে রজনীকান্ত বিদায় লইবার মানসে বিনোদিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। অতি ক্ষুণ্ণ মনে রজনী নৌকায় আসিলেন, দেখিলেন, স্ত্রীলোকগণ কুমুদিনীকে নৌকায় তুলিয়া দিতে আসিয়াছে। তন্মধ্যে বিনোদিনী নাই। নীরবে নৌকায় বসিয়া হরিনাথ বাবুর সৌধমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। হঠাৎ মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। দেখিলেন, সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর একটি স্ত্রীলোক আকাশপটে চিত্রবৎ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দেখিতেছে। রজনী অমনি নৌকা ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলেন, এবং মুহূর্ত্তেক মধ্যে সেই ছাদে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদিনী আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। বিনোদিনী পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, রজনীকান্ত। অমনি চক্ষুপর্য্যন্ত আবরণ করিয়া আধ ঘোমটা টানিলেন, এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। সফল হইলেন না। গিরিচ্যুত নির্ঝরিণীর রুদ্ধ বেগের ন্যায় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রন্দন উছলিয়া উঠিল। ঘোমটা টানিয়া কুলবধূর ন্যায় মুখাবরণ করিয়া রজনীকান্তের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া রজনীকান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর রজনী বলিল "বিনোদিনি, অনেক দিন আর দেখা হবে না, যাবার সময় আমার সঙ্গে একটা কথা কও।" বিনোদিনী উত্তরে কেবল মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিম্ন হইতে একজন চেঁচাইয়া বলিল, "রজনী বাবু শিগ্‌গির এস; বারবেলা হলো।" পুনঃপুনঃ সেই ব্যক্তি ডাকাতে রজনী বলিল "তবে আমি এখন যাই, তুমি ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না!" এই বলিয়া সেইস্থান হইতে রজনী চলিলেন। সিঁড়ির নিকট আসিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দিকে আসিতেছেন, যেন কি বলিবেন। রজনী দাঁড়াইল। বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার এস।"

রজনী। এলে তুমি ত আমার সঙ্গে দেখাও করিবে না, কথাও কহিবে না। এসে কি কর্‌বো?

বালিকাস্বভাব বিনোদিনী গদ্‌গদস্বরে বলিল "কথা কব, তুমি আর একবার এস।"

রজনী তদ্রূপ স্বরে উত্তর করিল, "তবে আস্‌বো।" এই বলিয়া দ্রুত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নৌকায় কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "অত অন্যমনস্ক কেন?" রজনী কহিলেন, "জানি না।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

"মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?"

"কই আমার মালা কই? আমার মালা? আমি যে কত দুঃখে গাঁথিলাম—আমি যে কত কষ্টে ফুল তুলিলাম—কত যত্নে একটি একটি করিয়া গাঁথিলাম—তাঁকে পরাইব বলে—কই আমার মালা—হাঁ মা—আমার মালা কি হলো?"

গভীর যামিনীতে হরিনাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত কক্ষে ষোড়শবর্ষীয়া একটি যুবতী, অতিশীর্ণ, অতিমলিন, শয্যায় মিশাইয়া জ্বরে এপাশ ওপাশ করিতেছে আর অতি মৃদু অথচ মধুরস্বরে প্রলাপ বাক্য বলিতেছে।

"হাঁ মা—আমার মালা?"

নিকটে একটী দীপ জ্বলিতেছে আর শয্যোপরে একটী অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক বসিয়া তাঁহার শুশ্রুষা করিতেছে আর এক একবার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে।

"হাঁ মা—আমার মালা কি হলো?"

অর্দ্ধবয়সী বলিল, "বিনোদিনি, কেন মা—এত বকিতেছ?" আবার কক্ষ নিস্তব্ধ হইল—বিনোদিনী চেতনরহিত হইলেন।

রজনীকান্তকে বিদায় দিয়া অবধি বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, প্রবল ঝটিকাপীড়িত অপরিস্ফুটিত গোলাপ কুসুমের ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগিলেন, সে রূপ, সে যৌবন, সে লাবণ্য, সে বসন্ত-পবন-মেঘ-খণ্ডবৎ গতি, সে সহৃদয়তা, সে উল্লাস সকলই লোপ হইল, কেবল সেই মাধুর্য্য, সেই ভুবনমোহিনী হাসি ছিল। বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ এবং শীর্ণ হইতে লাগিলেন, চতুর্থ মাসে শয্যাশায়ী হইলেন। কাস, এবং তৎসহিত জ্বর, এই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। অনেক ভাল ভাল চিকিৎসক দেখিল, কিন্তু সকলে একবাক্যে বলিল "শিবের অসাধ্য—রক্ষা নাই।"

অদ্য রাত্রিতে বিনোদিনীর বড় জ্বর—এ পাশ ও পাশ করিতেছেন আরও

এলোমেলো বকিতেছেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ—থাকিয়া আবার বলিলেন—"আর একবার এস, আমার মরবার আগে আর একবার এস—কথা কব—দেখা দিব—আমি কি আগে কথা কইতাম না? দেখা দিতাম না? কিন্তু এখন—এখন যে বড় লজ্জা করে—লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিব—আর কথা কইতে পারবো না।"

বিনোদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি বলিতেছ মা—কেন অত বকিতেছ, স্থির হও।"

বিনোদিনী আবার চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপে সে রাত কাটিল। পর দিবস প্রাতে জ্বর বিচ্ছেদ হইল। হর্ম্ম্যতলে অনেক গুলিন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, শয্যোপরে বিনোদিনীর মাতা বসিয়া আছে, বিছানায় বিনোদিনীর নিকটে একটী পাত্রে স্তূপাকার ফুল রহিয়াছে, গোলাপ, বেল, যুঁই, গন্ধরাজ, চামেলি নানাপ্রকার ফুল রহিয়াছে—যেন তাহারা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রিয়সখী বিনোদিনীকে দেখিতে আসিয়াছে, বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে সে কুসুমস্তূপ প্রতি চাহিতেছেন, এক একটি করিয়া পৃথক্ করিতেছেন, তৎপরে সূঁচ সূতা লইয়া শয়নাবস্থাতেই মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারিটি ফুল গাঁথিয়া আর পারিলেন না। হাত কাঁপিতে লাগিল, শরীর ঘামিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার অপরাজিতা—তাঁহার সমবয়স্কা এক যুবতী—আসিয়া তাঁহার নিকট বসিল, এবং বিনোদিনীর আদেশানুসারে সেই মালা গাঁথিল। মালা ছড়াটি বিনোদিনী কখন তাহার গলদেশে, কখন হৃদয়ে, কখন নাসিকারন্ধ্রের নিকট রাখিতে লাগিল। সেই সদ্যগ্রন্থিত পুষ্পমালা স্পর্শ করিয়া, তাহার ঘ্রাণ লইয়া বিনোদিনী অনেক দিনের পর সুখানুভব করিলেন, মনে মনে আশার উদ্দীপন হইল, ভাবিলেন "আমি মরিব না—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে এ অল্প বয়সে মরবো।" আবার ভাবিলেন, "না—ফুলটী ত না ফুটিতে ফুটিতেই গাছ থেকে শুকাইয়া যায়—আমিও ফুটিতে পাইলাম না।" আবার ভাবিলেন "কোন কোন ফুল তো শুকাইতে শুকাইতে আবার পরিস্ফুটিত হয়—কিন্তু তাহারা যে বাঁচে সে তাহাদের কোন ভালবাসার লোকের আদরে, যত্নে বাঁচে—আমায় কে বাঁচাবে? আমায় কে আদর করিবে? আর কাহার আদরেই বা বাঁচিব?—যে আমায় বাঁচাইতে পারে তিনি দেশান্তর—তিনি কি আমার পীড়া শুনিয়া দুঃখিত? কখন না? যদিই দুঃখিত হয়ে থাকেন—আচ্ছা—কুলীনের দুই মেয়ের কি এক বরের সহিত বিয়ে হয় না? হয় বই কি—কত! আচ্ছা আমার কি—" চক্ষু মুদিলেন। যে সুখ সকলের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটে, তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সেই আক্ষেপে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন। বেলা হইলে স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া গেল কেবল তাঁহার মাতা তাঁহার নিকট রহিল। বিনোদিনী বলিলেন, "মা সংবাদ পাঠাইয়াছ?" তাঁহার মাতা উত্তর করিল, "কোথায় পাঠাব মা?"

বি। রজ—দিদির কাছে।

মা। পাঠাইয়াছি।

বি। মা—কবিরাজের কথা মত আমি আর কত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিব।

তাঁহার মাতা কাঁদিয়া উত্তর করিল "কেন মা অমন কথা কহিতেছ? বালাই, বালাই—বাঁচিবে বই কি—কি হইয়াছে যে মরবে—"

বিনোদিনী আবার সেই ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া তাঁহার মাতার গলা জড়াইয়া বলিলেন "বালাই আমি মরিব কেন—মা—তুমি কেঁদোনা—মা কাঁদিস্ না।" এই বলিয়া উভয়ে গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নানা প্রকার মানসিক ক্লেশে উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনী মোহ গেলেন। সেই-দিন বিনোদিনীর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন।

দুই প্রহরের সময় বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?" তাঁহার প্রসূতি একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, "চুপ কর না মা, তোমার সে সকল কথায় কায কি।"

বিনোদিনী আবার সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "বল না মা, তাতে দোষ কি?"

এক বৃদ্ধা হর্ম্ম্যতলে বসিয়া তুলসীর মালা ঘুরাইতেছিল,—বিনোদিনীর মাতাকে চুপি চুপি বলিল, পরকালের কথা কহিতে দোষ কি? তৎপরে বিনোদিনীকে বলিল, "যারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে মরে, তারাই স্বর্গে যায়—আর সেখানে অক্ষয় সুখ পায়।"

বি। আচ্ছা, যাদের আমি বড় ভালবাসি—দেখিতে বড় সাধ করি, তাহার সঙ্গে কি সেখানে দেখা হয়?

প্রাচীনা। হয়।

বিনোদিনী ভাবিতে লাগিলেন, "তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—হে পরমেশ্বর তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—তা হলে তাঁর সহিত আমার দেখা হবে—চিরকাল দেখা হবে!" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা, সেখানে কি চিরকাল দেখা হয় গা?"

প্রাচীনা উত্তর করিলেন "চিরকাল।" বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন "তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—কিন্তু কেমন করে যাব—আমি ত কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করি নাই, কখন কোন ব্রতনেম করি নাই—কোন পূজা করি নাই—কোন তীর্থ করি নাই—কেবল একবার কাশী গিয়াছিলাম—আর একবার ত্রিবেণীতেও স্নান করিয়াছি—আর সকল যোগে গঙ্গাস্নান করিয়াছি—ও পুণ্যিপুকুর যমপুকুর ও সেঁজুতি করিয়াছিলাম—আচ্ছা, এতে কি স্বর্গে যেতে পারে না?" আবার ভাবিলেন "এই সকল কাজকে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে—আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে।" ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলেন। তার পর আর কথা কহিলেন না। সন্ধ্যার পর অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল, ক্ষণে ক্ষণে, মুহুর্মুহু সেই অন্তিমকালের নিকটবর্ত্তী

হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া রাত্রি হইল, বিনোদিনীর জ্বর আসিল, কিন্তু জ্বরে সেরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন না—নিঃশব্দে বিছানায় মিশাইয়া আছেন। আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন "একবার এলে হোত—দেখ্‌তে বড় সাধ হয়েছে।" আবার নীরব হইলেন। ক্ষণেক পরে হঠাৎ বালিস হইতে মাথা তুলিয়া যেন দূরনিঃসৃত কোন শব্দ শুনিতে লাগিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "মা, কে আস্‌চে?"

উ। কৈ কেহ না।

বিনোদিনী তাহা বিশ্বাস করিলেন না, সেইরূপ মাথা তুলিয়া শুনিতে লাগিলেন, জুতার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। বিনোদিনী তাহা শুনিয়া (কি জানি কিজন্য) অবিরত ঘামিতে লাগিলেন, অতি দুর্ব্বল হইলেন, যেন মোহ যান যান;—কিন্তু একদৃষ্টে দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে জুতার শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল এবং পরক্ষণেই কে কক্ষের দ্বার খুলিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে রজনীকান্ত বিনোদিনীর নিকট দাঁড়াইয়া—কিন্তু বিনোদিনী মুমূর্ষবৎ।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বিনোদিনী প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র আবার সেই লজ্জা আসিল, সেই চিরশত্রু লজ্জা নয়ন উন্মীলন করিতে নিষেধ করিল—রজনীর সঙ্গে কথা কহিতে নিষেধ করিল—বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, মুখ ঢাকিয়া, শয্যায় মিশাইয়া রহিলেন; কেবল নয়নের নিকটের অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া রজনীকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। এবার বিনোদিনীর সেরূপ ক্রন্দন নাই, বাহ্যিক চাঞ্চল্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই—স্থির হইয়া একদৃষ্টে রজনীকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনী বিনোদিনীর শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না—ধারার উপর ধারা পড়িতে লাগিল। জামাতার কান্না দেখিয়া, বিনোদিনীর মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। জামাতার সম্মুখে—এবং রোগিণীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে তিনি না পারিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

রজনী রোদন সম্বরণ করিয়া বিনোদিনীর কাছে বসিলেন। বিনোদিনী কাঁদিতেছিল—রজনী কাছে বসিল দেখিয়া প্রফুল্লমুখে হাসিল—উৎক্ষিপ্তনয়নে রজনীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সেই স্নেহময়, আহ্লাদবিস্ফারিত কটাক্ষ শেলের মত রজনীর বুকে বিঁধিল—তখন প্রকৃত কথার কিছু কিছু বুঝি রজনী বুঝিতে পারিলেন।

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিনি, কেমন আছ?"

বিনোদিনী অতি মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন বেশ আছি—তুমি কেমন আছ?"

রজনী কিছু উত্তর না করিয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদি কেমন আছে?"

র। ভাল আছে।

তার পর কথা বলিতে বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িল—বলিল, "দিদিকে বলিও, আমি মরিবার সময়ে দেবতার কাছে কামনা করিতেছি—দিদি যেন আমার মত সুখী হয়—আমি যেমন তোমার কোলে মরিলাম—দিদিও যেন তোমার কোলে তেমনি মরে।"

তখন রজনীকান্ত সকল বুঝিয়া, কপালে করাঘাত করিলেন।

বিনোদিনী তাহা দেখিলেন, রজনীর হাত ধরিলেন; বলিলেন, "ছি! অমন করিও না। দিদিকে ভালবাসিও—আমি যে তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিলাম, ইহা যেন দিদি কখনও না জানিতে পারে।"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পরকালে তুমি সুখী হইবে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "আজ আমাকে দেখা দিয়া, তুমি আমায় ইহকালে সুখী করিলে। আমি তোমায় দেখিয়া মরিলাম।"

এই বলিয়া বিনোদিনী নীরব হইল। অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি না মিলাইতে মিলাইতে বিনোদিনী রজনীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিল।

সমাপ্তঃ

পলিটিক্স

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কিজন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্স কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্স ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স সবজেক্টরূপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিক্সের চাপ কেন? আমি রাজা, না খোষামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোষামদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শনসম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরি টাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স নাই! এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্সবিকার শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন

অহিফেণপ্রসাদ প্রসন্নচিত্তে লোকের এই পলিটিক্সপ্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটা গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে—ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হপ্তায় হপ্তায়, রোজ রোজ, পলিটিক্স; কিন্তু বোবার বাঁকচাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুত গমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শন-লালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্সওয়ালারা! আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুর বাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। "জয় রাধেকৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই আমাদের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁশি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটা শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্রসর হইল; এক একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেণ প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স,—এই কুক্কুর ত পলিটীশ্যন! তখন মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুকুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকল এজিটেশ্যন সফল হইল; কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহসহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন

সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোররবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুরপানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটী bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—একমুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উলসি বা কার্ডিনেল দেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষকষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুল-সংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টি গোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহার নৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে ন্যাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে এও পলিটিক্স। দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যান আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম দাস বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।

দ্বিতীয় সংখ্যা

বিংশ অধ্যায়ে রুদ্রপীড়ের রণ। রণে রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাভূত করিলেন। দেবগণ স্বর্গদ্বার হইতে তাড়িত হইয়া ভগ্নোৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন—বৃত্র এবং বৃত্রপুত্র ইন্দ্রেতর দেবের অজেয়—অতএব ইন্দ্র যতদিন না আসেন, ততদিন রণক্লেশ বৃথা সহা।

হেন কালে শূন্তে ভৈরব নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে,—যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্ত দূর,
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্তেতে চায় ;

দেখে—ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল,
চির পরিচিত সুনীল তন্থ।

একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী, এবং ত্রিদেব ইহার অভিনেতৃগণ। রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণীর অপমানে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া বৃত্রবধের পরামর্শ জন্য ব্রহ্মার সদনে গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ :—

দেখিলা সে মহাশূন্তে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়,
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভাস্বর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া !
চারি দিকে।
ঘেরি সে মহামণ্ডল—কিরণ-পূরিত—
পার্শ্ব নিম্ন ঊর্দ্ধ দেশে অপূর্ব্ব মূরতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত !
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে

সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে,
কত দিকে, কত রূপে, কত শোভাময়
ভেদি সে ভানুমণ্ডল প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
সদৃশ বিস্তার—স্রোত-পারাবার ঘোর ;
তরঙ্গিত সদা,—ঘূর্ণ্যমান উর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার,
নির্ব্বাণ, নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতঃ উর্ম্মির সিন্ধু ; ঊর্দ্ধদেশে তার

বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী,
আবর্ত্ত ভিতরে কোটী আবর্ত্ত যেন বা!
জনমি তাহার মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত-তনু—কেন্দ্র আভাময়;
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে; দূরতর যত
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু মৃৎ পিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ-ভুবন মোহময়!

বিরাজে সে ঊর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে!
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে;
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে; বিধি পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতমালা জীবনমণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃরেখাঅঙ্গে পরকাশ।
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা মণ্ডলী; হেরেন হরসে
সৃষ্টির ললাম-শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণি দেহে স্নেহ-সুধাধার!

লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ভূত করিলেন; দুর্বধ স্পেন্সর তাহার বিচিত্র ব্যাখ্যা করিলেন। ঘৃণিত বঙ্গদেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধা সঞ্চিত করিলেন।

বন্ধা বিষ্ণুর কাছে গেলেন; এবং বিষ্ণু ও উমার সহিত কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। কৈলাসের ফুলবেঞ্চে হুকুম হইল যে অকালে বৃত্রের নিধন হউক।

দ্বাবিংশ স্বর্গের আরম্ভে;—

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুর-ভামিনী;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গ রহে যেন স্থির!

যেন চল চল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন!

ঐন্দ্রিলা একটু সোহাগ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাণী জিতিয়া গিয়াছে, সেই কালে গা জ্বলিতেছিল। বৃত্রাসুর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভাব কেন? মহিষী তখন দুঃখের কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। "শচী আমায় ন্যাতি মারিয়া, বৌ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।" অসুর বড় রাগিয়া উঠিল। তখন ঐন্দ্রিলা যথায় সুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী নির্ব্বিঘ্নে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহা দেখাইতে লইয়া গেল। বৃত্র দেখিতে অমরার প্রাচীরে উঠিলেন।

তখন দেবদৈত্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়াছে। রুদ্রপীড় অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়া, দেবসেনা বিমুখ করিতেছে। এমত সময়ে বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন।

দেখিল অসুর সুর প্রাচীর শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।
চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর-কুণ্ডল
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রশস্ত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা-পরশ।

বৃত্র পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত করিলেন ;

"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিল দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর
ক্ষণকাল নিবার এ সুর রথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।"

বৃত্রাসুর চলিয়া গেলে, রুদ্রপীড় সকল দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দেবরাজের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ, ত্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণারসে। রুদ্রপীড়ের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ হিংসাপূর্ণা ঐন্দ্রিলার তেজোগর্ব্ব অমর্ষসূচিত রোদন উভয়েই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল। আমরা এই কাব্যের প্রথমভাগ হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছি এজন্য, আমরা আরও উদ্ধৃত করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ঐন্দ্রিলাবিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিলে ঐন্দ্রিলার চরিত্রে সুসঙ্গতি স্পষ্টীকৃত হয় না :—

"কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী!
নহিলে সে দেখা'তাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?
জ্বালা'তাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালা'তাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর!
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা!"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজ-বামার
রুদ্রপীড়-রণ-সাজে ; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার!
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া!

এই ঘোর রণবাদ্যের সঙ্গে নারীহৃদয়ের মধুরনাদিনী বীণাতন্ত্রীও বাজে ;—

"কে হরিলা? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি?—হৃদয় মাণিক!
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার—
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড় মম!
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহার,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন! দৈত্যকুলমণি
দেখিব হে একবার! জীবন পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ!—এ জগত মাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর
'ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে'
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,

নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি এনে দেও সে ধন আমার।"
পুত্র শোকাতুর বৃত্র স্ফুরিত নাসিকা,
বিস্ফারিত-বক্ষস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
"সাজো রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।"

এই রণসজ্জা অতিশয় ভয়ঙ্করী। পরদিন সূর্য্যোদয়ে রণ হইবে—দানবপুরীতে সেই কালরজনীতে ভীষণ রণসজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল ধ্বংস হইবে। আমরা সেই ভয়ঙ্করী রণসজ্জার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—দুঃখ রহিল। কৃতান্তের কালছায়া আসিয়া সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে—গভীর মানসিক অন্ধকারে অসুরপুরী গাহমান হইয়াছে—কালসমুদ্র উদ্বেলনোন্মুখ দেখিয়া কূলস্থ জন্তুসমূহের ন্যায় অসুরপুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগামী বৃত্রসংহারের করাল ছায়া অসুরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গে বজ্রাঘাতে বৃত্রবধ এবং কাব্যসমাপ্তি। দেবদানবের আশ্চর্য্য রণ।

লহরে লহরে
ছুলিয়া, ভাঙিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার,
সাগর তরঙ্গ তুল্য বিপুল বিশাল
চলিল দনুজদল সেনানী চালনে।
দৈতধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকার!
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমক্ অস্ত্র' পরে;
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া!

উভয় দলের সমবেত সেনামধ্যে যখন ইন্দ্র রণসজ্জা করিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে সর্ব্বহাসিনী, সর্ব্বভাষিণী, সর্ব্বনাশিনী চপলা সুমেরু হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এতবলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্ল মতি; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন! ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ-বদনে বামা মুদিল নয়ন;
রাঙিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর।
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরেছে অপূর্ব্বমূর্ত্তি—বিধি-হরি-হর
তেজে নিত্য সচেতন! হেরিছে সঘনে
স্থিরসৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে!
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম; কহিলা "চপলে,
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুর-রণভূমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে,
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে; বিবাহ উৎসব
হবে পরে!" মাতলি আনিলা পুষ্পমালা
দিলা সুখে ইন্দ্র করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা বজ্রে সে কুসুমদাম।
স্বয়ম্বরা হইলা চপলা মনসুখে,
বরিল লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর সমর ক্ষেত্রে—বৃত্রবধ দিনে!

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এ বিবাহে বঙ্গদর্শন ঘটক। রূপ ও তেজের পরিণয়ে বঙ্গদর্শন চিরকাল ঘটকালি করে, আমরা বঙ্গদর্শনকে এই আশীর্ব্বাদই করি।

তুমুল সংগ্রাম বাধিল। বাসব ও জয়ন্তের পরাভবার্থ বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন—

ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে! হেনকালে, হায়,
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেতবাহ কৈলাসের পথে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে!
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে!
শূল ব্যর্থ দেখিয়া বৃত্র
ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ!
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্ণজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়!
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে!—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন! মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"

তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন।

ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ-অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে;
সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!

বজ্রাঘাতে বৃত্র প্রাণত্যাগ করিল।

(ক্রমশঃ)

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
  শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
  ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

২

সকলি যেতেছে—সকলি যাইবে
  এ জগত মাঝে রবে না কেহ
আশায় আনন্দ—নিরাশা বেদনা—
  ধুলাতে লুটাবে সোণার দেহ।

৩

এই যে তখন দেখিনু প্রভাতে
  রঞ্জিয়া গগন অপূর্ব্ব রাগে
উঠিল তপন সোণার বরণ
  সে চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে।

৪

কোথা সে উষার সুষমা এখন
  কোথা সে ললিত লোহিত বিভা,
দেখনা ভুবন ভরিছে আঁধারে
  নিশিতে বিলীন হতেছে দিবা।

৫

এই যে সে দিন হৃদয়মাঝারে
  রোপিলে যতনে আশার তরু
না ফলিতে ফল শুকাল পাদপ
  সে হৃদি এখন হইল মরু।

এই যে সে দিন খোদিলে কাননে
  সুন্দর সরসী সলিলে ভরা,—
নিদাঘ আইল শুকাল সলিল
  নীরস হইল সরস ধরা।

৭

ভালবেসে তারে প্রাণেরো অধিক
  সুখ আশে আমি সঁপিনু প্রাণ;
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে—
  এ হৃদি করিয়ে চির শ্মশান।

৮

ভেবেছিনু আমি সখার সহিত
  যাপিব যামিনী জাগিয়া থাকি
নিদ্রিত দেখিয়া গেল সে চলিয়া—
  জনমের মত দিলেক ফাঁকি!

৯

জাগ্রতের দুঃখ কহিব কাহারে
  যদি কভু পাই সখার দেখা
আর না ঘুমাব হয়ে অচেতন
  আর ত নারিবে করিতে একা।

১০

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
  শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
  ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

১১

ক্রমশঃ যেতেছে—ক্রমশঃ আসিছে
ক্রমশঃ ছুটিছে অণুতে অণু,
নূতন হতেছে পুরাতন ক্রমে
পুরাণ ধরিছে নূতন তনু।

১২

মেঘেতে মেঘেতে মিশায়ে যেতেছে
আলোকে আলোকে হ'তেছে লীন
সিন্ধুর সলিল শোষিছে তপন,
নিশি পাছে পাছে ছুটিছে দিন।

১৩

চির আবর্ত্তন—চির চঞ্চলতা
নাহিক বিরাম তিলেক তরে,
কেবলি ঘুরিছে—কেবলি ঝরিছে
দেখিলে প্রাণ যে কেমনি করে!

১৪

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

১৫

বহিছে সমীর ঝরিছে পল্লব
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিটপীতলে
অমনি ধরণী জগত জননী
ধরিছে টানিয়া কোমল কোলে।

১৬

দেখিতে দেখিতে হল স্তূপাকার
আর যে দেখিতে পরাণ কাঁদে,
অমনি করিয়া গিয়াছে ঝরিয়া
যত আশা মোর আছিল হৃদে।

১৭

অমনি করিয়া পড়িবে ঝরিয়া
রবি শশী তারা দেখিছ যত,—
অমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পড়িবে বিটপী-পত্রের মত।

১৮

অমনি করিয়া এ তনু আমার
পড়িবে ঝরিয়া পত্রের কাছে—
অমনি করিয়া খসিবে আমার
যত কিছু প্রিয় জগতে আছে!

১৯

বেলা গেল, রবি ডুবিছে ক্রমশঃ
কাল মেঘে কিবা করিয়া লাল
এখনি সে রাগ বিলীন হইবে
ঘেরিলে সন্ধ্যার তিমির জাল।

২০

এখনো নীরবে ঝরিছে পল্লব
কতই এখনও ঝরিবে আর,—
এ চির পতন না জানি কখন
কবে সমাপন হইবে তার!

২১

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ

পঞ্চম বর্ষ ঃ দ্বাদশ সংখ্যা

১। স্বপ্ন

১

নিশীথে শুইয়া, রজত পালঙ্কে
পুষ্পগন্ধি শির, রাখি রামা অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন, শিহরে সশঙ্কে
মহিষীর কোলে, শিহরে রায়।
চমকি সুন্দরী নৃপে জাগাইল
বলে প্রাণনাথ, এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে, যে না চমকিল
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

২

উঠিয়া নৃপতি কহে মৃদু বাণী
যে দেখিনু স্বপ্ন, শিহরে পরাণি,
স্বর্গীয় জননী চৌহানেররাণী
বক্তহস্তী তাঁরে মারিতে ধায়।
ভয়ে ভীত প্রাণ রাজেন্দ্রঘরণী
আমার নিকটে আসিল অমনি
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী
বক্তহস্তীশুণ্ডে প্রাণ বা যায়॥

৩

ধরি ভীম গদা মারি হস্তিতুণ্ডে,
না মানিল গদা, বাড়াইয়া শুণ্ডে,
জননীকে ধরি উঠাইল মুণ্ডে;
পাড়িয়া ভূমেতে বধিল প্রাণ।
কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি
কি আছে বিপদ কপালে না জানি
মত্তহস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ॥

৪

শুনিয়াছি নাকি তুরস্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্ত স্বপন নয়।
জননী রূপেতে বুঝিবা স্বদেশ;
বুঝি বা তুরস্ক মত্ত হস্তী বেশ,
বার বার বুঝি এই বার শেষ,
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়॥

৫

শুনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়—
জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥

পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জ রাজার কন্যা।

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,
আসে আসুক না নর বা অমর
কার সাধ্য তব শকতি সয় ?
পৃথ্বীরাজ সেনা অনন্ত মণ্ডল
পৃথ্বীরাজ ভুজে অবিজিত বল
অক্ষয় ও শিরে কিরীট কুণ্ডল
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয় ॥

৭

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি জয় জয় বলি
ভূষণে শিঞ্জিনী, নয়নে বিজলি
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ
নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি ॥

২। রণসজ্জা

১

রণসাজে সাজে চৌহানের বল,
অশ্ব গজ রথ পদাতির দল,
পতাকার রবে পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ।
ধূলিতে পূরিল গগন মণ্ডল
ধূলিতে পূরিল যমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ ॥

২

দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন—
খড়্গী বর্ম্মী চর্ম্মী ধানুকী ধীর।
মদবার * হতে আইল সমর †
আবু হতে এলো দুরন্ত প্রমর
সিন্ধু বারানসী প্রয়াগ ঈশ্বর ;
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর ॥

৩

গ্রীবা বাঁকাইয়া চলিল তুরঙ্গ
শুণ্ড আছাড়িয়া চলিল মাতঙ্গ
ধনু আস্ফালিয়া—শুনিতে আতঙ্ক—
দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতায়নে কনৌজনন্দিনী
দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী
ভারত ভরসা, ধরম রক্ষিণী—
ভাসিলা সুন্দরী নয়ন জলে ॥

৪

সহসা পশ্চাতে দেখিল স্বামীরে,
মুছিলা অঞ্চলে নয়নের নীরে,
যুড়ি দুই কর বলে "হেন বীরে
রণ সাজে আমি সাজাব আজ।"
পরাইল ধনী কবচকুণ্ডল
মুক্তার দাম বক্ষে ঝলমল
ঝলসিল রত্ন কীরিটি মণ্ডল
ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ ॥

৫

সাজাইয়া নাথে যোড় করি পাণি
ভারতের রাণী কহে মৃদু বাণী
"সুখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি
এ বাহিনীপতি, চলিলা রণে।
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী,
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী
মথিবে সে সিন্ধু নিয়ত প্রহারি
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে ॥

* মেবার। † সমরসিংহ।

৬

আমি অভাগিনী　জনমি কামিনী
অবরোধে আজি　রহিনু বন্দিনী
না হতে পেলাম　তোমার সঙ্গিনী,
　　অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে।
যবে পশি তুমি　সমর সাগরে
খেদাইবে দূরে　ঘোরির বানরে
না পাব দেখিতে,　দেখিবে ত পরে
　　তব বীরপনা! না রব কাছে॥

৭

সাধ প্রাণনাথ　সাধ নিজ কাজ
তুমি পৃথ্বীপতি　মহা মহারাজ
হানি শত্রু শিরে　বাসবের বাজ
　　ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু　হয়েন নির্দ্দয়
যদি হয় রণে　পাঠানের জয়
না আসিও ফিরে;—দেহ যেন রয়
　　রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রু রুধিরে॥

৮

কত সুখ প্রভু,　ভুঞ্জিলে জীবনে!
কি সাধ বা বাকি　এ তিন ভুবনে?
নয় গেল প্রাণ,　ধর্ম্মের কারণে?
　　চিরদিন রহে জীবন কার?
যুগে যুগে নাথ　ঘোষিবে সে যশ
গৌরবে পূরিত　হবে দিগ দশ
এ কান্ত শরীর　এ নব বয়স
　　স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার॥

৯

করিলাম পণ　শুনহে রাজন
নাশিয়া ঘোরীরে,　জিনি এই রণ
নাহি যতক্ষণ　কর আগমন,
　　না খাইব কিছু, না করি' পান।
জয় জয় বীর　জয় পৃথ্বীরাজ!
লভ পূর্ণ জয়　সমরেতে আজ
যুগে যুগে প্রভু　ঘোষিবে এ কাজ
　　হর হর শম্ভো কর কল্যাণ॥

১০

হর হর হর!　বম বম কালী!
বম বম বলি　রাজার দুলালি,
করতালি দিল—দিল করতালি
　　রাজ রাজপতি ফুল্ল হৃদয়।
ডাকে বামা জয়　জয় পৃথ্বীরাজ
জয় জয় জয়　জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয়　জয় পৃথ্বীরাজ
　　কর, দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয়॥

১১

প্রসারিয়া রাজা　মহা ভুজদ্বয়ে,
কমনীয় বপু,　ধরিল হৃদয়ে,
পড়ে অশ্রুধারা　চারি গণ্ড বয়ে,
　　চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে।
স্মরি ইষ্টদেবে　বাহিরিল বীর,
মহা গজপৃষ্ঠে　শোভিল শরীর
মহিষীর চক্ষে　বহে ঘন নীর;
　　কে জানে এতই জল নয়নে!

১২

লুটাইয়া পড়ি　ধরণীর তলে
তবু চন্দ্রাননী　জয় জয় বলে
জয় জয় বলে,—নয়নের জলে
　　জয় জয় কথা না পায় ঠাঁই।
কবি বলে মাতা　মিছে গাও জয়
কাঁদ যতক্ষণ　দেহে প্রাণ রয়,
ও কান্না রহিবে　এ ভারতময়
　　আজিও আমরা কাঁদি সবাই॥

৩। চিতারোহণ

১

কত দিন রাত পড়ে রহে রাণী
না খাইল অন্ন না খাইল পানি
কি হইল রণে কিছুই না জানি,
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে—
কেহ নারে কারে ফুটিয়া বলিতে,
হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয়॥

২

মহারবে যেন সাগর উছলে
উঠিল রোদন ভারত মণ্ডলে
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান।
আসিছে যবন সামাল সামাল!
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল?
পৃথ্বীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল,
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ॥

৩

ভূমি শয্যা ত্যাজি উঠে চন্দ্রাননী।
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি,
সম্মুখ সমরে বীর শিরোমণি
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে,
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া পূজিব প্রভুরে,
পুরাও রে সাধ; দুঃখ যাক দূরে
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে॥

৪

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে
সে নহে বিজিত; অপ্সরে কিন্নরে,
গাহিছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে জয় জয় বল,
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া চল
জলন্ত চিতায় প্রচণ্ড অনল,
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয়!

৫

চন্দনের কাষ্ঠ, এলো রাশি রাশি
কুসুমের হার যোগাইল দাসী
রতন ভূষণ কত পরে হাসি
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে।
আয় আয় সখি, চড়ি চিতানলে
কি হবে রহিয়ে ভারতমণ্ডলে?
আয় আয় সখি যাইব সকলে
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে॥

৬

আরোহিলা চিতা কামিনীর দল
চন্দনের কাষ্ঠে জ্বলিল অনল
সুগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল—
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে।
বলে সবে বল পৃথ্বীরাজ জয়
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচয়
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠ বাসে॥

৭

কবি বলে মাতঃ কি কাজ করিলে
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে॥
সেই চিতানল, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারত মণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে॥

জটাধারীর রোজনামচা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশুতোষ বাবুর কাছারি

আমাদের শ্রীনগরাধিপতি মহাত্মা আশুতোষ বাবুর নাম চিরপ্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল যখন তিনি প্রায় সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হন আপামর সকলে আপন আপন আয়ুর কিয়দংশ কাটিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য গ্রামের দেবমন্দিরে একত্র হইয়া কেন আরাধনা করিয়াছিল? দরিদ্রের কুটীর হইতে আমার জন্য—হে সমতাবাদী সুজন। তোমার জন্য এরূপ প্রার্থনা কেন না গগনে উঠে? আশুতোষ বাবু উচ্চতর রাজপুরুষদের নিকট তাদৃশ পরিচিত নহেন। সংবাদপত্রে, কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে বা বৎসরান্তে সাধারণ উপকারের কার্য্য তালিকায় নাম বাহির করিবার জন্য তাদৃশ অভিলাষী ছিলেন না। হয়ত অনেক সাহেব তাঁহার নামও শুনেন নাই; কিন্তু যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি কখন তাঁহাকে ভুলিবেন না, তাঁহার বাঙ্গালিজাতির উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রবীন সজ্জন ডাক্তার ইটওয়াল সাহেব, আশুতোষ বাবুকে আত্যন্তিক সম্মান করিতেন ও অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন কিন্তু সাহেব কখন তাঁহাকে নগরে যাইয়া কোন রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলে আশু-বাবু হাসিয়া কহিতেন "আমি ওমেদার নহি।" যদি ধনপুত্রে স্বচ্ছন্দতায়, বিস্তৃত রাজ্যখণ্ডের স্বামিত্বে, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা খনন, জাঙ্গাল নির্ম্মাণ, দেবালয় স্থাপন, দেবসেবা, অতিথিসেবা, ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে স্থাপনায়, যশকীর্ত্তির গৌরবে কাহাকেও সুখী করিতে পারে তবে বোধ হয় আশুতোষ বাবু মর্ত্ত্যে একজন নিতান্তই সুখী পুরুষ ছিলেন। যেমন একদিকে তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবী অনুকূল, প্রকৃতি সুন্দরীও তাঁহাকে সেইরূপ সুন্দরপ্রকৃতি দিয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক বা শারীরিক সৌকুমার্য্য অধিক সুন্দর এইরূপ বিতর্ক সতত উপস্থিত

হইত। একদিকে তাঁহার রাজীবলোচনের সুপ্রভা, হাস্যময় সুকুমার ওষ্ঠ, চম্পকপুষ্পের ন্যায় বিলোড়িত অঙ্গুলিনির্দ্দেশ আর একদিকে সুমধুর শোকনিবারণকারী সুবচন যখন তোমার হৃদয়কে শীতল করিত তখন নিজ অনুতাপ ভুলিয়া বিলক্ষণ বোধ হইত যে এই মহাজন যথার্থই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

সূর্য্যোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রতিদণ্ডেই প্রায় তাঁহার উদারতার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইত। সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই দেখ চারিদিক হইতে তাঁহার কপোতপাল পালে পালে উড়িয়া সূর্য্যের কিরণ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেছে; খর্ব্ব খর্ব্ব পাতিহংস, বৃহত্তরকায় লম্বগ্রীব রাজহংসগণ কাকলি রবে তাঁহার চরণ নিকটে আহার প্রার্থনা করিতেছে, দৈনিক সর্ষপ বা তণ্ডুল বিতরণ হইতেছে; ইহারা উদর পূরণ করিয়া চলিয়া গেল, বাবু মহাশয় বৈঠকখানায় স্বীয় আসনে বসিলেন, চারিপার্শ্বে কতকগুলি পিঞ্জরে শ্যামা, ময়না, শারিকা, হলুদগুঁড়ি, তুঁতি, মুরি, হীরামোহন, একটি চল্লিশ বৎসরের হরিৎ শিকাধারী কাকাতোয়া, বেষ্টন করিয়া বসিল। একটি বড় পিয়ালাপূর্ণ দুগ্ধ, কতকগুলি হিঙ্গুলে পুত্তলের মত সুশ্রী স্বর্ণালঙ্কৃত বালকবালিকা আসিয়া জুটিল। বাবু মহাশয় বেদানা ভাঙ্গিতেছেন, সাদরে শিশুদের মুখে প্রদান করিতেছেন। আবার একদিকে ক্ষুদ্র চামচে ভরিয়া পক্ষীর মুখেও দুগ্ধ দিতেছেন, পড়িতে কহিতেছেন, আবার মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যের উপদেশ দিয়া মন্ত্রী ভৃত্যবর্গকে পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে অতিথের একটি বৃহৎ ঝণ্ডি আসিয়া উপস্থিত, তাহাদের সহিত কতকগুলি টাট্টু, একটি উট, কতকগুলি তুরি ভেরী, শঙ্খ ও ছালা ছালা শালগ্রাম ও বিগ্রহ ছিল। অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ভেরী বাজিয়া উঠিল; শিশু সকল ভয় পাইয়া অন্তঃপুর দিকে পলায়ন করিল, কেহ ভেরীর সঙ্গে সঙ্গে আপন রোদনধ্বনি মিশাইল, ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য আশুতোষ বাবু একটী শিশুকে স্বক্রোড়ে লইলেন। এদিকে ঝণ্ডির সর্দ্দার বিভূতিভূষণ জটাধারী রুদ্রাক্ষমালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে দোল গুড়ের হাঁড়ির মত স্ফীত উদরে উচ্চরবে একটি আশীর্ব্বাদ বচনে ধনপুত্র স্বচ্ছন্দতা দান করিলেন, পরে কোন মহাপুরুষের ন্যায় হেলিতে দুলিতে, কোন সৈন্যদলের অধিনায়কের চালে চলিতে চলিতে, স্পর্দ্ধাসহকারে বাবু মহাশয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার জনৈক চেলা একটি রাঙ্গা বনাতের আসন পাড়িয়া দিল, আর একজন অনুচর দূর হইতে কহিয়া উঠিল। "সাধুকো চড়াও টাট্টু, খিলাও লাড্ডু।" ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অনুচর খাদস্বরে জলদতানে—"লাদ দেও, লাদায় দেও, লাদন হারা সঙ্গত দেও, বৃন্দাবন মে পৌঁছা দেও," কহিয়া উঠিল।

বাবু মহাশয় এসকল ভণ্ডামি বিলক্ষণ বুঝিতেন, হিন্দুধর্ম্মের কি সার

অসার সকলই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দশজন প্রতিপালনের জন্যই ভগবান্ একজন বড় লোকের সৃজন করিয়া থাকেন, তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল না, নেড়ানেড়ী বাউল দাসের উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না, বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রশংসা করিলে দুই একটি বৈষ্ণবী বারাঙ্গনার নাম উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মের গৌরব প্রমাণ করিতেন। সে যাহা হউক তিনি সাধুর সহিত বিতর্ক করিলেন, সাধুকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, তাঁহার নিকট ক্রোধনিবারণী ঔষধও ছিল। দুই ছিলিম গঞ্জিকা, কয়েকটী আফিঙ্গের বড়ি ও আহারোপযোগী ঘৃত ময়দা দান করিবার আদেশ দিয়া সাধু সর্দ্দারকে ঝণ্ডি সহ বিদায় করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন একটি ভদ্র প্রজা কাচা গলায় দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আশুতোষ বাবু কহিয়া উঠিলেন "কে বাপু পরিক্ষিত? কবিরাজকে যে পাঠাইয়াছিলাম কোন উপকার হইল না? তোমার পিতাকে বাঁচাইতে পারিল না? সংকার কেমন করে হল? কাল রাত্রে যে বড় বর্ষা হইয়াছিল, গোলা হইতে গোমস্তা গড়ে কাট দিয়াছিল কি না?" পরিক্ষিত উত্তর কি দিবে, কান্দিয়াই অস্থির হইল। বাবু মহাশয় আবার কহিলেন "ঐ সকলের পথ দুই দিন অগ্র পশ্চাত মাত্র। যদি সুসন্তান হও এখন শ্রাদ্ধাদির উপায় কর।"

প। শ্রাদ্ধের কর্ত্তা, মহাশয়।

কর্ত্তামহাশয় তখনি ভাণ্ডারিকে ডাকাইলেন, পরিক্ষিতের অবস্থানুযায়ী শ্রাদ্ধর সমস্ত উপকরণের তালিকা প্রস্তুত হইল, কোন হাম্বার হইতে ধান, কোন গোলা হইতে চাল, কোন উদ্যান হইতে উদ্ভিজ্জ তরুতরকারি, কোন মালের পুষ্করিণী হইতে মৎস লইবার অনুজ্ঞা দিলেন। আবার ভাগীদের আপত্তি আশঙ্কায় নিম্নস্বরে কহিলেন, "যদি আবশ্যক হয় রায় বাঁদের বায়ুকোণে সেই পুরাণ পাকুড় গাছটি কাটিয়া লইও, জ্বালানের সুসার হইবেক।" এই কথা শেষ না হইতেই সভাপতি তর্কালঙ্কার মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপকের সহিত বাবু মহাশয় সতত পরিহাসে অনুরক্ত। দেখিবা মাত্র কহিলেন "ইংরেজেরা অনেক ক্রিয়া রহিত করিতেছে, গঙ্গাসাগরে সন্তান সম্প্রদান করা বন্ধ করিল, সতীর আগুন খাওয়া উঠাইল, শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্বন্ধে একটি নিয়ম হইলে দরিদ্রেরা ব্রাহ্মণ গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়।" "মাসত্রয় মাত্র সেই রেমরায়ের" (মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম অধ্যাপক এই প্রকার উচ্চারণ করিতেন)—"মাসত্রয় রেমরায়ের পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন এখনও সেই কুমন্ত্রণা ভুলিলেন না?" অমনি জানুদেশে হস্তাঘাত করিতে করিতে "সব উচ্ছন্ন গেল!" বলিতে বলিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, ক্রোধভরে এক পা চালনা না করিতেই তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাবলীটি খসিয়া পড়িল। এ একটি কুলক্ষণ মনে করিয়া স্তব্ধ হইলেন। অমনি একটি

কর্ম্মচারী কহিয়া উঠিল "মহাশয় প্রস্থানের কর্ম্ম নয়—এ দিকে পলাইবেন ঐ দিকে ধরিবে ; ঐ দেখুন ইনকমটেক্সের পিয়াদা মহাশয়ের নামে বিজ্ঞাপন জারি করিতে আসিয়াছে"—কম্পিতকলেবর অধ্যাপক মহাশয় ইনকমটেক্সের নাম শুনিয়াই বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন "ব্যাপার কি ?"

কর্ম্মচারী বলিলেক "মহাশয়ের সম্বৎসরের আটচল্লিশ টাকা মাত্র কর ধার্য্য হইয়াছে—এই বিজ্ঞাপনটি লইয়া রাখিয়াছি—এই মোহর এই দস্তখৎ।"

ত। মোহর দস্তখত তোমরা দেখ, মুটিস আর আমি দেখিব না, এখন উপায় ? কর্ত্তা এই সম্মুখে। মহাশয় একখানি গ্রাম নিস্কর করিয়া দিলেন, সকলে জানিল, কথা রাষ্ট্র হইল, তাহাতে এই জ্বালা বাড়িল—কি বিপদ ! কোথা রাজা ব্রাহ্মণে দান দিবে, না দানের অংশ আতপ তণ্ডুল, কলা, মূল, কাঁচকলায় পর্য্যন্ত হস্ত নিক্ষেপ ! পিয়াদা কোথায় ?" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন "ভাল স্মরণ হয়েছে সে দিন চান্দ্রায়ণের পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা আমার প্রাপ্তি আছে। মহাশয় !" স্মরণ করিয়া দিবা মাত্র আশুতোষ বাবু আদেশ করিলেন। তর্কলঙ্কার মহাশয় পঞ্চ মুদ্রা পাইলেন, হস্তে লইলেন ও মস্তক হেলাইয়া কহিলেন পঞ্চ মুদ্রা পঞ্চ আনা "ষট শতাধিক সহস্রং কপর্দ্দক মূল্যম্" সঙ্গে সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয় একটী শিকি ও চারিটী পয়সা পাইলেন। শিকিটি আবার কর্ম্মচারীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "বাপু ! পিয়াদাকে এইটী দিয়ে বিজ্ঞাপনে রূপস লিখে দেও, অনুপস্থানকে রূপস বলনা তোমরা ? আমি শ্রীহরি বলিয়া প্রস্থান করি।" ইঙ্গিত মাত্রে এই সময় একটি সাজান পিয়াদা কহিয়া উঠিল "ও তর্কালঙ্কার মহাশয় রসিদ দিয়ে যান।" তর্কালঙ্কার পশ্চাতে অবলোকন করিলেন না দ্রুতগতি বৈঠকখানার পশ্চাতে যাইয়া করসংগ্রাহককে অভিসম্পাত দিয়া উদ্যান বনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দেখা কে পায় ?

এখন বিষয়কার্য্য আরম্ভ হইল। আশুবাবু পকেট বুক, মেমো কেশ, পেনশিল, হাতচিঠি, সংবাদ পত্রের কলম কাটা, সরকুলার হুকুমের স্লিপ রাখিতেন না, কিন্তু কার্য্য সময়ে বাল্মীকি, ব্যাস, পঞ্চতন্ত্র, নীতি, আনওয়ার সোহেলির কেস্‌সা, সাদির বয়েত, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতাবলী, তুলসী দাসের কহত, কবীরের দোঁহা, সময়ে সময়ে অনর্গল ব্যাখ্যা করিতেন, আবার রাজহাঁসের খাঁচার ভগ্ন দ্বার মেরামত হইয়াছে কি না তাহাও এক মুখে প্রশ্ন করিতেছেন। অপর মুহূর্ত্তে পার্লমেণ্ট সভায় আয়কর সম্বন্ধে মন্ত্রিগণের বক্তৃতার যে অনুবাদ ভাস্করপত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহা মুখে মুখে কহিয়া সকলের কৌতুক হরণ করিতেছেন—এমন সময় নিকটস্থ কনকপুর গ্রাম হইতে, একটী হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিল। তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে কুলনারীগণ নিজ নিজ গৃহে

বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, অন্নের হাঁড়ি অগ্নিস্পর্শ করে না, পথে লোক চলে না, ঘাটে জল নড়ে না—কেবল রাঙ্গা পাগড়ী মেহ্‌দী রঙ্গরঞ্জিত বৃহৎ বৃহৎ দাড়ি, রক্ত চক্ষুর নিম্নভাগে ঝোপের মত বড় গোঁফাল বরকন্দাজ দল গ্রামের তল-মাটি উপর করিতেছে। কনকপুর রঘুবীরের ঘর গ্রাম, রঘুবীর আপন স্ত্রী সোণা বাগ্‌দিনীকে কুচরিত্রা সন্দেহে বিলক্ষণ প্রহার করে, সোণা অভিমানে আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়াছিল, রঘু ভাগ্যক্রমে সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাঁচায়, এই দুটি কথা দারগা সাহেবের কর্ণগোচর হয়, এখন রঘু স্ত্রী সহিত অভিযুক্ত। প্রথমতঃ দারগা সাহেব একদাম খুনের অভিযোগ করেন, পরে রঘু ফেরার হইলে আত্মহত্যার উদ্যম জন্য তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালাইতেছেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ জন্য সমস্ত গ্রাম উৎসন্ন যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। সাক্ষী রাখিয়া কে আত্মহত্যার উদ্যোগ করে? কিন্তু সাক্ষী সংগ্রহ জন্য একদিকে রাজকর্ম্মচারিগণ যেমন তৎপর অন্যদিকে সমস্ত গ্রামস্থ লোক সর্দ্দারপুত্রকে রক্ষা করিতে যত্নবান্। কি হইবে, কে উদ্ধার করিবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া গ্রাম্যমতে যিনি ভবের ভাবনা ভাবিয়া থাকেন—আশুতোষ বাবুর নিকট গ্রামস্থ মুখ্য মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোণাই মণ্ডল সকলের অগ্রসর, স্থূলকায় খর্ব্বকলেবর মাথায় টাক—সোণাই মণ্ডলের কপালের মধ্য-ভাগে গোলাকৃতি একটী আধুলি প্রমাণ ধূলার দাগ, ব্রাহ্মণগণকে ঘন ঘন প্রণাম করিয়া তিনি পরমগৌরবে এই চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন—সোণার হস্তে কয়েকটি আম্রপত্র, ব্রাহ্মণ দেখিলে সেই পত্রে পদরেণু লইয়া নিজ ওষ্ঠে সম্প্রদান করেন কারণ এইরূপ ধূলা খাইয়াই তাঁহার শূলরোগ আরাম হইয়াছে। তাঁহার পশ্চাতে, রামুরায় ফৌজদারির গোমস্তা, লম্বাকৃতি, বক্রপৃষ্ঠ, অতিশয় টেরা চক্ষু ও উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় বক্রভাবে পাদুকার চর্ম্ম কাটিয়া বাহির হইয়া মিলিত—জুতা পরিবার বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। পায়ের গোড়ালি যেন হালি মেটে দেওয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে; ফাটা সমূহ মোমে ও ঘুঁটের ছাইয়ে আবদ্ধ, উপরে, জানুতল পর্য্যন্ত লোমরাজি ধূলায় ধূসর, উভয়ে পাদুকাদ্বয় ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন, ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইলেন। প্রকৃত ঘটনা ক্ষণমধ্যে আশুতোষ বাবুর কর্ণগোচর হইল, তাঁহাকে কথা অতি সহজ বোধ হইল। "ভ্রষ্টা স্ত্রী আত্মাভিমানে আত্মহত্যা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল?" আশুবাবু কহিলেন "এই কি বড় গুরুতর কথা, যদি গুরুতরই হয় সে জন্য দণ্ড দিতে এত ঔৎসুক্য কেন? 'আইন' 'আইন' করিয়াই সকলে ব্যস্ত হইতেছে।—যে আইনে যে পুলিসে একদিন সিঁধ চুরি বন্ধ হইল না, যাহারা আমাদের ধন মান ডাকাইত হস্ত হইতে ও বড় শাঁকোর লাঠিয়ালের লাঠি হইতে রক্ষা করিতে পারে না তাহারা আমাদের নিজের

প্রাণ নিজ হাত হইতে রক্ষা করিতে এত ব্যস্ত কেন?" সোণাই মণ্ডল খাদ স্বরে কহিয়া উঠিল—"বড় গম্ভীরের কথা—এই কথা শুনিবার আশায় এই আশ্রয়ে এই শ্রীচরণ তলে আমাদের এতদূর আগমন, এখন রক্ষা করুন।"

আশুতোষ বাবু কহিলেন "তোমাদের কথাগুলি দেওয়ানজী গজাননের নিকট যাইয়া কহ—নিষ্পত্তি জন্য তোমাদের মোকর্দ্দমা তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিলাম। তিনি দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তোমরা স্নান আহার কর, পরে আরাম করিয়া দেওয়ান্জির নিকট যাইবে, সকল কথার নিষ্পত্তি মুহূর্ত্তে হইবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেওয়ান্ গজানন চৌধুরী

গজাননের প্রকৃতির প্রকৃত বর্ণনার্থ দুষ্ট সরস্বতীর বর প্রার্থনা করি। কপটতা চাতুর্য্য তাঁহার শত্রুদমনের প্রবল অস্ত্র, বাক্পটুতা চাটুকারিতা, প্রিয়বাক্য, মাটীর মত অচলতা তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র। তাঁহার সত্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে একটী গল্প সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। শুনা যায় জাহ্নবীস্রোতে কয় নৌকা বিলাতী মিথ্যা কথা ভাসিয়া আসিয়াছিল, দেশের কয়েকটী লোকে তাহা ভাগাভাগি করিয়া লয়। ব্যবস্থাজীবী কেহ বাকি ছিলেন না, মোক্তার বলুন আরও উচ্চ লোক বলুন, গোমস্তা, কুঠিয়াল, মহাজন, সওদাগর অনেকে পড়িয়া কাড়াকাড়ি করেন; কেহ বেশি কেহ কম ভাগ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। গজানন তখন কার্য্যান্তরে অর্থাৎ একটি দলিল স্বহস্তে কাটকুট করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে পঁহুছিয়া দেখিলেন দেশের লোকের ভাগাভাগিতেই সব কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। গজানন হতাশ হইয়া, ব্যাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে বসিলেন, দেবীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন, ধরনা দিলেন—অবশেষে আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করায় জাহ্নবীদেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। দেবী কহিলেন "বাছা! মিথ্যাকথার ভাগ পাও নাই বলিয়া তুমি কাঁদিতেছ—তোমার ভাগে আবশ্যক? ষোল আনা রকম মিথ্যা তোমায় দিতেছি—অদ্যাবধি তুমি যাহা কহিবে মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। যা কহিবে তাহাই মিথ্যা হইবে।" সেই পর্য্যন্ত গজানন মিথ্যা রচনায় সম্পূর্ণ পটু হইলেন। কিন্তু এই অসরল লোক সরলস্বভাব আশুতোষ বাবুর নিকট অনেক দূর প্রতিপন্ন ছিলেন। ঋজুচিত্ত আশুতোষ সময়ে সময়ে গজাননের চক্রভেদ করিতে অশক্ত হইতেন বা অনাবশ্যক

বিবেচনা করিতেন; কারণ আশুতোষ বাবুর রাজ্যোন্নতিসাধন গজাননের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে উপায়ে হউক কার্য্য উদ্ধার করিতেন, কিন্তু আশু বাবু ফলমাত্র বিজ্ঞাত, উপায়চক্র গজাননের গভীর মনকূপেই বদ্ধ থাকিত। এ দিকে মোকর্দ্দমা গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে, কাঁচাইতে, পাখা দিতে, উড়াইতে দেওয়ানজি অদ্বিতীয় গুণাধার; সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, তাঁহার চক্ষে সব সমান, গোময় চন্দন সমানজ্ঞান। গজানন মিথ্যার মহাদেব! নয় শ উনন্নব্বয়ের তোড়াটী সহস্র টাকা পূর্ণ করাই তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য—ঐহিকের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল। যেমন ঔষধগুণে ফণাধারী সর্প নতশির, সেইরূপ গজাননের মন্ত্রে দম্ভশালী দারগা, ভীষণমুখ জমাদার সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী সমনত্র। ইঙ্গিত মাত্রে সোণাই মণ্ডল, ও রামু রায় সঙ্গে গজানন কনকপুরে উপস্থিত হইলেন। একটি স্বতন্ত্র গোলাবাটীর ঈশান কোণাংশে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বসিলেন। দুই দণ্ডের মধ্যে স্বয়ং দারগা সাহেব দাড়ি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে তথায় উপস্থিত ও ক্ষণকাল মধ্যে পরামর্শ, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ, অঙ্গুলি বিক্ষেপণের দ্বারা পরস্পর গাত্রে লিখন ও কাণাকাণি করিয়া কমিটীর কার্য্যারম্ভ ও মজলিস গরম হইল। রঘুবীর আর ফেরার নাই, পচা পুকুরের পাণি সেওলা লেপিত অঙ্গসহ রঘুবীর বৈঠকসম্মুখে করযোড় হইয়া বসিয়াছে, মধ্যে মধ্যে আসনের নিকটে তলব হইতেছে ও নিলামের ডাকের মত দারগার দাবি চড়িতেছে, বাড়িতেছে। দেওয়ানজি মহাশয়ের নিঃস্বার্থ মধ্যস্থলী। রঘুবীর জানিতেছে তিনি পরম শুভকারী, দারগা জানিতেছেন তিনি কেবল শতকরা দশ টাকা অংশের অংশী। এখন এক দুই, একশ রূপেয়া তিন—ডাক থামিল। রঘুবীরকে চঞ্চল দেখিয়া দেওয়ানজী কহিলেন "ডাক বন্ধ হইলে আর ফিরে? সরকারের হুকুম? বলে হাকিম ফিরে তবু হুকুম ফিরে না।" রঘুবীরের চক্ষু স্থির, তাহার কুঁড়ের চার কোণ খুঁজিলে ত এক কড়া কাণা কড়ি পাইবার যো নাই—কিন্তু এ দিকে টাকাতেই কলম চলে, টাকাতেই মুখ খুলে, টাকাতেই সত্য ঢাকে, মোকর্দ্দমা উড়ে, টাকা না হইলে রিপোর্ট কেমন করে খতম হয়? দেওয়ানজি রঘুবীরকে লইয়া আবার আর এক ঘরে উপস্থিত। "টাকার কি?" "ওরে টাকার কি?" "টাকা?" "টাকারে?" "ওরে টাকা?" এরূপ কয়েকটী গোল গোল কথাতেই রঘুবীরের মাথাটী টাকা টাকায় সম্পূর্ণ হইল, টাকা টাকা করিয়া ঘুরিতেছে বোধ হইল—কহিল "দেওয়ানজী মহাশয়, আপনি রাখুন দেওয়ানজী মহাশয়?" দেওয়ানজী কহিলেন "তোর কয় বিঘা জায়গির?"

রঘু। ৩২ বিঘা।

গজানন বলিলেন, তবে ভাবনা কি? আমিই টাকা দিচ্চি, আমার খাতায় লিখে পড়ে নিচ্চি, তুই একটা সৈ করে দে, আর না দিবিই বা কেন? আমি কি

পর? পর যে পর? তোর মিত্র না শত্রু? এক দিকে রঘুবীরের জায়গিরটে দেওয়ান্‌জির হস্তগত অন্যদিকে সে চির অনুসারী কৃতদাস হইল।

এই সময় আর একটি ব্যাঘাত উপস্থিত। দারগা সাহেব রিপোর্ট করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি একটা সংবাদ পাইয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল। রঘুবীরের বুড় শ্বশুর শঙ্কর সর্দ্দার বাঁকিয়া বসিয়াছে কন্যাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া "খুন" "খুন" করিতেছে, তাহার মাথায় খুন চড়িয়া গিয়াছে, পূজা করিয়া স্নিগ্ধ করিতে হইবেক, মন্ত্র বলে খুন ঝাড়িতে হইবে, তবে খুন নামিবে, না হইলে দারগা যাহা করুন সে খুন খুন করিয়া খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে উপস্থিত হইবেই হইবে। একজন পদাতিক আসিয়া এই সংবাদ কহিতে কহিতে আর একজন আসিল। দারগা কহিলেন "খবর কি?"

প। খবর! শঙ্কর সর্দ্দার জলপান বেঁধে নদী পার হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ কোলার মাঠ পাছু করলে।

দেওয়ানজি শঙ্করকে কখন দেখেন নাই। জিজ্ঞাসিলেন "লোকটা কেমন?"

প। কেমন? তালপাতের সিপাই, এক চক্ষু অন্ধ, উদরপীড়ায় বিব্রত কিন্তু কথার বড় আঁট, শির লোক হুজুর।

দে। উদর পীড়ায় বিব্রত! মার দিয়া। যখন বেদনায় কাতর হবে শর্ম্মার হাতে আস্‌বে—এই এল আর কি, এল—লাউসেন দত্তকে ডাক, আর উদরাময়ের পাক তেল এনে রাখ—তবে রে একজন দৌড়! ঔষধের নাম করে ফিরিয়ে আন। আর তাতে না আসে—দৌড়; পথে যেখানে পাবি ধরবি, বগলে দাবিয়ে ধরবি আর হাজির করবি—যা দৌড়—দেখবো ধরেচিস্‌ কি হাজির করেচিস্‌। হাজির করলি?

পদাতিক দৌড়িল. দারগা সাহেব ও দেওয়ান্‌জি পাশাপাশি করিয়া বসিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে আমাদের গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তও পৌঁছিলেন। তিনি কেবল শিক্ষক নহেন, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তাঁহাকে কেহ শুভঙ্কর জানিত, কেহ ধন্বন্তরি বলিত, লম্বাকার দত্তজ মহাশয় লতিয়ে লতিয়ে আসিলেন, গজাননের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইলেন, একপার্শ্বে বসিলেন। যেমন অপরাপর গৃহরাজিমধ্যে জগন্নাথের মন্দির, নগরের অট্টালিকামধ্যে নূতন পোষ্ট আফিস গৃহের চূড়া, তেমনি অপর লোকের মধ্যে দত্তজ মহাশয়ের পক্ক কেশসংযুক্ত উন্নত মস্তক; আর সকলের মস্তক তাঁহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে রহিল, দত্তজ মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে হইলে সকলকে আকাশের দিকে চাহিতে হইত। দত্তজ মহাশয় বসিবামাত্র উড়ানির এক কোণের একটি বড় পুঁটলি খুলিলেন, তাহাতে জড়িবড়ি খল নুড়ি ও কতকগুলি পুরাণ কাগজের মোড়ক খুলিয়া সামনে সাজাইলেন, আবার এখনকার এবালিসি ঔষধ পানের রস, তুলসি পাতা, আদা ও মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে দূরে একটী চীৎকার

শব্দ শুনা গেল। “দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের” “দোহাই মেজেষ্টার সাহেবের রক্ষা কর।” দেওয়ানজি শব্দ শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন—এই শব্দ তাঁহার জয়সূচক ধ্বনি। মনে জানিলেন শিকার হস্তগত, শিকার শঙ্কর সর্দ্দার পদাতিকের বগলে শূন্যে শূন্যে আসিতেছে, চলিতে হইতেছে না, ঔষধ পাইয়া আরাম লাভ করিবে তাহাও জানিয়াছে, মোকর্দ্দমা রফা হইবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; বাণী পটিবে, টাকা গাঁটে বান্ধিবে। সকল মনে মনে জানিতেছে গুণিতেছে; তবু চীৎকারে গগন ভেদ করিতেছে; এ চীৎকারের মানে আছে; দর বাড়াইতেছে। যখন যাহাকে দরকার তখন তার দর বাড়ে, দর বাড়াইতে কে ত্রুটি করে? যাহা হউক কিঞ্চিৎকাল মধ্যে দেওয়ানজির নিকট শঙ্কর সর্দ্দার আনীত হইল। দেওয়ানজি দত্তজ মহাশয়কে ইঙ্গিত করিলেন। লাউসেন মহাশয় শঙ্করের সর্ব্বাঙ্গে ধূলা ছড়াইয়া দুই একটী ফুঁক দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাকতেল মাখাইতে কহিলেন ও শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিলেন ও পরে কহিয়া উঠিলেন, আমি দেখচি তুই ভাল হবি; তবে কি না “উপচার বিনা ব্যাধি ঔষধ সেবনং বৃথা” কেবল ঔষধে কিছু হবার নয় এতে গদ চাই, পদ চাই, ঝাড়ন চাই ফুকন চাই!

দেওয়ানজি কহিলেন সব হবে, শঙ্কর বাহাদুর এতদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে হয় না? পেটের পীড়া আবার ছার পীড়া! কয়দিন থাকে! দুদিন মাখ থাক; পুরাণ চালের অন্ন খাও, মদগুর মৎস্যের ঝোল আহার কর। ব্যাম? গেল রে গেল এই গেল আর থাকে? লাউসেন সেই স্বপ্নাদ্য ঔষধটা ভুল না—ওকে খাওয়াব ভাল করব, করবই করব। দেওয়ানজি কার্য্যসাধন জন্য সকলের স্তুতি করিতেন তাহাতে তাঁহার অপমান জ্ঞান ছিল না। মুহূর্ত্তে শঙ্কর তাহার দাস হইল, মোকর্দ্দমা আর উড়াইবার দেরি কি?

তৃতীয় সংখ্যা

এখন আমরা বৃত্রসংহার বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বৃত্রসংহারে প্রবেশ করিয়াই আমরা কাব্যের দ্বারে শক্তির বিশাল মূর্ত্তি দেখিতে পাই। চারিদিকে শক্তির বিকাশ। সম্মুখে, মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত দৈবশক্তি—সূর্য্য, বহ্নি, মরুৎ, পাশী, স্বয়ং দণ্ডধর কৃতান্ত। তদুপরি দৈবশক্তিবিজয়ী, আসুরিক বল। অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শফরীর ন্যায়—আমরা এই শক্তিসাগরে ডুবিয়া, অস্থির, দিশাহারা হই; কাব্যের মর্ম্মার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারি না। যেমন সমুদ্রতলস্থ ক্ষুদ্র মৎস্য সাগরবেলার কোন সন্ধান পায় না—আমরা এই কাব্যমধ্যে প্রথমে শক্তির সীমা দেখিতে পাই না। শক্তিই শক্তির সীমা স্বরূপ দেখিতে পাই—অন্য সীমা দেখিতে পাই না। দেখি, দৈবশক্তির শেষ আসুরিক শক্তির রোধ দৈবশক্তিতে। তবে বাহুবল কি এই জগতে অপ্রতিহত? কি মর্ত্ত্যে, কি স্বর্গে বাহুবলই কি বাহুবলের শেষ দমন কর্ত্তা? এরূপ সিদ্ধান্তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—জগৎ কেবল দুঃখের আগার বলিয়া বোধ হয়, এবং স্রষ্টার সৃষ্টি কেবল নিষ্ঠুরের পীড়নকৌশল বলিয়া বোধ হয়।

এই প্রশ্নের উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞান সহজে দিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের সামান্য ভাগ দর্শন ও বিজ্ঞানের আয়ত্ত। তাহাদিগের ক্ষমতা ক্ষুদ্র পরিধিমধ্যে সঙ্কীর্ণীভূতা—তাহারা প্রমাণের অধীন। যতদূর প্রমাণ আছে—ততদূর দর্শন বা বিজ্ঞান যাইতে পারে; প্রমাণরজ্জু ফুরাইলে, তাহাদিগের গতি বন্ধ হয়। তাহারা বলে ঈশ্বর নাই; ধর্ম্ম নাই; উভয়েরই প্রমাণাভাব; বাহুবলই বাহুবলের সীমা!

এইখানে কাব্য আসিয়া, আপনার উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যাহা বিজ্ঞান ও দর্শনের অতীত, তাহা কাব্যের আয়ত্ত। যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান বা দর্শন দিতে অক্ষম, কাব্য তাহাতে সক্ষম। যাহা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কবি নিজপ্রতিভাবলে দরপ্রসারিণী মানসী দৃষ্টির তেজে, তাহা পরিষ্কার দেখিতে

পান। সে দৃষ্টি ভ্রান্তিশূন্যা, কেন না তাহা নৈসর্গিক—ঈশ্বরপ্রেরিত। কবিরাই প্রধান শিক্ষক—জগৎগুরুশ্রেণীর মধ্যে গেলেলিও বা বেকন্ অপেক্ষা সেক্ষপীয়রের উচ্চ স্থান, লাপ্লাস বা কোমৎ অপেক্ষা ওয়াল্টার স্কটের অধিক মহিমা।*

এই দৈব এবং আসুরিক শক্তির ভীষণ অবতারণা নূতন নহে। এবং বৃত্রবধও নূতন নহে। বাল্যকাল হইতে আমরা এ সকল জানি। পুরাণ, উপপুরাণ দেবাসুরের শক্তিমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ—বৃত্রসংহার কাব্য সেই মহাবৃক্ষের একটি পল্লব মাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। কেন রচিত হইল? বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্য কি? অনেকের বিবেচনায় এরূপ কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্য, কয়েকটি উজ্জ্বলচিত্রের একত্র সমাবেশ—কতকগুলি সুপদ্যের একত্রে সঙ্কলন মাত্র। আমরা বিগত দুই সংখ্যায় যে কবিতা, পুষ্পহার গাঁথিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছি, অনেকের বিবেচনায় তাহাই কাব্যের উদ্দেশ্য এবং সফলতা। এরূপ অনেক কাব্য আছে। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ ভিন্ন অপরে সচরাচর এইরূপ কাব্য প্রণয়নে ব্যস্ত। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যও আছে। "পলাশির যুদ্ধ" একটি উদাহরণ। এখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, কিন্তু কতকগুলি সুমধুর, ওজস্বী গীতিকাব্যের সঙ্কলন মাত্র। বৃত্রসংহারের লক্ষ্য মহত্তর—সুতরাং উচ্চতর স্থান ইহার প্রাপ্য।

প্রথমে কাব্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অপরিমেয় দৈব ও আসুরিক শক্তির "ঘাত প্রতিঘাতে" কিছু ব্যতিব্যস্ত হই—কোন্ পথে কাব্যস্রোত চলিতেছে, শীঘ্র বুঝিতে পারি না। প্রথম যখন নৈমিষারণ্যে অসহায়া শচীকে অসুরগণ ধরিতে যায়, তখন একটু আলো দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, শক্তির **অত্যাচার**। প্রথম খণ্ডের শেষে গিয়া, যখন শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা স্বর্গীয় বায়ুস্তরে জ্বলিতে দেখি, তখনই বুঝিতে পারি কাব্যের মর্ম্ম কি—শক্তির অত্যাচারেই শক্তির অধঃপতন।

বাহুবলই কি বাহুবলের সীমা? এ প্রশ্নের এখন উত্তর পাইলাম। বাহুবল বাহুবলের সীমা নহে। বাহুবলের অসদ্ব্যবহার বা অত্যাচারই বাহুবলের সীমা। বাহুবল ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে স্থায়ী, অত্যাচার বা অধর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে বিনষ্ট হয়। মনুষ্যজীবন ইহার নিত্য উদাহরণস্থল। সমাজের গতি ইহার

---

* কাব্যের উদ্দেশ্য যে শিক্ষা ইহা সচরাচর বোধ হয় স্বীকৃত নহে। বিলাতি সমালোচক-দিগের প্রচলিত মত এই যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ছাড়িয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কাব্য অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য বটে এবং অসত্যও বটে। কি প্রকারে সত্য এবং কি প্রকারে অসত্য, শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ, উভয়ের সঙ্গে কাব্যের কি সম্বন্ধ, সবিস্তারে তাহা বুঝাইবার স্থান এ নহে। তাহা বুঝাইতে আর একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচন করা গিয়াছে।

উদাহরণে পরিপূর্ণ। ইতিহাস কেবল এই কথাই কীর্ত্তন করে—হস্তিনার কুরুগণ হইতে পুনার মহারাষ্ট্রগণ পর্য্যন্ত—টার্কুইনের রোম হইতে অদ্যকার টর্কি পর্য্যন্ত, এই মহাতত্ত্বের ঘোষণা করে। কথা পুরাতন, কিন্তু আজিও মনুষ্য ইহা বুঝিল না। মনে করে শক্তিই অজেয়, কেন না শক্তি শক্তি। কিন্তু কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে পান শক্তি অকিঞ্চিৎকর, অনিত্য,—শক্তিও অশক্ত। ধর্ম্মই নিত্য, ধর্ম্মই বল—শক্তি তাহার সহায় মাত্র।

এই নৈতিকতত্ত্বের উপর আরোহণ করিয়া, মনুষ্যজীবনের এই সমস্যার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, কবি বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ না ভাবেন, যে এই নৈতিকতত্ত্বের একটি উদাহরণ অলঙ্কারবিশিষ্ট করিয়া ছন্দোবন্ধে উপাখ্যাত করা তাঁহার উদ্দেশ্য। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্যও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্দর্য্য ? কোন্ আকার ধরিয়া সৌন্দর্য্য কাব্যমধ্যে অবতরণ করিবে ? যদি কাব্য না হইয়া ভাস্কর্য্য বা চিত্রবিদ্যা হইত, তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইত। রতির রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত—নন্দনকাননের শোভা, বা সুমেরুর মাহাত্ম্য পটে বিকসিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নহে—মনের সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্য। কেবল পর্ব্বতের শোভা, রমণীর রূপ, বা আকাশের বর্ণ, ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য গঠিত হইতে পারে না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশ্য। মানসিক বা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব কার্য্যের বিবৃতি লইয়া এসকল কাব্য গঠিত করিতে হয়। যে কার্য্য সুন্দর, তাহাই কাব্যের বিষয়। কিন্তু কোন্ কার্য্য সুন্দর ? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে "সৌন্দর্য্য কি ?" তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তাহার স্থান নাই—তাহার সময় এ নহে। তবে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কোন মহদ্ধর্ম্মের সঙ্গে যে কার্য্য কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। কার্য্যটি নীতিসঙ্গত না হইলেও হইতে পারে, তথাপি কোন সুপ্রবৃত্তি বা সুনীতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা চাহি। সুন্দর কার্য্যই সুনীতি সঙ্গত। অতিভীষণ কার্য্যও এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা যায় যে কেবল ধর্ম্মানুরোধেই পরশুরাম মাতৃহত্যারূপ মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই মহাপাপও সুন্দর হইয়া উঠে।

কার্য্য অনেক সময়েই স্বতঃ সুন্দর হয় না। অন্য কার্য্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর হয়। রাম কর্ত্তৃক সীতা ত্যাগ স্বতঃ সুন্দর নহে; অনেক ইতরব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু রাম সীতার পূর্ব্ব প্রণয়, রামের জন্য সীতা যে দুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যে কারণে রাম সীতাকে

ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই সীতাত্যাগ সুন্দর কার্য্য।—"সুন্দর" অর্থে "ভাল" নহে। অতি মন্দ কার্য্যও সুন্দর হইতে পারে। এই রামকৃত সীতাবর্জ্জন ও পরশুরামকৃত মাতৃবধ ইহার উদাহরণ। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্য্যের সৌন্দর্য্য, তখন সে সৌন্দর্য্য ঐ সম্বন্ধের। আরও বিবেচনা করিতে হইবে যে কার্য্যপরম্পরার যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য। যেগুলি নিত্যসম্বন্ধ সেগুলি নিয়ম বলিয়া পরিচিত। ঐ নিয়মগুলিই নৈতিকতত্ত্ব। যদি কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধটি সৌন্দর্য্যের আধার হয়, তবে ঐ নৈতিকতত্ত্বগুলিও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক অনেকগুলি জটিল ও দুরূহ নৈতিকতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমাময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য নৈতিকতত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।

মনুষ্যজীবন সৌন্দর্য্যের উৎস—অতএব মনুষ্যজীবনই কাব্যের বিষয়। কোটিরূপ-ধারী মনুষ্যজীবন কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না—এইজন্য কাব্যমাত্রে মনুষ্যজীবনের এক একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয়। রামায়ণে রাজধর্ম্ম—মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে ক্রোধ, এবং মিলটনে অপরাধ। রোমিও জুলিয়েটে যৌবন, মাকবেথে লোভ, শকুন্তলায় সরলতা, উত্তরচরিতে স্মৃতি। সকলগুলিই নৈতিক বা মানসিকতত্ত্ব। তদ্বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই।

হেমবাবু মনুষ্যজীবনের যে মূর্ত্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর। বাহুবলের শাস্তা ধর্ম্ম; ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য; পুণ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে দেখ, আলোকসম্মুখী রত্নের ন্যায় ইহা জ্বলিতে থাকে। হেমবাবু এই তত্ত্বকে এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের আলয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া, ত্রিদেব—তিনমূর্ত্তিতে পরমেশ্বর—অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।

বাহ্য বা মানসিক জগতে এমন কোন নিয়মই নাই, যে তাহা অবস্থাবিশেষে একাই কার্য্য করে। কি বাহ্যিক কি মানসিক নিয়ম অনুক্ষণ অন্য কোটি নিয়ম কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত, সংযত, বিস্মিত, বিফলীকৃত, বিকৃত হইতেছে। অতএব একমাত্র নিয়মের অধীন যে কাব্যের কার্য্য তাহা মনুষ্যজীবনের অনুরূপ চিত্র নহে—অনুরূপ না হইলেই অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক হইলেই অসুন্দর। এ কথা

* কাব্যের নায়ক মনুষ্যকল্প দেবতা হইলেও এ কথার কোন ব্যত্যয় নাই।

বৃত্রসংহারেও প্রমাণীকৃত। ধর্ম্মের সঙ্গে বাহুবলের যে সম্বন্ধ তাহা কাব্যের স্থূলচর্ম্ম —মেরুদণ্ড। কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর কতকগুলি বিষয় আছে। প্রথম, দেশ-বাৎসল্য, দেবগণের স্বর্গোদ্ধারের ইচ্ছায় পরিণত, চিত্রিত, এবং বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় তত্ত্বটি, আমরা লেডি মাক্‌বেথে দেখিয়াছিলাম—বৃত্রসংহারেও দেখিলাম। লোকে যাহাকে সচরাচর বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—সেক্ষপীয়রে তাহা লেডি-মাক্‌বেথ—বৃত্রসংহারে তাহা ঐন্দ্রিলা। উভয়েই একটি অপরিবর্ত্তনীয় সামাজিক শক্তির প্রতিমা। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বটে, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য্য সচরাচর গৃহীত হয় কি না সন্দেহ। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থূল বলিয়া প্রলয়ঙ্করী নহে; স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থূল নহে—পুরুষের বুদ্ধি দূরগামিনী কিন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অধিকতর সুতীক্ষ্ণা। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অমার্জ্জিতা বা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রলয়ঙ্করী নহে; যে দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে তুল্য শিক্ষিত, উভয়ের বুদ্ধি যে সকল দেশে তুল্য-রূপে মার্জ্জিত, যে সকল দেশে মিসেস্ মিল, মাদাম রোলন্দ বা মাদাম দেস্তাল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সকল দেশেও স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। লক্ষ্মী চঞ্চলা; সরস্বতী মুখরা; সতী আত্মঘাতিনী; রুদ্রাণী রণোন্মত্তা, বিবসনা। বাল্মীকির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জগতে, দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতা, স্বর্ণমৃগের জন্য অধীরা। যিনি পরে রাবণের ঐশ্বর্য্যের লোভ সম্বরণ করিলেন, অশোকবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন, তিনি একটি মৃগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। ঐন্দ্রিলা স্বর্গের সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও শচীকে অপমান করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের দয়া অল্প নহে, কিন্তু প্রতিযোগিনীর উপর স্ত্রীলোকে যেরূপ নিষ্ঠুর, বন্যপশুও তাদৃশ নহে। এই সকল কথা হেমবাবু ঐন্দ্রিলাতে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক। এই কাব্যে প্রথমতঃ শক্তি, অচিন্ত্যনীয়, অপরিমেয় কিন্তু অনন্ত শক্তি নহে। দেবগণ ভুবনসংহারে সক্ষম, তথাপি বৃত্র ও বৃত্রপুত্রের বীর্য্যের অধীন। বৃত্র দেবগণকেও পীড়িত করিতে সক্ষম, তথাপি মরণাধীন। বৃত্রের শক্তি পুণ্যজাত, ঈশ্বরপ্রেরিত—ঈশ্বরেরই শক্তি। ত্রিশূল তাহার রূপ, স্বর্গের আধিপত্য তাহার ফল। এই শক্তির তিন শত্রু। প্রথম শত্রু সর্ব্বসংহর্ত্তা কাল; ব্রহ্মার দিবস বৃত্রশক্তির জীবন; কালসহকারে সে শক্তি অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু কাল এখনও সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃত্রশক্তির নিকট উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় শত্রু দেবতার স্বর্গবাৎসল্য; কিন্তু দেবতা ঈশ্বরসৃষ্ট ঈশ্বরপালিত, ঐশীশক্তির নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। তৃতীয় শত্রু অধর্ম্ম; ধর্ম্মরূপী ঈশ্বর; অধর্ম্মের সহিত ঐশীশক্তি—শিবের ত্রিশূল—একত্রে থাকিতে পারে না। ঐন্দ্রিলার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অধর্ম্ম প্রবেশ করিল, অমনি শিবশূল গগনপথে শ্বেতবাহু কর্ত্তৃক অপহৃত

হইল; ত্রিদেবশক্তি ইন্দ্রায়ুধে প্রবেশ করিল। অধর্ম্মে অকালে বৃত্রশক্তি বিনষ্ট হইল।

বৃত্রসংহারের নায়কনায়িকা সকল অমানুষিক হওয়াতে ইহার ফলসিদ্ধি আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গভূমে বলই অধিনায়ক—ক্ষুদ্র মনুষ্যের বলের অপেক্ষা দেবাসুরের বল সে কল্পনা স্পষ্টতর করিয়াছে। কিন্তু কেবল অমানুষিক শক্তিই তাঁহার প্রয়োজনীয়। যে সকল তত্ত্ব কাব্যের বিষয় তাহা মানবচরিত্রে নিহিত; অতিমানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি না। এই জন্য যেখানে মনুষ্যপ্রণীত কাব্যে দেবগণের অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দেবগণ মনুষ্যকল্প; মানুষের ছাঁচে ঢালা। মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, প্যারাডাইজ লষ্টে, সর্ব্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মনুষ্যোপম, মানুষিক রাগ দ্বেষ দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। হেম বাবুর সুরাসুর সুরী অসুরীগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য। বাহ্যচিত্র মনুষ্যলোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মানবানুকারী। তাঁহার সুরাসুরগণ অতিপ্রকৃত শারীরিক শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র।

সমুদায় নায়ক নায়িকার মধ্যে শচীর চরিত্রই মনুষ্যচরিত্র হইতে কিছু দূরতাপ্রাপ্ত—এইখানেই দৈব চরিত্রের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই শচীচরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মহিমা সমালোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর ন্যায় পুত্রবৎসলা—মানুষীর ন্যায় দুঃখবিদগ্ধা, স্মৃতিপীড়িতা—অবনীর কঠিন মাটী তাঁহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের সহিত মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমিষারণ্যে তাঁহার মর্ম্মদাহ করে—তথাপি শচী বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢ়সংস্থাপিতা, স্থৈর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে মহামহিমাময়ী। সকল নায়ক নায়িকাদিগের মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ উন্নত স্ত্রীচরিত্র কোথাও নাই—মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্শ্বে ইন্দুবালা দেবদারুতলায় নব মল্লিকার ন্যায়, সিংহীরী অঙ্কলালিত হরিণশিশুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় সুকুমার। শচীর পর, ইন্দুবালার চরিত্রই মনোহর। বস্তুতঃ কাব্যমধ্যে, নায়িকাদিগের চরিত্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। শচী, ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলা এবং চপলা সকলেই সুচিত্রিত এবং সুরক্ষিত। নায়কদিগের মধ্যে কেবল রুদ্রপীড়ের চরিত্রই পরিস্ফুট; তাহাও অভিমন্যু ও হেক্টারের ছাঁচে ঢালা। বাঙ্গালি কবিরা প্রায়ই স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুপটু; প্রমীলাই মেঘনাদবধের প্রধান গৌরব। বস্তুতঃ বাঙ্গালি লেখক যে স্ত্রীচরিত্রে অধিক নিপুণ, পুরুষচরিত্র প্রণয়নে তাদৃশ নিপুণ নহে, তাহার কারণ সহজে বুঝা যায়। বাঙ্গালার স্ত্রীগণ, রমণীকূলের গৌরব; বাঙ্গালার পুরুষগণ পুরুষ নামের কলঙ্ক। অন্য কোনদেশেই বাঙ্গালি-মহিলার চরিত্রের ন্যায় উন্নত স্ত্রীচরিত্র নাই—অন্য কোন দেশেই বাঙ্গালি পুরুষের মত

ঘৃণাস্পদ কাপুরুষ নাই। কবিগণ জন্মাবধি উন্নত স্ত্রীচরিত্র আদর্শ প্রত্যহ দেখিতে পান; জন্মাবধি প্রত্যহ কাপুরুষ মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন। যে সকল সংস্কার মাতৃদুগ্ধের সহিত পীত হয়, তাহা চেষ্টা করিলেও জয় করা যায় না। বাঙ্গালি লেখক স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুনিপুণ, পুরুষচরিত্রে অনিপুণ কাজে কাজেই হইয়া পড়েন। তবে যখন বাঙ্গালি পুরুষের দোষমালা গীত করিতে হইবে, তখন বাঙ্গালি কবির পুরুষচিত্রে নৈপুণ্যের অভাব থাকে না; পুরুষ বানরের চিত্র প্রণয়নে বাঙ্গালির তুলি অভ্রান্ত, কেন না আদর্শের অভাব নাই। দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত পুরুষচরিত্র সকল অসাধারণ উজ্জ্বলতাপূর্ণ। বাবুরাম বাবু, রাম দাস, বা জলধরের চরিত্র আকাঙ্ক্ষার অতীত। বানরকে সম্মুখে রাখিয়া সুনিপুণ ভাস্কর উত্তম বানরমূর্ত্তি গড়িতে পারে, কিন্তু কখন দেবতা গড়িতে পারে না। দেব গড়িতে বানর হয়, বাঙ্গালাদেশে ইহা প্রাচীন কথা। হেম বাবু যে নায়ক চরিত্রে কৃতকার্য্য হয়েন নাই, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই। জীবন্ত আদর্শের অভাবে, বিদেশী পুরাবৃত্তে তাঁহাকে আদর্শ খুঁজিতে হইয়াছে। রুদ্রপীড়ের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ পড়িতে ইন্দ্রের চরিত্রে বেয়ার্ড বা অন্য ইউরোপীয় মাধ্যকালিক অশ্বারোহী বীরকে মনে পড়ে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে যে সকল দেশে পুরুষচরিত্র বলবত্তর, সে দেশের সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষচরিত্র প্রবলতর হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় সাহিত্য এ কথার সমর্থন করে। হোমর হইতে সদ্যঃপ্রসূত নবেলখানি পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ। আমরা কেবল ইংরেজি সাহিত্যেরই বিশেষ উল্লেখ করিব, কেন না অন্য দেশের সাহিত্যের বিষয়ে কথা কহিবার বিশেষ অধিকারী নহি। ইংরেজি সাহিত্যের কথা পাড়িলে আগে সেক্ষপীয়রের নাটক ও স্কটের উপন্যাসগুলি মনে পড়ে। এই দুই কাব্যশ্রেণীই প্রকৃত চিত্রাগার—আর সকলই ইহার কাছে সামান্য। স্কটের উপন্যাসে পুরুষচরিত্র প্রবল—স্কট যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়নে সুদক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রণীত চরিত্রগুলি স্ত্রী পুরুষে বিভাগ করিলে দেখা যাইবে কোন দিগ্ ভারি। একা রিবেকা পঁচিশখানা কাব্য আলো করিতে পারে না। সেক্ষপীয়রের কথা স্বতন্ত্র; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বক্ষম। তাঁহার তুল্য সর্ব্বজ্ঞতা মনুষ্যদেহে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার লেখনীর কাছে স্ত্রীপুরুষ তুল্য হওয়াই সম্ভব। বাস্তবিক তাদৃশ তুল্যতা আর কোথাও নাই। তথাপি তাঁহারই স্বদেশী কবি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে—"Stronger Shakespeare felt for man alone."

বৃত্রসংহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে বাকি রহিল। অবকাশ হয় ত সময়ান্তরে বলিব।

চতুর্থ তর্ক—অদৃষ্ট

আমরা জগতের জনক ও উপাদান কারণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মতগুলি এক প্রকার সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে যাহার সাহায্যে এই বিশ্বরাজ্যের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে জগতের সেই প্রধান সহকারী কারণ অদৃষ্টের বিষয় নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

নৈয়ায়িকদিগের মতে এই জগৎনির্ম্মাণ কার্য্যে অদৃষ্ট ঈশ্বরের একটি দক্ষ ও সুনিপুণকার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ। ইহা দ্বারাই বিশ্বে এতাদৃশ মনোহর বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, ইহার কৌশলেই তেজোরাশি সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণ, হিমালয় প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত এবং সুতীক্ষ্ণ কণ্টক প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সকল যথানিয়মে সৃষ্ট হয়। অধিক কি রজঃকণা হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত, জলবিন্দু হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে দিক্‌হস্তী পর্য্যন্ত, সফরী হইতে রাঘব পর্য্যন্ত, বিস্ফুলিঙ্গ হইতে সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত এবং মক্ষিকা হইতে গরুত্মান্ পর্য্যন্ত জগতে যে সকল পদার্থ আছে তৎসমুদায়ই অদৃষ্টপ্রভাবে নির্ম্মিত। অদৃষ্ট প্রভাবেই জীবগণের হৃদয়ে রাগদ্বেষাদিবৃত্তির উদয় হয়। অহি নকুল, অশ্ব মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণের মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈরিতা, তাহার প্রতি একমাত্র অদৃষ্টই কারণ। মনুষ্যবালকের কি নিমিত্ত প্রথমেই অন্নেতে রুচি হয়? মৃগশিশুরা কাহার দ্বারা শিক্ষিত না হইয়াও কি কারণে স্বয়ং তৃণ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এরূপ সকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দেখা যায় না। নৈয়ায়িকগণ বলেন কর্ম্ম মাত্রের যেরূপ এক একটি কারণ আছে সেইরূপ কর্ম্ম মাত্রের এক একটি ফল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে লোকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কিন্তু অনেক স্থলে কর্ম্মের ফল লক্ষিত হয় না। অতএব যে স্থলে কর্ম্মের ফল লক্ষিত হয় না সেই স্থলে অদৃষ্টরূপ ফল কল্পনীয়। অর্থাৎ ইহলোকে যে সকল ফল দৃষ্ট

হয় না তাহারা অদৃষ্টরূপে পরিগণিত হইয়া স্বর্গাদি ভোগ ও পরজন্মে সুখ দুঃখাদির কারণ হয়। তথাচ বৈশেষিক দর্শনকার কণাদমুনি বলিয়াছেন।*

"দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজনমভ্যুদয়ায়।" বৈ ৬অ, প্র আ, ১সূ।

কার্য্য দুই প্রকার, প্রথম যাহাদের ফল দৃষ্ট হয় যেমন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি, দ্বিতীয় যাহাদের ফল দৃষ্ট হয় না যেমন যজ্ঞ দান প্রভৃতি। যেখানে কোন ফল দৃষ্ট হয় না সেইখানে অদৃষ্টরূপ ফল কল্পনীয়। যদি বল যজ্ঞাদি এজন্মে সম্পন্ন হইল তাহার ফল পরলোকে হইবে এ বড় অসঙ্গত কথা। সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে জানিতে পারিবে যে, সকল ক্রিয়ার ফল সদ্য উৎপন্ন হয় না। বীজবপন, ভূকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া সকল যেমন বিলম্বে ফল উৎপাদন করে তেমনি দান যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া সকলও যে বিলম্বে ফল উৎপাদন করিবে তাহাতে নূতনতা কি? ফল কথা যাগাদির সহিত তাহার ফল স্বর্গাদির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। যাগাদি নাশ হইবামাত্র একটি অপূর্ব্ব † উৎপন্ন হয় সেই অপূর্ব্ব হইতে স্বর্গাদি ফল জন্মে।

যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে অদৃষ্টরূপ ফলের উৎপত্তির বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য এই যুক্তি দিয়াছেন যে—

"বিফলা বিশ্ববৃত্তি র্নো ন দুঃখৈকফলাঽপিবা।
দৃষ্টলাভফলা বাঽপি বিপ্রলম্ভোঽপি নেদৃশঃ।" কু, প্র, স্ত, ৮কা।

যদি যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্ফল হইত তবে পরোলোকার্থী মনুষ্য মাত্রেই কি নিমিত্ত এতাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। যদি বল যজ্ঞাদি নিষ্ফল কেন? অর্থনাশ শারীরিক ক্লেশ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহা অতি অযৌক্তিক কথা। কারণ, সকলেই অভীপ্সিত সুখাদি লাভের জন্যই আয়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অনভিমত দুঃখাদি লাভের জন্য নহে। ঐহিক সম্মানাদি প্রাপ্তিকেও যজ্ঞাদি কার্য্যের ফল বলিতে পার না। কারণ, যাহাদিগের অণুমাত্র ঐহিক সম্মানাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা নাই এরূপ মনস্বী ব্যক্তিকেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা গিয়াছে। যদি বল কোন বঞ্চক ব্যক্তি লোককে ক্লেশ দিবার জন্য এইরূপ যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তাহাও হইতে পারে না। দেখ, যে ব্যক্তি প্রথমে যজ্ঞাদির সৃষ্টি করিয়াছে সে স্বয়ং অবশ্য ইহাদিগের

---

* নৈয়ায়িক আর বৈশেষিকদিগের মধ্যে অল্পই বিভিন্নতা; এমন কি বৈশেষিক দর্শনকে উন্নত ন্যায়দর্শন বলিলে হয়; সুতরাং এখানে বৈশেষিক সূত্রের দৃষ্টান্ত অন্যায় হয় নাই। পরেও অনেক স্থলে দেখান যাইবে।

† আমরা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অপূর্ব্ব শব্দের সহজ প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় দেখা গেল না এবং ইহার অর্থও প্রকাশ করা গেল না। পাঠকগণ ইহাকেও অদৃষ্টের সমান বুঝিবেন।

অনুষ্ঠান জন্য শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। এখন বল দেখি পৃথিবীতে এমন বঞ্চক কে আছে যে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য আপনার নাসিকা ছেদ করে ?

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, ভাল যাগাদি, স্বর্গাদির হেতু হউক, কিন্তু কি নিমিত্ত তাহারা পরজন্মের সুখ দুঃখাদির কারণ অদৃষ্টের প্রতি হেতু হইবে। ইহার উত্তরে উদয়নাচার্য্য বলেন—

"চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।
সম্ভোগো নির্ব্বিশেষাণাং ন ভূতৈঃ সংস্কৃতৈরপি॥"

চিরবিনষ্ট যাগাদি হইতে যদি স্বর্গ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের দ্বারা পরজন্মের সুখ দুঃখের হেতু অদৃষ্টেরও উৎপত্তি হইতে পারে। আরও দেখ প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর তুল্যরূপ ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও তাহারা যখন পৃথক্ পৃথক্ সুখদুঃখাদির ভোগ করিতেছে তখন পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট ভিন্ন ইহার কারণ আর কিছুই দেখা যায় না।

ন্যায়মতে স্বর্গাদি ভোগরূপ যজ্ঞাদির অদৃশ্য ফল কেবল অদৃষ্ট নয়, নরকাদি ভোগের কারণ হিংসাদির অদৃশ্য ফলের নামও অদৃষ্ট। ভাষা পরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ বলেন—

"ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ ধর্ম্মঃ স্বর্গাদি সাধনং।
গঙ্গাস্নানাদি যাগাদিব্যাপারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ।"

অদৃষ্ট দুই প্রকার, প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় অধর্ম্ম। ধর্ম্ম, গঙ্গাস্নান ও যজ্ঞাদির ফল স্বরূপ এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু। অধর্ম্ম, গর্হিত কর্ম্মের ফল ও নরকাদি প্রাপ্তির হেতু।

মহর্ষি গৌতম শরীরোৎপত্তির বিচার স্থলে এইরূপে অদৃষ্টের প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন।

"পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তি"। ৩অ, ২আ, ৬৪সূ।

"পূর্ব্ব শরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগ্ বুদ্ধি শরীরারম্ভ লক্ষণা, তৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলস্যানুবন্ধঃ, আত্মসমবেতস্যাবস্থানাং তেন প্রযুক্তেভ্যোভূতেভ্য তস্য (শরীরস্য) উৎপত্তিঃ" ভাষ্যম্।

পূর্ব্বশরীরের বাক্য, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে সমবায়* সম্বন্ধে অবস্থান করে। সেই আত্মসমবেত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলকর্ত্তৃক প্রযুক্ত পঞ্চভূতের সংযোগে দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয়।

* সমবায় এক প্রকার নিত্য সম্বন্ধ (*Intimate Relation*) পরে ইহার স্বরূপ দেখান যাইবে। এই সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত বস্তুর নাম সমবেত।

"পূর্ব্বকৃতস্য যাগদান হিংসাদেঃ ফলস্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপস্য অনুবন্ধাৎ (সহকারিভাবাৎ) তস্য শরীরস্যোৎপত্তিঃ" সূত্রবৃত্তিঃ।

পূর্ব্বশরীর কৃত দান যজ্ঞ হিংসাদির ফল যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহার সহায়তায় দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয়।

বৈশেষিক সূত্রকার আর একস্থলে বলিয়াছেন—

"অপসর্পণমুপসর্পণ মশিত পীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তর সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্ট কারিতানি॥" ৫অ, ২আ, ১৭সূত্র।

অদৃষ্টবশেই মন আর প্রাণ একদেহের অপায় হইলে অপর দেহে প্রবেশ করিয়া তদুপযুক্ত ভোজন পান এবং কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। অর্থাৎ যতদিন অবধি অদৃষ্ট থাকিবে ততদিন অবধি এক দেহের নাশ হইলে অপর দেহের উৎপত্তি হইবে এবং তদুপযুক্ত ভোগও হইবে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে কর্ম্মানুসারে দেহান্তর প্রাপ্তি হইতে থাকে, কর্ম্মবশে মনুষ্যদেহের পর শৃগালদেহের প্রাপ্তি হইতে পারে এবং কর্ম্মবশেই শৃগালদেহ হইতে মনুষ্যদেহ হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের বিশেষ নিরূপণ হইয়াছে।† ক্রমশঃ ভোগ করিতে করিতে অদৃষ্টের অভাব হইলে আর শরীরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, শরীরযন্ত্রণা নিবৃত্তির নামই মোক্ষ।

এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে অদৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্ম্মের ফল, এবং সেই অদৃষ্টবশে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে বিবেচনা কর দেহের সহিত সংযোগ লাভ করিয়া জীব অবশ্যই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় সুতরাং অদৃষ্টের নাশ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইল, আর অদৃষ্টের নাশ না হইলে মোক্ষপ্রাপ্তিও দুর্ঘট। ইহার উত্তরে বৈশেষিক দর্শনকার বলিয়াছেন, যোগবলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের (সাংসারিক মায়ার) ধ্বংস হয়, মায়ার বিনাশ হইলে তৎপ্রসূত রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি দোষের অপায় হয়, এবং ঐ সকল দোষের নিবৃত্তি হইলে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয় না; এইরূপে কর্ম্মের অভাবে দেহোৎপত্তির অভাব, এই দেহোৎপত্তির অভাবের নামই মোক্ষ।

এই সকল কথাগুলি বলিতে বেশ সহজ, শুনিতেও বেশ মিষ্ট; কিন্তু গোল উঠাইলে আবার মহাগোল উপস্থিত হইতে পারে। আমরা এখানে তত গোলযোগ না উঠাইয়া এইমাত্র বলিতেছি যে "বীজাঙ্কুরের ন্যায়*" সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার

† "ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা। প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপ বিপর্য্যয়ম্।" মনু।

কোন কোন মনুষ্য ইহজন্মকৃত পাপের দ্বারা কেহ কেহ বা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের দ্বারা রূপের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়।

* "আদৌ বীজঃ ততোঽঙ্কুরঃ কিমাদাবঙ্কুরস্ততো বীজমিত্যনির্ণয়েন বীজাঙ্কুর প্রবাহোঽনাদিঃ।" ন্যায়াবলী।

করিয়াই মহর্ষিগণ এই কথা বলিয়া থাকিবেন। যেমন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং সেই বৃক্ষের ফল হইতে বীজের উৎপত্তি; এখানে দেখা যাইতেছে যেরূপ বীজের উৎপত্তির প্রতি বৃক্ষ কারণ, সেইরূপ বৃক্ষের উৎপত্তির প্রতি বীজও কারণ কিন্তু বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে ইহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তেমনি অদৃষ্ট সৃষ্টির প্রতি কারণ এবং সৃষ্টি না থাকিলে কর্ম্ম হয় না কর্ম্ম না হইলে অদৃষ্ট কিরূপে জন্মিবে?

নৈয়ায়িকদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে তাঁহাদের মতে সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টির আদি নাই কিন্তু ইহার ধ্বংস আছে অর্থাৎ অদৃষ্টের লোপ হইলে ইহারও লোপ হইবে। এক্ষণে আমাদের সংশয় এই যে, যদি এমন সময় উপস্থিত হয় যে সকল অদৃষ্টের নাশ হইয়া গেল একটীও অদৃষ্ট রহিল না যে পুনরায় সৃষ্টি হইবে সুতরাং অপুনরাগমনের জন্য সৃষ্টিও একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহার পর ঈশ্বর থাকেন কি না? যদি থাকেন তবে নিষ্প্রয়োজন, যদি তাঁহার কোন কার্য্যই থাকিল না তবে তাঁহার থাকা না থাকায় তুল্য। যদি না থাকেন তবে তাঁহার নিত্যত্ব ভঙ্গ। এইরূপ অপর নিত্য বস্তুরও নিত্যত্বের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

যাহা হউক বোধ হয় নৈয়ায়িকগণ নিম্নলিখিত দুইটী যুক্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের ফলকে অদৃষ্ট বলিয়া থাকিবেন। প্রথম কার্য্য মাত্রের অবশ্য একটী কারণ আছে, কারণ না থাকিলে কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না; দ্বিতীয় কর্ম্মমাত্রের এক একটি ফল অবশ্য স্বীকার্য্য, ফল না থাকিলে কি নিমিত্ত লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে? কিন্তু আমরা দেখিতেছি এক ব্যক্তি আজন্ম দরিদ্র, নানাবিধ যত্ন করিয়াও তাহার দারিদ্র্য ঘুচে না, আর এক ব্যক্তি জন্মাবধি কেবল সুখভোগ করিতেছে দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। ইত্যাদি স্থলে আমরা কেবল কার্য্য দেখিতেছি কারণ দেখিতে পাই না। যদি বল আজন্ম দরিদ্র ব্যক্তির পিতা দরিদ্র থাকাতে সেও দরিদ্র হইয়াছে এবং আজন্ম সুখী ব্যক্তির পিতার অতুল সম্পত্তি থাকাতে সে সুখভোগ করিতেছে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব তাহাদের পিতার মধ্যেই বা এরূপ বৈষম্য কি নিমিত্ত হইল? ইহার পর ক্রমশঃ যতদূর যাইবে ততদূরই প্রশ্ন চলিবে মীমাংসা কিছুই হইবে না অর্থাৎ তাদৃশ বৈষম্যের প্রতি কোন কারণই দৃষ্ট হইবে না। অন্যদিকে একজন সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ইহজন্মে তদনুরূপ ফল পাইতেছে না, দুঃখে দুঃখেই জীবন শেষ করিতেছে। অপরে নিয়ত গর্হিত কার্য্য আচরণ করিয়াও তদনুযায়ী ফল না পাইয়া বরং সুখে জীবন যাপন করিতেছে। এখানে কর্ম্ম আছে কিন্তু ফল নাই; একদিকে কার্য্যের প্রতি কোন কারণ দেখা যাইতেছে না অপরদিকে কার্য্যের ফল দৃষ্ট হইতেছে না কিন্তু

দুইটাই থাকা আবশ্যক। সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বজন্মের সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলকে পরজন্মের সুখ দুঃখের প্রতি কারণ বলিয়া এই বিষম সমস্যার এক প্রকার সমাধান করিয়াছেন বলিতে হইবে।

বৈশেষিক সূত্রকার বলেন—

"তৎসংযোগো বিভাগঃ।" ৬ অ, ২আ, ১৫সূ।

যতদিন লোকের ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম থাকিবে ততদিন এই পৃথিবীতে জন্ম মরণের ধারাপ্রবাহ থাকিবে, ততদিন জীবগণ এক দেহের পর অপর দেহ আশ্রয় করিয়া আপন আপন কর্ম্মভোগ করিবে। এইরূপ জন্মপ্রবাহকে বেদে অজরপঞ্জরী ভাব এবং দর্শনশাস্ত্রে প্রেত্যভাব বলে।

যথা গৌতমসূত্রে—

"প্রেত্য-মৃত্বা, ভাবো জননং, প্রেত্যভাবঃ। তত্র পুনরিত্যনেনাভ্যাস কথানাৎ প্রাগুৎপত্তি-শুতোমরণং তত উৎপত্তিরিতি প্রেত্যভাবোঽয়মরণাদি রপবর্গান্তঃ।"

মৃত ব্যক্তির পুনর্ব্বার উৎপত্তির নাম প্রেত্যভাব। প্রথম উৎপত্তি, তাহার পর মরণ, তাহার পর আবার উৎপত্তি এইরূপে প্রেত্যভাব অনাদি কিন্তু মোক্ষ হইলে ইহার নাশ হয়।

গৌতম বলেন—

"আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ।" ৪অ, ১আ, ১০সূ।

আত্মার নিত্যত্ব যদি স্বীকার কর তবে প্রেত্যভাবও স্বীকার করিতে হইবে কারণ সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ভোক্তা একমাত্র আত্মা এবং ঐ সকল কর্ম্ম হইতেই উত্তমাধম কুলে জন্ম হইয়া থাকে।

আমরা এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের এতদ্বিষয়ক মতামত সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইউরোপীয় দার্শনিক-গণের মধ্যে অনেকেও অদৃষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাঁহারা আমাদিগের আচার্য্য-গণের ন্যায় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে অদৃষ্ট বলেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন "অদৃষ্ট শব্দের অর্থ ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তি-নিষ্পত্তি অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ংই প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন যাপনের জন্য এক একটি নিকটবর্ত্তী পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।" বকল সাহেব সভ্যতার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

"They require us to believe that the Author of creation whose beneficence they at the same time willingly allow, has, notwithstanding His Supreme goodness made an arbitrary distinction, between the elect and the non-elect; that He has from all eternity doomed to perdition

millions of creatures yet unborn, and whom His act alone can call into existence; and that He has done this, not in virtue of any principle of justice, but by a mere stretch of despotic power."

অদৃষ্টবাদীরা বলেন যদিও ঈশ্বর সকল জীবের উপর সমান দয়াবান্ তথাপি তিনি কতকগুলি লোকের জন্য মুক্তি এবং কতকগুলি লোকের জন্য কেবল নরকভোগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি অনন্ত পূর্ব্বকাল হইতে যাহারা অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই এমন সকল আত্মারও নরক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই আবার ইহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ন্যায়ানুসারে এরূপ করেন নাই আপনার ইচ্ছাতেই করিয়াছেন।

ইংলিস চার্চের ১৭ নিয়মে লিখিত আছে—

"Predestination to life is the everlasting purpose of God, whereby (before the foundations of the world were laid) He hath constantly decreed by His counsel, secret to us, to deliver from curse and damnation those whom He hath chosen in Christ out of mankind, and to bring them, by Christ to everlasting salvation." &c.

মনুষ্যের অদৃষ্ট পরমেশ্বরের একপ্রকার নিত্য অভিপ্রায়, ইহা দ্বারাই তিনি সৃষ্টির ভিত্তিস্থাপনের পূর্ব্বে আপনার ইচ্ছানুসারে মনুষ্যজাতির মধ্য হইতে কেবল কতকগুলি লোককে অভিশাপ এবং নরক হইতে নিস্তার করিবার জন্য খ্রীষ্টের শিষ্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবং ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে খ্রীষ্ট তাঁহাদিগকে অনন্তসুখময় মোক্ষধামে লইয়া যাইবেন।

পাঁচ শতাব্দীতে অগষ্টাইন এই মতের প্রচার করেন, তাহার পর কালবীন ইহার পোষকতা করিয়া দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করেন। আমাদিগের দেশেও এইরূপ মত যে এক সময় প্রচলিত হইয়াছিল তাহা, "অয়ং দরিদ্রো ভবিতেতিবৈধসীং লিপিং ললাটে-হর্থিজনস্য জাগ্রতীম্" এবং ললাটে লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবার্য্যতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা একপ্রকার প্রতিভাসিত হইতেছে। আমাদের দেশে এখনও এই মত এইরূপে প্রচলিত আছে যে বালক জন্মিবার পর ষষ্ঠ দিবস রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া সেই নববালকের কপালে সুখ দুঃখ ভোগাদি লিখিয়া যান এবং ঐ নিমিত্ত সূতিকাগারের দ্বারে লেখনী মসীপাত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। বোধ হয় এই নিমিত্তই অদৃষ্টের নাম "কপাল" হইয়া থাকিবে। আর সংস্কৃত "ভাগধেয়" কথাটীও এই মতের পোষকতা করিতেছে, ইহার অর্থ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যের সুখদুঃখ একবারে ঈশ্বরকর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে।

এই মত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলবাদীদিগের মতের উপর যে সকল সন্দেহ

হইয়াছিল, তৎসমুদয় একপ্রকার নিরস্ত হইয়াছে বটে কিন্তু আর কতকগুলি নূতন দোষের আবির্ভাব হইল। দয়ার সাগর পরমেশ্বর যদি আপন ইচ্ছাতে নিজ সৃষ্ট মনুষ্যগণ হইতে কতকগুলি লোককে সুখী এবং কতকগুলি লোককে দুঃখী করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অদ্বিতীয় মাহাত্ম্য কোথায় রহিল?' তাঁহার ঈশ্বরত্বে কলঙ্ক হইল—তিনি একজন সামান্য মনুষ্য অপেক্ষাও হীনস্বভাব হইলেন।

পরমেশ্বরকে পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইউরোপে আর একটি মতের আবির্ভাব হয়। ইহার অনুসারে মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন। আর্ম্মিনিয়স এবং তাঁহার শিষ্যেরা এই মতের প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ সকলের উপরেই সমান, কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে মনুষ্যেরা স্বাধীন। বর্ত্তমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতাবলম্বীই অনেক।

ওএষ্টমিনিষ্টর কনফেসন (Westminster Confession) নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর ভাবিঘটনা সকল জ্ঞাত আছেন বটে কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিয়া দেন নাই। মনুষ্য সকল স্বাধীনেচ্ছু, তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে পাপ বা পুণ্য করিয়া থাকে।

"উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বোধ হয় আমাদের দেশেও এইরূপ কোন মত এক সময় প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

যাহা হৌক এই স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের মত যে ভ্রমশূন্য নয় ইহা দেখাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বকল সাহেবের এতদ্বিষয়ক বিচারটি এখানে উপন্যস্ত হইতেছে।

তিনি বলেন "স্বাধীনেচ্ছাবাদীদের মত এই যে মনুষ্যমাত্রে বিবেচনা করে এবং জানে যে তাহারা স্বাধীন, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তর্ক করিয়াও এই বুদ্ধির অপলাপ হয় না। যাহা হৌক এই মতের পোষণের জন্য দুটী স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে। প্রথম মনুষ্যের হৃদয়ে একটি স্বাধীন চেতনাশক্তি বাস করে। দ্বিতীয় ঐ চেতনা দ্বারা যাহা জানা যায় তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কোনরূপে অন্যথা হয় না। এই দুইটী স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে প্রথমটি সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু কখনই সত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় নাই। দ্বিতীয়টি ত সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম বিবেচনা কর চৈতন্য যে মনের একটি ধর্ম্ম সে বিষয়ে কিছু স্থিরতা নাই, অনেক বড় বড় চিন্তাশীলদিগের মতে ইহা মনের একটী অবস্থা মাত্র। যদি ইহা ঠিক হয়, তবে ত স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের তর্কের বলে আঘাত হইল, কারণ যদিও, মনের ধর্ম্মসমুদয় সকল অবস্থাতেই একরূপ কার্য্য করে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু মনের অবস্থার বিষয় এ কথাটি স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু কারণবিশেষে মনের অবস্থাবিশেষ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আর যদিও চৈতন্যকে মনের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি

ইতিহাসাদিতে ইহার সম্পূর্ণ অস্থিরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যের সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে যে সকল অবস্থা অতীত হইয়াছে, প্রত্যেক অবস্থাতেই তাহাদের বিশ্বাস বিভিন্নরূপ হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই সেই অবস্থার ধর্ম্ম, দর্শন ও নীতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এক সময় যাহা বিশ্বাসের উপযোগী ছিল, অন্য সময় তাহাই আবার উপহাসের স্থল হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল বিশ্বাস যখন প্রচলিত ছিল, তখন তাহারা আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য স্বাধীনেচ্ছার ন্যায় চৈতন্যের অংশরূপে পরিগণিত হইত।

"ঐ সকল ধর্ম্মাদি চৈতন্য দ্বারা স্থিরীকৃত হইলেও উহাদিগকে কখনই সত্য বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর বিপদের পথ আশ্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক সময় সত্যের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার না করিলে চৈতন্যদ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ের সত্যতা আর কিছুতেই প্রমাণীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ তর্ক করিলে সংপ্রতিপক্ষতা দোষ সত্বেও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়।"

"আমরা সাধারণ মনুষ্যদিগের কার্য্য হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; অবস্থা বিশেষে কি মনুষ্যের ভূত প্রেতাদির অস্তিত্বের বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান হয় না? কিন্তু তাদৃশ পদার্থের স্থিতির বিষয় প্রায় সকলেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। যদি বল সে সকল জ্ঞান যথার্থ নয় ভ্রমমাত্র, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বিষয় বিশুদ্ধ চৈতন্যদ্বারা স্থিরীকৃত আর কোন্ কোন্ বিষয় বা ভ্রমাত্মক চৈতন্যদ্বারা স্থিরীকৃত ইহা কিরূপে স্থির হইবে? যদি একস্থলে চৈতন্য আমাদিগকে বঞ্চনা করে, তবে অন্য স্থলে বঞ্চনা না করিবার কারণ কি? যদি এ বিষয়ে কোন প্রতিভূ না থাকে তবে কেবল চৈতন্যের উপরই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, আর যদি কোন প্রতিভূ থাকে, তবে চৈতন্যকে একপ্রকার তাহার অধীন স্বীকার করিতে হইতেছে। এক্ষণে দেখ চৈতন্যের প্রধানতা না থাকিলে স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের মূল অশুদ্ধ হইল সুতরাং আর একটি নূতন ভিত্তি স্থাপন করা আবশ্যক হইতেছে।" *

স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের আশঙ্কা এই যে যদি আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন না হইত তবে আমরা সময়ে সময়ে চুরি ও নরহত্যা প্রভৃতি সমাজবিগর্হিত কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে কখনই নিস্তার পাইতে পারিতাম না। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে ইচ্ছা স্বাধীন হইলেই বা কিরূপে ঐ সকল নিন্দনীয় কার্য্য হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন, সুতরাং যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তখন তাহাই করিব। চুরি করিতে ইচ্ছা হইল চুরি করিলাম, খুন করিতে ইচ্ছা হইল খুন করিলাম; যদি

* See Buckle's History of Civilization page 14.

ঐ সকল ইচ্ছার প্রতিবন্ধক কিছু থাকে, তাহাহইলে আর তাহাদের স্বাধীনতা কোথায় রহিল ?

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের উৎপত্তির বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বকল সাহেব একটি যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস লিখিয়াছেন। বোধ করি এখানে তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"মনুষ্য যখন এরূপ অসভ্যাবস্থায় থাকে যে তাহাদের বাস করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে না কেবল এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করতঃ মৃগয়াদি কার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তখন তাহার কি নিমিত্ত যে কোন কোন দিন প্রচুর এবং কোন কোন দিন অল্প খাদ্য লাভ হয় ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা সকল বস্তুকেই অকস্মাৎ সঙ্ঘটিত বিবেচনা করে। তাহারা জানিতে পারে না যে সকল ভূমির সামান্যরূপ শস্য উৎপাদনকারিণী শক্তি নাই এবং ইহাও বুঝিতে পারে না যে সকল কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি একটি না একটি কারণ আছে।

"পরে যখন তাহারা কালক্রমে কৃষাণরূপে পরিণত হয় চাস বাস করিতে থাকে, তখন তাহারা দেখে যে, ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে তাহার এতদিন পরে ফল পাওয়া যায়। এক্ষণে তাহাদের কিছু কিছু ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে থাকে। এখন আর পূর্ব্বের মত সকল কার্য্যকেই অকস্মাৎ সঙ্ঘটিত বিবেচনা করে না, এক্ষণে তাহাদের হৃদয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞানের ঈষন্মাত্র আলোক প্রকাশিত হয়।

"এইরূপে সমাজ ক্রমশঃ যতই উন্নতি প্রাপ্ত হয় ততই তদন্তর্গত মনুষ্য সকল নৈসর্গিক নিয়মগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে থাকে, আর পূর্ব্বে যাহা অকস্মাৎ সংঘটিত বিবেচনা করিত তখন তাহার পরিবর্ত্তে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, স্থান গ্রহণ করে। অর্থাৎ তখন তাহারা বুঝিতে থাকে যে কোন কর্ম্ম অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না একটী কার্য্যের উৎপত্তির জন্য পূর্ব্বে আর একটী কার্য্যের অবস্থিতি আবশ্যক।

"সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত দুই মত হইতে ক্রমশঃ স্বাধীনেচ্ছা ও অদৃষ্টবাদীদিগের মত উদিত হইয়া থাকিবে। সমাজের উন্নতির সহিত যে এরূপ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইবে ইহাও কিছু আশ্চর্য্য নয়। প্রত্যেক দেশে ধনরাশি যখন একপ্রকার বর্দ্ধিত সীমা প্রাপ্ত হয় ; তখন সেখানে এক এক ব্যক্তির পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের স্ব স্ব অভাব পূরণ করিয়াও উদ্বৃত্ত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত সেই দেশে অনেকের পরিশ্রম না করিলেও চলে। ঐ সকল পরিশ্রমশূন্য মনুষ্যেরা পরিশ্রমকারী মনুষ্যগণ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া প্রায় আমোদ আহ্লাদে জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা (অতি অল্পই) বিদ্যাধ্যয়ন ও তাহার প্রচারের জন্যও যত্ন করিয়া থাকেন।"

"ইহাও সচরাচর দেখা যায় যে এই শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আবার কোন

কোন ব্যক্তি বাহ্যঘটনাবলী একবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজের মনের বৃত্তিগুলি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল মহাত্মারা যখন মনস্তত্ব বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন, তখন ইহাদিগের দ্বারা এক একটি নূতন দর্শন বা ধর্ম্ম পরিষ্কৃত হয়, যাহা বহুতর মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া নিজের অনুগামী করে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আদিমাচার্য্যগণ সাময়িক সাধারণ মত সমুদয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদের মত স্থির করেন, কারণ প্রচলিত মত সকলের আকর্ষণী-শক্তি একবারে পরিত্যাগ করা কঠিন। তবে নূতন দর্শন বা নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় যে শুনা যায়, বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে কিন্তু তৎকালপ্রচলিত মতের নূতন পদ্ধতিতে সংগ্রহ মাত্র। এইজন্য বলা যাইতেছে যে পূর্ব্বে বাহ্য জগতে যাহা অকস্মাৎ বলিয়া জ্ঞাত ছিল তাহাই ক্রমে অন্তর্জগতের স্বাধীনেচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে এবং পূর্ব্বকালের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ক্রমশঃ অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে। বিশেষ এই যে প্রথমটির উন্নতির কারণ তার্কিকগণ, দ্বিতীয়টির পোষণ কর্ত্তা ধর্ম্মপ্রচারকগণ। একদিকে তার্কিকগণ মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিরপেক্ষ অকস্মাৎ বিষয়ক মতটী তন্ন তন্ন সমালোচন করতঃ তাহার সামগ্রী দ্বারাই স্বাধীনেচ্ছা-বিষয়ক মতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যদিকে ধর্ম্মপ্রচারকগণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধের উপর একখানি ধর্ম্মের চর্ম্মমাত্র আবরণ দিয়া অদৃষ্টের আবির্ভাব করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন যে অসাধারণ ঐশীশক্তি প্রভাবে এই সৃষ্টি যথানিয়মে একরূপে চলিতেছে এক্ষণে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের সহিত এই মতেরও যোগ করিলেন যে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভেই যাহা যেরূপ হইবে তাহা একবারে নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।"*

এক অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া একটী দীর্ঘ প্রস্তাব ত লিখিয়া বসিলাম। এক্ষণে পাঠকগণের মনোরম হওয়া না হওয়ার বিষয় ইহার অদৃষ্ট। আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকি, অদৃষ্ট না থাকিলে জগতের মধ্যে সর্ব্বদা বৈষম্য ঘটিবে কেন? কিন্তু আমরা অদৃষ্টকে অদৃষ্টই রাখিতে চাই। প্রাচীন মহর্ষিগণের ন্যায় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে অদৃষ্ট বলি না; তাহার প্রথম কারণ এই যে বীজাঙ্কুর ন্যায়ে সৃষ্টি অনাদি, ইহার ঠিক তাৎপর্য্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, দ্বিতীয় কারণ এই যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলকে অদৃষ্ট বলিলে অদৃষ্টের আর অদৃষ্টত্ব থাকিল কই? দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহাতে ঈশ্বরে পূর্ব্বোক্ত দোষারোপ হয় এবং অদৃষ্টেরও অদৃষ্টত্ব থাকে না। এই নিমিত্ত আমার এই দুইটি মতের অতিরিক্ত একটি নবীন মত অবলম্বন করিয়া বলিতেছি যে, যে সকল কারণ পরম্পরা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে তাহার নামই অদৃষ্ট।

* See Buckle's History of Civilization page 9.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে বৈজিক প্রবলতাসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। জাতি-বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বীজের প্রবলতা থাকে। শৃগাল ও কুক্কুরের মধ্যে শৃগালের বৈজিক প্রবলতা অধিক; অশ্ব ও গর্দ্দভের মধ্যে গর্দ্দভের বৈজিক প্রবলতা অধিক। শৃগাল ও কুক্কুরে শাবক উৎপাদিত হইলে শৃগালের ন্যায় শাবক হয়, কুক্কুরের ন্যায় একেবারে হয় না। অশ্ব ও গর্দ্দভ সংযোগে যে শাবক জন্মে তাহা গর্দ্দভের ন্যায় হয় অশ্বের ন্যায় হয় না। এইস্থলে বলিতে হইবে অশ্ব অপেক্ষা গর্দ্দভের বৈজিকবল অধিক সেইজন্য শাবক গর্দ্দভের ন্যায় হয়।

এইরূপ আবার ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেও দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বৈজিক প্রবলতা থাকে যে তাঁহারা যে স্ত্রী গ্রহণ করুন, বা যে পুরুষ গ্রহণ করুন সন্তানে কেবল তাঁহাদেরই শারীরিক চিহ্ন প্রকাশ হইবে; অপরের কোন চিহ্নও থাকিবে না। প্রথম পরিচ্ছেদে যে সকল পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলির বৈজিক প্রবলতা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। ডারউইন সাহেব একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে কুক্কুরটির শাবক মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ হইত; যে বর্ণের কুক্কুরীর গর্ভে জন্ম হউক তাহার ঔরসজ শাবক নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হইত। উপস্থিত লেখকের একটি গাভী ছিল, তাহার বর্ণ গোয়ালারা বোধ হয় "সামলা" বলিত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের লোমে তাহার অঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল। কোথায় কৃষ্ণবর্ণ অধিক বা কোথায় শ্বেতবর্ণ অধিক এমত নহে, উভয় বর্ণের লোম সর্ব্বাঙ্গে সমভাবে সন্নিবেশিত ছিল আর তাহার খুর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই গাভীর বৎসমাত্রেই "সামলা" হইত। অন্য "সামলা" গাভীর বৎস মধ্যে কোনটি শ্বেত বর্ণের হয় বা কোনটী কৃষ্ণবর্ণের অথবা অন্য বর্ণের হয় কিন্তু যে গাভীটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে তাহার বৎস "সামলা" ভিন্ন অন্য বর্ণের কখন হয় নাই; শ্বেতবর্ণের বা রক্তবর্ণের বা যে বর্ণের বৃষজাত হউক বৎসের বর্ণ

নিশ্চয়ই “সামলা” হইত তাহার খুর নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হইত। এস্থলে বলিতে হইবে যে গাভীটির বৈজিকশক্তি অতি প্রবল ছিল। যে কোন বৃষ হউক কোন অংশে আপনার আকৃতি বৎসে দিতে পারিত না। সকল বৃষই গাভীটির নিকট বৈজিক অংশে দুর্ব্বল বলিয়া সপ্রমাণিত হইত। গাভীটির পুরুষানুক্রমে বৈজিক বিষয়ে এইরূপ প্রবল ছিল, আমরা তাহা ইহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অষ্ট্রীয়া রাজ্যের রাজরাজের বংশেও এইরূপ বৈজিক প্রবলতা আছে বলিয়া শুনা যায়। তাঁহারা যে বংশেই বিবাহ করুন, সন্তানের ওষ্ঠ তাঁহাদের বংশানুরূপ স্থূল হইবে; বিবাহিত বংশের অনুরূপ হইবে না।*

এইরূপ বৈজিক প্রবলতা কখন স্ত্রীর মধ্যে কখন পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। যেখানে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জননীর মত হয়, যেখানে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জনকের মত হয়। এইজন্য কোন কোন লেখক বলেন যে, যে স্থলে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা অধিক সে স্থলে হয় ত কন্যাসন্তান অধিক জন্মে, আর যে স্থলে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা অধিক সে স্থলে পুত্র অধিক জন্মে। ওয়াকার সাহেব লিখিয়াছেন যে আইয়রলণ্ডদেশে একজন সাহেব ক্রমে ক্রমে তিন বিবাহ করেন এবং সেই তিন স্ত্রী দ্বারা তাঁহার যত সন্তান হইয়াছিল সকল গুলিই পুত্র হইয়াছিল।† নাইট সাহেব লিখিয়াছেন যে তাঁহার দুইটী গাভী ক্রমান্বয়ে নই অর্থাৎ স্ত্রীবৎস প্রসব করে। প্রথম গাভীটি পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে চতুর্দ্দশ স্ত্রীবৎস প্রসব করে, আর অপরটী ষোড়শ বৎসরে পঞ্চদশ স্ত্রীবৎস প্রসব করে। তিনি আরও বলেন যে প্রতিবার বৃষ পরিবর্ত্তন করিতেন তথাপি স্ত্রীবৎস ভিন্ন অন্য বৎস হইত না। কেবল উভয় গাভীর একবার একটি করিয়া এঁড়ে অর্থাৎ পুরুষবৎস হইয়াছিল।‡

সর্ব্বদাই দেখা যায় যে ব্যক্তিবিশেষের কখন এক স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে পুত্র প্রসব করিয়াছে আবার সেই ব্যক্তির কোন অপর স্ত্রী হয়ত ক্রমান্বয়ে কেবল কন্যা প্রসব করিয়াছে। এমত স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা সেই পুরুষের বৈজিক প্রবলতা ছিল তাহাতেই কেবল পুত্র জন্মিয়াছে আর দ্বিতীয়া স্ত্রী অপেক্ষা তাহার বৈজিক দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়া কেবল কন্যা জন্মিয়াছে। কিন্তু বৈজিক প্রবলতা বা দুর্ব্বলতাই যে ইহার কারণ তাহা নিশ্চয় বলা যায় না; ইদানীন্তন পণ্ডিতদিগের

---

* Such are the features of the reigning house of Austria, in which the thick lip introduced by the marriage of the Emperor Maxmilian with Mary of Burgundy, is visible in their descendants to this day, after a lapse of three centuries. *Walker on Intermarriage page* 145.

† From Philosophical Trans. 1787.

‡ Quoted by Walker.

মধ্যে এরূপ মত শুনা যায় না। পূর্ব্বে যাঁহারা এইরূপ মত সমর্থন করিতেন তাঁহারা বৈজিক প্রবলতা ও বীজাধিক্য এই দুই কথার প্রভেদ বিশেষ করিয়া জানিতেন না।

অনেকে বলেন যে, যে দেশে বহু বিবাহ প্রচলিত সেখানে পুরুষেরা দুর্ব্বল স্ত্রীলোকেরা বলিষ্ঠ। এইজন্য সে দেশে কন্যা সন্তান অধিক জন্মে। এ কথা সত্য হইলে হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের বৈজিক প্রবলতা যে ইহার কারণ এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। বৈজিক প্রবলতার ফল স্বতন্ত্র। সে যাহা হউক আমাদের দেশে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু তাই বলিয়া যে বাঙ্গালায় কন্যার ভাগ অধিক এমত নিশ্চয় নাই, কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালার লোকসংখ্যা হইয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা বাঙ্গলায় স্ত্রীর ভাগ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই অথবা কুলীন প্রভৃতি যাঁহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিশেষ প্রচলিত তাঁহাদের বংশ স্বতন্ত্র করিয়া গণনা হয় নাই। সেরূপ গণনা হইলে ফল কি হইত বলা যায় না, বোধ হয় কন্যা সন্তানের ভাগ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। আমাদিগের বিশ্বাস কুলীনদিগের মধ্যে কন্যার ভাগ অধিক, এ বিশ্বাসের মূল প্রকৃত না হইতে পারে কিন্তু সচরাচর কুলীন কন্যা সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে। যদি এই বিশ্বাস প্রকৃত হয় অর্থাৎ বাস্তবিক যদি কুলীনদিগের মধ্যে পুত্র অপেক্ষা কন্যা সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে বহুবিবাহের কারণ এক প্রকার বুঝা যায়। যেখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক সে স্থলে প্রত্যেক পুরুষে একটি করিয়া স্ত্রী বিবাহ করিলে অনেকগুলি স্ত্রী অবিবাহিতা থাকে। কাজেই পুরুষদিগকে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়। বহুবিবাহের কারণ এই। কিন্তু এক্ষণে বিচার্য্য যে কুলীনদিগের মধ্যে কন্যার সংখ্যা কেন অধিক হয়? পূর্ব্বে যে মতের উল্লেখ করা গিয়াছে তদনুসারে বহুবিবাহই কি ইহার কারণ? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বহুবিবাহের ফল বহু কন্যা এবং বহু কন্যার ফল বহুবিবাহ। কিন্তু আমাদের দেশে আবহমানকাল এরূপ বহুবিবাহের প্রথা ছিল না এক সময়ে না এক সময়ে প্রথম আরম্ভ হয় সেই আরম্ভের মূল কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়া থাকে। যে স্থলে জনকের গঠন একরূপ জননীর গঠন অন্যরূপ, সে স্থলে সন্তানের গঠন প্রত্যেক অংশে জনক জননী উভয়ের ন্যায় হইতে পারে না; কোন অংশে জনকের ন্যায় কোন অংশে জননীর ন্যায় হইয়া থাকে। যথা

মহিষের ঔরসে গাভীর গর্ভে বৎস উৎপন্ন হইলে বৎসের কোন অংশ মহিষের ন্যায় কোন অংশ গাভীর ন্যায় হইবে। হয় ত শৃঙ্গ ও পুচ্ছ মহিষের ন্যায় অঙ্গগঠন গাভীর ন্যায় হইবে। বাঙ্গালির ঔরসে কাফ্রির গর্ভে যদি সন্তান হয় তাহা হইলে সন্তানের কেশ হয় ত কাফ্রির ন্যায় কুঞ্চিত হইবে, আকার হয় ত বাঙ্গালির ন্যায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। কিন্তু যে স্থলে জনক জননীর গঠন স্বতন্ত্র নহে উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একইরূপ সে স্থলে সন্তানের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণতঃ উভয়ের ন্যায় হওয়া সম্ভব। যে সন্তানের জনকজননী উভয়েই কাফ্রি সে সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাফ্রির ন্যায় হইয়া থাকে। যে গোবৎসের জনকজননী উভয়েই খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন সে বৎস অবশ্য বা উভয়ের ন্যায় খর্ব্বকায় ও শৃঙ্গহীন হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহা না হয় তবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পূর্ব্ব পুরুষের সাদৃশ্য ঘটনার কথা যাহা বলা গিয়াছে তাহা ঘটিয়া থাকিবে বা অন্য কোন বিশেষ কারণ প্রবল হইয়া থাকিবে। নতুবা সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহাতে এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, যে স্থলে বৃষ ও গাভী উভয়েই খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন সেস্থলে বৎস অবশ্য খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন হইবে।

অতএব জনকজননীর মধ্যে আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে যতই সমসাদৃশ্য থাকিবে, সন্তানের সাদৃশ্য ততই সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। কিন্তু জনকজননীরা ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভব হইলে তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে সমসাদৃশ্য বড় থাকে না। কাজেই তাঁহাদের সন্তান যে উভয়ের ন্যায় হইবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সন্তান এ অবস্থায় হয় পিতার ন্যায়, নতুবা মাতার ন্যায় হইবে, অথবা কতক পিতার ন্যায় কতক মাতার ন্যায় হইবে। অপরাপর স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা নিকট জ্ঞাতির মধ্যে পরস্পরের সমসাদৃশ্য অধিক থাকে। আবার জ্ঞাতি অপেক্ষা সহোদর সহোদরার মধ্যে সমসাদৃশ্য আরও প্রবল হয় এইজন্য বিলাতের পশু ব্যবসায়ীরা, সাদৃশ্য আবশ্যক হইলে সহোদর সহোদরার মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়া লয়, পিতা ও কন্যার মধ্যে সমসাদৃশ্য থাকে অতএব তাহাদের মধ্যেও শাবক উৎপাদন করায়। এই প্রথাকে ইংরেজিতে interbreeding বা in-and-in breeding বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোন প্রচলিত কথা নাই; বোধ হয় আপাতত ইহাকে কুলবীজক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অর্থগ্রহ হইতে পারে। এই প্রথার ভাল মন্দ দুই আছে।

ভাল ফল এই যে, যদি কোন বিশেষ গুণের নিমিত্ত কোন পশু বা পক্ষী প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত হয় অথবা তজ্জন্য অপর পশু পক্ষী অপেক্ষা তাহার অধিক মূল্য হয়, তাহা হইলে এই প্রথার দ্বারা সেই বিশেষ গুণটি বংশগত করান যাইতে পারে। বিলাতের কোন কোন গোমেষাদির বংশ যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা এই নিয়মের কৌশলে। মাতৃকুল ও পিতৃকুল স্বতন্ত্র হইলে বাঞ্ছিত গুণটি হয় ত বংশগত করান

যায় না। এক কুলের গুণ হয় ত অপর কুলের বৈজিক প্রবলতা দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে অথবা হয় ত উভয় কুলের দোষ গুণ সন্তানে আসিয়া গুণ অপেক্ষা কোন দোষের ভাগ প্রবল হইতে পারে, এই ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেবল সহোদর সহোদরার ও অভাবে নিকট জ্ঞাতি মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়া লয়। নিকট জ্ঞাতিরা কতকটা সমগুণবিশিষ্ট, এক রক্ত, কাজেই দোষ গুণ কতকাংশে একই প্রকার। এইজন্য বাঞ্ছিত গুণটি তদ্দারা রক্ষা হইলে হইতে পারে।

পশুদিগের মধ্যে এরূপ কুলবীজক যে কেবল ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রথম ঘটনা হইয়াছে এমত নহে। তাহাদের অনেক জাতির মধ্যে ইহা স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্যমধ্যে ইহা কতদূর স্বাভাবিক বলা যায় না, বোধ হয় কেবল সংস্কারবিরুদ্ধ, স্বভাববিরুদ্ধ নহে। জ্ঞাতিবিবাহ অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত আছে, জ্ঞাতিবিবাহও এক প্রকার কুলবীজক। ইহা দ্বারা পশুদিগের মধ্যে যে ফল উৎপাদিত হয় মনুষ্যদিগের মধ্যেও তাহাই হইতে পারে। অর্থাৎ জনকজননীর সহিত সন্তানের সমসাদৃশ্য জন্মিতে পারে। কিন্তু সেই উদ্দেশে জ্ঞাতিবিবাহ যে সাধারণতঃ প্রচলিত হইয়াছে এমত নহে। সন্তান জনক-জননীর মত হউক ইহা কয়জন লোকে আন্তরিক প্রার্থনা করে বা সেই অভিপ্রায়ে বিবাহ সংঘটন করে? তথাপি যে জ্ঞাতিবিবাহ ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় তাহার মূল কারণ কুলানুরূপ সন্তান কামনা নহে, কেবল মাত্র যে এই বিবাহ অল্প ব্যয়ে, অল্প যত্নে, অল্প বয়সে ঘটে বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে।

জ্ঞাতিগমন প্রথার ভাল ফলের কথা বলা গেল এক্ষণে মন্দ ফলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। পশুব্যবসায়ীরা এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে এই প্রথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে প্রচলিত রাখিলে ক্রমে পুরুষ পরম্পরায় বলক্ষয় হইতে থাকে, আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়, সন্তান উৎপাদিকা শক্তিরও হ্রাস হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেকে এ কথা একেবারে স্বীকার করেন না।* আমরা ইহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি, তবে যাঁহারা ব্যবসা উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন আমরা তাঁহাদের কথা অবহেলা করিতে পারি না। রাইট নামক একজন ব্যবসায়ী একটি শূকর প্রতিপালন করেন, সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত শূকর আপন কন্যার বংশে সন্তান উৎপাদন করে। তাহার ফল এই হইল যে, কতক শাবক অল্পদিনের মধ্যে মরিয়া গেল, কতক চলৎশক্তি রহিত হইল, কতক বা জড়বৎ জন্মিল, এমন কি দুগ্ধপানেও অসমর্থ হইল; আর কতকের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি একেবারে হইল

---

* See marriage of near kin by Mr. Huth 1876. Westminster Review xvci. See also Mr. W. Adam on consanguinity in marriage, in the Fortnightly Review 1865.

না।* নাথুসীস নামে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন জর্ম্মান স্বদেশে এইরূপ আর একটি পরীক্ষা করেন। ইয়র্কসাইয়ার হইতে তিনি এক বৃহৎ শূকরী আনয়ন করেন; শূকরী তৎকালে গর্ভবতী ছিল; জর্ম্মানীতে আসিয়া কতকগুলি বৎস প্রসব করিল। বৎসগুলি বড় হইলে নাথুসীস সাহেব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শাবক উৎপাদন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ তিন পুরুষ হইলে পর নাথুসীস দেখিলেন যে, ক্রমে খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বলকায় শাবক জন্মিতেছে এবং কতকের সন্তান আদৌ জন্মিতেছে না। শেষ তিনি উহাদের মধ্য হইতে একটী বলিষ্ঠা শূকরী বাছিয়া অন্যবংশজাত শূকরের নিকট দিলেন। তাহাতে শূকরীর প্রথমেই ২১টি শাবক জন্মিল, তৎপূর্ব্বে নিজ গোষ্ঠিতে শূকরী যে কয়েকবার গর্ভবতী হইয়াছিল তাহাতে ৫টি কি ৬টির অধিক শাবক জন্মে নাই তাহারাও অতি দুর্ব্বল হইয়াছিল।

যাঁহারা বলেন যে জ্ঞাতিগামীদিগের বংশগত কোন ক্ষতি হয় না, তাঁহারা প্রায় কেহই রীতিমত পশু ব্যবসায়ী নহেন। যাঁহারাই পালিত পশুর অবনতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত আপন পশুর বংশ অবিমিশ্রিত রাখিতে গিয়াছেন, অর্থাৎ অন্যবংশ-জাত পশুর সংস্পর্শে আসিতে দেন নাই, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে ইহাতে বাস্তবিক অনিষ্ট হইয়াছে। পশুর মূল গুণ রক্ষা হয় বটে কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কয়েকটি দোষ বংশে উপস্থিত হয়। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহা সকল পশুর পক্ষে সমভাবে অনিষ্টকর হয় না। যে সকল চতুষ্পদ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, যথা গো মেষাদি, তাহাদের পক্ষে কুলবীজক বহুকালে অনিষ্ট করে, কিন্তু অন্য পশুর বংশে কুলবীজক দুই চারি পুরুষের মধ্যেই অনিষ্ট আরম্ভ করে।

ইহার স্থূল কথা ডারউইন সাহেব বলিয়াছেন যে কুলবীজকে মন্দ ফল সহজে ধরা পড়ে না, কেন না তাহা অতি অল্পে অল্পে সঞ্চয় হইতে থাকে।† তিন চারি পুরুষ অতিবাহিত না হইলে সে সঞ্চিত দোষ লক্ষ্য উপযোগী স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয় না।‡ কিন্তু কুক্কুট, কপোত প্রভৃতির সেই তিন চারি পুরুষ অল্পকাল মধ্যেই

---

* Darwin's Variations of Animals under Domestication Vol. II. page 101.

† The evil results from close breeding are difficult to detect for they accumulate slowly. *Variation of animals*, Vol. 2 page 92.

‡ Manifest evil does not usually follow for pairing the nearest relations for two three or even four generations ; but several causes interfere with our detecting the evil—such as the deterioration being very gradual, and the difficulty of distinguishing between such direct evil and the inevitable augmentation of any morbid tendencies which may be latent or apparent in the related parents. *Darwin's Variation of animals Ch.* xvii.

অতিবাহিত হইয়া যায় অতএব তাহাদের সম্বন্ধে এই পরীক্ষা সকলেই অনায়াসে করিতে পারেন।*

পশু পক্ষীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া হউক বা অন্য কারণেই হউক, অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে মনুষ্যপক্ষে জ্ঞাতিবিবাহ অবশ্য অনিষ্টকর। আবার কেহ তাহা অস্বীকার করেন। করুন, কিন্তু একটী অনিষ্ট স্পষ্ট দেখা যায়। এক বংশে যদি কোন রোগ থাকে জ্ঞাতিবিবাহে সে রোগ দৃঢ়বদ্ধ হয়। জনকজননী উভয়েরই রক্ত আশ্রয় করিয়া সেই রোগ সন্তানে আইসে। জনকজননী ভিন্ন ভিন্ন বংশের হইলে একের রোগাংশ অপরের রক্তদ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল দেশে বহুকালাবধি জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল দেশে সকল বিবাহই জ্ঞাতির মধ্যে হয় না অধিকাংশ বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন বংশে হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে যে দুই একটী জ্ঞাতিবিবাহ ঘটে তাহাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল জানা যায় না। তদ্ভিন্ন এই বিবাহ কোন বংশেই পুরুষানুক্রমে হয় না, এবার যদি কেহ নিজগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে, হয়ত তাঁহার সন্তানেরা আবার অপর বংশে বিবাহ করে। কাজেই অনিষ্ট বড় লক্ষ্য উপযোগী হয় না।

পশুদিগের মধ্যে ব্যবসায়ীরা যেরূপ করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কোন বংশে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে তাহা হইলে জ্ঞাতিবিবাহের ফলাফল বুঝা যাইতে পারে। শুনা যায় যে মিশোর রাজ্যে রাজপরিবারের মধ্যে সহোদর সহোদরায় বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু সে বংশ শীঘ্রই লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মরাজ্যের রাজপরিবারের মধ্যে এই প্রথা কতক আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশে কিরূপ প্রথা ছিল বা আছে তদ্বিষয় আগামী সংখ্যায় বলা যাইবে।

---

* Evidence of evil effects of close interbreeding can most readily be acquired in the case of animals such as fowls, pigeons, &c. which propagate quickly and from being kept in the same place are exposed to the same conditions. *Variation of animals Ch.* xvii.

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা বলিতে পারি, শ্রুত আছে যে তিনি স্নানাহার করিতেন, এবং রজনীযোগে নিদ্রা দিতেন, ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটী ঘর বড় সুশোভিত। শ্বেত প্রস্তরের মেঝ্যা; শ্বেত প্রস্তরের প্রাচীর; তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পশু পক্ষী এবং মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন, নানা রঙ্গের বস্ত্রের বাহার দিয়া বসিয়া, কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কাহারও নাকে বড় বড় মতিদার নথ দুলিতেছে, কাহারও কাণে হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলিতেছে। অধিকাংশই যুবতী, হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—বলিতে কি একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে। কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দূষিও না—যতদিন হাসিবার বয়স আছে—ততদিন ইহারা হাসিয়া লইবে—হাসির অপেক্ষা আর সুখ কি? চিত্ত যদি নির্ম্মল হয়, আনন্দ যদি পাপশূন্য হয়, তবে এই যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌবনের হাসির অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই। কাঁদিবার দিন সকলেরই আসিবে, শীঘ্রই আসিবে। যে যত পারে হাসুক, তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ নাই।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তীদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব

চিত্রগুলি ; মহামূল্য। প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণ মধ্য হইতে বাহির করিতেছিল ; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবীর আয়ি ?"

প্রাচীনা বলিল, "এ আক্‌বর বাদশাহের তসবীর।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।"

আর একজন বলিল, "সে কি লো ? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস কেন ? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়া ছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল "ইহার দাম কত ?"

প্রাচীনা বড় দাম হাকিল, রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নূরজাঁহা বেগম কততে কিনিয়াছিল ?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল ; বলিল—"বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা তসবীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন তবে আমি তসবীর দেখাইব। আজ তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাতজন সাতদিক হইতে বলিল, "ওগো আমি রাজকুমারী ! ও আয়ি বুড়ী আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল প্রায় থামিল—কেবল তাকা তাকি আঁচাআঁচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে !

বৃদ্ধা অনিমিক্ লোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতা প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর ! বুড়ী বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না,—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেত প্রস্তরের বর্ণ নহে ;

শাদা পাথর এত গোলাবি আভা মারে না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারু বর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ও মা—পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতি দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া, বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি কাঁদিস্ কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে—আদত মানুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

আমি জানি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি অনেকে সেই রূপসীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রণাম রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম সম্বন্ধের পায়ে। "তুমি আমার গৃহিণী—অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার হাতে অন্ন জল—অতএব তোমাকে প্রণাম করি—আমাকে একমুঠা খাইতে দিও"—সে প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্তু বুড়ীর প্রণাম সে দরের নহে। বুড়ী বুঝি অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিল। তিনিই রূপ; তিনিই গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের বা অনন্ত গুণের ছায়া দেখা যায়, সেইখানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হয়। অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণাম করিল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা, এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবীর বেচিতে আসিয়াছেন ?"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন ?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি ? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে আক্‌বর বাদশাহ কি জাঁহাগীর বাদশাহের তসবীর কি নাই ?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা ? একখানা থাকিলে কি আর একখানা লইতে নাই ? আপনারা লইবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরিব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে ?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবীর সকলে দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্‌বর বাদশাহ, জাঁহাগীর, শাহা জাঁহা, নূরজাঁহা, নূরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে। হিন্দু রাজার তসবীর আছে ?"

"অভাব কি ?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পছন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে ?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তসবীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন ? এমন কাহার তসবীর যে দেখাইতে ভয় পাইতেছ ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষ্‌মনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবীর ?

বুড়ী। (সভয়ে)। রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে। বীরপুরুষের চেহারা।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহেন—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনফা করিল। তারপর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি যদি বীরের তসবীর লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল! বল!"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটীতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটী বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী। কাক পক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি প্রস্তর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটীতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী, ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত, বামচরণখানি, ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুত-কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখিগণ শিহরিল।

রাজপুত-কুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে? এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, "আয়িবুড়ি, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বলাতে হয় মা। আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি।"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুড়ী বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী বুঁদী। সে চিত্রগুলি দেশে দেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে বুঁদি গেল। সেখানে গিয়া দেখিল তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয় বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে তখন বুড়ীর মন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া

মোহর লইয়া নিমক্ খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী আর থাকিতে পারিল না—শপথ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর দুঃসাহসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল, আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—আমার দিব্য এ কথা কাহার কাছে বলিও না।

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আপনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল, জান! কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান, তখনই আপনার প্রিয় সখীর কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী দুই চারি দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাঁদী স্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাহের কাছে গল্প করিল।

ঔরঙ্গজেব সসাগরা ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ এক চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রূরমনা ঔরঙ্গজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। যে যত ক্ষুদ্র হৌক, যে যেমন মহৎ হউক, কেহ তাঁহার প্রতিহিংসার অতীত নহে। অমনি স্থির করিলেন যে, সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার গুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।"

যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল—বলিল "সে কি জাঁহাপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্যা বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য!"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই দিনেই চঞ্চলকুমারীর সর্ব্বনাশের উদ্যোগ হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্তসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিমশাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত—যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতা প্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাজার সংস্বভাব ও

রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সম্বাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী একলিঙ্গের পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীগন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিল। দেখিল, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিল। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র নির্ম্মল তাহা দেখিতে পাইল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল—"এখন উপায়?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন? উপায় নাই, সখি!—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা, যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ওপথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার করিতে পারে তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালন হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে তাহা কি একবার ভাবিয়াছ?

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাথর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল "আমিও সেই পরামর্শই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন্ করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটী অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল। বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্ম্মল জানিত ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল শিহরিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলি মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে না প্রতাপ আছে?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, কিন্তু রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিতে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল—আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ

রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইঁহার স্মরণ লই ইনি কি রক্ষা করিবেন না?"

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী—যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?"

রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর অথচ অবিকম্পিত, কণ্ঠে বলিলেন, "যে রাজপুত হইয়া, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে—সে রাজা হউক ভিক্ষুক হউক রূপবান্ হউক কুরূপ হউক যুবা হউক বৃদ্ধ হউক—যেই হউক—সে যদি আমায় যথাশাস্ত্র গ্রহণ করে তবে আমি চিরকাল তাহার দাসী হইব।"

নির্ম্মল কিছু প্রসন্ন হইল। বলিল, "রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না। গোপনে—কেহ জানিতে না পারে এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না?"

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।

নির্ম্মলা উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছু মাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।